শ্রীঅরবিন্দ : নিজের কথা

প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড

শ্রীঅরবিন্দ : নিজের কথা

প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

শ্রীঅরবিন্দ : নিজের কথা

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীঅরবিন্দ : নিজের কথা ও মায়ের কথা

প্রথম খণ্ড

শ্রীঅরবিন্দ : নিজের কথা

প্রথম বিভাগ

প্রাক্-পণ্ডিচেরী জীবন

(১) ইংলণ্ডে বাল্যজীবন ঃ ১৮৭৯-১৮৯৩

অরবিন্দ জন্মেছিলেন কলকাতায় ১৫ই অগস্ট ১৮৭২ তারিখে। তাঁর পিতা ছিলেন সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ, যাঁরা এদেশ থেকে প্রথম বিলাত-যাত্রা করেন শিক্ষালাভের জন্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম। দেশে ফিরে এলেন আচারে ব্যবহারে ও আদর্শে পুরো সাহেবীভাবাপন্ন হয়ে,—কাজেই অরবিন্দ শিশুকাল থেকে কেবল ইংরেজী ও হিন্দী কথাই বলতে শিখলেন, বহু পরে মাতৃভাষা শিখেছিলেন ইংলণ্ড থেকে দেশে ফেরার পর। পিতা এ সম্বন্ধে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন তাঁর ছেলেরা মানুষ হবে পাকা ইউরোপীয় আদর্শে। তারই জন্য ভারতে থাকতে তিনি তিন ছেলেকে প্রাথমিক শিক্ষা নিতে পাঠালেন দার্জিলিংএ আইরিশ নান্‌দের স্কুলে। ১৮৭৯ সালে তিনি ইংলণ্ডে গিয়ে তিন ছেলেকে রেখে এলেন একজন ইংরেজী পাদ্রী ও তাঁর স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে, এবং বিশেষ ক'রে বলে এলেন যেন কোনো ভারতীয়ের সঙ্গে ওদের কদাচ মিশতে দেওয়া না হয়। সেই নির্দেশমত অরবিন্দ সেখানে শিক্ষা পেতে থাকলেন, ভারত বা সেখানকার মানুষ বা সেখানকার ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছুই তিনি জানলেন না।

শ্রীঅরবিন্দের পিতা ওঁর নাম রেখেছিলেন অরবিন্দ অ্যাকরয়েড ঘোষ, পরে তিনি অ্যাক্‌রয়েড কথাটি পরিত্যাগ করেন।

ম্যাঞ্চেস্টারের গ্রামার স্কুলে শ্রীঅরবিন্দ যাননি, তাঁর দুই ভাই সেখানে গিয়েছিল। আর তিনি শিক্ষা পেতেন মিস্টার ও মিসেস্ ড্রুয়েটের কাছে। ড্রুয়েট ছিলেন ল্যাটিন ভাষাতে বিশেষ পারদর্শী। তিনি গ্রীক না শিখিয়ে ল্যাটিনই খুব ভালো ক'রে এত বেশি শেখালেন তাই দেখে লণ্ডন সেন্ট পলস্ স্কুলের হেডমাস্টার নিজেই তাঁকে গ্রীক ভাষা শিখিয়ে তাড়াতাড়ি স্কুলের উঁচু ক্লাসে উঠিয়ে দিলেন।

সে সময় ওখানকার প্রোভস্ট ছিলেন প্রোথিরো, অস্টেন্‌লে নয়।

ম্যাঞ্চেস্টারে ও সেন্ট পল্‌সে তিনি ক্ল্যাসিকের পাঠ নিতে থাকলেন। কিন্তু শেষের তিনটি বছর স্কুলের পাঠ্য শেষ ক'রে বাকী সময়টা কাটাতেন ইংরেজী সাহিত্য ও কাব্য ও উপন্যাস প্রভৃতি নিয়ে, তা ছাড়াও পড়তেন ফরাসী সাহিত্য ও ইউরোপের সমস্ত ইতিহাস। এ-ছাড়াও তিনি কিছুকাল ধরে ইটালিয় ভাষা, এবং জার্মান ও স্প্যানিশ ভাষা শিখেছিলেন। আর

বেশির ভাগ সময়ই কাটতো কবিতা রচনাতে। স্কুলের পাঠ্য প্রস্তুত করতে খুব অল্প সময়ই লাগতো, অনায়াসেই তা হয়ে যেতো অধিক পরিশ্রম না ক'রে। আর তাতেই তিনি কিংস কলেজে একটি বছরে সেখানকার সমস্ত প্রাইজগুলি জিতে নিয়েছিলেন ল্যাটিন ও গ্রীক কবিতা প্রভৃতি লিখে।

কেমব্রিজের গ্রাজুয়েট তিনি হননি। ট্রাইপস্ পরীক্ষার প্রথম অংশ পাস করেছিলেন খুব উচ্চ স্থান নিয়ে ফার্স্ট ক্লাসে। সাধারণত ওখানে বি. এ. ডিগ্রী দেওয়া হয় তৃতীয় বছরে ঐ পরীক্ষা পাস করলে, কিন্তু তিনি দ্বিতীয় বছরে পাস করলেন; সে ক্ষেত্রে চতুর্থ বছরে দ্বিতীয় অংশ পাস করলে তবে ঐ ডিগ্রী মেলে। তিনি দরখাস্ত করলে তা পেতে পারতেন, কিন্তু তাতে আগ্রহ তাঁর ছিলনা। সাধারণত যারা শিক্ষকতা করবে তাদের পক্ষেই ইংরেজীতে বি. এ. ডিগ্রী কাজে লাগে।

সেন্ট্ পল্স্ স্কুলে দিনের বেলা পড়ানো হতো। এঁরা তিন ভাই লণ্ডনে কিছুকাল ছিলেন মিস্টার ড্রুইটের মায়ের কাছে, কিন্তু ধর্ম নিয়ে মনোমোহনের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হওয়াতে তিনি এদের ছেড়ে চলে যান। বৃদ্ধা ছিলেন গোঁড়া ইভাঞ্জেলিক, তিনি বললেন এই নাস্তিকের সঙ্গে বাস করলে তাঁর মাথায় বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়বে। অতঃপর বিনয়ভূষণ ও অরবিন্দ সাউথ কেনসিংটন ক্লাবের একটি ঘরে বাস করতে থাকলেন, কারণ বাংলার ছোটলাট স্যার হেনরি কটনের ভাই জে. এস. কটন ছিলেন ওখানকার সেক্রেটারি, আর বিনয়ভূষণ ছিলেন তাঁর সহকারী। মনোমোহন বাস করতে লাগলেন একটি বাসাতে। পরে অরবিন্দকেও বাসা করতে হয়েছিল কেমব্রিজে না যাওয়া পর্যন্ত। এই সময়টাতে তাঁকে খুবই দুঃখ ও দারিদ্র্য ভোগ করতে হয়েছে। গোটা একটা বছর ধরে তাঁকে কাটাতে হয়েছে সকালে এক কাপ চায়ের সঙ্গে রুটি মাখন ও দুই টুকরা স্যাণ্ডউইচ মাত্র খেয়ে, আর সন্ধ্যায় এক পেনি মূল্যের সেভিলয় (Saveloy) মাত্র, এই ছিল সারা দিনের খাদ্য।

আই. সি. এস্ পরীক্ষায় ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষাতে যাননি কেন

ঘরে বসে থেকে না যাবার কারণ কিছু ছিলনা। আই. সি. এস্ হবার বাসনা না থাকাতেই ওরূপ দাসত্ব এড়িয়ে যাবার ছুতো খুঁজছিলেন।

চাকরি নিতে চাইনা বললে বাড়ির লোকেরা নারাজ হবে বলে এই ভাবে কৌশল ক'রে ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষাতে ফেল হ'য়ে গেলেন।

> ইণ্ডিয়ান সিভিল সারভিসের অনুপযুক্ত বিবেচিত হলে শ্রীঅরবিন্দ ক্লাসিকাল পাঠাধ্যয়নে সম্পূর্ণভাবে অভিনিবিষ্ট হলেন।

এ সব অধ্যয়ন তখন শেষ হয়ে গিয়েছে।

> সিভিল সারভিস পরীক্ষার দু'বছর পর তিনি ক্লাসিকাল ট্রাইপসে প্রথম শ্রেণীর স্নাতকরূপে কিংস কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হন।

এ ব্যাপার ঘটেছিল আগে, সিভিল সারভিসে ব্যর্থতার পরে নয়।

কুড়ি বছর বয়সের পূর্বেই ইউরোপের সকল ভাষা শেখা সম্পর্কে

প্রকৃত সত্য হবে এই যে তিনি গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরেজী ও ফরাসী ভাষাতে ভালো রকম ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন আর জার্মন, ইটালিয়ান ও স্প্যানিশ প্রভৃতি ভাষাগুলি খানিকটা পর্যন্তই আয়ত্ত করেছিলেন।

> অল্প বয়সে ইংলণ্ডে থাকা কালেই তিনি নিজের জাতিকে মুক্ত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন।

তা ঠিক কথা নয়; ঐ বয়সে তিনি ভারতীয় রাজনীতির কথা প্রথম জানতে শুরু করেন, আগে যা কিছুই জানতেন না। তাঁর পিতা তাঁকে " The Bengalee " কাগজ পাঠাতেন দাগ দিয়ে, যাতে ইংরেজের দ্বারা

ভারতীয়ের নির্যাতনের কথা থাকতো, আর তিনি চিঠিতে ঐ সব উল্লেখ করে বলতেন যে ভারতে যে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট আছে তা নিতান্ত হৃদয়-হীন। এগারো বছর বয়সেই অরবিন্দের একটা স্পষ্ট ধারণা হয়েছিল যে জগতে সাধারণভাবে একটা জোর বিপ্লব আসবে এবং তাতে তাঁকে বিশেষ অংশগ্রহণ করতে হবে। তার পর ভারতের সম্বন্ধে ঐ সকল কথা জেনে তাঁর নিজের দেশকে বন্ধনমুক্ত করার দিকেই তাঁর মন আকৃষ্ট হলো। কিন্তু সে বিষয়ে "দৃঢ়প্রতিজ্ঞ" হতে আরো চার বছর সময় লেগেছিল। যখন তিনি কেমব্রিজে গেলেন তার আগেই সংকল্প পাকা হয়ে গেছে, এবং সেখানকার ভারতীয় "মজলিশে"র সভ্য ও কিছুকাল সেক্রেটারি হয়ে থেকে সেখানে কতকগুলি বিপ্লবাত্মক বক্তৃতা দিয়েছিলেন; পরে জেনেছিলেন যে তাতেই কর্তৃপক্ষ তাঁকে আই. সি. এস্ নির্বাচন থেকে ছাঁটাই করেছিল, ঘোড়ায় চড়া বাদ দেওয়া একটা উপলক্ষ হলো মাত্র, কারণ অনেক ক্ষেত্রে ভারতে গিয়ে ঘোড়ায় চড়া শিখবো বলাতেও কাজ চলে গেছে।

> ইংলণ্ডে বালক অরবিন্দ " Lotus and Dagger " গুপ্তচক্র স্থাপনা করেন।

এটি ঠিক কথা নয়। লণ্ডনে একবার ভারতীয় ছাত্রেরা মিলে এক গুপ্তচক্র গড়ে তোলে যার নাম দেয় " Lotus and Dagger ", তাতে প্রত্যেকজন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করবে এবং তার জন্যে প্রত্যেকে এক একটি বিশেষ কাজের ভার নেবে। অরবিন্দ তার স্থাপনা করেন নি, কিন্তু তিনি এবং তাঁর ভাইরা এর সভ্য হয়েছিলেন। কিন্তু সে চক্র গোড়াতেই ভেঙে গেল, তিনি কেমব্রিজ ছেড়ে আসা এবং ভারতে ফেরার আগেই। তখনকার দিনে ভারতের রাজনীতি ছিল ভীরু এবং নরমপন্থী, এই প্রথম ইংলণ্ডে ভারতের ছাত্রেরা মিলে এমন কাণ্ড করেছিল। ভারতেও একবার অরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ বসু এমনি এক চক্র গড়েছিলেন—যাতে অল্পবয়সী রবীন্দ্রনাথও যোগ দিয়েছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবাত্মক জাতীয়তাবাদ প্রচার করা, কিন্তু তা কিছুই হয়নি। পরবর্তী কালে মহারাষ্ট্রে এই ভাব জেগে ওঠাতে পশ্চিম

ভারতে একজন রাজপুত প্রধানের নেতৃত্বে বোম্বাই শহরে পঞ্চসংসদ স্থাপিত হয়েছিল, অনেক প্রখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় রাজনীতিজ্ঞ তাতে ছিলেন। অরবিন্দ তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়েছিলেন ১৯০২-৩ সালের মধ্যে, তার আগেই তিনি বাংলা দেশে নিজের থেকে গোপনে বিপ্লবের কাজ শুরু ক'রে দিয়েছিলেন। বাংলা দেশে তিনি দেখলেন যে ছোটো ছোটো কয়েকটি গোপন দল নতুন স্থাপিত হয়েছে এবং তারা কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্য না নিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করছে, তাই তিনি সবগুলিকে একত্রিত ক'রে একটা সাধারণ লক্ষ্য নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন, যদিও তা পুরোপুরি সফল হলোনা। কিন্তু বিপ্লবের প্রচেষ্টা বাড়তে থাকল এবং সারা বাংলা দেশে শীঘ্রই ব্যাপকভাবে বিদ্বেষের বহ্নি দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল।

লণ্ডনে তিনি ফেবিয়ান সোসাইটিতে যোগ দিয়েছিলেন।

একবারও না।

বালক অরবিন্দ মানুষ ও প্রকৃতির সৌন্দর্য সম্বন্ধে বিশেষ সংবেদনশীল ছিলেন। মানুষ মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর হয় এর শত শত দৃষ্টান্ত দেখে তিনি বেদনা বোধ করতেন।

বেদনা ঠিক নয়, বিরাগ; শৈশবকাল থেকেই সকল রকম নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতনের উপর তাঁর একটা ঘৃণা বিদ্বেষ ছিল, কিন্তু তাকে ঠিক বেদনা বলা যায় না।

হয়তো পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি কিছু কিছু বাংলা জানতেন। কিন্তু একুশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি কেবল ইংরেজীতেই কথা বলতেন।

আমার পিতার গৃহে ইংরেজী ও হিন্দী ছাড়া আর কিছুই বলা হতো

না। বাংলা আমি আদৌ জানতাম না।

> অরবিন্দের ইংলণ্ডে থাকাকালীন আঠারো থেকে কুড়ি বছর বয়সের মধ্যে যে সকল কবিতা লিখেছিলেন এবং যা " Songs to Myrtilla " পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা দেখলেই বোঝা যায় যে প্রচ্ছন্ন বিদেশী প্রভাব তার মধ্যে পুরোপুরি রয়েছে, কেবল নামে ও ইঙ্গিতে নয়, কিন্তু ওখান-কারই নানা সূত্র থেকে তার প্রতিধ্বনি স্বরূপ।

বিদেশী কার কাছে? অরবিন্দ তখন ভারতের সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। খাঁটি ইউরোপীয় পরিস্থিতি ও সংস্কৃতির মধ্যে থেকে যেমন শিক্ষা ও মনোভাব ও আদর্শ পেয়েছিলেন তার থেকেই ওগুলি রচিত, তাছাড়া আর কিছু হতে পারত না। তেমনি আবার ঐ বই-খানিতেই রয়েছে ভারতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা যা তিনি লিখেছিলেন দেশে ফিরে আসার পরে, এখানকার পরিস্থিত থেকে যেমন প্রতিক্রিয়া তাঁর মধ্যে ঘটেছিল।

> স্যার হেনরি কটনের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ রাজ-নারায়ণ বসুর খুব হৃদ্যতা ছিল। তাঁর পুত্র জেম্‌স্ কটন তখন লণ্ডনে ছিলেন। এই অনুকূল অবস্থার ফলেই বরোদার গাইকোয়াড়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল।

কটন ছিলেন আমার পিতার বন্ধু, তাঁরা দুজনে আমাকে বাংলা দেশে চাকরিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু এতে গায়কোয়াড়ের কোনো সম্পর্ক নেই। জেম্‌স্ কটন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে জানতেন কেনসিংটন ক্লাবে তাঁহার সহকারী রূপে, তিনি আমাদের যথেষ্ট স্নেহ করতেন। তিনিই সাক্ষাৎ ঘটিয়েছিলেন।

> নিজের দেশের সংস্কৃতি থেকে বর্জিত হয়ে চৌদ্দ বছর

> ইংলণ্ডে বাস ক'রে যুবক অরবিন্দ বেশ সুখী ছিলেন না। তিনি কামনা করতেন যে তাঁর জাতীয়করণ গোড়া থেকে আরম্ভ করা হোক।

তার জন্য অসুখী থাকার কোনো কারণ ছিল না বা জাতীয়করণের ইচ্ছাও জাগেনি—সেটা হলো ভারতে আসার পরে, যখন ভারতের আচার আচরণ ও সংস্কৃতি প্রভৃতি জেনে দেশের সব কিছুর প্রতিই তিনি আকৃষ্ট হলেন।

> ইংলণ্ড ত্যাগের সময় দেশে আসতে ইচ্ছা থাকলেও তিনি কিছু ব্যথা বোধ করলেন। এর পর কোথায় কি ঘটবে ভেবে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেন। সে ভাব এড়াবার জন্য তিনি তখন কবিতা লিখতেন।

ইংলণ্ড ত্যাগ করাতে তেমন ব্যথাবোধ কিছুই ছিলনা, কারণ সেখানকার পূর্ব জীবনের প্রতি তাঁর আসক্তিও ছিলনা কিংবা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগও ছিলনা। ইংলণ্ডে মাত্র গুটিকয়েক বন্ধুই ছিল এবং তাও অন্তরঙ্গ নয়; সেখানকার স্থানীয় মানসিক আবহাওয়া তার অনুকূল ছিলনা। সুতরাং দুঃখ এড়াবার কোনো প্রশ্নই আসে না।

> অরবিন্দ চলেছেন ভারতে গায়কোয়াড়ের চাকরি নিয়ে; তাঁর এতদিনের বাসভূমির দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি বিদায়বাণী লিখলেন "Envoi" কবিতায়।

তা নয়, ওতে বলা হয়েছে এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে বদল হওয়ার কথা। ইংলণ্ড বা ইউরোপীয় সাহিত্য ও চিন্তাধারার প্রতি কিছু আকর্ষণ অবশ্য ছিল, কিন্তু ঐ ইংলণ্ড দেশের প্রতি নয়; ইংলণ্ডকে আপন দেশের মতো কখনই দেখেন নি, যা মনোমোহন কিছুকাল করেছিলেন। যদি ইউরোপের কোনো দেশকে দ্বিতীয় মাতৃভূমির মতো মনে হয়ে থাকে,

বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির দিক থেকে, তবে তা ইংলণ্ড নয়, কিন্তু ফ্রান্স।

ওখানে থাকতে তাঁকে নাম দেওয়া হয়েছিল অ্যাক্রয়েড অরবিন্দ ঘোষ (A.A.Ghosh) কিন্তু ইংলণ্ড ছাড়ার আগে তিনি "অ্যাক্রয়েড" বর্জন করেছিলেন।

> শ্রীঅরবিন্দের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ পেয়ে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়।

অন্য দুই ভাইএর ফিরে আসার কথা ছিলনা, কেবল অরবিন্দেরই ছিল। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তাঁর নাম করতে করতে পিতা মারা যান।

> পিতার মৃত্যুর পর সংসার পালনের ভার তাঁর উপর পড়াতে শীঘ্র চাকরি নিতেই হলো।

সে সময়ে সংসার পালনের কোনো প্রশ্নই ছিলনা। তা এলো ভারতে আসার কিছু পরে।

(২) বরোদার জীবন ঃ ১৮৯৩-১৯০৬

বরোদা রাজ্যে চাকরি

প্রথমে তিনি ঢোকেন সেটেলমেণ্ট বিভাগে, তার পর কিছুদিন স্ট্যাম্প অফিসে এবং তার পরেই কেন্দ্রীয় খাজনা বিভাগে। তার পর সেখানে কলেজে না ঢুকেই তিনি ফরাসী ভাষার লেক্‌চারার হলেন, এবং পরে নিজেই বেছে নিলেন ইংরেজী প্রফেসরের পদ। কিন্তু মহারাজা বরাবরই তাঁকে ডেকে পাঠাতেন যখনই ইংরেজীতে বিশেষ রকমের কিছু লেখার দরকার হতো, তদ্ভিন্ন সাধারণ সভাতে বক্তৃতা লিখে দেবার জন্য এবং সাহিত্য বা শিক্ষা সম্পর্কিত নানা প্রসঙ্গেও ডাক আসতো। অতঃপর তিনি কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ও পরে অস্থায়ী প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন। মহারাজার যা কিছু কাজ তিনি ক'রে দিতেন তা বেসরকারী হিসাবে; মহারাজা তাঁকে প্যালেসে ব্রেকফাস্টে আমন্ত্রণ করতেন এবং তখনই এই সব কাজ করা হতো।

×

প্রাইভেট সেক্রেটারির পদ তিনি কখনই পাননি। কাজ শিখবার জন্য তাঁকে সেটলমেন্টে, স্ট্যাম্প ও খাজনা বিভাগে দেওয়া হয়েছিল, তার পর সেক্রেটারিয়েট অফিসে ডিস্‌প্যাচ প্রভৃতি লেখার জন্য; শেষে তিনি কালজের দিকে ঝুঁকলেন ফরাসীর লেকচারার হয়ে, ও পরে হলেন ইংরেজী প্রফেসার ও শেষে ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল। এ ছাড়া চিঠিপত্র ও বক্তৃতা প্রভৃতি ও দলিল প্রভৃতি লেখার জন্য মহারাজা তাঁকে ডাকতেন, কারণ সেগুলি সাবধানে রচনা করতে হতো। এ সমস্ত ছিল বেসরকারী কাজ, প্রাইভেট সেক্রেটারি রূপে নয়। একবার মহারাজা কাশ্মীরে বেড়াতে যাবার সময় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে নানারকম খটাখটি বাধলো, তাই আর দ্বিতীয় বার কখনো সঙ্গে নেননি।

গায়কোয়াড় কর্তৃক ভোজের নিমন্ত্রণ

সাধারণতঃ এই নিমন্ত্রণগুলি ছিল কোন কাজের জন্য। তাই সেগুলি প্রত্যাখ্যান করা যেত না।

মহারাজার সার্টিফিকেট

"কর্মঠ, গম্ভীরপ্রকৃতি, ইত্যাদি"—মহারাজা শ্রীঅরবিন্দের গুণব্যাখ্যা এমনভাবে করেননি। তিনি কর্মদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার সম্পর্কে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সময়ে উপস্থিত না হওয়া ও যথাযথ নিয়ম লঙ্ঘন করার কথাও বলেছেন। অতএব পূর্বোক্ত গুণগুলির কথা না বলে যদি বলা হতো কর্মনৈপুণ্য ও ক্ষিপ্রকারিতার কথা তাহলে অনেকটা ঠিক হতো। ঐগুলি বলাতে বক্তব্যটা সমুচিত হয়নি।

কর্তৃপক্ষ তাঁর দেশাত্মক ক্রিয়াকলাপে আপত্তি করেছিল।

বরোদার কর্তৃপক্ষের কথা?

তাঁদের যে ওতে কোনো আপত্তি ছিল এমন কথা শ্রীঅরবিন্দের জানা নেই। তিনি "ইন্দু প্রকাশ" পত্রিকাতে যে প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন তা বেনামীতে, যদিও বোম্বাইএর অনেকেই জানতো যে কার লেখা। এ ছাড়া প্যালেসের কয়েকটি অনুষ্ঠানে তিনি যা ভাষণ দিয়েছিলেন, যেমন ডাঃ এস্. কে. মল্লিকের সম্বর্ধনা উপলক্ষে, তার মধ্যে রাজনীতির নাম গন্ধ ছিল না, তিনি যা বলেছেন তা বরোদা কলেজ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান-রূপে; বরোদা ছাড়ার আগে তিনি সভাপতিরূপে যা কিছু বলেছেন তাতে কেউই আপত্তি করেনি। বরং ইংলণ্ডে থাকার সময় কেমব্রিজের ভারতীয় মজলিশে তিনি যে সব বিপ্লববাদের কথা বলেছিলেন তা আপত্তিজনক বলে চিহ্নিত করেছিল ইণ্ডিয়া অফিস।

> ভারতে যখন এলেন তখন শ্রীঅরবিন্দ ভারতের কোনো ভাষাই জানেন না, কেবল একটু আধটু বাংলা ছাড়া, যা শিখতে হয়েছিল আই. সি. এস্ পরীক্ষার জন্য।

আই. সি. এস্ পরীক্ষাতে বাংলা ছিল না। পরীক্ষা পাস করার পরে তাঁকে বাংলা দেশে কর্মে নিয়োগ করা হবে বলে তিনি বাংলা শিখতে শুরু করেন। তাও শেখেন বাংলার ফেরত একজন ইংরেজ জজের কাছে, সুতরাং যা শেখা হয় তা অতি নগণ্য। বরোদায় চলে আসার পরে তিনি নিজের থেকেই বাংলা শিখে নেন।

বরোদায় বাংলা শিক্ষা

এখানে বলা দরকার যে কোনো শিক্ষক নিযুক্ত করার আগে তিনি নিজে এতটাই বাংলা শিখতে পেরেছিলেন যে বঙ্কিমের উপন্যাস ও মধুসূদনের কাব্য পড়ে তিনি বুঝতে পারতেন শেষকালে তিনি এতটাই শিখেছিলেন যে বাংলাতে নিজেই অধিকাংশ প্রবন্ধ লিখে একটি বাংলা সাপ্তাহিক তিনি পরিচালিত করতেন। তবে অবশ্য ইংরেজীর উপর তাঁর যেমন দখল ছিল বাংলাতে তা ছিল না, সেই জন্য মাতৃভাষাতে বক্তৃতা দিতে তিনি সাহস করতেন না।

> বরোদাতে দিনেন্দ্রকুমার রায়ের কাছে তিনি বাংলায় রীতিমত পাঠ গ্রহণ করেছেন।

না, তেমন রীতিমত ভাবে পাঠগ্রহণ করা হয়নি। শ্রীঅরবিন্দের সহচর রূপে দিনেন্দ্র থাকতেন তাঁর সঙ্গে, তাঁর কাজ ছিল বাংলায় কথা বলতে অভ্যাস করানো এবং ভুল করলে তা ধরিয়ে দেওয়া। সুতরাং তিনি দিনেন্দ্রের ছাত্রস্বরূপ ছিলেন না, বাংলা তিনি আগেই শিখেছেন, দিনেন্দ্র কেবল সাহায্য করতেন।

পর তাও দেওয়া থেমে গেল।

> ঐ প্রবন্ধগুলির নাম দেওয়া হয়েছিল " New Lamps for Old "—পুরানোর স্থানে নূতন আলো, তা ছিল ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে।

ভারতীয় সভ্যতা নিয়ে নয়, কংগ্রেসের পুরানো রাজনীতি নিয়ে। আলাদিনের প্রদীপ নয়, কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল দেশে কংগ্রেসের পুরানো টিম্‌-টিমে আলোর বদলে নূতন আলো এনে দেওয়া।

> তিনি বরোদা ও বোম্বাই থেকে তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে বাংলাতে পাঠিয়েছিলেন সেখানে বিপ্লবী তৎপরতার জন্য জমি প্রস্তুত করতে।

বাংলাতে বরোদা বা বোম্বাইএর কোনো বন্ধুকে পাঠানো হয়নি। প্রথম অগ্রদূত হিসাবে পাঠিয়েছিলেন একজন বাঙালী যুবককে। এঁকে শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর বরোদার বন্ধুরা বরোদার সৈন্যবিভাগে অশ্বারোহী সৈন্য রূপে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, যদিও ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নিষেধ ছিল যে কোনো বাঙালীকে সৈন্য রূপে কোথাও না নেওয়া হয়। এই ব্যক্তি খুবই উৎসাহী ও সুদক্ষ ছিল, সে কলিকাতায় গিয়েই প্রথম একটি দল গঠন করলে যা শীঘ্রই আরো বাড়তে থাকলো (পরে অনেক শাখাও স্থাপিত হয়েছিল); সে ওখানে পি. মিত্র ও অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গেও যোগদান করেছিল, তারা তখন ঐ প্রদেশে বিপ্লবের কাজ আগেই শুরু করেছে। তার পরে বারীন গিয়ে তার সঙ্গে যোগ দিলে, সে ইতিমধ্যে বরোদায় এসেছিল।

> ঐ সময়ে বোম্বাইতে উদয়পুরের কোনো রাজপুত কুমার এক গুপ্ত সমিতি গঠন করেছিল।

কোনো রাজকুমার নয়, কিন্তু উদয়পুর রাজ্যের একজন প্রধান, যাঁর উপাধি ছিল ঠাকুর। ঠাকুর নিজে বোম্বাই সমিতিতে ছিলেননা। তিনি ছিলেন গোটা আন্দোলনের শীর্ষ নেতা রূপে, সমিতি তাঁকে সাহায্য করতো মহারাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যগুলিকে এ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে। তিনি নিজে প্রধানত কাজ করতেন ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে, দুটি বা তিনটি রেজিমেন্টকে তিনি ইতিমধ্যেই হাত করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বিশেষ ক'রে এইজন্য একবার মধ্য ভারতে গিয়েছিলেন, সেখানকার রেজিমেন্টের সৈন্য ও নিম্ন অফিসারদের সঙ্গে কথা বলতে।

> বরোদায় থাকতে বাংলায় তিনি গিয়েছিলেন দেখতে যে সেখানকার লোকের রাজনৈতিক চেতনা কেমন, প্রকৃত কোনো আন্দোলন গড়ে তোলার কোনো আশা আছে কিনা।

এখানে যোগ করা উচিত যে তখন তিনি যে কাজ শুরু করেছেন তার কোনো নামকরণই হয়নি, আর তেমনি ভাব নিয়েই তিনি বাংলা দেশ দেখতে গিয়েছিলেন।

> ১৯০০ সাল থেকে শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে ঢুকতে যাতে দেশের পুনরুদ্ধারের জন্য যেসব শক্তি কাজ করছে তার সঙ্গে নিজের শক্তিকেও যুক্ত করতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অনেক কথোপকথন করেছেন, অনেক চিঠিপত্র লিখেছেন, সম্মুখীন নেতাদের উপর অনেক চাপ দিয়েছেন; কিন্তু ফল বিশেষ কিছু হয়নি।

এতে ঠিক কথাটা বোঝানো হলো না। তিনি ইতিমধ্যেই উন্নতিকামী নেতাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন এবং রাজনৈতিক কর্মীদের দল গড়া হচ্ছে, যাতে সময় উপস্থিত হলেই তাদের কাজ শুরু হয়ে যেতে পারে। কেবল জন সাধারণের দিকেই বিশেষ কিছু করা যায়নি।

> তাঁর নিজের নির্ভীক প্রদেশই তখন তাঁর এই জোরালো জাতীয়তাবাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছিল না।

সে সময়ে আর কেবল নির্ভীকই দেশ ছিল না; সেখানে বন্দে মাতরম্ মন্ত্র ঐ দেশের লোককে উজ্জীবিত করে এমন বদ্‌লে দিয়েছিল যে তারা সক্রিয় বিপ্লবের কাজে দুর্দান্তভাবে মেতে উঠল।

> তিনি দেখলেন যে বাংলা দেশে চলেছে হতাশা ও নিশ্চেষ্টতার পালা। সুতরাং অপেক্ষা ক'রে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

এখানে যোগ করতে হবে—তাই তিনি তাঁর প্রারব্ধ রাজনৈতিক কাজ লোকচক্ষুর আড়ালে নীরবে করে যেতে থাকলেন। জনগণের পক্ষে কাজের সময় তখনও আসেনি। এই ভাবেই গোপনে তিনি বরাবর কাজ করে যাচ্ছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ঘটনাচক্রে গণ আন্দোলনে প্রকাশ্যে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব না হলো।

> বরোদা রাজ্যের চাকরিতে থাকতে তিনি মাঝে মাঝে বাংলা দেশে যেতেন তাঁর দাদামশাই-এর কাছে। উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক।

এ কথা ঠিক নয়। তখনকার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ছিলনা। কয়েক বছর পরে যখন তিনি "যুগান্তর" পত্রিকাতে বারীনের সহযোগী দেবব্রত বসুর সঙ্গে ঘুরে বেড়ান প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করতে, এবং জেলায় জেলায় নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে জানতে দেশের বর্তমান অবস্থার কথা ও বিপ্লবী তৎপরতার কতদূর পর্যন্ত সম্ভাবনা আছে, তখনকার কথা তাই বটে। এতে তিনি জানলেন যে ওরূপ গোপন আয়োজন বা প্রস্তুতি বিশেষ কার্যকরী হবেনা, যদি সেই সঙ্গে সর্বব্যাপক গণ আন্দোলন না জাগে এবং জনগণ স্বাধীনতালাভের আদর্শ গ্রহণ না করে। পরবর্তী

কালে এই বিশ্বাসই তাঁকে অনুরূপ কাজে উৎসাহ দান করেছিল।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত দেওঘরে অবস্থান।

শ্রীঅরবিন্দ দেওঘরে থাকতেন সর্বদাই তাঁর মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর পরিবারবর্গের সঙ্গে। তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ী দেওঘরে থাকতেন না।

> নেতাদের মধ্যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন পি. মিত্র খুবই করিৎকর্মা ব্যক্তি।

পি. মিত্র ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ও তিনি আধ্যাত্মিক জীবন পালন করতেন; বিপিন পাল এবং আরো কয়েকজন নেতার মতো এঁরা ছিলেন বিখ্যাত যোগী বিজয় গোস্বামীর শিষ্য, কিন্তু রাজনীতির মধ্যে এসব তিনি ঢোকান নি।

> শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দেশপ্রেমে প্রভাবিত হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের বাণীগুলির দ্বারা।

বিবেকানন্দের কোনো বাণী বা রাজনৈতিক মনোভাবের কথা শ্রীঅরবিন্দ জানতেন না। কেবল প্রসঙ্গক্রমে শুনেছিলেন বিবেকানন্দের তীব্র দেশপ্রীতির কথা, যাতে নিবেদিতাও যোগ দিয়েছিলেন।

> অ্যালান হিউম ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন, যাতে ইংরেজ কর্তাব্যক্তিরা ওরই মাধ্যমে ভারতের প্রজাদের সঙ্গে মিশে দেশের শাসনসংস্কার প্রভৃতির জন্য আলোচনা করতে পারে।

সে সময়ে কংগ্রেস স্বয়ং এমন মাধ্যম হবার কথা স্বীকার করতো না, আর ব্রিটিশ রাজও তা মেনে নিতো না। তারা সন্তোষের চোখে একে দেখেনি, যথাসম্ভব তাচ্ছিল্য ক'রে চলতো। আর শ্রীঅরবিন্দও এর ঘোর বিরোধী ছিলেন, যেভাবে ব্রিটিশ রাজের কাছে দেশবাসীরা আবেদন নিবেদন জানাচ্ছে ও ব্যর্থ হ'লে কেবল প্রতিবাদ জানিয়ে দরখাস্ত করছে; তিনি চাইতেন যে দেশে আত্মনির্ভরতা আসুক, সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ করা হোক, এবং সকল শক্তিকে সংহত ক'রে দেশ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হোক।

> শ্রীঅরবিন্দ হিংসাত্মক বিপ্লব পছন্দ করতেন না, এতে তাঁর আস্থা ছিল না।

কথাটা ঠিক নয়। শ্রীঅরবিন্দ যদি হিংসাত্মক ক্রিয়া পছন্দ না করতেন তাহলে তিনি জাতীয় রাজদ্রোহকারী গোপন সমিতিতে যোগ দিতেন না। ইতিহাস তাঁকে ওরূপ শিক্ষা দেয়নি। বরং তিনি আগ্রহ সহকারে পড়েছেন বিদ্রোহের দ্বারা দেশমুক্তির কথা, যেমন হয়েছিল মধ্যযুগের ফ্রান্সে ইংরেজ-দের বিরুদ্ধে, এবং যার দ্বারা আমেরিকা ও ইটালি মুক্তি লাভ করেছিল। এই সব বিদ্রোহক্রিয়া থেকেই এবং তাদের নেতাদের থেকে তিনি যথেষ্ট প্রেরণা পেয়েছিলেন, বিশেষত জোয়ন দ'আর্ক ও ম্যাটসিনির থেকে। আর গণ আন্দোলনের কাজে যদিও তিনি গ্রহণ করেছিলেন অসহযোগ ও অহিংস প্রতিরোধের নীতি, কিন্তু তাই তাঁর একমাত্র কাজ ছিল না, যতদিন বাংলাতে ছিলেন ততদিন মুক্ত বিদ্রোহের জন্য গোপন প্রস্তুতির কাজও চালিয়ে যাচ্ছিলেন, যদি অহিংস প্রতিরোধে কোনো কাজ না হয়।

স্বদেশী, পার্নেলবাদ ও সিন্‌ফিন্‌ আন্দোলন

শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবনীতি পার্নেলবাদের উপর স্থাপিত নয়। আর সিন্‌ফিনের সঙ্গে এর মিল থাকলেও সিন্‌ফিন্‌ আন্দোলনের পূর্বেই এর সন্নপাত, সতরাং তাকে অনসরণ করেও নয়।

ইংলণ্ডে থেকে বুদ্ধিবৃত্তির চূড়ান্ত উৎকর্ষ ঘটলেও শ্রীঅরবিন্দ তাতে সুখী হননি। তাঁর গভীর মনের ধোঁকা রয়েই গেল। কেমন ভাবে দেশের লোকের কাজে লাগবেন, কেমন ভাবে কি করবেন ঠিক করতে না পেরে তিনি যোগের পথ নিলেন, যাতে ভিতরকার ভাবধারা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলিকে ঠিক ভাবে উদ্দিষ্ট কাজে লাগানো যায়।

শ্রীঅরবিন্দ অসুখী ছিলেন না। আর "মনের ধোঁকা" কথাটাও অতিশয়োক্তি হয়ে গেছে। তাঁর অভ্যস্ত কর্মপদ্ধতিই এই ছিল যে আগের থেকে কোনো মতলব না এঁটে স্থির উদ্দেশ্য রেখে কেবল লক্ষ্য ক'রে যাওয়া, সমস্ত শক্তিকে সংহত করা, এবং সঠিক সময় উপস্থিত দেখে কাজে নামা। তাঁর প্রথম রাজনৈতিক ক্রিয়া তরুণ বয়সেই ঘটেছিল (স্বাধীনতা যারা চায় এবং তার জন্য যারা কাজে নামতে প্রস্তুত তাদের একজোট করা) কিন্তু তা পরে রীতিমত আকার নিলে ১৯০২ সালে; তারও দুই বছর পরে তিনি যোগ শুরু করেন—ভাবধারা পরিষ্কার করবার জন্য নয়, যাতে আধ্যাত্মিক শক্তি মেলে এবং তাঁর গন্তব্য পথে আলোকদান করে।

তিনি নর্মদাতীরে ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন জাতীয় শিক্ষাধারা সম্বন্ধে উপদেশ নিতে।

শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মানন্দের কাছে যান জাতীয় শিক্ষা ব্যাপারের প্রশ্ন ওঠার অনেক আগেই। আর ব্রহ্মানন্দ তাঁকে কোনো উপদেশও দেননি বা পরস্পরে কোনো কথাবার্তাও হয়নি। তিনি গিয়েছিলেন তাঁর আশ্রমে কেবল দর্শন পেতে ও আশীর্বাদ নিতে। বারীনের যোগাযোগ ছিল গঙ্গনাথ ও তার গুরুর সঙ্গে, যিনি ছিলেন ব্রহ্মানন্দের পার্শ্বচর সন্ন্যাসীদের দলে, কিন্তু সে সম্পর্ক ছিল শুধু আধ্যাত্মিক।

পণ্ডিচেরীতে নীরব যোগ সাধনা শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গেই

(৩) জাতীয়তাবাদের নেতারূপে ঃ ১৯০৬-১৯১০

রাজনৈতিক জীবনের সম্বন্ধে সাধারণ বিবৃতি

শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক মতবাদ ও ক্রিয়ার তিনটি দিক ছিল। প্রথম, যার থেকে তাঁর কাজের শুরু, গুপ্ত বিপ্লবের প্রচার ও তার জন্য প্রস্তুতি, যার ভিতরকার উদ্দেশ্য থাকবে সশস্ত্র বিদ্রোহ। দ্বিতীয়, সাধারণ প্রচারণা, যাতে সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার আদর্শে দীক্ষিত ও উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা যায়, যা তখনকার দিনে অধিকাংশ লোকই অসম্ভব, অসাধ্য ও পাগলের খেয়াল বলে মনে করতো। সবাই জানতো যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অতি দুর্ধর্ষ, আর ভারত অতি দুর্বল, তার কাছে কোনো হাতিয়ার পর্যন্ত রাখা হয়নি, সুতরাং ওদিকে কোনো চেষ্টা করতে যাওয়া বাতুলতা। তৃতীয়, একটা জন সংগঠন গড়ে তোলা, যার কাজ হবে উত্তরোত্তর ক্রিয়াশীল ভাবে অসহযোগ ও অহিংস প্রতিরোধ সাধারণের তরফ থেকে বাড়িয়ে বিদেশী শাসন ব্যবস্থাকে পঙ্গু ক'রে দেওয়া।

তখনকার দিনে বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যের যুদ্ধরীতি ও অস্ত্রশস্ত্রাদি এখনকার দিনের মতো এমন উন্নত ও অপরাজেয় ছিল না: তখনও কেবল রাইফেল বন্দুক নিয়ে লড়াই হ'তো, এখনকার মতো মারাত্মক অস্ত্রাদির আবিষ্কার হয়নি, এবং বিমান শক্তিও গড়ে ওঠেনি। ভারতবাসীর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ ভেবেছিলেন যে সমুচিত সংগঠনের দ্বারা ও বাইরের থেকে সাহায্য নিয়ে এর সঙ্গে মোকাবিলা হতে পারে; আর ভারত হলো বিরাট ভূমি, সেখানে প্রকৃত ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী যা আছে তা মুষ্টিমেয়, এখানে গেরিলা যুদ্ধ ও সেই সঙ্গে সাধারণ বিদ্রোহের দ্বারাও আশানুরূপ ফল পাওয়া যেতে পারে। তদ্ভিন্ন ভারতীয় সেনাবাহিনীতেও বিদ্রোহ এনে ফেলার অবকাশ আছে। অপরপক্ষে ব্রিটিশ জাতির চরিত্র ও তাদের রাজনৈতিক প্রবৃত্তি বিশ্লেষণ ক'রে যতটা তিনি দেখেছেন তাতে জানতেন যে যদিও তারা ভারতবাসীদের আত্মমুক্তির প্রচেষ্টাকে দমন করতে চাইবে এবং তার পরে নিজেদের সাম্রাজ্যঘটিত স্বার্থকে বজায় রেখে ধীরে ধীরে হয়তো কিছু শাসন সংস্কার এনেও দেবে,

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকবে না: যদি দেখে যে বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ এখানে খুব সাধারণ ও অনিবার্য হয়ে উঠেছে, তাহলে অবশেষে সাম্রাজ্য সম্পর্ক যতটুকু সম্ভব বজায় রেখে তারা স্বাধীনতাই দিয়ে দেবে, জোর ক'রে কেড়ে নিতে হবে না।

শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে কোনো কোনো অঞ্চলের ধারণা এই যে তিনি নিতান্তই পুরোপুরি শান্তিবাদী, সকল রকম হিংসাত্মক ক্রিয়ার বিরোধী, সন্ত্রাসবাদ ও সশস্ত্র বিদ্রোহ পছন্দ করেন না, ইত্যাদি, কারণ তা হিন্দু ধর্মের পক্ষে নিষিদ্ধ। এমন কি তাঁকে অহিংসাবাদের অগ্রদূতও বলা হয়েছে। সে সমস্তই ভুল কথা। তিনি তেমন নির্বীর্য নীতিবাদীও নন আর দুর্বল নিরীহ শান্তিবাদীও নন।

জাতীয় আন্দোলনের প্রণালীরূপে অহিংস প্রতিরোধের নীতি তখন নেওয়া হয়েছিল কোনো অহিংসাবাদ ও শান্তিবাদের কারণে নয়। শান্তি সর্বাপেক্ষা উচ্চতম আদর্শ বটে, কিন্তু তার ভিত্তি হবে আধ্যাত্মিক বা অন্ততপক্ষে মনস্তাত্ত্বিক; মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন না ঘটলে তা যথার্থভাবে আসে না। অন্য কোনো ভিত্তিতে সে প্রচেষ্টা করতে গেলে (নৈতিক বা অন্য কিছু) তা ব্যর্থ হবে এবং তাতে বরং আরো খারাপ হবে। আন্তর্জাতিক সমঝোতা ও আন্তর্জাতিক শক্তির দ্বারা যুদ্ধ নিবারণ করা যদি সম্ভব হয়, যেমন চেষ্টা এখন করা হচ্ছে, তার তিনি সমর্থনই করবেন, কিন্তু তা অহিংসাবাদ হবে না, তা হবে আইনের শক্তিতে বিরোধের শক্তিকে দমন করা, আর তাও স্থায়ী হবে কিনা সন্দেহ। বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই ধরণের শান্তি আনা হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে গৃহযুদ্ধ, রাজনৈতিক বিদ্রোহ ও তার দমন প্রভৃতির ফলে রক্তারক্তি নিবারিত হয়নি। ঐ ধরনের বিশ্বশান্তিতেও তাই হতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ কখনই তাঁর এ অভিমত গোপন করেননি যে হিংসাত্মক ক্রিয়ার দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করাতে সকল জাতিরই অধিকার আছে, যদি অন্য কোনো উপায় না থাকে এবং যদি তা সে করতে সক্ষম হয়; তবে এ পথ সে নেবে কিনা, তা স্থির করবে বিচারের দ্বারা যে কোন পথ তার পক্ষে সব চেয়ে ভালো, এ ছাড়া কোনো নৈতিক কারণে নয়। এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ তিলকের সঙ্গে একমত ছিলেন এবং আরো অনেক জাতীয়তাবাদী নেতারও তাই মত ছিল, যারা অহিংসাবাদী বা শান্তিবাদী ছিলেন না।

ভারতে থাকার প্রথম কয়েক বছর শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি সম্পর্কে

হাত গুটিয়ে ছিলেন (কেবল "ইন্দুপ্রকাশে" প্রবন্ধগুলি লেখা ছাড়া) তিনি দেশের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে পাকা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাই-ছিলেন যে এমন অবস্থাতে কি করা যেতে পারে। তার পর তাঁর প্রথম চাল হলো বরোদার সেনাবিভাগের যতীন ব্যানার্জিকে তাঁর প্রতিনিধি রূপে বাংলা দেশে পাঠানো, সে গিয়ে ওখানে ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে উদ্দিষ্ট কাজের উপযোগী ক'রে তুলবে; তিনি ভেবেছিলেন যে এতে হয়তো ৩০ বছর পর্যন্ত সময় লেগে যাবে, তবেই সাফল্য আসা সম্ভব হতে পারবে। বস্তুত সেই আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য পুরোপুরি ভাবে আসতে ৫০ বছর সময় লেগে গেছে। তাকে পাঠানোর মতলব ছিল এই যে গোপনে অথবা প্রকাশ্যেও নানা অজুহাতে সারা বাংলা জুড়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রচার ক'রে সকল স্থানে দল গড়ে তোলা হবে এবং দেশের যুবকদের তাতে দলভুক্ত করা হবে। আর বয়স্ক যারা এতে সহানুভূতিশীল অথবা যাদের বুঝিয়ে বলে সমর্থন লাভ করা যাবে তাদের কাছে নেওয়া হবে আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য। প্রত্যেক শহরে এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক গ্রামেও এর কেন্দ্র থাকবে। তরুণ যুবকদের নিয়ে নানারূপ সমিতি গড়া হবে, সাংস্কৃতিক, নৈতিক সংঘ বা খেলাধূলার আখড়ার নামে, তার তলে তলে থাকবে বিপ্লবের উদ্দেশ্য। তাদের শেখানো হবে ঘোড়ায় চড়া, ব্যায়াম, জুজুৎসু, ড্রিল প্রভৃতি, যাতে সে শিক্ষা যথাসময়ে লড়াইএর কাজে লাগবে। এই ভাবের বীজ ক্ষেত্রে পড়বামাত্রই তাড়াতাড়ি তা উপ্ত হয়ে উঠল; ছোটো-খাটো যুবক সমিতি কয়েকটি আগের থেকেই ছিল, কিন্তু তাদের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না বা কোন দিক দিয়ে কি করা যায় তার কোনো নির্দেশ ছিল না, তারা অচিরে এই বিপ্লবের ভাবটি গ্রহণ করলে। তখন তাদের দেখে তাড়াতাড়ি আরো অনেক দলের সৃষ্টি হলো। ইতিমধ্যে পশ্চিম ভারতে শ্রীঅরবিন্দ এক গুপ্ত চক্রের সভ্যের সঙ্গে গিয়ে তাদের শপথ গ্রহণ করলেন এবং বোম্বাই সমিতিতে যোগ দিলেন। পরে তিনি বাংলা দেশেও ঐ সমিতির আদর্শগুলির ধরণে দীক্ষা দিতে চাইলেন। পি. মিত্র এবং আরো কয়েকজন বিপ্লবী নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তিনি এই কথা বললেন, তাতে তাঁরা সকলেই তাঁর কথামত কাজ করতে রাজী হয়ে গেলেন। তাঁদের দলের বাহ্য পরিচয় ছিল লাঠি খেলার দল; সরলা দেবীর উৎসাহে বাংলা দেশে এই সব দল গড়ে উঠেছিল, কিন্তু অনুরূপ ও অন্যরূপ নানা অজুহাতে আরো অনেক দল শীঘ্রই গড়ে উঠল।

শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশ্য ছিল সকল দলকে একজোটের মধ্যে আনা, তা যদিও সম্ভব হয়নি, কিন্তু তাতে আন্দোলন আটকায়নি, কারণ মূল উদ্দেশ্যটা সকলেই ধরে নিয়েছিল, এবং বিভিন্ন দল বিভিন্ন ভাবে কাজ করলেও এই বিপ্লবের ভাবটি সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে সক্রিয় হয়ে উঠল। তার পরে এলো বাংলা-দেশ বিভাগ। এই দেশ ভাগ করার ফলে সাধারণের মধ্যে একটা বিদ্রোহ জেগে উঠল, যা জাতীয়তাবাদী চরমপন্থীদের পক্ষে যথেষ্টই ইন্ধন যোগালে। শ্রীঅরবিন্দও তখন উত্তরোত্তর সেই দিকেই সক্রিয় হয়ে উঠলেন, তাঁর গুপ্ত ক্রিয়ার আয়োজন আপাতত আনুষঙ্গিক হয়ে রইল। তিনি তখন এই সুযোগে স্বদেশী আন্দোলনকে জাগিয়ে তুললেন এবং হিংসাত্মক বিপ্লব রইল ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু তা সাধারণের সহানুভূতি পেতে থাকল। বারীনের প্রস্তাবে তিনি "যুগান্তর" পত্রিকা বের করলেন যাতে প্রকাশ্য বিদ্রোহের কথা ও ব্রিটিশ শাসনকে অস্বীকার করার কথা প্রচার করা হতো, ও এমন কি গেরিলা যুদ্ধ করবার পদ্ধতি সম্বন্ধেও প্রবন্ধ লেখা হতো। শ্রীঅরবিন্দ নিজেও প্রথম দিকের কয়েক সংখ্যায় মূল প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং সাধারণ পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন; সহকারী সম্পাদক রূপে স্বামী বিবেকানন্দের ভাই নিজেই সম্পাদক বলে পুলিশের হাতে ধরা দিলেন এবং দণ্ডিত হলেন। শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে "যুগান্তর" এই নীতি গ্রহণ করলে যে বিদেশী ব্রিটিশ আদালতকে আমরা মানি না, তাই তাঁর পক্ষ সমর্থন করা হলো না। এতে কাগজের মর্যাদা অনেক বেড়ে গেল। বাংলার বাছা বাছা তিন জন তরুণ লেখক ওতে লিখতে থাকলেন, সারা বাংলায় ওর প্রভাব বিস্তার হতে থাকল। এখানে বলা প্রয়োজন যে সন্ত্রাস-বাদ যদিও গুপ্তচক্রের কর্মপদ্ধতির মধ্যে ছিল না, কিন্তু বাংলা দেশে দমন ও উৎপীড়নের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সেটি এখানেই জন্মেছিল।

শ্রীঅরবিন্দের দেশের কাজ "ইন্দুপ্রকাশে" প্রবন্ধ লেখা থেকে শুরু। ঐ কাগজের সম্পাদক কেমব্রিজ বন্ধু কে. জি. দেশপাণ্ডের অনুরোধে লিখলেন " New Lamps for Old " যাতে কংগ্রেসের প্রার্থনা ও প্রতিবাদের নীতিকে নিন্দা ক'রে নির্ভীক আত্মনির্ভরশীল হতে নেতাদের আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু এই খোলাখুলি উক্তিতে ভয় পেয়ে জনৈক মডারেট নেতা ভয় দেখিয়ে ঐরূপ প্রবন্ধ লেখা থামিয়ে দিলে, তখন তিনি সাধারণভাবে কংগ্রেসের কর্মক্ষেত্র আরো ব্যাপক করার প্রয়োজন সম্বন্ধে লিখতে থাকলেন। অতঃপর তিনি ১৯০৫ সাল পর্যন্ত যা কিছু দেশের কাজ করেছেন তা

গোপনে, কিন্তু তিলকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন আমেদাবাদ কংগ্রেসে, একজন উপযুক্ত বিপ্লবী নেতা হিসাবে; তিলক তাঁকে পাণ্ডেলের বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে মাঠে দাঁড়িয়ে প্রায় এক ঘন্টা কথা বললেন এবং সংস্কার-বাদীদের নিন্দা ক'রে জানিয়ে দিলেন যে মহারাষ্ট্রে কেমন ধরনের কাজ শুরু করা হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিপ্লবী তৎপরতার মধ্যে বিশেষ ভাবে একটা কাজের সূত্রপাত করেছিলেন যা জাতীয়তাবাদের একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গস্বরূপ হয়েছিল। তিনি কর্মকেন্দ্রের যুবকদের বললেন সাধারণের মধ্যে স্বদেশী ভাব প্রচার করতে, যা তখন অল্প লোকই মেনে চলতো। তাদের মধ্যে একজন সুদক্ষ যুবক ছিলেন সখারাম গণেশ দেউস্কর (পূর্বপুরুষ থেকে বাংলার বাসিন্দা) তিনি চমৎকার বাংলা লিখতেন এবং বাংলাতে শিবাজীর জীবনী লিখেছিলেন, তিনিই তাতে প্রথম 'স্বরাজ' শব্দটি ব্যবহার করেন, এবং জাতীয়তাবাদীরা স্বাধীনতার স্থানে ঐ স্বরাজ শব্দটি গ্রহণ করে। এই স্বরাজ প্রাপ্তি তাদের প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি "দেশের কথা" বলে একটি বাংলা বই লিখলেন তাতে নিখুঁত হিসাবের দ্বারা দেখিয়ে দিলেন যে ব্রিটিশরা শিল্প বাণিজ্যের মাধ্যমে কি পরিমাণে ভারতকে শোষণ করছে। এই বইখানি খুব কাজ করলে, তরুণ যুবকদের মন আকৃষ্ট করে স্বদেশীর আন্দোলনকে খুব অগ্রসর ক'রে দিলে। শ্রীঅরবিন্দ নিজেও এ বিষয়ে প্রয়োজন বোধ করেছিলেন যে ভারতের আপন শিল্পবাণিজ্যের প্রসার করা বিপ্লবের অঙ্গস্বরূপ হবে।

বরোদায় চাকরি করার জন্য তিনি প্রকাশ্যে রাজনীতি করতে পারতেন না। তদ্ভিন্ন তিনি নিজেই চাইতেন বাহ্যদৃষ্টির অন্তরালবর্তী হয়ে পিছন থেকে কাজ করতে, নিজের নাম কাউকে জানতে না দিয়ে। কেবল যখন "বন্দে মাতরম্" পত্রিকার সম্পাদকরূপে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে দণ্ডিত করল তখনই তাঁর নাম সাধারণে জানতে পারলে। আর তখন থেকে তিনি জাতীয়তাবাদের গোপন নেতা না থেকে প্রকাশ্যে বাংলার প্রধান নেতা হয়ে দাঁড়ালেন এবং প্রকাশ্য ভাবেই সকল কাজের নির্দেশ দিতে থাকলেন। তিনি ঠিক ক'রে ছকে নিয়েছিলেন যে দেশের কাজ কোন রাস্তায় অগ্রসর হবে; তা ছিল কতকটা আয়র্ল্যাণ্ডের সিন্‌ফিন্ আন্দোলনের মতো, যার সূত্রপাত হয়েছিল আমাদের অনেক পরে; তিনি সিন্‌ফিন্ থেকে কোনো সত্র পাননি এবং তার সম্বন্ধে জানলেন পণ্ডিচেরী যাবার পরে। কিন্তু

আয়র্ল্যাণ্ড ও ভারতের মধ্যে একটা মস্ত পার্থক্য আছে যার জন্য এখানে কাজ করা খুব কঠিন হয়েছিল। কারণ আইরিশরা আবহমান কাল থেকেই ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী এবং স্বাধীন হবার জন্য বারেবারেই বিদ্রোহ করে এসেছে; কিন্তু ভারতের বেলা বরং তার উল্টা কথা। শ্রীঅরবিন্দকে অনবরত চেষ্টা করতে হয়েছে ভারতবাসীদের মনে স্বাধীনতার ভাবটি জাগিয়ে তুলতে, এবং সেই সঙ্গে প্রথমে দল গঠন ক'রে রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়িয়ে যেতে হয়েছে যাতে ক্রমশঃ সমগ্র জনগণও এতে যোগ দিতে এগিয়ে আসে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসকে আবেদন নিবেদনের সভামাত্র থাকার বদলে বিপ্লবাত্মক ক্রিয়ার জন্য দখল ক'রে নেওয়া; কংগ্রেসকে দখল করতে না পারলে গড়ে তুলতে হবে এমন একটি বিপ্লব কেন্দ্র যা সমগ্র দেশের ক্রিয়া পরিচালিত করবে। সেটি হবে রাজ্যের ভিতরকার রাজ্য, যেখান থেকে লোকের কাছে সকল নির্দেশ প্রেরিত হবে এবং কর্ম সম্পাদনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠিত হবে; বিদেশী গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অসহযোগ ও অহিংস প্রতিরোধের মাত্রা এতই বাড়িয়ে তোলা হবে যে শাসনকার্য চালানোই তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে; এমন সর্বব্যাপী অশান্তি দেখা দেবে যে ওদের দমননীতি অকেজো হয়ে উঠবে, অবশেষে দেশে প্রকাশ্য বিদ্রোহ জাগবে। এই প্রোগ্রামের মধ্যে থাকবে ব্রিটিশদের সকল ব্যবসাকে বর্জন ওদের স্কুল কলেজ বর্জন ক'রে নিজেদের জাতীয় স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠা, ওদের আদালতের বদলে নিজেদের সালিসী আদালত স্থাপন করা যাতে সকলকেই যেতে হবে, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা যারা পরে মুক্তি সৈন্য রূপে বিদ্রোহ আনবে, ইত্যাদি।

এই ভারতীয় রাজনৈতিক তৎপরতার কাজ নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ খুব কম সময়ের জন্যই প্রত্যক্ষ নেতারূপে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তার পরে এই কর্মধারা থেকে সরে ১৯১০ সালে পণ্ডিচেরীতে চলে গেছেন; তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রোগ্রামের অনেক কিছুই বাতিল হয়ে যায়, তথাপি এ কাজ এতটাই চালিয়ে যাওয়া হয় যাতে ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতার লক্ষ্য দৃঢ়বদ্ধ হয় এবং অসহযোগ ও প্রতিরোধের ক্রিয়া চলতে থাকে, আর মাঝে মাঝে বিদ্রোহ দেখা দিতে থাকে, এতেই শেষ পর্যন্ত বিজয়লাভ ঘটে। পরে যা কিছু করা হয়েছে তা শ্রীঅরবিন্দের পন্থাই প্রধানত অনুসরণ ক'রে। শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদীরা কংগ্রেস অধিকার ক'রে নেয়, স্বাধীনতা লাভই লক্ষ্য বলে ঘোষণা করে, কেবল মুসলমান ও অবনত জাতির কিছু

অংশ ছাড়া সমগ্র দেশই এর নির্দেশ মেনে নিয়ে প্রথম জাতীয় ভারত সরকার গড়ে ওঠে এবং ব্রিটিশরা ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করে।

প্রথমে শ্রীঅরবিন্দ আড়াল থেকেই কাজ করতেন, কারণ তখনও বরোদা রাজ্যের চাকরি ছাড়েননি; কিন্তু তিনি বিনা বেতনে দীর্ঘকালের জন্য ছুটি নিতেন, তার মধ্যে গুপ্ত বিপ্লবের কাজ ছাড়াও তিনি বরিশাল সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন যা পুলিশ ভেঙে নষ্ট ক'রে দেয়, আর বিপিন পালের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ পরিক্রমা করেছেন ও কংগ্রেসের চরমপন্থী দলের সঙ্গে সংযোগ রেখেছেন। এই সময়ে বিপিন পালের সহযোগিতায় "বন্দে মাতরম্" পত্রিকার সম্পাদনা করেন। নতুন রাজনৈতিক দল গঠন ক'রে তিনি কলিকাতা কংগ্রেসে তিলকের নেতৃত্বে চরমপন্থী দলে থাকেন, যারা সংখ্যায় কম হলেও নিজেদের প্রোগ্রাম কতকটা প্রস্তাবভুক্ত করেন। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ স্থাপিত হওয়াতে তিনি বরোদার চাকরি পরিত্যাগ ক'রে এইখানে প্রিন্সিপ্যাল রূপে যোগ দেন। সুবোধ মল্লিক ছিলেন গুপ্ত বিপ্লবের কাজে ও রাজনৈতিক আন্দোলনেও তাঁর সহযোগী, কলকাতায় তাঁরই বাড়িতে তিনি থাকতেন, তিনি ঐ কলেজ স্থাপনার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করেন, এবং কথা থাকে যে শ্রীঅরবিন্দকে মাসিক ১৫০ টাকা বেতন দেওয়া হবে; সুতরাং এখন তিনি তাঁর সকল সময়টাই দেশের কাজে নিয়োগ করতে সক্ষম হলেন। বিপিন পাল মাত্র ৫০০ টাকা নিয়ে দৈনিক "বন্দে মাতরম্" চালাতে আরম্ভ করে কোনো আর্থিক সাহায্য না পেয়ে শ্রীঅরবিন্দকে এর ভার নিতে বললেন। তিনি তখনই সম্মত হলেন কারণ দেখলেন যে এই হলো বিপ্লবাত্মক প্রচার কার্যের উপযুক্ত সুযোগ। তিনি কংগ্রেসের নব আদর্শের তরুণদের একত্র করে তিলকের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রীয় দলের সঙ্গে হাত মেলাতে বললেন, যারা নরমপন্থীদের সঙ্গে সংগ্রাম করবে। "বন্দে মাতরম্" পত্রিকা হলো এদের দলীয় কাগজ, এবং আর্থিক ব্যবস্থার জন্য একটী বন্দে মাতরম্ কোম্পানি স্থাপিত হলো, এবং বিপিন পাল প্রচারের জন্য জেলায় জেলায় প্রেরিত হওয়াতে শ্রীঅরবিন্দ নিজেই কাগজের সমস্ত ভার গ্রহণ করলেন। কাগজের প্রচুর কাটতি হতে থাকল সমগ্র ভারত জুড়ে। এই কাগজ সম্পাদনায় বিপিন পাল এবং শ্রীঅরবিন্দ ছাড়াও কয়েকজন সুদক্ষ লেখক ছিলেন, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, বিজয় চ্যাটার্জি। ইংরাজী ভাষাতে শ্যাম-সুন্দর ও বিজয় ছিলেন ওস্তাদ; শ্যামসুন্দর লিখতে থাকলেন শ্রীঅরবিন্দের

ধাঁচে, তাতে অনেকেই মনে করলে সেই প্রবন্ধগুলি সব শ্রীঅরবিন্দেরই লেখা। কিন্তু পরে এদের সঙ্গে বিপিন পালের মনান্তর ঘটল, বিশেষত রাজনীতির বিষয়ে, কারণ বিপিন পাল ছিলেন বিপ্লববাদের বিরোধী। এতে বিপিন পাল কাগজ ছেড়ে চলে গেলেন। শ্রীঅরবিন্দ এটা হতে দিতেন না, কারণ বিপিন পাল নেতা হবার উপযুক্ত না হলেও একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তক ব্যক্তি ছিলেন, উৎকৃষ্ট লেখক এবং বক্তা ছিলেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তখন মারাত্মক জ্বরে পীড়িত হয়ে শরীর সারতে বাইরে গেছেন। তাঁর বিনা অনুমতিতে কাগজের সম্পাদক বলে তাঁর নাম ছাপা হয়েছিল, কিন্তু তা মাত্র একদিনের জন্য, তখনই তিনি তা বন্ধ ক'রে দিলেন, কারণ তখনও বরোদার চাকরি ছাড়েননি, তদ্ভিন্ন নিজের নাম প্রকাশ্যে জাহির করা তিনি চাননা। কিন্তু এর পর থেকে কাগজের বক্তব্যসূত্র তিনিই নিয়ন্ত্রণ করতেন। কাগজের নতুন দলের লক্ষ্য বিপিন পাল বলেছিলেন ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে স্বায়ত্তশাসন; কিন্তু তার মানে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনও হতে পারে, যাকে কলকাতা কংগ্রেসে দাদাভাই নওরোজি স্বরাজ নামে অভিহিত করেছিলেন। তাই শ্রীঅরবিন্দের প্রথম কাজ হলো সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করা যে পূর্ণ স্বাধীনতাই এই দলের লক্ষ্য, এবং এই কথাই কাগজে পুনঃপুনঃ লিখিত হতে থাকল। শ্রীঅরবিন্দই হলেন প্রথম নেতা যিনি প্রকাশ্যভাবে এ কথা ঘোষণা করতে থাকলেন এবং তার ফলও চমৎকার হলো। এঁদের দল পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থে 'স্বরাজ' শব্দটি ব্যবহার করতে থাকল এবং তাই সর্বত্র গৃহীত হলো। কিন্তু কংগ্রেস এ আদর্শ মেনে নিলে অনেক পরে করাচি সম্মেলনে, যখন জাতীয়তা-বাদীরাই নেতৃত্বে প্রাধান্য লাভ করল। 'বন্দে মাতরম্' কাগজে নতুন আদর্শ প্রোগ্রাম রাখা হলো অসহযোগ, প্রতিরোধ, স্বদেশী গ্রহণ, বিদেশী বর্জন, জাতীয় শিক্ষাবিধি, সালিসী বিচার প্রভৃতি, সবই শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। শ্রীঅরবিন্দ কাগজে এইগুলি সম্বন্ধে যুক্তি দেখিয়ে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখতে থাকলেন, মডারেট নেতাদের দ্বারা গঠিত বদ্ধ ধারণাগুলি ভেঙে দেবার জন্য যে—ব্রিটিশরা অতি ন্যায়পরায়ণ, তারা দেশের অনেক উপকার করেছে, তাদের আইন আদালত নিখুঁত, তাদের স্কুল কলেজের শিক্ষাবিধি উদার—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার বদলে সত্য এই যে ওরা জাতিকে পঙ্গু করেছে, উন্নতির অবরোধ ঘটিয়েছে, আর্থিক দাসত্ব ঘটিয়েছে, বড়ো রকম কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে দেয়নি, এবং বিদেশীদের

অধীনে থাকার আরো নানা দুর্গতি; তা ছাড়া যদিও ওরা উপকারী হয় তথাপি স্বাধীনতার তুলনায় পরাধীনতা কখনো কাম্য হতে পারে না। এই সকল ভাবধারা সর্বত্রই আদৃত হলো, বিশেষত পাঞ্জাবে। জনগণের মনকে নতুন ভাবে দীক্ষিত ক'রে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করার দিক দিয়ে "বন্দে মাতরম্" যে কাজ করেছে জগতের সংবাদপত্রের ইতিহাসে তা অতুলনীয়। কিন্তু আর্থিক দিক দিয়ে সেরূপ কথা নয়, কারণ চরমপন্থীরা সকলেই দরিদ্র। যতদিন পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন ওর পরিচালক ততদিন কোনোগতিকে তিনি চালাচ্ছিলেন, কিন্তু গণসমর্থন সত্ত্বেও কাগজটির আশানুরূপ বিস্তার ঘটেনি, তারপর যখন তিনি এক বৎসর জেলে আটকে রইলেন তখন কাগজের অবস্থা অতি শোচনীয় হয়ে উঠল; শেষ পর্যন্ত কাগজ বন্ধ ক'রে দেওয়াই স্থির হলো, আর বিজয় চ্যাটার্জিকে এমন প্রবন্ধ লিখতে বলা হলো যাতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টই ওর প্রকাশ বন্ধ ক'রে দেয়। শ্রীঅরবিন্দ বরাবরই এমন সতর্কতা নিয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতেন যাতে রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হয়ে কাগজের অস্তিত্বই না লোপ পায়। "স্টেটস-ম্যান" পত্রিকার সম্পাদক লিখলে যে এর প্রবন্ধগুলিতে পুরোপুরি রাজদ্রোহ প্রচার করা হচ্ছে, কিন্তু এমনই দক্ষতার সঙ্গে যে আইনের বন্ধনে ফেলা যায় না। কিন্তু এখন ঐ কৌশল সফল হলো, শ্রীঅরবিন্দের অনুপস্থিতিতে কাগজটি বন্ধ হয়ে গেল।

গভর্ণমেন্ট দমননীতি নেবার আগে জাতীয়তাবাদী প্রোগ্রামের মাত্র আংশিক সূচনা হয়। ওর প্রধান পদ ছিল স্বদেশী ও বয়কট; স্বদেশী নীতি যথেষ্টই প্রচার করা হয়েছিল, তার ফল হয়েছিল বিলম্বে। শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছিলেন যে কেবল ভাবের প্রচার নয় কিন্তু বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দ্বারা তা যেন বাস্তবে কার্যকরী হয়। বরোদায় থাকতে তিনি লিখে পাঠাতেন যে ধনী শিল্পপতিদের ও বড়ো জমিদারদের একজোট করে যেন এমন কল কারখানা খোলা হয় ও জিনিস উৎপাদন করা হয় যাতে স্বদেশী নীতি বাস্তবে সফল হয়। কিন্তু জবাব এলো যে তা অসম্ভব, শিল্পপতি ও ধনীরা এতে ভয় পায়, আর ব্যবসাদারেরা ব্রিটিশ মাল আমদানি ক'রে লাভবান সুতরাং এটাই তারা বজায় রাখতে চায়। সুতরাং ও সংকল্প তাঁকে ছাড়তে হলো। তিলক ও শ্রীঅরবিন্দ দুজনেই চাইতেন ব্রিটিশ জিনিস বর্জন, কিন্তু কেবল ব্রিটিশ জিনিসই, অন্য কোনো বিদেশের জিনিস নয়। এঁরা বলতেন যে সকলে প্রয়োজনমত জার্মানি অস্ট্রিয়া ও আমেরিকার

জিনিস কেনো, যাতে ব্রিটিশের উপর চাপ পড়ে। এই বয়কট হবে রাজ-নৈতিক অস্ত্র স্বরূপ; সম্পূর্ণ বিদেশী বর্জন চলতে পারে না, আর কংগ্রেসে যা প্রস্তাব করা হলো তা বিশেষ কাজের নয়। কংগ্রেস বললে দেশের উৎপাদন বাড়াও এবং দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করো, সাধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি এখানে তৈরী হোক এবং ভারতে তার যথেষ্ট উপাদান আছে; কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া কোনো কাজের কথা নয়, কারণ ভারত স্বাধীন হলেই তাকে ঘরের জিনিস রপ্তানিও করতে হবে আর বাইরের জিনিস আমদানিও করতে হবে, আন্তর্জাতিক লেনদেন বজায় রাখতে হবে। কিন্তু বিদেশী বর্জন ভাবটি প্রচুর সমর্থন লাভ করলে এবং নেতারা এ বিষয়ে প্রচুর উৎসাহ ও প্ররোচনা দিয়ে সকলকে উৎসাহিত করতে থাকল। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাও হলো আর একটি প্রোগ্রাম যার উপর শ্রীঅরবিন্দ বিশেষ গুরুত্ব দিলেন। বরোদার কলেজে প্রফেসররূপে কাজ ক'রে তিনি ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজের শিক্ষাবিধির অসারতা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তিনি বোধ করেছিলেন যে ঐরূপ শিক্ষাতে ভারতের ছাত্রদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শাণিত বোধকে ভোঁতা ও অকেজো করে দেওয়া হয়, মন্দ বুদ্ধি অভ্যাস করানো হয়, এবং সংকীর্ণ ধরণের মুখস্থ করা জ্ঞান দিয়ে তাদের মৌলিকতা নষ্ট করা হয়। এ আন্দোলনেও যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গেল, বাংলা দেশে অনেক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হলো এবং তাতে উপযুক্ত ব্যক্তিরা শিক্ষক হয়ে পড়াতে লাগলেন, তথাপি আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় উন্নতি আশানুরূপ হয়নি। শ্রীঅরবিন্দ স্থির করেছিলেন যে তিনি স্বয়ং এই আন্দোলন পরিচালিত ক'রে দেখবেন যে এই প্রচেষ্টাকে আরো ব্যাপক ক'রে এর ভিত্তি সুদৃঢ় করা যায় কিনা, কিন্তু বাংলা দেশ ছেড়ে যাওয়াতে তা আর সম্ভব হলো না। দমননীতির প্রভাবে ও প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে বিদ্যালয়গুলি স্থায়িত্ব লাভ করতে পারলে না। কিন্তু ওর ভাবটি টিকে রইল পরে কখনো সাফল্য লাভের জন্য। সালিসী বিচারের আদালতও কয়েকটি জেলাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কাজ করছিল, কিন্তু তাও বিপর্যস্ত হয়ে বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু স্বেচ্ছাবাহিনীর দলগুলি প্রাণবন্ত হয়ে টিকে রইল, আরো সংখ্যাতে বাড়তে থাকল, এবং মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত দেখাতে লাগল। জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক অংশটি সমানে কাজ করতে থাকল এবং প্রতিবার দমন ও নির্যাতনের পরে আবার মুক্তির আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠতে থাকল;

এই ভাবে তা প্রায় পঞ্চাশ বছর সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। সব চেয়ে বড়ো কথা, এতে দেশের মধ্যে এক নতুন মনোবলের সাড়া জেগে উঠেছে। বন্দে মাতরম্ ধ্বনি যখন চারিদিকে মুখর হয়ে উঠত তখন লোকে উৎফুল্ল হয়ে বুক ফুলিয়ে মনে করতো যে আমরা বেঁচে আছি, আমাদের আশা করবার কিছু আছে; লোকের আলস্য ও ভয় ঘুচে গিয়ে তাদের মনে এমন এক তেজ দেখা দিল যা কিছুতেই দমে না, আর এই জনতেজেরই তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠে শেষে ভারতকে পূর্ণ জয়ের দ্বারদেশে এনে ফেললে।

"বন্দে মাতরম্" পত্রিকার মামলার পরে শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তাবাদের নেতারূপে স্বীকৃত হলেন। মেদিনীপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি তাঁর দলবল নিয়ে গেলেন, সেখানে দুই দলে বিরোধ বাধল। তিনি এই প্রথম মঞ্চে উঠে বক্তৃতা দিলেন, আর সুরাটে অনেক সভাতে সভাপতিত্ব করলেন। ওখান থেকে কলকাতায় ফেরার পথে অনেক স্থানে নেমে বড়ো বড়ো সভাতে তাঁকে ভাষণ দিতে হলো, কারণ জনগণ তাঁর কথা শুনতে উদগ্রীব হয়েছিল। অতঃপর হুগলি সম্মেলনে দলবল নিয়ে গিয়ে প্রথম বুঝতে পারলেন যে নতুন জাতীয়তাবাদই ক্রমে প্রাধান্য লাভ করছে, আর বিষয় নির্বাচন কমিটিতে মডারেটদের প্রস্তাবকে নাকচ ক'রে দিতে তিনি সক্ষম হলেন, তাকে নিতান্ত অবাস্তব প্রস্তাব বলে। কিন্তু মডারেটরা যখন কংগ্রেস পরিত্যাগ করার ভয় দেখালে তখন তা নিবারণ করবার জন্য তিনি ওদের প্রস্তাবই পাস হতে দিলেন, এবং সভায় ঘোষণা করলেন যে ঐক্য বজায় রাখার জন্যই তিনি নিজের দলকে ওতে সম্মত করালেন, যাতে শক্তির ভাগাভাগি না হয়। মডারেট দলের সকলে আশ্চর্য হয়ে ভাবলে যে তাদের বড়ো বড়ো নেতারা যাতে বিফল হলো, একজন তরুণ যুবকের কথায় কিভাবে সকলেই তাতে রাজী হয়ে গেল।

এই সময়টিতে তিনি "নবশক্তি" নামক বাংলা দৈনিকের ভার নিয়ে আগে যেখানে স্কট্‌স লেনে স্ত্রী ও ভগ্নীকে নিয়ে থাকতেন সেখান থেকে উঠে এলেন ঐ দৈনিক পত্রিকার অফিসের বাড়িতে। একদিন ভোরে যখন সেখানে ঘুমোচ্ছিলেন তখন পুলিশ রিভলভার হাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। থানা থেকে তাঁকে আলিপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে এক বছর থাকতে হয় ম্যাজিস্ট্রেটের ও আলিপুর সেশন আদালতের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত। সেখানে কিছু-কাল তাঁকে নির্জন গৃহে রাখা হয়, পরে অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে তিনি

একটা বড়ো ঘরে থাকেন; অবশেষে জেলের মধ্যে অ্যাপ্রুভার খুন হবার পরে প্রত্যেক কয়েদীকে আলাদা আলাদা ঘরে রাখা হয়, কেবল আদালতে ও শরীর চর্চার সময় পরস্পরে সাক্ষাৎ হতো কিন্তু কথা বলা চলত না। এই মাঝের সময়টিতে তিনি তাঁর সহযোগী অনেক কয়েদীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। জেলে অধিকাংশ সময় তিনি গীতা ও উপনিষদ পড়তেন ও গভীরভাবে যোগ করতেন। সকলের সঙ্গে মিলে থাকবার সময় যখন একা থাকার সুযোগ ছিল না, তখনও তাই করতেন। হাসি তামাশা খেলাধূলার মধ্যে এবং হট্টগোলের মধ্যেও তিনি তাইতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, আর যখন একা রাখা হয়েছিল তখন তার পুরোপুরি সুযোগই পেয়েছিলেন। সেশন আদালতে কয়েদীদের সকলকে একটা খাঁচার মধ্যে রাখা হতো, সেখানে সর্বক্ষণই তিনি ধ্যানে মগ্ন থাকতেন, আদালতে কি বলা হচ্ছে সেদিকে কান দিতেন না। চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন জাতীয়তার দলভুক্ত বিখ্যাত ব্যারিস্টার, তিনি তাঁর সমস্ত পসার ত্যাগ ক'রে মাসের পর মাস শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ নিয়ে লড়তে থাকলেন, আর তাঁরই হাতে সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে তিনি নির্লিপ্ত হয়ে রইলেন; কারণ ভিতরে ভিতরে তিনি নিশ্চয়তা পেয়েছিলেন যে মুক্তি তিনি পাবেনই। এই জেলে বাস করার কালে জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর সম্পূর্ণই বদলে গেল; তিনি যোগের পথ নিয়েছিলেন এই ধারণাতে যে এতে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ ক'রে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের নির্দেশ পাবেন। কিন্তু এখন আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক জীবনের উপলব্ধির মাত্রা বাড়তে বাড়তে তা এতই বেড়ে গেল যে এক বৃহত্তর ব্যাপক ক্ষেত্রে তাঁকে সম্পূর্ণ উঠিয়ে দিলে এবং দেশমুক্তি ও দেশসেবার পরিধিকে ছাড়িয়ে আরো বৃহত্তর জগৎব্যাপী পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে গিয়ে তাঁকে জানিয়ে দিলে যে সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর কিছু করবার আছে, যার আভাস তিনি ইতিপূর্বেই কিছু পেয়েছিলেন।

জেল থেকে যখন তিনি বেরিয়ে এলেন তখন দেখলেন যে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলে গেছে; জাতীয় নেতারা অধিকাংশই জেলে অথবা অজ্ঞাতবাসে, দেশবাসীর মনোভাব বদলে না গেলেও দমনের ফলে হতাশ ও নিরুদ্যম। শ্রীঅরবিন্দ সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য কলকাতায় প্রতি সপ্তাহে সভা করতে লাগলেন, কিন্তু যেখানে হাজার হাজার উৎসাহী শ্রোতা এসে জুটতো সেখানে শতের বেশি হয় না এবং তাদের মধ্যেও আর তেমন তেজ বা স্ফূর্তি নেই। তিনি বিভিন্ন জেলাতেও নানা

স্থানে গেলেন, এবং উত্তরপাড়াতে এক সভাতে প্রথম বললেন তাঁর যোগ ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা। এ ছাড়া তিনি দুটি সাপ্তাহিক বের করলেন, ইংরেজীতে "কর্মযোগীন" ও বাংলাতে "ধর্ম" নাম দিয়ে, তার বেশ কাটতি হতে থাকল এবং তা স্বয়ংনির্ভর হয়ে উঠল। ১৯০৯ সালে তিনি বরিশাল সম্মেলনে যোগ দিলেন; কারণ দুই দলে বিচ্ছেদ না হওয়াতে এখন কেন্দ্রীয় মডারেটরাই কংগ্রেসের স্থলে। সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীঅরবিন্দকে এবং জাতীয় দলের আরো দুজনকে নিয়ে এক ঘরোয়া বৈঠকে প্রস্তাব করলেন যে আগামী বেনারস সম্মেলনে দুই দলে মিলে দক্ষিণপন্থীদের হারিয়ে দেবেন, এবং তিনিই প্রধান নেতা হবেন চরমপন্থীদের হাতে রেখে; কিন্তু এতে জাতীয়তাবাদীদের মডারেট দলভুক্ত হয়ে তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ এতে রাজী না হয়ে বললেন যে সংবিধান এমন বদলানো হোক যাতে জাতীয়তাবাদীরা আলাদাভাবে তাদের দলের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। এতে আলোচনা ভেঙে গেল। শ্রীঅরবিন্দ তখন ভাবতে থাকলেন যে বর্তমান অবস্থাতে কেমন উপায়ে জাতীয় আন্দোলন আবার পুনরুজ্জীবিত করা যায়। তিনি দেখলেন যে অ্যানি বেসান্টের হোম রুল আন্দোলনে যোগ দেওয়া সম্ভব, যাকে গভর্ণমেন্ট দমন করতে পারেনি, কিন্তু তাতে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে হয়। পরবর্তী কালে গান্ধীজীর প্রবর্তিত অহিংস প্রতিরোধের আন্দোলনকে জোরদার ক'রে তোলার কথাও তিনি ভেবে দেখলেন। কিন্তু তিনি তেমন আন্দোলনের নেতাও এখন আর হতে পারেন না।

যে ভুয়ো রকমের শাসনসংস্কার প্রবর্তন করতে তখনকার গভর্ণমেন্ট প্রস্তাব করেছিল তাতে কখনই তিনি মত দেননি। তিনি বরাবরই এই নীতি রেখেছিলেন "কোনো আপোষ নয়" আর এখন "কর্ম-যোগীন" পত্রিকাতে দেশবাসীদের প্রতি খোলা চিঠিতে লিখলেন "শাসন ক্ষমতায় হাত না পেলে কোনো সহযোগিতা নয়।" দেশের মনোনীত মন্ত্রীদের হাতে ও নির্বাচিত লোকসভার হাতে যদি শাসনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা না দেওয়া হয় তাহলে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের কোনো-প্রস্তাবেই রাজী হওয়া নয়। এমন হবার কোনো চিহ্নই দেখা গেল না, কেবল পরে মন্টেগু সংস্কার প্রস্তাবে সামান্য কিছু দেওয়া হলো। তিনি বুঝলেন যে গভর্ণমেন্ট দেশবাসীর চাহিদার আধাআধি দিতে চাইবে,

কিন্তু তেমন কিছু না আসা পর্যন্ত বিশ্বাস নেই। মন্টেগু প্রস্তাব এলো শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরিতে চলে যাবার নয় বছর পরে, যখন তিনি রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিযুক্ত আছেন আর দেশের কাজে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করছেন, আর অবশেষে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ও ভারতীয় নেতাদের মিলিত আলোচনার ফলে এলো ক্রিপ্স প্রস্তাব, এবং তার পরে আরো কিছু ঘটল।

কিন্তু এর আগে শ্রীঅরবিন্দকে সরিয়ে দেবার জন্য গভর্ণমেন্ট বদ্ধ-পরিকর হয়েছিল, যেহেতু তিনিই তাদের দমন নীতির প্রধান অন্তরায়। দ্বীপান্তরে পাঠাতে সক্ষম না হয়ে ওরা তাঁকে দেশান্তরিত করতে চাইলে। ভগিনী নিবেদিতা এ-কথা জানতে পেরে শ্রীঅরবিন্দকে বললেন ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করে যেতে এবং বাইরের থেকে নির্বিরোধে দেশের কাজ করতে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ "কর্মযোগীন" পত্রিকাতে নিজের সই দিয়ে চিঠি লিখলেন যে দেশান্তরে যদি চলে যেতে হয় তাই দেশবাসীকে তিনি তাঁর শেষ উইল লিখে দিচ্ছেন; এতেই কাজ হলো, ঐ গুপ্ত মতলবও বিফল হওয়াতে গভর্ণমেন্ট সুযোগ খুঁজতে থাকল যাতে কোনো অজুহাতে তাঁকে রাজদ্রোহে অভিযুক্ত করা যায়, এবং সে সুযোগ তারা পেলে যখন তিনি ঐ 'কর্মযোগীন' পত্রিকাতেই এক প্রবন্ধ লিখলেন বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা ক'রে। সেই প্রবন্ধে নরম ভাব ছাড়া উগ্রভাব কিছু ছিল না, এবং পরে হাইকোর্ট ঐ প্রবন্ধকে রাজদ্রোহসূচক নয় বলাতে ওর মুদ্রাকর ছাড়া পেয়ে যায়। ইতিমধ্যে এক রাত্রে শ্রীঅরবিন্দ 'কর্ম-যোগীন' অফিসে বসে খবর পেলেন গভর্ণমেন্ট ঐ অফিস খানাতল্লাসি ক'রে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে মনস্থ করেছে। এ-অবস্থায় কি করা যায় ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তিনি উপর থেকে আদেশ পেলেন, তুমি ফরাসী চন্দননগরে চলে যাও। তৎক্ষণাৎ তিনি সে আদেশ পালন করলেন, কারণ তখন তিনি এই রকমই স্থির করেছিলেন যে ভগবৎ নির্দেশমতই তিনি চলবেন, তার আর ব্যতিক্রম বা নড়চড় হবে না; সুতরাং কারো সঙ্গে তিনি কোনো পরামর্শ না ক'রে দশ মিনিটের মধ্যে সটান গঙ্গার ঘাটে গিয়ে নৌকায় উঠলেন আর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই চন্দননগরে পৌঁছে গোপন স্থানে বাস করতে লাগলেন। তিনি নিবেদিতার কাছে খবর পাঠিয়ে দিলেন যে তাঁর অবর্তমানে যেন নিবেদিতা কাগজ সম্পাদনার ভার নেন। এখন থেকে দুটি পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলো। চন্দননগরে থেকে তিনি

সব কাজ বন্ধ ক'রে দিয়ে কেবল নির্জন ধ্যানে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে রইলেন। তারপরে আবার আদেশ এলো পণ্ডিচেরি চলে যাবার জন্য। উত্তরপাড়ার কয়েকজন বিপ্লবী যুবক নৌকাতে ক'রে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গেল; সেখান থেকে "ডুপ্লে" জাহাজে উঠে তিনি পণ্ডিচেরিতে পৌছলেন ৪ঠা এপ্রিল ১৯১০।

এর পর থেকে পণ্ডিচেরিতে তাঁর যোগ সাধনা উত্তরোত্তর তাঁর সর্ব-শক্তিকে গভীর ভাবে ওতেই নিয়োগ করলে। তিনি রাজনৈতিক সব কাজ পরিত্যাগ করলেন, কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করতে যাবার প্রস্তাব একাধিক বার প্রত্যাখ্যান করলেন, কোনো বিষয়ে কোনোরূপ উক্তি দিতে অস্বীকৃত হলেন, কেবল আধ্যাত্মিক প্রবন্ধ "আর্য" পত্রিকাতে লেখা ছাড়া অন্য কোথাও কিছু লিখলেন না। কয়েক বছর পর্যন্ত তিনি দুই একজন ব্যক্তির মাধ্যমে বিপ্লবীদের সঙ্গে কিছু গোপন চিঠিপত্র লেখালেখি করেছিলেন, পরে তাও ছেড়ে দিয়ে রাজনৈতিক কোনো সম্পর্কই আর রাখলেন না। ভবিষ্যৎ দৃষ্টি উন্মীলিত হওয়াতে তিনি স্পষ্টই দেখলেন যে নানারকম শক্তিগুলি যে ভাবে কাজ করছে তাতে ভারতের স্বাধীনতা লাভ অপরিহার্য, আর ভারতের অটুট প্রতিরোধ ও আন্তর্জাতিক প্রভাবের চাপে ব্রিটিশরা শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হবে এবং নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও ঘটনাবলী সেই দিকেই ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে। এতে তিনি জানলেন যে সশস্ত্র বিদ্রোহের কোনো প্রয়োজন হবে না, সুতরাং সে প্রচেষ্টা ছেড়ে দিলেও কোনো ক্ষতি হবে না, যদিও বিপ্লবের ভাব বজায় থাকা চাই এবং তা চলতে থাকবে। অতএব তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়াসের আর কোনো প্রয়োজন থাকছে না। তা ছাড়া তাঁর আধ্যাত্মিক কর্মের দিকটা তাঁর কাছে ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল, তিনি দেখলেন যে এখন তাঁর সকল শক্তি সেই দিকেই নিযুক্ত রাখা দরকার। তাই যখন আশ্রম স্থাপিত হলো তখন তিনি তাকে রাজ-নৈতিক সকল সংস্রব থেকে মুক্ত রাখলেন, যদিও ব্যক্তিগত ভাবে তিনি দুবার রাজনীতির সংস্রবে এসেছিলেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এবং আরো অনেকে মোটে বিশ্বাসই করেনি যে তিনি রাজনীতি প্রকৃতই ত্যাগ করেছেন, তারা ভেবেছিল যে ফরাসী ভারতে আশ্রয় নিয়ে গোপনে গোপনে তিনি বিপ্লবের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ও দল গঠন করছেন। কিন্তু তা গুজব মাত্র, সত্য নয়। রাজনীতি থেকে এবং ব্যক্তিগত সকল তৎপরতা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছিলেন ১৯১০ সালে, এবং তখন থেকে তিনি ব্যক্তি-

গত ভাবে নির্জনবাসই করতে থাকেন।

কিন্তু তাই বলে সকলে যেমন ভেবেছিল তা নয় যে তিনি আর জগতের সম্বন্ধে বা ভারতের ভাগ্য সম্বন্ধে কোনো ধারই ধারেন না, সব কিছু থেকে দূরে সরে গিয়ে আপন আধ্যাত্মিক মার্গের চূড়ায় উঠে বসে আছেন। তা হতেই পারে না, কারণ তাঁর যোগের উদ্দেশ্যই ছিল কেবল ভগবৎ প্রাপ্তি নয় ও পূর্ণ আধ্যাত্মিক চৈতন্যলাভ নয়, কিন্তু সমগ্র জীবনকে ও জগৎকে সেই চৈতন্যের আওতার মধ্যে এনে ফেলা এবং তারই ভিত্তিতে মানুষের জীবনকে একটা আধ্যাত্মিক অর্থ দেওয়া। সেই নির্জনবাসে থেকেও তিনি জগতে এবং ভারতে কোথায় কি হচ্ছে তার সব খবরই রাখতেন, যেখানে দরকার সেখানে শক্তি প্রয়োগ করতেন, যদিও তা নীরব আধ্যাত্মিক শক্তি। কারণ যারা উচ্চ যোগসিদ্ধ হয় তারা সকলেই জানে যে জড়জগতে মন-প্রাণ-দেহের স্থূল শক্তিক্রিয়া ছাড়াও এমন অনেক অদৃশ্য শক্তি ও তেজ আছে যা উপর থেকে ও পিছন থেকে কাজ করে। আর যারা আধ্যাত্মিক চেতনাতে যথেষ্ট অগ্রসর তারা ইচ্ছা করলে তেমন ধরনের সক্রিয় শক্তির অধিকারী হতে ও তাকে ইচ্ছামত প্রয়োগ করতেও পারে, যদিও সকলে তা চায় না। কিন্তু সেই শক্তি অন্যান্য সকল শক্তি অপেক্ষা অধিক জোরালো এবং অধিক ফলপ্রদ। এইরূপ শক্তি শ্রীঅরবিন্দ লাভ করেছিলেন, এবং প্রথমে ব্যক্তিগত বিষয়ে সাফল্য পেয়ে সেই শক্তিকে তিনি জগতে ক্রিয়াশীল শক্তিগুলির উপর নিত্য প্রয়োগ করেছেন। এর সাফল্য তিনি যথেষ্টই দেখেছেন, তাই অন্যরূপ কোনো বাহ্য ক্রিয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। দুবার অবশ্য এর উপরে আরো কিছু প্রকাশ্য কাজের দরকার হয়েছিল। প্রথম হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। প্রথমে ঐ নিয়ে তিনি কিছু মাথা ঘামাননি, কিন্তু যখন দেখলেন যে হিটলার অন্য সব শক্তিকে চূর্ণ করে দিয়ে জগতে নাৎসি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তখন তিনি সক্রিয় হলেন। নিজেকে তিনি মিত্র শক্তিদের সপক্ষে বলে ঘোষণা করলেন, যুদ্ধের তহবিলে কিছু অর্থ দিলেন এবং যারা এই যুদ্ধে যেতে চায় তাদের উৎসাহিত করলেন। আর তলে তলে তিনি ডান্‌কার্কের পরাজয়ের পর থেকেই মিত্র শক্তিদের সপক্ষে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রেরণ করতে থাকলেন। যখন সকলেই মনে করছে যে এবার ইংলণ্ডের পতন আসন্ন ও হিটলারের জয় অবশ্যম্ভাবী, তখন হঠাৎ দেখা গেল যে জার্মন বিজয়লাভের গতি থেমে গেছে, যুদ্ধের ফলাফল বিপরীত দিকে মোড়

নিয়েছে। এ কাজটি তিনি করেছিলেন কারণ তিনি দেখলেন যে হিটলারের পশ্চাতে রয়েছে মারাত্মক সব আসুরিক শক্তি, সুতরাং তাদের জয় হওয়া মানেই জগতের মানুষকে অশুভ শক্তির অত্যাচারের দাস হয়ে থাকতে বাধ্য করা, তাতে মনুষ্য জগতের আধ্যাত্মিক বিবর্তনের ধারা একেবারে থেমে যাবে; আর তাতে কেবল ইউরোপই নয়, সমগ্র এশিয়া এবং সেই সঙ্গে ভারতও তাদের দাস হয়ে থাকবে; সে দাসত্ব এমন হবে যা এদেশ কখনই সহ্য করেনি, আর এখানকার মুক্তিপ্রয়াস সমস্তই বিফল হয়ে যাবে। এই কারণেই যখন ক্রিপ্‌স সংস্কার প্রস্তাব এলো তখন তিনি প্রকাশ্যভাবেই কংগ্রেস নেতাদের তা মেনে নিতে বললেন। জাপানী তৎপরতার সময় তিনি নানা কারণে কিছু করতে চাননি, যতক্ষণ পর্যন্ত বোঝা না গেল যে তারা ভারতকেও আক্রমণ করতে চায়। যুদ্ধের সমর্থনে ও হিটলারের কাজের পরিণাম সম্বন্ধে মন্তব্যপূর্ণ তাঁর কিছু চিঠিপত্র তিনি প্রকাশ হতেও দিয়েছিলেন। আর ক্রিপ্‌স প্রস্তাবকে তিনি সমর্থন করেছিলেন এই কারণে যে তাহলে ভারত ও ব্রিটেন একত্রে দাঁড়াবে আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে এবং তাতে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি এক ধাপ এগিয়ে যাবে। যখন ও প্রস্তাব ভেঙে গেল তখন শ্রীঅরবিন্দ আততায়ীদের বিরুদ্ধে আপন অধ্যাত্ম শক্তি প্রয়োগ করতে থাকলেন, তাতে দেখলেন যে এতদিন পর্যন্ত জাপানীরা যে দ্রুত জয়ের পর জয়লাভ করছিল তা থেমে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু উল্‌টে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের চরম ও মারাত্মক পরাজয় ঘটল। আর এটাও তিনি দেখলেন যে তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সফল হয়েছে, ভারত স্বাধীন হয়েছে, যদিও আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল রয়ে গেছে।

শ্রীঅরবিন্দ ভাইসরয়ের কাছে একমাত্র টেলিগ্রামের দ্বারা ১০০০ টাকা পাঠিয়েছিলেন যুদ্ধের তহবিলে ডোনেশন হিসাবে, উদ্দেশ্য ছিল এই যে তিনি নাৎসি পক্ষের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তিদের সমর্থন করছেন। মাদ্রাজের গভর্ণরকে তিনি একটি চিঠিও দিয়েছিলেন আরো কিছু টাকা দিয়ে যা পরে প্রকাশিত হয়েছিল। যুদ্ধের সমর্থনে তাঁর অন্যান্য লেখাও প্রকাশিত হয়েছিল। আর ক্রিপ্‌সের প্রস্তাবগুলির অনুমোদনে তিনি স্বয়ং ক্রিপ্‌স্‌কেই লম্বা টেলিগ্রামে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক মত ও শান্তিবাদ সম্বন্ধে

অনেক স্থানে বলা হয়েছে যে শ্রীঅরবিন্দ রাজনৈতিক মতামতের দিক থেকে শান্তিবাদী ছিলেন। যদিও তিনি সন্ত্রাসবাদ পছন্দ করতেন না, তথাপি তিনি যে মহাত্মা গান্ধীর মতো অহিংসাবাদী ছিলেন এ ধারণা ভুল। তিনি তাঁর মতামত " Essays on the Gita "তে স্পষ্টই ব্যক্ত করেছেন যে গীতাবর্ণিত "ধর্মযুদ্ধের" তিনি সমর্থন করেন। তা যদি না করতেন তাহলে মিত্রশক্তিদের পক্ষে যুদ্ধে তিনি সমর্থন দিতেন না। এবং নিজের ভক্তদের সৈনিক হিসাবে যুদ্ধে যোগ দিতেও বলতেন না। তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে অন্যান্য পত্রিকাদিতে ও বন্দে মাতরম্"-এ যা বলা হয়েছে তা তাঁর নিজের উক্তি নয়। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের যে নীতি তখন নেওয়া হয়েছিল প্রয়োজন বোধে, অহিংস বা শান্তিবাদী নীতি হিসাবে নয়। শান্তি অবশ্য সর্বোচ্চ আদর্শ কিন্তু তা আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে। অন্য দিক দিয়ে তা ব্যর্থ হবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিক শক্তির দ্বারা যুদ্ধ বর্জন করা যায় কিন্তু তা অহিংসা হলো না। আর তাতেও ঘরোয়া যুদ্ধ বন্ধ হবে না। স্বাধীনতা লাভের জন্য কোনো জাতি অবশ্যই যুদ্ধনীতি গ্রহণ করতে পারে এই মতই তিনি বরাবর পোষণ করতেন। তিলক এবং অন্যান্য জাতীয়বাদী নেতারও এই মত ছিল। বিপ্লবীরা যে গোপনে কাজ করেছে তার কারণ ছিল অন্যরূপ। সময় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত গোপন রাখাই প্রয়োজন ছিল। এ বিষয়ে সকল ভ্রান্ত ধারণা সংশোধিত হওয়া উচিত।

"যুগান্তর" পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন দত্ত সম্বন্ধে

সত্যের খাতিরে ওর নাম বাদ দেওয়াই উচিত। ভূপেন দত্ত 'যুগান্তরে' একজন সাধারণ কর্মী ছিল মাত্র, কিছু লিখতে পারত না। পুলিস যখন তল্লাশী করতে এসেছিল তখন সে নিজেই অগ্রসর হয়ে বললে আমি এডিটর, যদিও তা একেবারে মিথ্যা। তার পর সে নিজেকে আদালতে সমর্থন করবার চেষ্টা করেনি। প্রকৃত এডিটর ছিল বারিন, উপেন ব্যানার্জি, দেবব্রত বসু যিনি পরে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছিলেন। উপেন ও

দেবব্রত বাংলা রচনায় ধুরন্ধন ছিলেন এবং বারিন প্রভৃতির লেখাই জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই হলো সত্য কথা। ভূপেনের নাম বাদ দেওয়া উচিত।

> শ্রীঅরবিন্দ যখন কলকাতায় স্থায়ীভাবে এলেন তখন যেন তিনি স্বাধিকার প্রাপ্ত হলেন। তাই মোটা মাহিনা ও ভবিষ্যৎ উন্নতির পদ ছেড়ে বরোদা ত্যাগ করতে ইতস্তত করলেন না।

শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৪ সালের ও ১৯০৬ সালের কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন এবং চরমপন্থীদের চারটি প্রস্তাবে যোগ দিয়েছিলেন—"স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা", এবং মডারেটরা শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ১৯০৬ সালের প্রস্তাবসূচীতে তা গ্রহণ করেছিল। তখন বিপিন পাল "বন্দে মাতরম্" পত্রিকা বের করেছেন মাত্র ৫০০ টাকা নিয়ে । শ্রীঅরবিন্দ বিপিন পালের অনুপস্থিতিতে ঐ কাগজের সম্পাদনা করেন এবং তাকে জাতীয়তাবাদী দলের মুখপত্র ক'রে নিয়ে অর্থের ব্যবস্থা করেন। তিনি দলের নেতাদের একত্র ক'রে বলেন যে আর লুকোচুরি নয়, এবার মডারেট-দের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিমত জানিয়ে বিপ্লববাদ প্রচার করা দরকার। এর পরেই তিনি বরোদার চাকরি ছেড়ে আসেন, তখন তিনি বিনা বেতনে দীর্ঘ ছুটি নিয়েছিলেন; সেইজন্যই তিনি "বন্দে মাতরম্" কাগজের সম্পাদক রূপে নাম দিতে পারেননি, যদিও বিপিন পাল ছেড়ে যাবার পরে তিনিই সব কিছুর পরিচালনা করছিলেন।

> বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি তার প্রিন্সিপ্যাল হলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতের মিল না হওয়াতে তিনি ও কাজ পরিত্যাগ করলেন।

গোড়াতেই তিনি কলেজের পরিচালনার ভার শিক্ষাবিদ সতীশ মুখার্জির হাতে ছেড়ে দিয়ে রাজনৈতিক কাজে পুরোপুরি লিপ্ত হয়েছিলেন। যখন

তাঁর বিরুদ্ধে "বন্দে মাতরম্" মামলা শুরু হলো তখন পাছে কলেজের কর্তৃপক্ষরাও ওতে জড়িয়ে পড়ে তাই তিনি কলেজের পদটি পরিত্যাগ করলেন। মুক্তিলাভের পর আবার সে পদ গ্রহণ করেছিলেন। তার পরে আলিপুর বোমার মামলা যখন শুরু হলো তখন কলেজের কর্তৃপক্ষ-দের অনুরোধে তিনি শেষ পর্যন্ত ঐ পদ পরিত্যাগ করেছিলেন।

×

কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের কোনো মতভেদ হয়নি, তিনি 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার মামলার কারণেই পদত্যাগ করেছিলেন, যাতে কলেজের কোনো ক্ষতি না হয়। আলিপুর জেল থেকেই তিনি পদ-ত্যাগ পত্র দেন।

সতীশ মুখার্জি

১৯০৩-০৭ সালের মধ্যে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ সম্পর্কে সতীশ মুখার্জিকে জানতাম। তারপর আর যোগাযোগ হয়নি। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে কিছু জানতাম না, কেবল জেনেছিলেম যে তিনি বিজয় গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন,—বিপিন পাল এবং মনোরঞ্জন গুহ প্রভৃতিও তাই ছিলেন। সতীশ মুখার্জি খুব কর্মদক্ষ ও শিক্ষাবিদ ছিলেন, এই পর্যন্ত।

> বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ থেকে পদত্যাগের পর শ্রীঅরবিন্দ স্বাধীনভাবে ন্যাশনালিস্ট পার্টি ও তার মুখপত্র 'বন্দে-মাতরম্'-এর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট হতে পেরে-ছিলেন।

পূর্বে যা বলা হয়েছে তার থেকে দেখা যাবে যে এ ব্যাপার ঘটেছিল অনেক আগেই।

"বন্দে মাতরম্" পত্রিকাতে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক মতবাদ

রাজনৈতিক ব্যাপারে শ্রীঅরবিন্দের সুনির্দিষ্ট নীতিই ছিল ব্রিটিশদের কাছে কোনোরূপ আবেদন না করা, একে তিনি বলতেন ভিখারিবৃত্তি। কিন্তু কাগজে যে সব প্রবন্ধ ও প্রহসন ও বিদ্রূপসূচক জিনিস লেখা হতো সেগুলি ছিল শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর লেখা, শ্রীঅরবিন্দের নয়। শ্যামসুন্দর চমৎকার নকল রচনা করতে পারতেন এবং সুন্দর অলংকার ও উপমা প্রভৃতি দিয়ে প্রচুর হাস্যরসের সৃষ্টি করতে পারতেন। আর তিনি শ্রীঅরবিন্দের লেখার ধাঁচ এমন নকল করতেন যে কার লেখা কেউ ধরতে পারত না। শ্রীঅরবিন্দের অনুপস্থিতিতে শ্যামসুন্দরই সম্পাদকীয় লিখতেন, কেবল শ্রীঅরবিন্দ নিজে দেওঘর থেকে যা পাঠাতেন সেগুলি ছাড়া।

শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতির মধ্যে কখনো কিছু বিদ্বেষ ছিল না। ইংলণ্ডকে বা ইংরেজ জাতিকে তিনি ঘৃণা করেননি; তিনি ভারতের স্বাধীনতা চাইতেন ন্যায্য দাবী হিসাবে, কোনো কুশাসন বা নির্যাতনের জন্য নয়; যেখানে কাউকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেছেন, সেখানে তা করেছেন তাদের রাজনীতিক ক্রিয়া বা মতামতের জন্য, অন্য কোনো কারণে নয়।

> ১৯০৭ সালে তিনি যে "বন্দে মাতরম্" পত্রিকার সম্পাদক রূপে অভিযুক্ত হয়েছিলেন তা " The New Path. " "নতুন পথ" নামক কয়েকটি প্রবন্ধ লেখার জন্য।

তা নয়, অভিযুক্ত হয়েছিলেন সম্পাদকের নামে লেখা একটি চিঠির জন্য এবং "যুগান্তর" মামলার কয়েকটি প্রবন্ধের জন্য। কোনো সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য কখনো অভিযোগ হয়নি। "স্টেট্‌সম্যান" পত্রিকার সম্পাদক লিখলে যে এর প্রবন্ধগুলি এমন চাতুর্যের ভাষাতে লেখা যে তার মধ্যে পুরোপুরি রাজদ্রোহের কথা থাকলেও আইনের কবলে তাকে ধরা ছোঁয়া

যায় না। শাসকদেরও নিশ্চয় সেই মতই ছিল, কিন্তু কখনই তারা এই কাগজের তিন জন সম্পাদকীয় লেখকের কোনো লেখাকেই অভিযুক্ত করতে সাহস করেনি। তা ছাড়া এ-কথা ঠিক যে কোনো জাতিগত ঘৃণা দ্বেষ বা কুশাসন বা অত্যাচারের কারণে তিনি দেশের স্বাধীনতা চাননি, স্বাধীনতারই মৌলিক দাবীতে স্বাধীনতা চেয়েছেন। তিনি এই ভাব নিয়েছিলেন যে অধীনতার গভর্ণমেন্ট যতই ভালো হোক তবু নিজেদের স্বাধীন গভর্ণমেন্টের সমান নয়।

> অভিযোগ ফেঁসে গিয়ে তিনি মুক্ত হলেন, কিন্তু তার ফল এই হলো যে তাতে শ্রীঅরবিন্দকে সাধারণের দৃষ্টির সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে এবং শিক্ষিত লোকেরা সকলে "বন্দে মাতরম্" কাগজ পড়তে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল।

কাগজে লিখতেন এবং নেতার কাজ করতেন অন্তরাল থেকে, তিনি প্রকাশ্যে নিজের নাম জাহির করতে বা নিজেকে দেখাতে চাইতেন না, কিন্তু অন্যান্য নেতারা কারারুদ্ধ হওয়াতে এবং ঐ মামলাটির কারণে তিনি সাধারণের মঞ্চের সম্মুখে নেতারূপে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন।

> ১৯০৪ সাল থেকে কংগ্রেসের মধ্যে একটা চরমপন্থী দল গড়ে তোলা হয়েছিল আর তার সদস্যরা বোম্বাই কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্যে অপেক্ষা করে ছিল যাতে তারা সেখানে নিজেদের জানান দিতে পারে।

স্পষ্ট বোঝা গেল না কোন্ বিষয়ে কথাটা বলা হচ্ছে। ১৯০৪ সালে চরমপন্থী দল খোলাখুলিভাবে গড়ে ওঠেনি। যদিও কংগ্রেসের মধ্যে একটা অগ্রগামী দল ছিল, আর মহারাষ্ট্রেই ছিল তা শক্তিশালী, কিন্তু অন্যান্য স্থানে তা ছিল তখনো দুর্বল। অধিকাংশ যুবকদের নিয়েই গড়ে উঠেছিল এই দল। নেপথ্যে কখনো কখনো ঝগড়াও হত, তবে তা

সাধারণের গোচরে আসেনি। এমন কি এই চরমপন্থীরা একটা সুসংবদ্ধ দলেও পরিণত হয়নি। ১৯০৬ সালে শ্রীঅরবিন্দই বাংলার এই দলটিকে প্রকাশ্যভাবে সাধারণের সম্মুখে আসতে রাজি করান। তিনিই তিলককে তাদের নেতা বলে ঘোষণা করেন আর কংগ্রেসকে আয়ত্তাধীনে আনার জন্য, দলমত গঠন ও দেশের কাজের উপর কর্তৃত্ব আনার জন্য নরম-পন্থী নেতাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। কলকাতা কংগ্রেসের যে অধিবেশনে খোলাখুলি সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় দুটি দলের মধ্যে সেখানে শ্রীঅরবিন্দ উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তখনো নেপথ্য থেকে কাজ করছিলেন। দ্বিতীয় সংঘর্ষ বাধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে, মেদিনীপুরে। এখানেই তিনি প্রথমবার প্রকাশ্যভাবে বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদীদলের নেতৃত্ব করেন। শেষে দুটি দলের মধ্যে চরম বিচ্ছেদ আসে ১৯০৭ সালে, সুরাটে।

মুসলিমরা এবং বিদেশীদের বংশধরেরা বাংলা বিভাগ সমর্থন করলে।

এতে বোঝাচ্ছে যে দেশের সকল মুসলমানই বুঝি তাই, কিন্তু ভার-তের মধ্যে এই যে দুই জাতির স্বতন্ত্র প্রাধান্য এটা জিন্নার আবিষ্কার, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। দেশের শতকরা ৯০ভাগ মুসলমান হিন্দু থেকেই মুসলমান হয়েছে, তারাও হিন্দুদের মতোই ভারতীয়। জিন্না নিজেও একজন হিন্দু ছিলেন, জিনাভাই থেকে সম্প্রতি হয়েছেন জিন্না, আর বড়ো বড়ো মুসলমান নেতারাও বেশির ভাগই তাই।

আসাম মুসলমানপ্রধান ছিল।

আসামে হিন্দু ও স্থানীয় উপজাতির সংখ্যাধিক্য, তার মধ্যে মুসল-মানের সংখ্যা মাত্র শতকরা ২০ । এ সংখ্যা বেড়েছে আসামের সঙ্গে সিলেট যুক্ত হওয়াতে, তথাপি অমুসলমানের সংখ্যাই বেশি। বর্তমানে নির্বাচনে জয়ী কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট সেখানে রয়েছে, আর আসাম কিছুতেই মুসলমান বাংলার সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছে না।

১৯০৬ সালে বরিশাল কনফারেন্সে শ্রীঅরবিন্দের অংশ গ্রহণ।

বরিশাল কনফারেন্সে শ্রীঅরবিন্দ অংশগ্রহণ করেছিলেন আর পুলিশ যে শোভাযাত্রাটি ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল তার সামনের সারির তিনজনের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। এই সম্মেলনটি ভেঙে যাবার পর তিনি বিপিন পালের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ সফরে যান। বিরাট সব সভার অধিবেশন হয়েছিল সেখানে,—একটি জেলায় জেলা-শাসকের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও।

ডিসেম্বর ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসের কথা

শ্রীঅরবিন্দের যতদূর মনে আছে, আগুন লাগাবার চেষ্টা হয়নি। প্রথমে কথা ছিল নাগপুরে সম্মেলন হবে, কিন্তু ঐ মহারাষ্ট্র অঞ্চল অতীব চরমপন্থী। গুজরাটে তখন মডারেটদের প্রাধান্য, তাই সুরাটে কংগ্রেস বসবে স্থির হলো, যদিও গুজরাট পরে গান্ধীর নেতৃত্বে সব চেয়ে বেশি বিপ্লবী হয়েছিল। সুরাটে জাতীয়তাবাদীরা এসে জুটলো সকল দিক থেকে, এবং শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে নিজেদের সভা করলে, তখন সন্দেহ হলো যে কোন দলের সংখ্যাধিক্য ঘটবে। তাইতে মডারেটরা ঐ শহর থেকে তথাকথিত প্রতিনিধিদের জুটিয়ে সংখ্যায় দাঁড়ালো ১৩০০, আর জাতীয়তা-বাদীদের সংখ্যা হলো প্রায় ১১০০। মডারেটরা এমন নতুন সংবিধান বানালে যাতে কংগ্রেসে চরমপন্থীদের সংখ্যাধিক্য অনেক বছরই হতে পারবে না। তরুণ মহারাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদীরা স্থির করলে যে কিছুতেই তা হতে দেবে না, যদি বদলাতে না পারে তাহলে তারা কংগ্রেস ভেঙে দেবে; এ কথা তিলক প্রভৃতি নেতাদের জানানো হয়নি, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ জানতেন। সভা বসলে তিলক মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়ে সভাপতি নির্বাচন সম্বন্ধে প্রস্তাব করতে গেলেন; মডারেটদের নির্বাচিত সভাপতি তাঁকে থামিয়ে দিতে চাইলেন, তথাপি তিলক তাঁর প্রস্তাব পড়ে যেতে থাকলেন। এতে তুমুল গণ্ডগোল উঠল, গুজরাটি স্বেচ্ছাসেবকরা চেয়ার উঠিয়ে তিলককে মারতে উদ্যত হলো। তখন মহারাষ্ট্রীয়রা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং একজন মহারাষ্ট্রীয় জুতো ছুঁড়ে মারলে ওদের সভাপতি স্যর রাসবিহারী ঘোষের উদ্দেশে, সেটা গিয়ে লাগল সুরেন্দ্র ব্যানার্জির স্কন্ধে। মহারাষ্ট্রীয় যুবকেরা

দল বেঁধে মঞ্চের দিকে ছুটল, এবং চেয়ার নিয়ে কিছুক্ষণ মারামারির পরে মডারেট নেতারা মঞ্চ ছেড়ে পালালো। সভা ভেঙে গেল। মডারেটরা কংগ্রেস ছেড়ে আলাদা রকমের নিরাপদ জাতীয় সম্মেলন গড়ে তুলতে চাইলে। এদিকে লাজপত রায় তিলকের কাছে এসে বললে যে কংগ্রেস দুই ভাগ হয়ে গেলে গভর্ণমেন্ট স্থির করেছে যে চরমপন্থীদের যেমন ক'রে পারে দমন ক'রে দেবে। তিলক ভেবে দেখলেন যে দেশ এখনও তা সহ্য করবার মতো প্রস্তুত হয়নি, সুতরাং তিনি সব বাধা কাটিয়ে জাতীয়তা-বাদীদের নিয়ে মডারেটদের সভাতে গিয়ে তাদের সংবিধানের সমর্থনে স্বাক্ষর দিলেন। শ্রীঅরবিন্দ এবং আরো কেউ কেউ এতে রাজী ছিলেন না, কারণ মডারেটরা ওদের কাউকে দলভুক্ত করবে না, তার চেয়ে গভর্ণমেন্টের দমনের সম্মুখীন হতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু মডারেটদের সম্মেলন সার্থক হলো না, খুব কম লোকই তাতে গিয়ে যোগ দিলে। শ্রীঅরবিন্দ আশা করেছিলেন যে অন্ততপক্ষে বাংলা ও মহারাষ্ট্র সকল পীড়ন সহ্য করতে পারবে, আর যদি নাও পারে তথাপি ব্যাপক নির্যাতনে দেশের লোকের হৃদয় গলবে এবং তারা সমগ্রভাবে স্বাধীনতার আদর্শের দিকে ঝুঁকবে। তাই হলো যখন তিলক বর্মা জেল থেকে ছয় বছর পরে ফিরলেন, তিনি অ্যানি বেসান্টের সঙ্গে মিলে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। মডারেটরা একটি ক্ষুদ্র দলে পরিগণিত হলো এবং পরে তারাও পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ মেনে নিলে।

ইতিহাস ঠিক ঠিক বলতে পারে না যে যবনিকার অন্তরালে কোন আসল ব্যাপারটি ঘটেছে, কেবল পর্দার সম্মুখে যা দেখেছে তাই বলে। বস্তুত খুব কম লোকেই এ কথা জানে যে আমিই (তিলককে না জানিয়ে) নির্দেশ দিয়েছিলাম কংগ্রেস ভেঙে দিতে, এবং মডারেটদের নতুন গড়া সম্মেলনে যোগ দেওয়া থেকে বিরত হতে। সুরাটে এই দুটি জিনিসের জন্য আমিই দায়ী। আর বাংলা দেশেও বিপ্লববাদকে জোরদার ও বিদ্রোহী ক'রে তোলাও যে আমারই কাজ এ কথাও খব কম লোকে জানে।

গোখলে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত

আমেদাবাদ থেকে বরোদা যেতে শ্রীঅরবিন্দ গোখলের সঙ্গে এক ঘণ্টা কথা বলেছিলেন, তাতে তিনি যতই ভালো লোক হন তথাপি তাঁকে ভালো রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে কখনই সম্মানের উপযুক্ত মনে করেন না।

সুরাট কংগ্রেসের পর কলকাতা যাবার পথে "রাজনৈতিক সফর"।

ওরকম কোন সফর হয়নি। শ্রীঅরবিন্দ লেলের সঙ্গে পুনায় গিয়েছিলেন, আর সেখান থেকে বোম্বাই ফেরার পর কলকাতায়। বোম্বাই আর বরোদার বক্তৃতা ছাড়া তাঁর সমস্ত বক্তৃতাই হয়েছিল ফেরার পথে, যেখানেই তিনি একদিন বা দুদিনের জন্যে থেমেছিলেন।

লেলের সঙ্গে ধ্যানে বসার পর শ্রীঅরবিন্দের অবোধগম্য স্থির ভাব।

অবোধগম্য কেন হবে; বরোদায় তিন দিন যাবৎ লেলের সঙ্গে ধ্যান ক'রে তাঁর মনের মধ্যে এমন এক নীরবতা এসেছিল যা কয়েক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল এবং পরেও ছিল, যদিও বাইরে তিনি কাজ ক'রে যেতেন; কিন্তু ঐ সময়টাতে বাইরেও কিছু করতে পারতেন না। লেলে তাঁকে বলেছিল যে সভায় দাঁড়িয়ে শুধু নমস্কার করবে এবং অপেক্ষা করবে, ভাষণ আপনি আসবে, মন থেকে নয়, অন্য কোথাও থেকে। তাই হলো, এবং তার পর থেকে তিনি যা কিছু বলতেন ও লিখতেন ও কিছু করতেন, সবই আসতো মস্তিষ্ক-মনের বাইরে কোথাও থেকে।

ও কথা ঠিক নয়। ওতে শ্রীঅরবিন্দের যোগ সম্বন্ধে ভুল বোঝানো

হয়। যোগের কাজ তাঁর মধ্যে সর্বক্ষণই চলছিল, এমন কি বাইরে যখন কিছু করছেন তখনও, কিন্তু তথাপি নিজের মধ্যে গুটিয়ে গিয়ে তিনি 'স্তম্ভিত' হয়ে থাকেননি, যেমন বন্ধুরা মনে করতো। তিনি যে তাদের প্রশ্নাদির কোনো জবাব দিতেন না, তার কারণ তাঁর ইচ্ছা হতো না তাই চুপ থাকতেন।

লেলের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বেকার আধ্যাত্মিক অনুভূতি

লেলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি তোমার ভিতরকার দিশারীর হাতে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়ে তারই নির্দেশে চলতে পারবে কিনা, তা যদি পারো তাহলে কারো কাছে কোনো উপদেশের দরকার হবে না। এই কথাটাই শ্রীঅরবিন্দ ধরে নিলেন এবং তাঁর জীবন ও সাধনা ঠিক এই নিয়ম ধরেই চলেছিল। শ্রীঅরবিন্দের ইতিপূর্বে কিছু কিছু আধ্যাত্মিক অনুভূতি ঘটেছিল যখন তিনি যোগ কাকে বলে তাও জানতেন না—যেমন, বহুকাল পরে প্রথম দেশে ফিরে বোম্বাইএর অ্যাপোলো বন্দরে নেমে যেমনি তিনি দেশের মাটিতে পা দিলেন অমনি এক বিপুল প্রশান্তি তাঁর মধ্যে নেমে এলো (সেই প্রশান্তির ভাবটি তাঁকে কয়েক মাস পর্যন্ত ঘিরে থেকেছিল)। আর কাশ্মীরে তক্তি-সুলেমানের ধার দিয়ে যেতে যেতে তিনি হঠাৎ উপলব্ধি করলেন বিরাট অনন্তকে। নর্মদাতীরে কালীর মন্দিরে গিয়ে দেবীকে জাগ্রতরূপে দেখলেন। বরোদায় থাকতে প্রথম বছরে গাড়ি উল্‌টে পড়ে গিয়ে দেখলেন ভিতর থেকে কোনো দেবতা বেরিয়ে তাঁকে রক্ষা করল, ইত্যাদি। কিন্তু এই সব আভ্যন্তর অনুভূতি অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ এসেছিল, সাধনার সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। তিনি যোগ শুরু করেছিলেন কোনো গুরু না নিয়ে কোনো বন্ধুর কাছ থেকে পদ্ধতিটা শিখে নিয়ে, যিনি ছিলেন গঙ্গা মঠের ব্রহ্মানন্দের একজন চেলা; তখন তিনি অবহিতভাবে কেবল প্রাণায়াম করতেন (কখনো কখনো দৈনিক ছয় ঘণ্টারও বেশি)। যোগ আর রাজনীতিতে কোনো বিরোধ ছিল না, দুই কাজই করতেন এক সঙ্গে। তবে তিনি একজন গুরু খুঁজছিলেন। একজন নাগা সন্ন্যাসীকে পেয়েছিলেন যার যোগশক্তি তিনি প্রত্যক্ষ করে-ছিলেন যখন বারীনের প্রবল পাহাড়ী-জ্বর সে ব্যক্তি একটা জলের গ্লাসে

ছুরি ডুবিয়ে মন্ত্র পড়ে মুহূর্তের মধ্যে আরোগ্য ক'রে দিল, বারীন সেই জল পান করতেই জ্বরটা ছেড়ে গেল, কিন্তু তাকে তিনি গুরু করেননি। তিনি ব্রহ্মানন্দের কাছেও গিয়েছিলেন এবং তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু কেবল লেলে ছাড়া আর কাউকে তিনি গুরু করেননি, আর তাও অল্প কালের জন্য।

বিপ্লবের যুগের "ভবানী-মন্দিরের" কথা

"ভবানী-মন্দির" শ্রীঅরবিন্দেরই লেখা কিন্তু তার ভিতরকার ভাবটি অধিকাংশই বারীনের। মানুষ খুন করতে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য তাতে ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবের জন্য দেশকে প্রস্তুত করে তোলা। শ্রীঅরবিন্দ ও দিকটা শীঘ্রই ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু বারীন মানিকতলার বাগানে সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, এই কথাই হেমচন্দ্র বলেছে। শ্রীঅরবিন্দ ওর সঙ্গে সংশ্রব একেবারেই পরিত্যাগ করেছিলেন কিনা তা স্মরণ নেই। বারীনই একটা মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করছিল। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে তার খুব জ্বর হলো, তাই সে সন্ধান করা ছেড়ে বরোদায় চলে এলো। পরে সে বাংলা দেশে ফিরে গেল, সেখানে গিয়ে কোনো স্থান খুঁজে পেলে কিনা তিনি জানেন না। বারীনের গুরু ছিল সাকারিয়া স্বামী, যে সিপাহী বিদ্রোহের সময় লড়েছিল, আর সুরাট কংগ্রেস ভেঙে যাওয়াতে খুব উত্তেজিত হয়েছিল, কিন্তু তার ফলে কুকুরে কামড়ানোর বিষক্রিয়াতে সে মারা গেল, তার যোগশক্তিতে সে বিষ কিছুকাল নিষ্ক্রিয় থেকেও তা আবার প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ রাজনৈতিক ব্যাপারে তার সাহায্য চাননি। ভবানী মন্দিরের পরিকল্পনা আপনা হতেই থেমে গেল। যদিও বারীন মাণিকতলার বাগানে ছোটো আকারে ঐরূপ চেষ্টা করছিল কিন্তু ঐ নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ কিছু ভাবেননি।

পুলিশ ৫. ৫. ১৯০৮ তারিখে তাঁর হাতে পরিয়েছিল।

না, হাতকড়ি নয়, দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল; মডারেট কংগ্রেস নেতা ভূপেন বোস এসে প্রতিবাদ করাতে তা খুলে নেওয়া হয়েছিল।

* ×

হাতে নয়, কোমরে দড়ি বেঁধেছিল, কিন্তু মডারেট নেতা ভূপেন বোস তাই শুনে সেখানে উপস্থিত হয়ে অনুযোগ করাতে বাড়ি ত্যাগ করার আগে তা খুলে নেওয়া হয়েছিল।

> আলিপুর জেলে শ্রীঅরবিন্দ গীতা পড়তে থাকেন ও সেই অনুযায়ী সাধনা করতে থাকেন; তখন তিনি "সনাতন ধর্মের" মাহাত্ম্য পুরোপুরি উপলব্ধি করেন।

এখানে বলা দরকার যে অনেক কাল থেকেই তিনি ভারতের সনাতন ধর্মের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য পুরোপুরি জানতে ও পুরোপুরি গ্রহণ করতে সচেষ্ট ছিলেন।

> আলিপুর মামলা ১৯ মে ১৯০৮ তারিখে শুরু হয় এবং পুরো এক বছর চলে। ম্যাজিস্ট্রেট বীচক্রফ্‌ট ছিলেন কেমব্রিজে শ্রীঅরবিন্দের সহপাঠী। মামলা পরে সেশন আদালতে যায়, সেখানে বিচার শুরু হয় অক্‌টোবর ১৯০৮ থেকে।

এই কথাটি আগের ছত্রে বলা দরকার। প্রাথমিক বিচার শুরু হয় বালি নামক এক তরুণ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। বীচক্রফ্‌ট ম্যাজিস্ট্রেট নয়, তিনি সেশনের জজ ছিলেন।

আলিপুর কোর্টে শ্রীঅরবিন্দের তরফের বক্তব্য

শ্রীঅরবিন্দ কোর্টে কোনোই বক্তব্য রাখেননি। কোর্টে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন যে তাঁর যা বক্তব্য তা তাঁর উকিলরাই বলবে, নিজে কিছু বলতে চান না। যে বক্তব্যের উল্লেখ করা হয়েছে তা উকিলরাই লিখেছিল, তা তাঁর নিজের লেখা নয়।

আলিপুর জেলে শ্রীঅরবিন্দ অসুস্থ হন।

জেলে থাকতে তিনি অসুখে পড়েননি; স্বাভাবিক সুস্থ শরীরেই ছিলেন, একবার সামান্য যা হয়েছিল তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

এক বছর জেলে নির্জনবাসে থেকে ও ধ্যান ক'রে শ্রীঅরবিন্দ একেবারে বদ্‌লে গেলেন; আরো জোরের সঙ্গে তাঁর "সেবার" কাজে অনুপ্রাণিত হলেন।

সেবা নয়, "কাজ", দেশের জন্য, জগতের জন্য, শেষ পর্যন্ত ভগবানের জন্য "নিষ্কাম কর্ম" বলাই ঠিক, কোনো সেবার আদর্শ নয়।

শ্রীঅরবিন্দ দেশবাসীর উদ্দেশে "খোলা চিঠি" লিখেছিলেন ১৯০৯ জুলাই আবার ১৯০৯ ডিসেম্বর তারিখে।

এই দুটি চিঠি সম্বন্ধে কিছু গোলমাল রয়ে গেছে। প্রথম চিঠিখানির ফলে যে গভর্ণমেন্ট কোনো নীতিবদল করবে সে আশা করেননি। তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন যে শাসনসংস্কার যা আনবার কথা হচ্ছে তা মিথ্যা, অবাস্তব, গ্রহণযোগ্য নয়। বাস্তবিক যদি কিছু ক্ষমতা বা শাসনভার দেওয়া হয়, তা পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসন না হয়ে যদি আংশিকও হয় তবে জাতীয় দল তা মেনে নেবে প্রস্তুতি হিসাবে। নতুবা ততদিন পর্যন্ত জাতীয়

দল অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। শ্রীঅরবিন্দ এটা বোধ করেছিলেন যে তার অনুপস্থিতিতেও এ সংগ্রাম চলবে জেনে গভর্ণমেন্ট আর তাঁকে দেশান্তরিত করতে চাইবে না। হোম রুল ও পুরো নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রস্তাবের সঙ্গে এই প্রথম চিঠির কোনো সম্পর্ক ছিল না কারণ শ্রীঅরবিন্দ তখন ওর কথা জানতেন না। পরে কিন্তু তিনি দ্বিতীয় চিঠির কালে দেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও বিচার ক'রে দেখলেন যে এই রাজনৈতিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে হলে একটু পিছিয়ে আসা দরকার, নতুবা আন্দোলন থেমে যেতে পারে। হোম রুল আন্দোলন বা দক্ষিণ আফ্রিকার মতো আন্দোলন অদূর ভবিষ্যতে চলতে পারে, কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে নয়, তিনি স্বাধীনতার আন্দোলনই ধরে থাকবেন। দ্বিতীয় চিঠিতেও তাই তিনি লিখলেন অসার সংস্কার প্রস্তাবের কথা এবং নতুন ক'রে জাতীয় আন্দোলন চলার কথা। এর তারিখ ২৫শে ডিসেম্বর, প্রথম চিঠির পাঁচ মাস পরে। খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তারের মতলব হয়েছিল এই দ্বিতীয় চিঠির জন্য। শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর চলে যাওয়াতে তা থেমে গেল, যতদিন না তিনি আবার দেখা দেন তার অপেক্ষায়। এটা হলো ফেব্রুয়ারি মাসে, চিঠির একমাস পরে। শ্রীঅরবিন্দ চাইলেন যে পুলিশ প্রকাশ্যে সক্রিয় হোক। একজন পুলিশ গোয়েন্দার কাছ থেকে এক চিঠি চন্দননগরে তাঁর হাতে এলো, তাতে বলা হয়েছে লুকিয়ে না থেকে বিচারের সম্মুখীন হতে। তিনি তার জবাবে বললেন যে তার কোনো হেতু নেই, কারণ তাঁর নামে কোনো ওয়ারেন্ট বের করা হয়নি, এবং তাঁকে কোনো-রূপে প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করাও হয়নি; তিনি ভেবেছিলেন যে এ কথা শুনে পুলিশ হয়তো ওয়ারেন্ট এবং অভিযোগ এনে ফেলবে এবং পরে তাই হয়েছিল কাগজের বিরুদ্ধে।

রাজনীতি পরিত্যাগের কারণ

আরো আমি এই কথা বলতে পারি, এমন ধারণা ভুল যে আমার দ্বারা আর কিছু করা যাবে না বলেই আমি রাজনীতি পরিত্যাগ করেছি; এ-ভাব আমার কখনো ছিলই না। আমার যোগে যাতে কোনো বাধা না জন্মায় সেইজন্যই আমি ছাড়লাম, তা ছাড়া এ বিষয়ে আমি সুস্পষ্ট

আদেশ পেলাম। কিন্তু ছেড়ে আসার আগে এটাও ভিতর থেকে জেনেছিলাম যে আমি যে কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছি তা অন্যদের দ্বারা আরো অগ্রসর হতে থাকবে, আমারই পূর্বদৃষ্ট পথে, এবং শেষ পর্যন্ত তার বিজয় অনিবার্য, আমার নিজের তৎপরতা এবং উপস্থিতি সেখানে না থাকলেও। আমার সরে আসার মধ্যে বিন্দুমাত্র হতাশা বা ব্যর্থতার ভাব ছিল না। আর শেষ কথা, এমন কখনই হয়নি যে বড়ো বড়ো জগৎ ব্যাপারে আমার আন্তরিক ইচ্ছা, কোনোটা ব্যর্থ হয়েছে, যদিও সে ইচ্ছার পূরণ হতে অনেক সময় লাগতে পারে। আর আমার এই আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা আছে কিনা, সে কথা হবে পরে। বাধাবিপত্তি তো আছেই, তাই বলে ব্যর্থতার সার্টিফিকেট লিখে দেবার কোনো কারণ দেখি না।

অকটোবর ১৯৩২

(৪) পত্রিকাদিতে প্রকাশিত ভুল বিবৃতির সংশোধন

গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী "উদ্বোধন" পত্রিকাতে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন, বিশেষত আষাঢ় ১৩৫১, তাতে অনেক ভুল কথা আছে। চারুচন্দ্র দত্ত শ্রীঅরবিন্দকে তা জানান। শ্রীঅরবিন্দ তার জবাবে ভুলগুলি সংশোধন করে লিখে দেন এবং কিছু কিছু মুখেও বলেন।

তোমার প্রশ্নগুলির এই হলো আমার জবাব, কেবল ঘটনা সম্বন্ধেই।

(১) "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্বন্ধে এপ্রিল ১৯০৭তে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সব আমারই লেখা, বিপিন পালের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। ১৯০৬-এর শেষ ভাগে তিনি কাগজ ছেড়ে দিয়েছিলেন, তার পর আর ওতে কিছু লেখেননি। আমিই ঐ ধরনের প্রবন্ধ লিখতে চেয়েছিলাম, তার মধ্যে ঐ একটি।

(২) "ধর্ম" পত্রিকাতে ফেব্রুয়ারি ও মার্চ ১৯১০ তারিখের প্রবন্ধগুলি আমার লেখা নয়। ওগুলি এক নবীন সহ-সম্পাদকের লেখা। এ কথা সবাই জানতো, নলিনী কান্ত গুপ্তও জানেন, যিনি এখানে আমার কাছে রয়েছেন।

(৩) চন্দননগর যাবার পথে বাগবাজার মঠে শ্রী সারদেশ্বরী দেবীকে প্রণাম করতে আমি যাইনি। বস্তুত আমার জীবনে কখনই আমি তাঁকে দেখিনি। বাগবাজার ঘাট নয়, অন্য ঘাট থেকে (গঙ্গা ঘাট) নৌকোতে উঠে আমি চন্দননগর গেছি।

(৪) গণেন মহারাজ বা নিবেদিতা কেউই আমাকে তুলে দিতে ঘাটে যায়নি, কেউই জানতো না আমার যাবার কথা। নিবেদিতা সে কথা পরে জানলেন যখন তাঁর কাছে আমার অনুরোধ পৌঁছলো আমার অবর্ত-

মানে 'কর্মযোগীন' পত্রিকা চালিয়ে যেতে। যতদিন পর্যন্ত কাগজ বন্ধ না হয়েছে ততদিন তিনিই কাগজ চালিয়েছিলেন; তখনকার সমস্ত লেখাগুলি তাঁরই।

(৫) আমার স্ত্রীকে সারদেশ্বরী দেবীর কাছে আমি কখনো নিয়ে যাইনি; শুনেছি যে দেবব্রতর ভগ্নী সুধীরা বসু তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল। এ-কথা শুনেছি পণ্ডিচেরিতে আসার অনেক পরে। অমন একজন আধ্যাত্মিক জীবনের আশ্রয় পেয়েছেন শুনে খুব খুশি হয়েছিলাম, কিন্তু ঐ ব্যাপারে আমার নিজের কোনো হাত ছিল না।

(৬) নিবেদিতার পরামর্শে আমি চন্দননগর যাইনি। আগেকার ঘটনাতে যখন তাঁর কাছে শুনলাম যে গভর্ণমেন্ট আমাকে দেশান্তরিত করতে চায় তখন তিনি বলেছিলেন ব্রিটিশ রাজত্ব ছেড়ে গিয়ে বাইরের থেকে কাজ করতে; কিন্তু আমি তাঁকে বলেছিলাম যে তার দরকার হবে না, আমি এমন কিছু লিখব যাতে ও মতলব থেমে যাবে। তাতেই আমি লিখলাম "দেশবাসীর প্রতি আমার শেষ উইল"। নিবেদিতা পরে বলেছিলেন যে ওতে কাজ হয়েছে পূর্বোক্ত মতলব বাতিল হয়ে গেছে। তার পরে তাঁর ওরূপ পরামর্শ দেবার বা আমার তা গ্রহণ করবার আর কোনো ঘটনা ঘটেনি; কেন আমি চন্দননগর গেলাম তা তিনি জানতেন না।

(৭) চলে যাবার ব্যাপারটা এইরকম হয়েছিল। 'কর্মযোগীন' অফিসে বসে আমি শুনলাম একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের কাছে যে পরের দিন অফিস তল্লাসী করা হবে ও আমাকে গ্রেপ্তার করা হবে। (অফিস তল্লাসী করা হয়েছিল কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কোনো ওয়ারেন্ট ছিল না; তার পরে যখন শুনলাম যে কাগজের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে তখন আমি চন্দননগর ছেড়ে পণ্ডিচেরীতে চলে গেছি)। সেই গ্রেপ্তার হবার কথা এবং তাই নিয়ে অফিসের মধ্যে বাদানুবাদ যখন শুনছিলাম, হঠাৎ তখন আমার কানের কাছে অতি পরিচিত কণ্ঠে শুনলাম আদেশ "চন্দন-নগর চলে যাও"। প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে আমি নৌকোতে গিয়ে উঠেছি। রামচন্দ্র মজুমদার সঙ্গে ছিল, সে নৌকো ডাকলে; আমি তাতে উঠলাম গিয়ে আমার আত্মীয় বীরেন ঘোষ ও মণির (সুরেশ চক্রবর্তী) সঙ্গে, তারা আমার সঙ্গে বরাবর চন্দননগর পর্যন্ত গেল, বাগবাজারে বা অন্য কোথাও নৌকো না ভিড়িয়ে। চন্দননগরে যখন পৌছলাম তখনও রাত্রির অন্ধকার আছে ; পরের দিন সকালে ওরা কলকাতায় ফিরে গেল। আমি

গোপন স্থানে থেকে সাধনাতে নিযুক্ত রইলাম, তখন থেকে দুই কাগজের সঙ্গে আমার সকল সম্পর্ক ঘুচে গেল। তার পরে আবার ঠিক ঐরকম "পণ্ডিচেরি যাবার" আদেশ পেয়ে চন্দননগর ছেড়ে সেখানে পৌঁছলাম ৪ঠা এপ্রিল ১৯১০।

এখানে কৈফিয়ৎ হিসাবে বলব যে সেই সুরাট কংগ্রেসের পর লেলের সঙ্গে বরোদা, পুনা ও বোম্বাইতে গিয়ে যখন লেলের সঙ্গ ছাড়লাম তখন থেকে আমি এই নিয়ম মেনেই চলছিলাম যে ভিতর থেকে ভগবান যখন যেমন নির্দেশ দেবেন ঠিক তারই অনুসরণ ক'রে যাবো। জেলে এক বছরের মধ্যে আমার যে আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটেছিল তাতে আমার সত্তার পক্ষে একমাত্র ওটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়াল। সেই কারণেই আমি যখন যেমন আদেশ পাচ্ছিলাম তৎক্ষণাৎ তাই করছিলাম।

আমার জবানিতে এই কথাগুলি তুমি "উদ্বোধন" সম্পাদককে জানাতে পারো।

৫ ডিসেম্বর ১৯৪৪

গিরিজাশংকরের "উদ্বোধনে" অন্যান্য প্রবন্ধের জবাব

> ১৯০৪ সালে নিবেদিতা বরোদায় গিয়েছিলেন মহারাজার আমন্ত্রণে, সেখানে তাঁর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের আলাপ হয় রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে।

আমন্ত্রিত হয়েছিলেন কিনা স্মরণ নেই কিন্তু রাজ অতিথি কাশীরাও এবং আমি তাঁকে স্টেশন থেকে নিয়ে আসি।

তাঁর সঙ্গে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কোনো আধ্যাত্মিক কথা হয়েছিল কিনা স্মরণ নেই। রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছিল। স্টেশন থেকে শহরের পথে কলেজের প্রকাণ্ড গম্বুজওয়ালা বাড়িগুলি দেখে তিনি বললেন কুৎসিত, তার কাছেই যে ধর্মশালার বাড়ি ছিল তারই সুখ্যাতি করলেন। কাশীরাও তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে বললে যে এঁর মাথায় কিছু ছিট আছে! আমি তখন তাঁর লেখা "Kali the Mother" বইখানি পড়ে খব মগ্ধ, সে সম্পর্কে কথাও বলেছি; তিনি

বললেন তিনি জানেন যে আমি শক্তির পূজারী, তার মানে আমি তাঁর মতো গুপ্ত বিপ্লবীর দলভুক্ত; আর তিনি যখন মহারাজাকে বলছিলেন বিপ্লববাদের সমর্থন করতে, তখন আমি সেখানে ছিলাম; নিবেদিতা বললেন যে আমার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। কিন্তু সয়াজিরাও খুব চতুর ব্যক্তি, তিনি এমন বিপজ্জনক ব্যাপারে যেতে চান নি। এই পর্যন্তই আমার স্মরণ আছে।

শ্রীঅরবিন্দের ঘরে তল্লাসী করে পুলিশ দক্ষিণেশ্বরের মাটি পেয়েছিল।

সেই মাটি আমাকে এনে দিয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশনের একজন তরুণ কর্মী, আমি যত্ন ক'রে সে মাটি রেখে দিয়েছিলাম; পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করতে এসে সেই মাটি ঘরের মধ্যে পেয়েছিল।

"বন্দে মাতরম্" কাগজ শুরু হয় ৭ই অগস্ট ১৯০৬, তার জয়েন্ট স্টক কোম্পানি ঘোষিত হয় ১৮ অক্টোবর ১৯০৬। অগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বিপিন পাল ছিলেন সম্পাদক।

বিপিন পাল হরিদাস হালদারের কাছে ৫০০ টাকা নিয়ে কাগজ বের করেন। আমাকে বলেন সহ-সম্পাদক হতে, আমি রাজী হই। তখন আমি কলকাতায় তরুণ জাতীয়তাবাদীদের একটা ঘরোয়া বৈঠকে ডেকে এই কথা বললাম, তারা "বন্দে মাতরম্" পত্রিকাকে দলীয় কাগজ ক'রে নিতে স্বীকৃত হলো এবং সুবোধ মল্লিক ও নীরদ মল্লিক অর্থসাহায্য করতে থাকলেন। কোম্পানি গড়ে উঠল বটে কিন্তু সুবোধ মল্লিকই অর্থ দিয়ে চালাতে থাকলেন। বিপিন পাল এডিটর হয়ে রইলেন সি. আর. দাশের দ্বারা সমর্থিত হয়ে। হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ও শ্যামসুন্দর সম্পাদকীয় দলে এসে যোগ দিলেন, কিন্তু বিপিন পালের সঙ্গে তাঁদের বনল না, আর মল্লিকরা এদেরই সমর্থন করলেন। তখন বিপিন পাল ছেড়ে চলে গেলেন।

নভেম্বর কি ডিসেম্বর তা স্মরণ নেই, বোধ করি ডিসেম্বরে। ঐ সময়ে আমার প্রায় মরণাপন্ন রোগ হলো সার্পেন্টাইন লেনে শ্বশুরালয়ে থেকে, তখন কাগজের কি হচ্ছে তা জানতাম না। আমার অনুমতি না নিয়ে ওরা আমার নাম সম্পাদক বলে ছেপে দিলে, তাতে আমি সেক্রেটারিকে খুব ধমক দিয়ে তা প্রত্যাহার করে নিতে বললাম, আর সুবোধকেও এক কড়া চিঠি লিখলাম। তখন থেকে কাগজের সঙ্গে বিপিন পালের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কেউ বলে থাকবে যে আমি আলিপুর মামলাতে কয়েদ হবার পর বিপিন পাল আবার সম্পাদক হয়েছিলেন, কিন্তু আমি তা শুনিনি। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর বিজয় চ্যাটার্জি আমাকে বললে যে শ্যাম-সুন্দর ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ও সে এই তিন জনে মিলে কোনোগতিকে কাগজ চালাচ্ছে, কিন্তু আর্থিক অবস্থা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাই বিজয় তাতে এমন এক প্রবন্ধ লিখলে যে গভর্ণমেন্ট তেড়ে এসে কাগজ বন্ধ ক'রে দিলে, সুতরাং "বন্দে মাতরম্" কাগজ সম্মানের সঙ্গে থেমে গেল।

×

শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে গিরিজাশঙ্করের উক্তিগুলি যথাযথভাবে গ্রহণ করা যায় না। প্রায়শঃই তাদের ভিত্তি হল মিথ্যা বা বিকৃত সংবাদ। হয় ভ্রান্ত বিবরণের দিকে তাদের ঝোঁক কিম্বা অনুমান বা আন্দাজের দিকে।

মাদ্রাজের একটি সাপ্তাহিক, দি সান্‌ডে টাইম্‌স্, ১৭ জুন ১৯৪৫ সংখ্যায় হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড হতে গৃহীত একটি সংবাদে জানান যে শ্রীঅরবিন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী শ্রীসারদামণি দেবীর কাছে চন্দননগর যাবার আগে দীক্ষা-গ্রহণ করেন। এই কাহিনী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। দি সান্‌ডে টাইমসের ২৪ জুন সংখ্যায় এই সংবাদের প্রতি-বাদ জ্ঞাপন করা হয়। শ্রীঅরবিন্দের শ্রুতলিপি অনুসারে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সেক্রেটারীর নামে এই বিবৃতি দেওয়া হয়।

আপনাদের পত্রিকার বর্তমান মাসের ১৭ই তারিখের সংখ্যাটিতে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড থেকে গৃহীত এই বিবরণ প্রচারিত হয়েছে যে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী (?) যাবার পথে শ্রীসারদামণি দেবীকে দর্শন করে তাঁর কাছ থেকে কোন এক রকমের দীক্ষা প্রাপ্ত হন; শ্রীঅরবিন্দের আদেশ ও অনুমোদনক্রমে আমি এই বিবরণের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কিছুদিন আগে কলকাতার একটি মাসিক পত্রিকায় এইরকম কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল যে ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যেদিন শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে যান সেই রাত্রে তিনি নাকি বাগবাজার মঠে শ্রীসারদামণি দেবীর আশীর্বাদ-প্রার্থী হয়ে তাঁকে দর্শন করেন, আর ভগিনী নিবেদিতা ও মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী নাকি তাঁকে বিদায় অভ্যর্থনা জানান। অধিকন্তু ভগিনী নিবে-দিতার উপদেশেই নাকি শ্রীঅরবিন্দ ব্রিটীশ-ভারত পরিত্যাগ করেন। এইসব বিবরণ প্রকৃত তথ্যের বিপরীত। পূর্বে শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে শ্রীচারু-চন্দ্র দত্ত উপরোক্ত মাসিকেই ঐ সকল বিবরণের ভ্রম প্রতিপন্ন করেন।

শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগর প্রস্থান একটা আকস্মিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফল। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল উপর থেকে একটি আদেশের বলে, আর তা পালন করা হয়েছিল দ্রুতগতিতে, সঙ্গোপনে, কারো কাছ থেকে বা কোন স্থান থেকে কোনরকম উপদেশ না নিয়ে। তিনি 'ধর্ম্ম' অফিস থেকে সোজা ঘাটে গিয়েছিলেন—মঠে যাননি বা কেউ তাঁকে বিদায় জানান নি। একটি নৌকো ডাকা হয়, দুজন যুবকের সঙ্গে তাতে তিনি আরোহণ করেন এবং সোজা গন্তব্যের দিকে চলে যান। চন্দননগরে তাঁর বাসস্থানের কথা অত্যন্ত গোপন ছিল। কেবল মতিলাল রায়, যিনি শ্রীঅরবিন্দের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন, এবং আরো কয়েকজন এক যা জানতেন। শ্রীঅরবিন্দের প্রস্থানের বিষয় নিবেদিতাকে গোপনে জানানো হয় পরের দিন, এবং তাঁকে শ্রীঅরবিন্দের অনুপস্থিতিতে 'কর্মযোগীন্' পত্রিকা পরি-চালনার জন্য অনুরোধ করা হয়। তাতে তিনি সম্মত হন। চন্দননগর থেকে পণ্ডিচেরী যাবার পথে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর এক নিকটসম্পর্কীয় ভাইয়ের কাছ থেকে তোরঙ্গ নেবার জন্যে কলেজ স্ট্রীটের বাইরে দু' মিনিটের জন্যে থেমেছিলেন। সমুদ্রযাত্রার জন্যে একটি মেডিকেল সার্টিফিকেটের প্রয়োজনবশতঃ তিনি কেবল একজন ব্রিটীশ মেডিকেল অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, অপর কারো সঙ্গে নয়। তিনি সোজা ডুপ্লে স্টীমারে গিয়ে ওঠেন এবং পরদিন সকালে তিনি পণ্ডিচেরীর পথে।

এর সঙ্গে আরো একটুখানি যোগ করে দেওয়া যেতে পারে যে এই-সময়ে বা কোনসময়েই শ্রীঅরবিন্দ সারদাদেবীর কাছ থেকে কোনো রকমের দীক্ষাগ্রহণ করেননি। অন্য কারো কাছ থেকেও তিনি কোনো আনুষ্ঠানিক দীক্ষাগ্রহণ করেননি। ১৯০৪ সালে তিনি নিজে থেকেই তাঁর সাধনা শুরু করেন বরোদায়, প্রাণায়ামের নিয়মকানুন তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে জেনে নিয়ে। তারপর একমাত্র সাহায্য যা তিনি গ্রহণ করেন তা হল মহারাষ্ট্রীয় যোগী বিষ্ণুভাস্কর লেলের কাছ থেকে। তিনি শ্রীঅর-বিন্দকে শিখিয়েছিলেন কেমন করে মনের পূর্ণ নীরবতা এবং সমগ্র চেতনায় অচঞ্চল স্থৈর্য আনতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ তিনদিনের মধ্যে এই অবস্থা লাভ করেন। তার ফলে স্থায়ী ও ঘনীভূত আধ্যাত্মিক সিদ্ধি সব তাঁর সামনে যোগের বৃহত্তর পথগুলি খুলে দেয়। শেষে লেলে শ্রীঅরবিন্দকে বলেন তাঁর অন্তরস্থিত ভগবানের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে, একমাত্র তাঁরি চালনায় চালিত হতে, তাহলে লেলে বা অন্য কারো কাছ থেকে আর কোনো নির্দেশ গ্রহণের প্রয়োজন তাঁর হবে না। এর পর থেকে এই হল শ্রীঅরবিন্দের সাধনার সমগ্র ভিত্তি আর তত্ত্ব। তখন থেকে (১৯০৯ সালের আরম্ভ থেকে) শুরু করে পণ্ডিচেরীতে সুদীর্ঘ সুতীব্র তপোলব্ধ অভিজ্ঞতায় তিনি বাইরের কোনো আধ্যাত্মিক সাহায্য গ্রহণ করেননি।

> সুরেশ চক্রবর্তী শ্রীঅরবিন্দের একজন শিষ্য, তিনি "প্রবাসী" পত্রিকাতে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন। রামচন্দ্র মজুমদার যিনি "কর্মযোগীন" পত্রিকাতে ছিলেন, তিনি সেই প্রবন্ধের প্রতিবাদে আর এক প্রবন্ধ লেখেন, তাতে কেবল ভুল কথাই নয় অনেক মিথ্যা কাল্পনিক উক্তিও থাকে। শ্রীঅরবিন্দ সেগুলিকে সংশোধন করবার জন্য এক বিবৃতি দেন। সেটি পরে অনুবাদিত হয় নলিনী গুপ্ত কর্তৃক এবং "প্রবাসী" ও "বর্তিকা"তে ছাপা হয়।

সুরেশ চক্রবর্তীর প্রবন্ধের জবাবে আমার পুরানো বন্ধু রামচন্দ্র মজুম-দার বৃদ্ধ বয়সে প্রখর স্মৃতিশক্তির জন্য নিজেকে উল্লসিত বোধ করেছেন।

তাঁর স্মৃতিশক্তি এমনই প্রখর যে নিতান্ত ভুল কথাগুলিই কেমন করে তিনি নিখুঁতভাবে মনে রেখেছেন, শুধু তাই নয়, যা আদৌ ঘটেনি তাও তিনি ঘটেছে বলে মনে রেখেছেন। তাঁর বর্ণনাগুলি এমন ভুলে ভরা যে তার দ্বারা শ্রীঅরবিন্দের এক অতি আধুনিক কাল্পনিক ঘটনাবহুল জীবনচরিত রচিত হতে পারে, কিন্তু তা ছাড়া আর কিছুই হবে না। দুঃখের বিষয় যে তাঁর এই চমৎকার আকাশ কুসুমের পুষ্পোদ্যানটিকে পদদলিত করতে হচ্ছে, কিন্তু সত্য বৃত্তান্তের কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তাই ওর নিতান্ত ভুলগুলি সংশোধন করছি।

প্রথমত, সুরেশ চক্রবর্তীর চন্দননগর যাবার বিষয়ের প্রবন্ধটিতে ভুল ছিল এবং সারদা দেবীর কাছে যাবার কথাটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি যে ঐ ব্যাপার ওর কিছুদিন আগে ঘটার কথা বলা হয়েছে। সুরেশের বর্ণনা শ্রীঅরবিন্দকে জানানো হয়েছিল ও সম্মতি নেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু এখন আবার অন্য এক কাহিনী বেরিয়েছে, তা সত্যের অপলাপ ক'রে কতখানি আজগুবি ও অবাস্তব জিনিস সৃষ্ট হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ-স্বরূপ। সামশুল আলমকে হত্যা করা সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট তাঁকে অভিযুক্ত করবে, তাই নিয়ে নিবেদিতার সঙ্গে কখনো কোনো কথাই হয়নি, কারণ তা যে গভর্ণমেন্ট মনে করেছে এমন কিছুই তিনি শোনেননি। তাঁকে লুকিয়ে থাকতেও কখনো নিবেদিতা বলেননি। যা ঘটেছিল তার সঙ্গে চন্দননগর যাত্রার কোনোই সম্পর্ক নেই। কিছুকাল আগে নিবেদিতা বলেছিলেন যে গভর্ণমেন্ট তাঁকে দেশান্তরিত করতে চায়, তাতে তিনি "লুকিয়ে থাকতে" না বলে, বলেছিলেন ব্রিটিশ রাজ্য ছেড়ে বাইরের থেকে কাজ করতে, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তা শোনেননি। তিনি বললেন যে এমন একটি "খোলা চিঠি" লিখবেন যাতে ও মতলব ঘুচে যাবে, এবং তাই তিনি 'কর্মযোগীন' পত্রিকাতে লিখেছিলেন চিঠি "দেশবাসীকে আমার শেষ উইল"। নিবেদিতা পরে বলেছিলেন যে তাতে কাজ হয়েছিল।

চন্দননগরে যাবার সময় শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন-নি; এ সেই পুরোনো মিথ্যার জের যে তিনি বরানগর মঠে গিয়েছিলেন এবং নিবেদিতা তাঁকে ঘাটে নৌকোতে উঠিয়ে দেন। বস্তুত নিবেদিতা তাঁর চন্দননগর যাবার কথা কিছুই জানতেন না, পরে জানলেন খবর পেয়ে যে ওঁর অবর্তমানে তাঁকে এখন 'কর্মযোগীন' পত্রিকা চালাতে হবে।

এ কথা শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বলেছেন যে 'কর্মযোগীন' অফিসে বসে যখন শুনলেন অফিস তল্লাসী ও তাঁর গ্রেপ্তারের কথা, তখন হঠাৎ আদেশ পেলেন চন্দননগর চলে যেতে, আর তৎক্ষণাৎ তাই চলে গেলেন কাউকে কিছু না বলে, এমন কি তাঁর সহযোগীদের পর্যন্ত নয়। সকলের অজানিতে পনেরো মিনিটের মধ্যে সব কিছু হয়ে গেল। রাম মজুমদারের সঙ্গে তিনি ঘাটে চলে গেলেন, সুরেশ চক্রবর্তী ও বীরেন ঘোষ কিছুদূর পিছন থেকে তাঁকে অনুসরণ করছিল। একটা নৌকো ডাকা হলো, তিন জনে তখনই তার মধ্যে ঢুকলেন। তাঁর চন্দননগর বাসও গোপন ছিল, এবং পণ্ডিচেরি যাওয়াও তাই, খুব কম লোকই তা জানতো। রাম মজুমদারকে গোপন স্থান খুঁজতে কখনই বলেননি শ্রীঅরবিন্দ, তেমন কিছু বন্দোবস্ত করবার সময়ই ছিল না। না জানিয়ে গিয়ে পড়েছিলেন, এই ভেবে যে চন্দননগরের বন্ধুরা তাঁর থাকবার কিছু ব্যবস্থা করে দেবে। মতিলাল রায় প্রথমে তাঁকে নিজের বাড়িতে রাখলেন, তারপর অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থা করলেন বিশেষ কাউকে না জানিয়ে। এই হলো প্রকৃত ঘটনা যা শ্রীঅরবিন্দের জানিত।

আর এক উদ্ভট কাহিনী এই যে দেবব্রত বসু ও শ্রীঅরবিন্দ দুজনে গিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষিত হতে, আর স্বামী ব্রহ্মানন্দ দেবব্রতকে গ্রহণ ক'রে শ্রীঅরবিন্দকে ফিরিয়ে দিলেন। একেবারে মিথ্যা। শ্রীঅরবিন্দ কখনো স্বপ্নেও চাননি সন্ন্যাসী হতে অথবা সন্ন্যাসীদের প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করতে। এ কথা সকলেরই জানা উচিত যে সন্ন্যাস গ্রহণ করা শ্রীঅরবিন্দের যোগের অঙ্গই নয়; তিনি পণ্ডিচেরিতে যে আশ্রম করেছেন সেখানে কেউই সন্ন্যাসী নয়, কেউই গেরুয়া পরে না অথবা সন্ন্যাসের কৃচ্ছ্রসাধন করে না, তারা সকলে জীবন যোগের সাধক, আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লাভের ভিত্তিতে। বরাবরই তাই ছিল শ্রীঅরবিন্দের অভিপ্রায় তা ছাড়া অন্যরকম কিছু নয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তাঁর একবার মাত্র সাক্ষাৎ হয়েছিল যখন তিনি নৌকোযোগে বেলুড় মঠে যান; প্রায় পনের মিনিট যাবৎ তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল, কিন্তু কোনো আধ্যাত্মিক বিষয়ে নয়। ঐ স্বামীজীর কাছে গভর্ণমেন্ট থেকে পত্র এসেছিল, তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে এর কোনো জবাব দিতে হবে কিনা। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন দরকার নেই, স্বামীজী তাতেই সন্তুষ্ট হলেন। শ্রীঅরবিন্দ মঠ দেখে ফিরে এলেন, তার পর আর কিছু হয়নি। কখনই কোনো বিষয়ে

স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে পত্রালাপও হয়নি বা কখনই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তিনি সন্ন্যাসী রূপে ভর্তি হতে চাননি।

কোথাও কোথাও গুজব হয়েছে যে এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ কোনো স্থানে দীক্ষা নিয়েছিলেন। যারা রটিয়েছে তারা জানে না যে শ্রীঅরবিন্দ তখন আর আনাড়ি ছিলেন না, কারো কাছে আধ্যাত্মিক নির্দেশ নেবার তাঁর প্রয়োজনই ছিল না। ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর যোগের নির্দিষ্ট দার্শনিক ধারাতে চারটি বড়ো বড়ো উপলব্ধির মধ্যে দুটি উপলব্ধি সম্পূর্ণরূপেই পেয়ে গেছেন। প্রথমটি হয়েছিল জানুয়ারি ১৯০৮ সালে বরোদাতে মহারাষ্ট্র যোগী বিষ্ণুভাস্কর লেলের সঙ্গে ধ্যানে বসে; তা হলো স্থানাতীত কালাতীত নীরব ব্রহ্মের উপলব্ধি, যা পেয়েছিলেন সমগ্র চেতনার নিস্তরঙ্গ পূর্ণ স্থিরতার ফলে যাতে তিনি জগৎকে অবাস্তব মায়া রূপে অনুভব করছিলেন। কিন্তু এ-ভাব দ্বিতীয় উপলব্ধির পরে ঘুচে গেল, তা হয়েছিল আলিপুর জেলে, যাতে তিনি বিশ্বচেতনা ও সর্বভূতে ভগবানকে উপলব্ধি করেন, সে কথা তিনি বলেছিলেন তাঁর উত্তরপাড়া ভাষণে। আর দুটি উপলব্ধির আভাসও তিনি পেয়েছিলেন আলিপুর জেলে ধ্যানের মধ্যে তা হলো সচ্চিদানন্দের এবং সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দুই ভাবেই ব্রহ্মের উপলব্ধি এবং অতিমানসের অভিমুখে অন্যান্য উচ্চতর চেতনার উপলব্ধি। তদ্ভিন্ন লেলের কাছ থেকে সাধনার এই নীতিই তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে সাধনা এবং বাহ্য কর্ম সব কিছুর জন্যই তিনি একমাত্র ভগবৎ নির্দেশে পরিচালিত হবেন। এর পর অন্য কারো কাছে দীক্ষা বা নির্দেশ নেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বস্তুত শ্রীঅরবিন্দ কখনই কারো কাছে দীক্ষা নেননি; নিজেই প্রাণায়াম থেকে শুরু করেন, আর লেলে ছাড়া কোথাও সাহায্য চাননি।

রামচন্দ্রের বর্ণনা যে কতটুকু নির্ভরযোগ্য তা বোঝাতে আরো দুই একটি বিষয়ে বলা দরকার। অটোম্যাটিক বা স্বয়ংক্রিয় লেখন হবার কথা একেবারে কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন। শ্রীঅরবিন্দ সম্পূর্ণই অস্বীকার করেন যে কোনো কিছু সুবিধার জন্য তিনি অটোম্যাটিক লেখার সাহায্য নিয়েছিলেন, তার মানে হতো মিথ্যা কৌশলের সাহায্য নেওয়া, কারণ লেখকের চেতন মনের কাজ ছাড়া কোনো লেখনই হতে পারে না। যা কিছু করা হয়েছিল তা একটা আমোদ হিসাবে, অন্য কিছু নয়। কেমন ক'রে তার সূত্রপাত হয় তা এখানে বলা দরকার। বরোদায় থাকতে বারীন অটোম্যাটিক লেখন ঘটিয়েছিল চমৎকার ইংরেজী ভাষাতে লেখা, যাতে এমন

ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যা পরে সত্য হয়েছিল আর এমন সত্য খবরও ছিল যা ওখানকার কেউই জানতো না; যেমন লর্ড কার্জন অপ্রত্যাশিত ভাবে ভারত ছেড়ে চলে যাবে, জাতীয় আন্দোলন দমন করা হবে, আর তিলক সেই ঝঞ্ঝার মধ্যে নিজের মহত্ত্ব দেখাবেন; এ ভবিষ্যদ্বাণী তিলকের সামনেই লেখা হলো যখন তিনি বরোদায় গিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের কাছে। শ্রীঅরবিন্দ এতে খুবই আকৃষ্ট হয়ে এটা নিজে ক'রে দেখতে চাইলেন যে কেমন ক'রে এ ব্যাপার হয়। কলকাতায় থাকতে তাই তিনি করেছিলেন। কিন্তু তার ফল আশানুরূপ হয়নি, কাজেই পণ্ডিচেরিতেও বার কয়েক চেষ্টা করার পরে তা ছেড়ে দিলেন। রামচন্দ্র এ-ব্যাপারের যে মূল্য দিয়েছেন তা তিনি দেন না, কারণ বারীনের মতো কিছু তাঁর বেলাতে হয়নি। তাঁর অভিমত এই যে যদিও কখনো কখনো অন্য স্তরের সত্তারা এসে এমন কিছু ঘটাতে পারে তথাপি তারা উচ্চ স্তরের নয়, আর বেশির ভাগই আসে অবচেতন মনের নাটকীয়তা থেকে; কৃচিৎ কখনো সেখানে কিছুর টান পড়ে ভবিষ্যৎ প্রভৃতির কথা বেরিয়ে আসে, কিন্তু তা ছাড়া এর বিশেষ কিছু দাম নেই। রামচন্দ্র যা বলেছেন তা ভুল, থেরেসা বলে কোনো নির্দেশক ছিল না, যদিও থেরাসিনিস বলে একটা কেউ মাঝে মাঝে এসে পড়ত। যা লেখা হতো তা এলোমেলো, কোনো আত্মার মাধ্যমের মতো নয়।

আর একটি সামান্য অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে শ্রীঅরবিন্দ নাকি হয়েছেন একজন তামিল কবি—কয়েকদিন মাত্র তামিল ভাষা শিখেই। বস্তুত শ্রীঅরবিন্দ এক লাইনও তামিল কখনো লেখেননি, কবিতা তো দূরের কথা, আর তামিল ভাষাতে কখনো একটা কথাও বলেননি। মালাবরের একজন নেয়ারের কাছে কয়েকদিন তামিল ভাষাতে লেখা সংবাদপত্র পড়া শুনেছিলেন, সে বুঝিয়ে দিয়েছিল। এটা হয়েছিল বাংলা ছেড়ে আসার কিছুকাল আগে। পণ্ডিচেরিতে তামিল শিখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু নির্জনবাসে থাকাতে তা থেমে গেল।

শ্রীঅরবিন্দের রাজা হবার প্রশ্ন

রামচন্দ্রের বর্ণনার আগাগোড়াই ভুল। শ্রীশ গোস্বামী তাঁর চিঠিতে

দেখিয়ে দিয়েছেন যে রামচন্দ্র তাঁর জ্যোতিষ রচনা সম্বন্ধে যা বলেছেন তা কেবল নোট রাখা ছাড়া কিছু নয়। জ্যোতিষ বিদ্যাতে কিছু সত্য আছে কিনা তা দেখবার জন্য বরোদায় থাকতে শ্রীঅরবিন্দ মনে রাখবার জন্য এই সব নোট লিখে রাখতেন। জ্যোতিষী হতে বা জ্যোতিষ নিয়ে লিখতে তিনি চাননি। তা নিয়ে বই হয় না, বা আর্য-পাব্লিশিং হাউস থেকে কোনো বইও বাহির হয়নি।

শ্রীঅরবিন্দের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী যে কলেজ স্কোয়ারে কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়িতে থাকতেন এ কথা ঠিক নয়; শ্রীঅরবিন্দ নিজে সেখানে ছিলেন জেল থেকে বেরোবার পর এবং ফরাসী ভারতে চলে যাবার আগে। স্ত্রী বরাবরই থাকতেন বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল গিরিশ বোসের বাড়িতে।* শ্রীঅরবিন্দ যে বলেছিলেন তিনি মানুষ থেকে মানবতায় উঠে যাচ্ছেন, এ কথার কোনো মানেই হয় না, কেবল যদি মনে করা যায় যে তিনি বলেছেন পশু-মানব থেকে চিন্তক-মানব হবার কথা। কিন্তু এমন অর্থহীন কথা শ্রীঅরবিন্দ বলতে যাবেন কেন। যদি বলা হতো দিব্য মানবতা তাহলে তার কিছু মানে হতো, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এমন ধরনের কিছু বলার মতো লোকই নয়। বস্তুত রামচন্দ্র যেমন সব কথা শ্রীঅরবিন্দের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন তা শ্রীঅরবিন্দের অভ্যস্ত কথা বলার রীতির সম্পূর্ণ বিপরীত, যেমন তিনি বলেছেন যে চন্দননগর যাত্রার আগে তিনি রামচন্দ্রকে শেক্স্পিয়র ও পোলোনিয়সের স্টাইলে উপদেশ বাণী দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত যদি কিছু বলে থাকেন তবে কেবল চুপ ক'রে থাকতে, অন্য কিছু নয়।

এই যথেষ্ট। আরো সব নানা ভুলের কথা না বললেও চলবে। যথেষ্টই বলা হলো যাতে বোঝা যাবে যে কেউ যদি রামচন্দ্রের বর্ণনার উপর নির্ভর ক'রে শ্রীঅরবিন্দকে জানতে চায় তাহলে ভুল করবে। গেইটে যেমন বলেছেন "কবিকল্পনার সঙ্গে সত্য", এখানে তাই কিন্তু সত্যের ভাগ খুবই কম, কল্পনার ভাগই প্রচুর। ফল্স্টাফের হোটেলে রুটির সঙ্গে মদ্যের যে বিল হয়েছিল তার মধ্যে রুটি প্রায় কিছুই নেই, মদ্যই সমস্তটা।

জনৈকা ফরাসী মহিলা নিবেদিতার জীবনী লিখেছিলেন ফরাসী ভাষাতে। তার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে নিবে-

দিতার সংস্পর্শের কথা ছিল। শ্রীঅরবিন্দকে তা জানানো হতে তিনি তার এইরূপ উত্তর দেন।

লেখিকা তাঁর পুস্তকের ৩১৭-৩২৪ পৃষ্ঠাতে যা লিখেছেন তা সমস্তই অবাস্তব ও অমূলক উপাখ্যান। আলিপুর জেলে আমি প্রথমে ছিলাম নির্জন কোঠাতে আবার শেষের দিকে নরেন গোঁসাইএর হত্যার পরও তাই ছিলাম, মাঝখানে কিছুদিন সকলের সঙ্গে একত্রে থেকেছি। এ কথা ঠিক নয় যে ধ্যানের সময় তারা সকলে আমাকে ঘিরে থাকতো, আমি তাদের গীতা শোনাতাম আর তারা শ্লোকগুলি গাইতো, বা তারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করতো এবং আমি তাদের উপদেশ দিতাম; এ সমস্তই কল্পনার কথা। কয়েদীদের মধ্যে আমি কেবল অল্প কয়েকজনকেই চিনতাম; তার মধ্যে কয়েকজন বারীনের সঙ্গে সাধনা করতো, তারা বারীনের কাছেই কিছু সাহায্য চাইতে পারতো, আমার কাছে নয়। ঐ সময়টাতে আমি ওদের হৈ হল্লার মধ্যে নিজেকে পৃথক ক'রে নিয়ে নিজের যোগ করতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম, কারো সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে নিজের নীরবতার মধ্যেই থাকতাম। আমার প্রথম যোগ শুরু হয় ১৯০৪ সালে, কিন্তু সর্বদাই তা নিতান্ত ব্যক্তিগত ও পৃথকভাবে; কাছাকাছির লোকেরা জানতো যে আমি সাধক, কিন্তু তা ছাড়া আর কিছু নয়, আমার ভিতরে যা হচ্ছে তা নিজের মধ্যেই রাখতাম। কেবল জেল থেকে বেরিয়ে উত্তর-পাড়ার ভাষণেই প্রথম প্রকাশ্যে বলি আমার উপলব্ধির কথা। পণ্ডিচেরি যাবার আগে পর্যন্ত আমার কোনো শিষ্য ছিল না। বন্ধুবান্ধব ছিল বটে কিন্তু গুরু বা শিষ্য নয়; যাদের চিনতাম তা কোনো আধ্যাত্মিক সূত্রে নয়, কেবল রাজনীতিক ক্ষেত্রে। পরে অবশ্য ক্রমশঃ কিছু আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ঘটেছিল পণ্ডিচেরিতে, শ্রীমা এখানে জাপান থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত, তার পরে শেষে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হলো ১৯২৬ সালে। বিনা গুরুতে আমি যোগ আরম্ভ করি ১৯০৪ সালে; ১৯০৮ সালে একজন মহারাষ্ট্রীয় যোগীর কাছে সাহায্য পেয়ে আমার নিজের সাধনার ভিত্তি আবিষ্কার করি; কিন্তু তখন থেকে শ্রীমা ভারতে আসা পর্যন্ত আমি কারো কাছে কোনো আধ্যাত্মিক সাহায্য পাইনি। পূর্বে বা পরে আমার সাধনা কোনো পুস্তকাদির উপর নির্ভর ক'রে হয়নি, যা কিছু হয়েছে তা নিজেরই ব্যক্তিগত অনুভূতি ও উপলব্ধি ভিতরে ভিতরে জড়ো হয়ে। কেবল জেলে থাকার

সময় আমার কাছে ছিল গীতা ও উপনিষদ, তখন গীতার পন্থাতে যোগ করতাম আর উপনিষদের সাহায্যে ধ্যান করতাম। কেবল এই দুটি গ্রন্থ থেকে যা কিছু নির্দেশ পেয়েছি। বেদ পড়তে শুরু করেছি পণ্ডিচেরি আসার অনেক পরে, তখন তার সাহায্য নেওয়া নয় কিন্তু তাতে বর্ণিত উপলব্ধির সঙ্গে আমার উপলব্ধি অনেক মিলে গেছে। কোনো কিছু বাধাবিঘ্ন ঠেকলে বা কোনো প্রশ্ন উঠলে আমি গীতা থেকে কিছু আলো বা উত্তর পেতে চেয়েছি কিন্তু তা ছাড়া এমন কিছু ঘটেনি যা ঐ পুস্তকে বলা হয়েছে। জেলে নির্জন গৃহে ধ্যানের সময় আমি যে দুই সপ্তাহ যাবৎ বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম এ কথা সত্য এবং তাঁর উপস্থিতিও অনুভব করেছিলাম, কিন্তু তদ্ভিন্ন তাই নিয়ে বা গীতার ব্যাপার নিয়ে কোনো ঘটনাই ঘটেনি যা ঐ বইতে লেখা হয়েছে। সেই কণ্ঠস্বরে আমি শুনেছিলাম কতকগুলি সবিশেষ এবং সীমাবদ্ধ প্রয়োজনীয় অধ্যাত্ম উপলব্ধির কথা, কিন্তু সে বিষয়ে বলা শেষ হলে সেই কণ্ঠস্বরও থেমে গেল।

অতঃপর নিবেদিতার সঙ্গে আমার সংস্পর্শ সম্পর্কে—তা হয়েছিল নিছক রাজনীতিক ক্ষেত্রে। তার মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ কিছু ছিল না, তা যে ঘটেছিল অমন কথা আমার স্মরণ হয় না। দুই একবার তাঁর আধ্যাত্মিক দিকের আভাষ পেয়েছিলাম, কিন্তু তখন তিনি অন্যের সঙ্গে সেরূপ বলছিলেন, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি যে তাঁর সঙ্গে ২৪ ঘণ্টা কাটিয়েছি—এবং তখন আমাদের মধ্যে অনেক কিছু হয়েছে এ-সমস্তই উদ্ভট কথা, এক বর্ণ সত্য নয়। নিবেদিতা যখন বরোদায় যান কিছু ভাষণ দিতে তখন তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। আমি স্টেশনে গিয়েছিলাম তাঁকে আনতে এবং নির্দিষ্ট আবাসে তাঁকে পৌঁছে দিতে। মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে আমি তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম। তিনি আমার এই পরিচয় জানতেন "শক্তি মার্গে বিশ্বাসী ও কালীর সাধক" বলে, তার মানে একজন বিপ্লবী। আর আমি তাঁকে জানতাম তাঁর "Kali the Mother" বইখানি পড়ে। তাতেই আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মায়। পরে বাংলা দেশে দূত পাঠিয়ে বিপ্লবের কাজ চালাবার পরে আমি নিজেই বাংলায় উপস্থিত হলাম। গিয়ে দেখলাম যে ছোটো ছোটো বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছে, কিন্তু ছড়ানো ভাবে, পরস্পরের মধ্যে কোনো যোগ নেই। আমি চাইলাম সবগুলিকে এক কেন্দ্রীয় সংগঠনের মধ্যে মিলিয়ে আনতে, ব্যারিস্টার পি. মিত্রকে তার নেতা ক'রে এবং পাঁচটি নেতাকে সেই কেন্দ্রের সভ্য ক'রে, তার মধ্যে নিবেদিতা ছিলেন একজন। ঐ কাজ ক্রমে সারা

দেশে ব্যাপক হয়ে উঠল এবং হাজার হাজার যুবক তাতে যোগ দিলে, আর বারীনের "যুগান্তর" পত্রিকা যুবকদের মধ্যে খুব আদৃত হলো, কিন্তু আমি বরোদায় চলে যাওয়াতে দলে দলে মিল না হওয়ার ফলে ঐ কেন্দ্রীয় সংঘ উঠে গেল। তার পরে বাংলায় স্থায়ীভাবে এসে ন্যাশন্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও "বন্দে মাতরম্" কাগজের মূল সম্পাদকীয় লেখক না হওয়া পর্যন্ত নিবেদিতার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয়নি। তখন আমি চরমপন্থীদের একজন নেতা বলে জানিত হয়েছি, যাদের পরে বলা হলো জাতীয়তাবাদী, কিন্তু তখনও নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি, কেবল কংগ্রেস অধিবেশনে দুই একবার ব্যতীত, অর্থাৎ গুপ্ত বিপ্লবের ক্ষেত্রে নয়। আমি ব্যস্ত ছিলাম নিজের কাজ নিয়ে, তিনিও ব্যস্ত ছিলেন তাঁর কাজ নিয়ে, কাজেই বিপ্লব আন্দোলন সম্বন্ধে কোনো আলোচনাদি করার সুযোগ হয়নি। পরে কখনো কখনো গেছি বাগবাজারে তাঁর কাছে।

তেমনি একবারকার সাক্ষাৎ কালে তিনি আমাকে বলেছিলেন গভর্ণমেন্ট আমাকে দেশান্তরিত করতে চায়, তাই বলেছিলেন ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে বাইরে গিয়ে কাজ করতে যাতে কাজের কোনো বিঘ্ন না হয়। তখন তাঁর তরফের বিপদের কোনো প্রশ্ন ছিল না; তাঁর রাজনৈতিক মতামত জানা থাকা সত্ত্বেও বড়ো বড়ো গভর্ণমেন্ট কর্তাদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল, তাঁর গ্রেপ্তার হবার কোনো প্রশ্ন ছিল না। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে কোথাও যাবার দরকার হবে না, "কর্মযোগীন" পত্রিকাতে একটা খোলা চিঠি লিখব, তাতেই গভর্ণমেন্টের মতলব থেমে যাবে। তাই করলাম, এবং পরে যখন আবার তাঁর কাছে গেলাম তখন তিনি বললেন যে ওতে কাজ হয়েছে, দেশান্তরে পাঠানোর মতলব থেমে গেছে। চন্দননগর চলে গিয়েছিলাম তার অনেক পরে, ঐ দুই ঘটনার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, যদিও উক্ত বইটিতে সব একত্রে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। আর যে সব ঘটনার কথা বলা হয়েছে তা ভিত্তিহীন। গণেন মহারাজ আমাকে বলেন নি তল্লাশী ও গ্রেপ্তারের কথা, রামচন্দ্র মজুমদারের পিতা তাই শুনেছিলেন যে "কর্মযোগীন" অফিস তল্লাসী হবে ও আমাকে গ্রেপ্তার করা হবে। ওতে তিনি লিখেছেন আমি নাকি সি. আই. ডি. অফিসার সামসুল আলমকে হাইকোর্টে হত্যার ব্যাপারে অভিযুক্ত হবো, তাই নিবেদিতা আমাকে ডেকে পাঠিয়ে পরামর্শ দিলেন, তাতেই আমি চলে গেলাম। কিন্তু আমি ঐরূপ অভিযুক্ত হবার কথাও শুনিনি, আর তাই নিয়ে কোনো আলোচনাও হয়নি; পরে

যা হয়েছিল তা কেবল রাজদ্রোহের মামলা। নিবেদিতা এসব কথা কিছুই জানতেন না আমার চন্দননগরে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত। আমি তাঁর কাছে যাইনি বা তাঁর সঙ্গে দেখাও করিনি, এবং তিনি ও গণেন মহারাজ যে আমার সঙ্গে ঘাট পর্যন্ত গিয়েছিলেন এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সত্য এই যে উপর থেকে আদেশ পেলাম চন্দননগর যাবার, দশ মিনিটের মধ্যে ঘাটে চলে গেলাম; একটা নৌকো ডাকা হলো, দুজন যুবকের সঙ্গে চন্দ্রননগর চলে গেলাম। দুজন দাঁড়ি মাঝির একটা সাধারণ নৌকো মাত্র, সুদৃশ্য ফরাসী নৌকোতে যাওয়া এবং একে একে আলো অদৃশ্য হয়ে যাওয়া প্রভৃতি সব কিছুই কবিকল্পনা। অফিস থেকেই একজনকে পাঠিয়েছিলাম নিবে-দিতার কাছে, তিনি যেন আমার অনুপস্থিতিতে "কর্মযোগীন" পত্রিকাটি লেখেন। তিনি তাতে রাজী হলেন এবং কাগজ উঠে না যাওয়া পর্যন্ত তিনিই তা চালিয়েছিলেন; আমি আর তাতে কোনো কিছুই লিখিনি, আপন সাধনাতেই মগ্ন ছিলাম। কেবল দুবার ব্যতীত আমার স্বাক্ষর দিয়ে কোনো লেখাই বেরোয়নি, কেবল পূর্বোক্ত দুটি ব্যতীত, শেষেরটির বেলাতে রাজ-দ্রোহের অভিযোগ হয়ে তা ফেঁসে গিয়েছিল। নিবেদিতার দ্বারা নির্বাচিত স্থানে চন্দননগরে আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম এ-কথা ভুল। আমি কাউকে কিছু না জানিয়েই সেখানে গিয়েছি, মতিলাল রায় আমাকে ডেকে নিয়ে গোপন আশ্রয়ের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন; তিনি এবং আর কয়েকটি বন্ধু ছাড়া কেউই জানতো না আমি কোথায় আছি। গ্রেপ্তারের ওয়ারেন্ট বন্ধ রইল, মাসখানেক পরে পুলিশকে খোঁচা দেওয়াতে ওয়ারেন্ট বের করে আমার অনুপস্থিতিতে মুদ্রাকরের নামে মামলা করা হলো, সে মামলাতে হাইকোর্ট তাকে মুক্তি দিয়ে দিলে। তখন আমি পণ্ডিচেরির পথে, সেখানে পৌঁছলাম ৪ঠা এপ্রিল। সেখানেও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়িতে গোপনে ছিলাম ঐ মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত, তার পর ফরাসী ভারতে আমার উপস্থিতির কথা প্রকাশ করে দিলাম। এইগুলি হলো প্রকৃত ঘটনা, ঐ বইখানিতে যা সব লেখা হয়েছে তার সঙ্গে কোনো মিল নেই। লেখিকাকে এ-কথা জানিয়ে দেবে যাতে তিনি পরবর্তী সংস্করণে সমস্ত ভুলগুলি সংশো-ধন করে দিতে পারেন এবং এই সকল ভুলের দ্বারা নিবেদিতার জীবনের ইতিহাসের মূল্য কোনোরূপে দূষিত না হয়।

১৩-৯-১৯৪৬

দ্বিতীয় বিভাগ

যোগ-আরম্ভ

যোগ-আরম্ভ

প্র ঃ অমুক বলেন কোথায় যেন লেখা আছে যে ১৮৯০ সালে আপনি কিছু উপলব্ধি পেয়েছিলেন। তা কি সত্য?

উঃ ১৮৯০ সালে? সম্ভব মনে হয় না। যে বছর ইংলণ্ড ছেড়ে আসি তখন কিছু একটা হয়েছিল, যদিও যোগ সম্বন্ধে কিছুই তখন জানি না। কিন্তু সম্ভবত তা ১৮৯২-৯৩এর কথা। ১৮৯০ সালে বিশেষ কিছু হয়নি। কোথায় এ লেখা দেখলে?

২২-৮-১৯৩৬

তুমি কি মনে করো যে বুদ্ধ বা কনফুসিয়স বা আমি জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জানতাম যে আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণ করব? সাধারণ চেতনাতে সাধারণ জীবনই যাপন করা হয়েছে। নব চেতনা পরে এসেছে।

২৭-৪-১৯৩৬

প্রথম নিরেট উপলব্ধি

উপলব্ধিকে গভীর ও আধ্যাত্মিক ভাবে নিরেট বলছি এই অর্থে যে তা তখন প্রকৃত বাস্তব, সক্রিয়, চেতনার কাছে স্থূল দৃশ্য বস্তুও যেমন সম্পূর্ণ সত্য বস্তু তেমনি সম্পূর্ণ সত্য। ব্যক্তি ভগবান বা নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্ম বা আত্মার তেমন স্পষ্ট উপলব্ধি সাধারণত সাধনার প্রথম অবস্থাতে বা বহু বছর পর্যন্ত আসে না, খুব কম লোকের বেলাতেই আসে। আমার এসেছিল লণ্ডনে প্রথম একটা পূর্বানুভূতির পনেরো বছর পরে, আর রীতিমত যোগ সাধনা শুরু করার পঞ্চম বৎসরে। একে আমি খুবই ত্বরিত ব্যাপার বলে মনে করি, প্রায় মেল ট্রেনের গতিতে আসা; যদিও এর চেয়েও তাড়াতাড়ি অনেকের ঘটেছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি হবার দাবী

করা অভিজ্ঞ যোগী বা সাধকের কাছে অস্বাভাবিক অধৈর্য বলে গণ্য হবে। প্রায় সকলেই বলবে ধীরে ধীরে প্রথম কয়েক বছরে কিছু কিছু বিকাশ হতে থাকাই সবচেয়ে ভালো, কেবল প্রকৃতি প্রস্তুত হয়ে উঠে ভগবানের দিকে একাগ্র হয়ে গেলে তখনই আসবে পাকা সুস্পষ্ট উপলব্ধি।

জুন ১৯৩৪

দিব্য কৃপাতে অনুভূতির ধারা

আচ্ছা, এ কেমন কাহিনী শুনছি যে আমি বছরের পর বছর প্রত্যহ চার পাঁচ ঘণ্টা ধ্যানমগ্ন থাকার পরে তবেই কিছু অনুভূতি এসেছে? এমন কষ্টকর জিনিস কখনই হয়নি। আমি আগে চার পাঁচ ঘণ্টা প্রাণায়াম করেছি বটে কিন্তু সে অন্য কথা। আর ধারা বলতে কি বোঝায়? প্রাণায়ামের কালে কবিতার ধারা এসেছিল বটে, কিন্তু তা কয়েক বছর পরে নয়। যদি অনুভূতির ধারার কথা বলো, তা এসেছিল কয়েক বছর পরে যখন আমি প্রাণায়াম ছেড়ে দিয়েছি, যখন কিছুই করিনি এবং কি করতে হবে তাও জানতাম না, চেষ্টাও হয়েছে ব্যর্থ। যা এলো-তা ঐ প্রাণায়াম বা ধ্যানের দ্বারা নয়, কিন্তু অদ্ভুত রকমের এক সহজ উপায়ে, হয়তো এক সাময়িক গুরুর কৃপাতে (কিন্তু বাস্তবিক তা নয়, কারণ সে নিজেই ওতে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল) কিংবা শাশ্বত ব্রহ্মের কৃপাতে, ও পরে মহাকালী ও কৃষ্ণের কৃপাতে। অতএব আমাকে দিয়ে ভগবানের কৃপার বিরুদ্ধে কিছু বলাতে চেষ্টা কোরো না, তাতে কোনোই ফল হবে না।

২২-১-১৯৩৬

আমি যা লিখি, তুমি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তার বিকৃত ব্যাখ্যা করো তা'হলে কিছু বলে লাভ কি? আমি পরিষ্কার করে বলেছিলাম যে প্রাণায়াম আমাকে কোনো আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এনে দেয়নি। অনেক আগেই আমি প্রাণায়াম করা ছেড়ে দিয়েছি। ব্রহ্মের উপলব্ধি আমার এসেছিল যখন আমি পথ হাতড়াচ্ছিলাম, সাধনা একেবারেই করছিলাম না, কোনো চেষ্টা-চরিত্র ছিল না, কারণ বুঝতে পারছিলাম না যে সব চেষ্টাচরিত্র ব্যর্থ হবার

পর আর কী করতে হবে। তারপর তিনদিনের মধ্যে এমন এক উপলব্ধি আমার হল যা বেশীরভাগ যোগীই দীর্ঘ যোগজীবনের শেষে লাভ করেন। আমি এটা পেলাম কোনো রকম ইচ্ছা বা চেষ্টা করে নয়। আমি এটা পেয়েছিলাম লেলেকেও বিস্মিত করে; তিনি আমাকে বেশ আলাদা রকমের একটা কিছু দেবারই চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয় না যে তুমি বুঝতে পারছ। কাজেই আর কিছু বলছিনে।

২৪-১-১৯৩৬

×

চিত্রকলা-রহস্য দর্শনের মতো বা অন্য আরো কয়েকটি জিনিসের মতো সবকিছুই আমার মধ্যে কেন হঠাৎ খুলে যায়নি? না, সব কিছু খোলেনি। তোমাকে তো বলেছি যে অনেক কিছুর ক্ষেত্রে আমাকে বহু কষ্ট স্বীকার করে মন্থর গতিতে চলতে হয়েছে। তা না হলে ব্যাপারটি ঘটতে এতদিন (৩০ বছর) লাগত না। এই যোগে সব কিছুতেই একটা সোজা হ্রস্ব পথ নেওয়া যায় না। প্রতিটি সমস্যার উপরে, প্রতিটি সচেতন স্তরে আমাকে কাজ করতে হয়েছে সমস্যা-সমাধান ও রূপান্তরের জন্যে, আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই বড় আরামের অবস্থাই আমাকে মেনে নিতে হয়েছে, আর কোনো অলৌকিক ব্যাপারের দ্বারা বাজিমাৎ করার চেষ্টা না করে সততার সঙ্গে কাজ করে যেতে হয়েছে। অবশ্য চেতনার বৃদ্ধি যদি আপনা থেকেই হয় তো ভাল, বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি হবে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও এলোমেলো সহজ ঘোড়দৌড় দিয়ে তা আসবে না।

৪-৪-১৯৩৫

×

বিশুদ্ধি ও উপলব্ধি

ক কি বলেছেন বা কোন প্রবন্ধে তা জানি না, আমার কাছে তা নেই। কিন্তু যদি তাতে এমন কথা বলা হয়ে থাকে যে যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ বিশুদ্ধ ও নিখুঁত হতে না পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার সার্থক ধ্যান বা উপলব্ধি

আসতে পারে না, তাহলে বলব যে আমার অভিজ্ঞতা তার বিপরীত কথা বলবে। আমি বরাবরই আগে ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি পেয়েছি এবং পরে তার ফলে এসেছে বিশুদ্ধি। আরো অনেকের দেখেছি যাদের আভ্যন্তরীণ উন্নতি তেমন কিছু ছিল না অথচ ধ্যানেতে বড়ো বড়ো রকমের মূল্যবান উপলব্ধি পেয়েছে। যে সব যোগীরা সার্থক ভাবে ধ্যান ক'রে আভ্যন্তরীণ চেতনাতে গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি লাভ করেছে তারা প্রকৃতিতে কি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল? আমার তা মনে হয় না। এ ক্ষেত্রে এমন সাধারণ কোনো নিয়ম থাকবে তা আমি মানি না, কারণ আধ্যাত্মিক চেতনা আসা একটা বিরাট ও জটিল ব্যাপার, যাতে সব রকমই হতে পারে, এমন কি প্রত্যেকের বেলাতে তার প্রকৃতি অনুযায়ী তা বিভিন্ন রকমের, আর তার মধ্যে মূল কথা হচ্ছে ভিতরের ডাক থাকা এবং আস্পৃহা নিয়ে অধ্যবসায়ের সঙ্গে লেগে থাকা, যত কালের জন্যই হোক, আর যত কিছু বিঘ্ন বিপত্তিই আসুক, কারণ তা ছাড়া আমাদের ভিতরকার আত্মা কোনো কিছুতেই খুশি হবে না।

যোগের শুরু থেকেই যদি পূর্ণ সমর্পণ ও বিশ্বাস প্রভৃতি থাকা দরকার হতো তাহলে তো কেউই যোগ করতে পারতো না। আমি নিজেও তা পারতাম না, যদি আমার বেলাতে আগের থেকে ওরূপ অবস্থা দাবী করা হতো....

৮-৩-১৯৩৫

আধ্যাত্মিক সম্ভাবনার পূর্ব ইঙ্গিত

প্রঃ এ-কথা কি ঠিক যে সাধনা করবার আগে যারা দিব্য কৃপাতে আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিছু পূর্ব-ইঙ্গিত পেয়েছে তারাই কেবল শেষ পর্যন্ত যেতে পারে, কিন্তু যারা তা পায়নি তারা কিছু অনুভূতি পেলেও শেষ পর্যন্ত সাধনা রাখতে পারে না?

উঃ আমি অন্ততপক্ষে যোগ করার আগে তেমন কোনো ইঙ্গিত পাইনি। অন্যেদের কথা বলতে পারি না—কেউ হয়তো পেয়ে থাকতে পারে—কিন্তু তাতে কেবল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাই আসবে, জ্ঞান কিছু মিলবে না; জ্ঞান আসে যোগের পরে, তার আগে নয়।

আবার বলছি যে কেবল এটাই দেখা দরকার যে আমার আত্মা বাস্তবিকই যোগের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে কিনা।

৫-৫-১৯৩৩

চার বছরের প্রচেষ্টা

এই সব বাধা বিপত্তি যে কেবল তোমারই বেলা হচ্ছে তা নয়, এ পথের সকল সাধকের বেলাতেই এমন বাধা থাকে। আমার নিজের বেলাতে চার বছরের আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা লেগেছে ঠিক পথটি খুঁজে পেতে, যদিও ভগবৎ সহায়তা সব সময়েই ছিল, তথাপি খুঁজতে খুঁজতে যেন দৈবাৎ মিলে গেল। তার পরেও আরো দশ বছর যাবৎ আভ্যন্তরীণ দিব্য নির্দেশে আমাকে তীব্রতর যোগ করতে হয়েছে ঐ পথ ছকে নেবার জন্য, তার কারণ নিজের অতীত ও জগতের অতীতকে কাটিয়ে উঠে আমাকে ভবিষ্যৎ পরিণতির প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে।

৫-৫-১৯৩২

প্রথম অদ্বৈত অনুভূতি

আমার ঐ কথাটা "যেন দৈবাৎ মিলে গেল" তাই নিয়ে তুমি অনেক কিছু জল্পনা ক'রে ফেলেছ, ঐ "যেন" কথাটিকে বাদ দিয়ে। নিজের থেকে চার বছর পর্যন্ত প্রাণায়াম প্রভৃতি করে আমি পেলাম কেবল খানিকটা দেহ-মনের জোর, কবিতা রচনার বেগ, কিছু সীমাবদ্ধ সূক্ষ্ম দৃষ্টি জাগ্রত চোখে, তাছাড়া সব সম্ভাবনা থেমে গেল, আমি দিশাহারা হয়ে রইলাম। তখন আমার সাক্ষাৎ ঘটল একজন অখ্যাতনামা ভক্তের সঙ্গে, যার মানসিক সংকীর্ণতা সত্ত্বেও কিছু আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও ডাক দেবার শক্তি ছিল।

তার সঙ্গে একত্রে বসে পুরো বাধ্য ভাবে সে যা বল্লছে তাই ক'রে যেতে থাকলাম, কিছুমাত্র না জেনে যে সে কোথায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছে বা নিজেই কোথায় যাচ্ছি। তার প্রথম ফল এই হলো যে উপর্যুপরি কতকগুলি জোরালো অনুভূতি এসে আমার চেতনার এমন সমূহ পরিবর্তন ঘটিয়ে দিলে যা তারও অপ্রত্যাশিত—কারণ তা হলো অদ্বৈত ও বৈদান্তিক অনুভূতি আর সে লোকটি ছিল অদ্বৈত বেদান্তের বিরোধী—আর আমারও ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত কারণ আমি জগৎকে অভ্রান্তরূপে প্রত্যক্ষ করতে থাকলাম যেন সিনেমার ছায়াছবির মতো সব ছায়ামূর্তিতে ভরা আর বিশ্বময় আছে কেবল অনন্ত ব্রহ্মের নির্ব্যক্তিকতা। অবশেষে এই হলো যে ঐ ব্যক্তি ভিতর থেকে আদিষ্ট হয়ে আমাকে বললে আমার নিজের ভিতরকার ভগবানের ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে। আর সেই সূত্রটিকেই বীজ রূপে ধরে আমি অটলভাবে যোগের উন্নতির ঘোরা পথে অকল্পনীয় রূপে অগ্রসর হয়ে গেছি, কোনো কিছু নিয়ম বা নীতি বা মন্ত্র বা শাস্ত্রের নির্দেশ না নিয়ে আর কোনো কিছু না জেনে যে কোথায় আমি এখন এসেছি আর কোথায় বা এর পরে যাবো। কিন্তু ঐ ব্যক্তি এর কিছুই বোঝেনি, তাই যখন দুই এক মাস পরে আবার তার সঙ্গে দেখা হলো, তখন সে ভয় পেয়ে বললে যে আমি যাকে অনুসরণ করছি সে কিন্তু ভিতরের ভগবান নয়, কোনো অদিব্য সয়তান আমাকে আশ্রয় করেছে। এই সব কারণে "আমার দৈবাৎ মিলে যাওয়া" বলাটা কি ন্যায্য হয়নি? আমি বলতে চেয়েছি যে ভগবানের কাজের ধারা মানুষের মনের কাজের ধারাতে চলে না, কিংবা আমাদের প্যাটার্নেও তার ক্রিয়া হয় না, সুতরাং তিনি কি করবেন, আর না করবেন তার কোনো বিচার করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কারণ আমরা যেটুকু জানতে পারি ভগবান তার চেয়ে অনেক বেশি জানেন। যদি ভগবানকে আদৌ আমরা মেনে থাকি, তাহলে আমার মনে হয় যে যুক্তি এবং ভক্তি দুই তরফ থেকেই বলবে তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস নিয়ে তাঁরই হাতে আত্মসমর্পণ করতে। তা ছাড়া অব্যভিচারিণী ভক্তি কেমন ক'রে হতে পারে তা জানি না।

মে ১৯৩২

মানব গুরুর দোষত্রুটি

চৈত্য উন্মীলন, আস্থা ও সমর্পণ থাকলে মানব গুরুর দোষত্রুটিতে কিছু যায় আসে না। গুরু হলেন ভগবানের মাধ্যম বা প্রতিনিধি বা তাঁর অভি-ব্যক্ত সত্তা, ব্যক্তিগত শক্তিলাভ অনুসারে; কিন্তু যাই কেন তিনি হোন, তাঁর কাছে নিজেকে দেওয়া মানেই ভগবানের কাছে দেওয়া; আর তাঁর শক্তির দ্বারা যদি বা কিছু কাজ হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ হয় গ্রহিতা-চেতনার নিজস্ব আভ্যন্তরীণ ভাবের দ্বারা, যা বাইরের মনে প্রকাশ পায় সরল বিশ্বাস বা বিনা শর্তে আত্মদান করার দ্বারা। এইগুলি থাকলে তাহলে শিষ্যের চেয়ে গুরু আধ্যাত্মিক ব্যাপারে নিকৃষ্ট হলেও সাধকের নিজেরই ভিতর থেকে ভগবৎ কৃপার ফলে সব কিছু আসবে, যদিও সেই মানব গুরু তা দিতে না পারে। ক বোধ হয় গোড়া থেকে এই জিনিসই করে গেছেন; কিন্তু এখনকার দিনে নানা ইতস্ততের ভিতর দিয়ে এমন মনোভাব আনতে পারা খুব কঠিন। আমার নিজের বেলাতে আভ্যন্তরীণ জীবনে প্রথম মোড় নেওয়া এসেছিল এমন একজন থেকে যে বুদ্ধিতে, বিদ্যায়, জ্ঞানে আমার চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট এবং আধ্যাত্মিক গুণেও অপরিণত; কিন্তু একটা শক্তি ছিল তার, এবং তারই সাহায্য পেতে আমি তার হাতে নিজেকে অকুণ্ঠভাবে সঁপে দিয়ে সে যেমন যেমন নির্দেশ দিতে থাকল আমি ঠিক সেইরকমই করতে থাকলাম। সে আশ্চর্য হয়ে অন্যেদের বললে যে এমন অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ ও নিখুঁতভাবে নির্দেশ মেনে চলা সে আর কোথাও দেখেনি। তারই ফলে এমন সব রূপান্তরকারী অনুভূতি হতে থাকল যার সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই নেই, তাই সে বললে যে ঐরকম সমর্পণ ও নির্ভরতার সঙ্গে যেন ভবিষ্যতে আমি নিজেরই ভিতরকার ভগবৎ দিশারীকে অনুসরণ করি। এই দৃষ্টান্তটি এখানে বললাম বোঝাতে যে এমনি ভাবেই কাজ হয়; মানুষের যুক্তিবুদ্ধির হিসাব মতো এ সব কাজ হয় না, তার চেয়ে বড়ো রকমের এবং আরো রহস্যজনক দিব্য নিয়মে তা হয়ে থাকে।

২৩-৩-১৯৩২

অদ্বৈত আত্মার অনুভূতি

প্রঃ। অদ্বৈত আত্মার অনুভূতি সম্বন্ধে –কে যা লিখেছেন তা দেখলাম। ওটা অকল্পনীয় ব্যাপার।

তা কি করা যাবে, যা হয়েছে তাই বলেছি। সম্ভাব্য সম্পর্কে মনের ধারণা আধ্যাত্মিক অনুভূতির কিনারা করতে পারে না।

প্রঃ। অনুভূতি কেমন হয়েছিল? জেলে আপনার বাসুদেব দর্শনের মতো?

জট পাকিয়ে ফেলছ। বাসুদেবের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক? বাসুদেব হলো কৃষ্ণের নাম, আমি উত্তরপাড়ার ভাষণে কৃষ্ণের কথাই বলেছিলাম।

প্রঃ। আত্মা মানে তো ব্যক্তিগত আত্মা?

না না। আত্মা মানে বেদান্তের অদ্বৈত আত্মা, শংকরের আত্মা, আত্মন্! যা আমি আগে কখনো জানতাম না, কখনো বুঝতামও না।

প্রঃ। আপনি কি প্রথমে গুজরাটে যোগ শুরু করেন নি?

হ্যাঁ, কিন্তু লণ্ডনে থাকতেই সূত্রপাত হয়। আপোলো বন্দরে পদার্পণ মাত্রেই তা স্ফুরিত হয়, তার পরের বছর বরোদাতে, যখন গাড়ির মধ্যে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। এখন পরিষ্কার হলো কি?

আত্মার উপলব্ধি ও ভগবৎ প্রেম

প্রেমের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আত্মার উপলব্ধি আর ভগবানের প্রতি প্রেম দুই স্বতন্ত্র জিনিস। আমি আত্মার দিক দিয়ে প্রচেষ্টা করিনি। ভগবানের প্রতি ভক্তের প্রেম ওর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস।

> প্রঃ। কিন্তু আত্মার অভিজ্ঞতালাভের মধুর স্মৃতি নিশ্চয় আপনাকে ধারণ করে রেখেছিল।

উঃ। না, এ ব্যাপারে চিনিমাখা কিছুই ছিল না। আর এই স্মৃতির প্রয়োজনটুকুও আমার ছিল না। কেন না, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে সেই উপলব্ধি এখনো আমার রয়ে গেছে, তবে এখন তা আমার অন্যান্য উপলব্ধির সঙ্গে মিশে আছে। আমি যা বলতে চাইছি তা এই যে এমন শত শত ভক্ত আছে যারা ধরা-ছোঁওয়ার মত বিশেষ কোনো উপলব্ধি ছাড়াই প্রেম আর আকুতির অধিকারী। একটা মানসিক ধারণা বা ভগবানের উপর হৃদয়াবেগজনিত একটা বিশ্বাস, এগুলিই তাদের ধরে রাখে। আসল কথাটা হচ্ছে এই যে ভগবানের প্রতি ভালবাসার জন্যে প্রথমেই একটা পাকাপাকি রকমের মোক্ষম উপলব্ধি পেতেই হবে এ কথা সত্যি নয়। এ হল অধ্যাত্ম-উপলব্ধির বিপরীত তথ্য—অতি সাধারণ তথ্য।

নির্বাণের অনুভূতি

আমি কখনো এ কথা বলিনি যে জীবনের অবস্থা এখন সুসংগত—বরং বলি যে এই রকমের মানব চেতনাতে সংগতি হওয়া অসম্ভব। বরাবরই বলে এসেছি যে মানব চেতনার অবস্থা বিকৃতিপূর্ণ ও অসম্ভব হয়েছে—তাই তো আমি চাইছি যে উচ্চতর চেতনা এসে এই সব দোষ সংশোধন ক'রে দিক। আমি তোমাকে নির্বাণ দিতে (কাগজে) চাই না এখন, কারণ তাতে কেবল লেখাতেই সংগতি আসবে। তুমি নীরবতা আনতে পারছ জেনে সুখী হলাম, আর নির্বাণেরও দাম আছে—আমার

প্রথম আধ্যাত্মিক অনুভূতিও তাই হয়েছিল এবং তারই ফলে আমার বাকী সব সাধনা সম্ভব হলো। কিন্তু তোমার বেলাতে তা পাবার সম্বন্ধে বলতে পারি না যে তোমার মন সে পথে তৈরি কি না। উপায় অবশ্য অনেক আছে। আমার বেলাতে ছিল চিন্তামাত্র প্রত্যাখ্যান। আমাকে বললে, "এখানে বসে দেখতে থাকো যে তোমার সব চিন্তাগুলো তোমার মধ্যে আসছে বাইরের থেকে, এলেই তাকে ঝেড়ে ফেলে দাও"। আমি আশ্চর্য হয়ে তাই দেখলাম যে বাস্তবিকই চিন্তা আসছে মাথার উপর থেকে তার মধ্যে, ঢুকে পড়বার আগেই তাকে ঠেলে ফেলে দিতে পারলাম।

তিন দিনের মধ্যে—বস্তুত একদিনেই—আমার মন ভরে রইল এক শাশ্বত নীরবতায় —এখনও তাই আছে। কিন্তু এমন ক'জন করতে পারবে তা জানি না। এক ব্যক্তি (কোনো শিষ্য নয়—তখনও শিষ্য কেউ হয়নি) আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল কেমন ক'রে যোগ করবে। আমি তাকে বললাম, "আগে মনকে নীরব করতে হবে"। সে তাই চেষ্টা করলে, তার মন তখন শূন্য ও নীরব হয়ে গেল। এতে সে ছুটে এসে আমাকে বললে, "আমার মাথাটা যে চিন্তাশূন্য হয়ে গেল, কিছু ভাবতেই পারছি না। আমি কি বোকা হয়ে গেলাম।" সে একবার দেখলে না যে এই যে চিন্তাগুলো সে বলছে এগুলো আসছে কোথা থেকে! আর এ কথাও বুঝলে না, যে আগের থেকেই বোকা যে হয় সে আর বোকা হতে পারে না। কিন্তু তখন আমার এত ধৈর্য ছিল না, আশ্চর্যভাবে নীরব হতে পারা সত্ত্বেও তাকে আমি ছেড়ে দিলাম।

সব চেয়ে সহজ উপায় হবে উপর থেকে নীরবতাকে আহ্বান করা, যেন তা এসে ঢোকে তোমার মস্তিষ্কে, মনে ও দেহে—যদি তা করতে পারো।

মনের উপর দখল ও মুক্তি

উন্নত মনের লোকেরা, যারা সাধারণের চেয়ে উপরে উঠেছে, তারা প্রয়োজনমত, অন্ততপক্ষে কোনো কোনো সময়ে মনকে দুই ভাগে ভাগ ক'রে নিতে পারে, একটা থাকে সক্রিয় অংশ যার মধ্যে সবরকম চিন্তাই কাজ করে, আর একটা থাকে সুস্থির প্রভুত্বপূর্ণ মন যে সাক্ষীও থাকে আর দেখেশুনে

বিচার ক'রে কোনোটাকে বর্জন কোনোটাকে গ্রহণ ক'রে বা সংশোধন ক'রে নিতে পারে,—সেই অংশই হলো মনের ঘরের প্রভু, তারই হয় আত্ম-সাম্রাজ্য।

যে হয় যোগী সে আরো এক ধাপ এগিয়ে যায়—সে কেবল প্রভুই হয়ে থাকে না, মনের মধ্যে থেকেও মন থেকে যেন বেরিয়ে গিয়ে উপরে উঠে মুক্ত হয়ে থাকতে পারে। তার কাছে মনের ঐ চিন্তাময় কারখানার অংশটা আর তেমন বাস্তব থাকে না; সে দেখতে পায় যে সব কিছু চিন্তা আসে বাইরের বিশ্ব মন বা বিশ্ব প্রকৃতি থেকে, কখনো বা গঠিত ও স্পষ্ট কখনো বা অগঠিত, তা আমাদের মধ্যে এসে গঠন নেয়। আমাদের মনের প্রধান কাজ হলো এই সব চিন্তা-তরঙ্গ ঢুকিয়ে নেওয়া বা প্রত্যাখ্যান করা (তেমনি প্রাণময় তরঙ্গকেও, দৈহিক শক্তিতরঙ্গকেও), এবং চিন্তার বেলা তাকে ব্যক্তিমনের গঠনে আনা (প্রাণের বেলাতেও তাই) যা পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি-শক্তির ক্রিয়াতে এসেছে। লেলের কাছে এর জন্য আমি ঋণী, সে বললে—"ধ্যানে বসে যাও, কিন্তু চিন্তা কোরো না, কেবল মনের দিকে চেয়ে থাকো, দেখবে যে চিন্তাগুলো আসছে তার মধ্যে; যেমনি দেখবে তেমনি তাকে তাড়াবে, এই করতে করতে মন সম্পূর্ণ নীরব হতে পারবে।" এ কথা আমি কখনো শুনিনি যে চিন্তাকে বাইরের থেকে মনের মধ্যে আসতে দেখা যায়, কিন্তু আমি তাই নিয়ে কোনো প্রশ্নই না ক'রে যা বললে তাই মেনে নিলাম এবং তাই করতে থাকলাম। শীঘ্রই আমার মন স্থির হয়ে গেল পর্বতচূড়ার নিস্তরঙ্গ বায়ুর মতো; যখন চিন্তা বাইরের থেকে আসতে থাকল একটার পর একটা তখন মস্তিষ্কে ঢোকার আগেই তাকে তাড়াতে থাকলাম, আর তিনদিনের মধ্যে আমি মুক্ত হয়ে গেলাম। সেই সময় থেকে আমার মনঃসত্তা হয়ে গেছে কেবল মুক্তিপ্রাপ্ত বুদ্ধি, কেবল বিশ্বগত মন, যা ব্যক্তিগত সংকীর্ণ চিন্তা-গণ্ডীর অন্তর্গত দিনমজুর নয়, কিন্তু শত শত রাজ্য থেকে যে জ্ঞান আসে তার গ্রহীতা, এবং এই বিশাল দৃশ্য জগৎ ও চিন্তাসাম্রাজ্যের যা কিছু আসে তার থেকে মুক্তভাবে ইচ্ছামত বেছে নিতে পারে। এ কথাগুলি বললাম এই জিনিস বোঝাতে যে মনঃসত্তার সম্ভাব্যতার কোনো সীমা নেই, নিজেরই ঘরে সে সাক্ষী ও প্রভু হয়ে থাকতে পারে। অবশ্য এমন বলছি না যে সবাই আমার মতো এমন ভাবে এত শীঘ্র এ কাজ করতে পারবে (যদিও পরে এই নতুন মনঃশক্তিকে পরিণত ক'রে আনতে আমার অনেক বছর সময় লেগেছিল), তথাপি সকলেই

আপন মনের উত্তরোত্তর এই ধরণের উন্নতি ও মুক্তিকে নিশ্চয় সম্ভব ক'রে আনতে পারে, যদি তার মধ্যে তেমন আস্থা ও ইচ্ছা থাকে।

স্থিরতা নেমে এসে মনের নীরবতা

প্রফেসর সোরলি যে বলেছেন স্বচ্ছ সমুজ্জ্বল স্থির মনের কথা তাতে আপত্তি করার কিছু নেই, কারণ এই ভাবেই মন প্রস্তুত হয়ে ওঠে তার নিস্তরঙ্গ আধারে উচ্চতর সত্যকে প্রতিফলিত করবার জন্য। কেবল একটা কথা জেনে রাখা চাই যে মনকে এমনি নীরব করে রাখা দরকার হলেও তা আনতে পারবার একাধিক উপায় আছে। যেমন, শুধু মনের নিজের চেষ্টাতেই তার স্বভাবজ ভাবাদির তরঙ্গ ওঠা অথবা দৈহিক জড়তাহেতু মনের নীরবতার বদলে নিদ্রা বা সুষুপ্তি আসাকে যে এড়ানো যায় তা নয়,—যা জ্ঞানযোগের সাধারণ পদ্ধতি। উপর থেকে একটা আধ্যাত্মিক স্থিরতা নেমে এসেও মনকে ও হৃদয়কে ও জীবন উত্তেজনাকে ও দৈহিক প্রতিক্রিয়াকে স্তব্ধ ক'রে দিতে পারে। এমনি হঠাৎ এই ধরণের স্থিরতা নেমে আসা বা উত্তরোত্তর এসে তা প্রগাঢ় হয়ে ওঠার কথা আধ্যাত্মিক অনুভূতির ক্ষেত্রে সুবিদিত। কিংবা এও হয় যে তুমি এমন পদ্ধতি নিয়ে কাজ শুরু করলে যাতে অনেক কালের মেহনত লাগবে, কিন্তু হঠাৎ দেখলে যে এইরকম নীরবতা তাড়াতাড়ি আপনা থেকে এসে গেল, যার সঙ্গে তোমার পূর্ব প্রয়াসের কোনোই মিল নেই। তুমি একটা রাস্তাতে কাজ শুরু করলে, কিন্তু উপরকার কৃপা তোমার সেই কাজের ভার নিয়ে নিলে, যা এলো তা তোমার আস্পৃহার লক্ষ্যস্থল থেকে কিংবা উপরের পরমাত্মার আনন্ত্যের একটা স্ফুলিঙ্গপাত রূপে। এই শেষের জিনিসটাই হয়েছিল আমার নিজের বেলাতে, যখন অভাবনীয় রূপে আমার মনের পূর্ণ নীরবতা এসে গেল, সে সম্বন্ধে আমার মধ্যে কোনো অনুভূতি হবার আগেই।

নীরব ব্রহ্ম ও দিব্যশক্তির ক্রিয়া

নীরব ব্রহ্মের উপলব্ধি যোগের সক্রিয়তার পক্ষে কোনো প্রতিবন্ধক হয় না,

বরং তা প্রথম পদক্ষেপ। ওর সঙ্গে জড়তাকে মেশানো উচিত নয়। নীরব ব্রহ্ম কোনো কিছুর সঙ্গেই জড়িত নয়। তোমার মনই জড়তার সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত।

কেবল কাজ করলেই সমস্যার সমাধান হয় না, কাজের পশ্চাতে ভাবটি থাকাই আসল কথা। মূল কথা হলো দিব্যশক্তির কাছে নিজেকে খুলে ধরা। নীরব ব্রহ্মের সাধনায় যুক্ত হয়ে গেলে তখন আর আগের মতো ভাব নিয়ে কাজ করবে না। তখন ঐ মুক্তিতে তোমার অহং ভাব ঘুচে গিয়ে তুমি দিব্যশক্তির যন্ত্রস্বরূপ হয়ে তারই শক্তিতে কাজ করছ বলে অনুভব করবে, তাতে জড়তা ঘুচে গিয়ে নতুন ভাবে কাজ করা সম্ভব হবে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ সাধারণভাবেই কাজ করবে, কিন্তু ভগবৎ যন্ত্র হয়ে কাজ করাই প্রকৃত পন্থা।

আমার প্রথমে পরম নির্বাণের উপলব্ধি ঘটেছিল, চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ। তার পরে এলো কর্মের অনুভূতি, নিজের নয়, উপরকার। সহজে তা না এলে ক্রমশ সে ভাব আনতে হবে।

২৬-৬-১৯৪৬

×

তুমি যে কথা বলেছ তা জীবনীশক্তিকে গুটিয়ে নেওয়া নয়; চেতনা উপরে উঠে থাকাতে নিম্নতর অংশগুলিতে এ কেবল স্থিরতা ও শূন্যভাব আসার ফল। কর্ম করা এতেও চলবে, এই অবস্থার মধ্যে তা অভ্যাস ক'রে নিলেই হবে। এর চেয়ে অনেক বেশি শূন্যতার অবস্থাতে আমি দৈনিক সংবাদপত্র চালিয়ে গেছি, তিন চার দিনের মধ্যে ডজন খানেক বক্তৃতা দিয়েছি—কিন্তু সেগুলো আমি করিনি, তা হয়ে গেছে। ঐ শক্তি এসে দেহকে দিয়ে কাজ-গুলি করিয়ে নিয়েছে, কিন্তু নিজের ভিতরে কোনো কাজ হয়নি। জীবনী-শক্তি গুটিয়ে গেলে দেহ হয়ে পড়ে অসহায়, প্রাণহীন, ফাঁকা এবং অসাড়, তাতে কেবল খুব যন্ত্রণাবোধ ছাড়া আর কোনো অনুভূতি হয় না।

১৩-৫-১৯৩৬

×

তুমি বই পড়ে যাচ্ছো আর আভ্যন্তরীণ চেতনা আলাদাভাবে তাই দেখতে পাচ্ছে যে তুমি পড়ছ, এটা নিশ্চয় সম্ভব। আমি সম্পূর্ণ আভ্যন্তর নীরবতার মধ্যেই সংবাদপত্র লিখেছি আর বক্তৃতা দিয়ে গেছি, তা আপনিই হয়ে গেছে মনের মধ্যে চিন্তামাত্র না এসে, বা সেই নীরবতা বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বা হ্রাস না পেয়ে।

২৭-১০-১৯৩৪

প্রকৃত বিপত্তি

হাক্সলির মন্তব্যের উপর শ্রীঅরবিন্দের কিছু বলার নেই। কিন্তু "ঐরূপ উচ্চতায় আমরা নিশ্চয় উঠতে পারি", এখানে "আমরা" কথাটির মানে সকল মানুষই নয়, কেবল যারা আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রায় যথেষ্ট অগ্রসর তাদের কথাই বলা হয়েছে। আর শ্রীঅরবিন্দ সম্ভবত নিজের অনুভূতির কথা ভেবেই ওটা বলেছেন। তিন বছরের ব্যর্থ প্রয়াসের পরে একজন যোগী তাঁকে দেখালে কেমন ক'রে মনকে নীরব করতে হয়। সেই উপায় অবলম্বন ক'রে দুই তিনদিনের মধ্যে মনকে নীরব করা গেল। চিন্তা সব থেমে গেল, চেতনার অনুভবাদি সব থেমে গিয়ে কেবল রইল বাইরের জিনিস দেখা এবং চেনা; কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শূন্য। অহংবোধ চলে গেল, কথা বলা এবং সাধারণ জীবনের কাজগুলি সব হতে থাকল কেবল অভ্যস্ত প্রকৃতির দ্বারা যা নিজের বলতে কিছু নয়। আর সে যা কিছু দেখছে তা সম্পূর্ণ অবাস্তব, বিশ্বের সব কিছুই তাই। আছে কেবল এক অবর্ণনীয় নিকালাতীত অদ্বিতীয় এক অস্তিত্ব যা বিশ্ব তৎপরতার সঙ্গে সম্পর্কিত নয় অথচ যেদিকে দৃষ্টি ফেরাই সেদিকেই তা রয়েছে। এইরূপ অবস্থাটি থেকে গেল কয়েক মাস পর্যন্ত, তার পর যদিও সেই অবাস্তব বোধ ঘুচল এবং জগৎ চেতনাতে ফিরে আসা গেল, তথাপি ভিতরকার শান্তি ও মুক্তি সকল বাহ্য ক্রিয়ার পিছনে টিকে রইল, সে উপলব্ধির রেশটুকু আর ঘুচল না। এর সঙ্গে আরো এক অনুভূতি এলো যে নিজে ছাড়া আরো একটা কিছু ভিতরে এসে সব কাজকর্মগুলো চালাচ্ছে এবং কথা বলছে, ব্যক্তিগত প্রবর্তনা বা চিন্তার দ্বারা নয়। সেটা কি জিনিস তা শ্রীঅরবিন্দ জানতেন না যতদিন তাঁর সক্রিয় ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের উপলব্ধি না এসেছিল,

যাতে তিনি দেখলেন যে সাধনা প্রভৃতি সব কিছুই তারই দ্বারা সাধিত হচ্ছে। এ ছাড়া আরো সব উপলব্ধি, যেমন আত্মাই সর্বময় ও সবকিছুই আত্মাময় এবং সবই আত্মা, সবই ভগবান এবং ভগবানের মধ্যেই সব,—এইরূপ ধরনের উচ্চতার কথাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে সেখানে আমরা উঠে যেতে পারি ; কারণ তাঁর নিজের বেলাতে তাতে খুব বেশি প্রতিবন্ধক হয়নি। যাতে সব চেয়ে বেশি বাধা ছিল এবং অনেক বছরের আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টাতে লেগে থাকতে হয়েছিল, তা হলো এই জ্ঞানকে জগতের ক্ষেত্রে এবং মনস্তাত্ত্বিক পার্থিব জীবনের মধ্যে নামিয়ে আনাতে—যার দ্বারা প্রকৃতির মধ্যে এবং মন প্রাণ দেহের স্তর থেকে অবচেতন ও মূল অচেতনার স্তর পর্যন্ত পরম ঋতচেতনা বা অতিমানসের দ্বারা রূপান্তরিত করা যায় এবং সেই সক্রিয় রূপান্তর সর্বসম্পূর্ণ হতে পারে।

৪-১১-১৯৪৬

আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্বন্ধে বুদ্ধির ব্যাখ্যা

বুদ্ধির উত্তীর্ণ জিনিসকে বুদ্ধির ব্যাখ্যার মধ্যে আনা চলে না। এ তো কোনো ভাবের প্রকাশ নয়। অনুভূতির দ্বারা আসে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, সরাসরি আসে চেতনার মধ্যে। সুতরাং তা চিন্তা নয় কিন্তু চেতনা। যেমন আমার প্রথম এসেছিল সকল চিন্তাকে স্তব্ধ করে দেবার পরে—প্রথমে এলো একটা স্থির নিশ্চল নীরবতা, তার পর একটা পরম বাস্তবতার নিরেট অনুভূতি যার কাছে অন্য সব কিছুই আছে কিন্তু আর বাস্তব নয়। এবং তা নির্ব্যক্তিক রকমের আধ্যাত্মিক বোধ যার মধ্যে কোনো বাস্তব অবাস্তবের বিচারভাব নেই, কারণ মনের ভাব মাত্রেই তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। মনের দ্বারা নয়, বিশুদ্ধ চেতনার দ্বারাই তা জানা গেল, সেখানে বাক্যের কোনো প্রয়োজনই হয় না, নামও কিছু তার নেই। কিন্তু তার কোনো সীমারেখা নেই, চিন্তার ভিতর দিয়েও তার অনুভূতি হতে পারে। তবে চিন্তার রাজ্যে তাকে আনতে গেলে তখন বুদ্ধির কাজ আসবে, কিন্তু তা অনিবার্য নয়। অনুভূতিকে বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করতে গেলে তার প্রয়োজন হবে, কিন্তু সে অন্যরূপ আলোকে। যা বুদ্ধির জিনিস নয় তাকে বাক্যের দ্বারা বলা কি

সম্ভব? হাউসম্যান বলেছেন যে কাব্য তখন প্রকৃত কাব্য হয় যখন তা বুদ্ধির অগোচর, তা এমন জিনিস দেখাবে যা বুদ্ধির চিন্তা দেখাতে পারে না। কিন্তু কোনো ভাষার দ্বারা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিউত্তীর্ণ চেতনাকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়? তবে বুদ্ধির বোঝবার মতো ক'রে বলতে চাইলে তখন তা হয়ে পড়ে আলাদা জিনিস।

১৪-১-১৯৩৪

নীরবতা ও সক্রিয়তা

১৯০৮ সালের পর যখন আমার মধ্যে নীরবতা এলো তখন থেকে আমি আর মাথা বা মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা করি না—মাথার উপরদিকে যে উদার বিশালতা রয়েছে সেখান থেকেই চিন্তাগুলি আসে।

১৭-১০-১৯৩৩

শূন্যতার উপলব্ধি আমার অনেক বছর ছিল। যা কিছু এসেছে তা শূন্যতার মধ্যেই, যে কোনো মুহূর্তে আমি নিজেকে নীরব প্রশান্তির মধ্যে গুটিয়ে নিতে পারতাম।

২১-৯-১৯৩৪

আত্মোপলব্ধি ও দেহের চেতনা

প্র ঃ। আত্মোপলব্ধির অবস্থায় দেহে খুব সামান্য চেতনাই অবশিষ্ট থাকে। দেহ যে কী করছে, কাকে ধারণ করে আছে বা কোথায় আছে এ সব আমি কিছুই জানিনে।

উ ঃ। সেটাই সচরাচর ঘটে। আমি ঐভাবে বহু বছর ধরে দেহ সম্বন্ধে অচেতন ছিলাম। ১৫-১০-১৯৩৪

যোগানুভূতি ও বৈজ্ঞানিক প্রতিবাদ

ঘণ্টাধ্বনি প্রভৃতি যে অনুভূতির কথা তুমি বলেছ তা বহুকাল আগে উপনিষদ বলে গেছেন বৃহত্তর চেতনা উন্মীলনের চিহ্ন, ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে। স্ফুলিঙ্গ দেখাও তাই। যোগ সাহিত্যে এ সবের বহু উল্লেখ আছে। আমার সাধনার প্রথম দিকে শত শত বার এ সব দেখেছি। সুতরাং তোমার সপক্ষে ভালো সাক্ষী ও সঙ্গী রয়েছে, বিজ্ঞানের তরফ থেকে আপত্তি করলেও তাকে গ্রাহ্য করবে না।

১৩-৩-১৯৩১

×

মনে আছে যখন আমি প্রথম অন্তর্দৃষ্টিতে কিছু দেখি (খোলা চোখেও তেমন দেখেছি) তখন আমার এক বিজ্ঞানী বন্ধু বললেন, ওগুলো ছায়াদৃষ্টি (after-image)। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে দৃষ্টি কি দুই মিনিট পর্যন্ত থাকে? তিনি বললেন "না", মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, যা চারিপাশে কোথাও নেই কিংবা পৃথিবীতেও নেই, যার গঠন চরিত্র বর্ণ ও ক্রিয়াকলাপ সব কিছুই আলাদা রকম, তেমন জিনিসেরও কি ছায়াদৃষ্টি হতে পার—তিনি তার জবাবে হাঁ বলতে পারলেন না। প্রকৃত ঘটনা নিয়ে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাকে যদি তার থিওরির ভিতর থেকে টেনে বের করা যায় তখন তা এমনি করেই ভেঙে পড়ে।

১৯-২-৩২

×

বোধ করি আমার পুরোপুরি ইউরোপীয় শিক্ষা তোমার চেয়ে বেশিই হয়েছিল আর আমিও এককালে ঘোর নাস্তিক ছিলাম, কিন্তু যখন থেকে এই সব জিনিস দেখলাম তখন আর ইউরোপের তখনকার ফ্যাশন অনুযায়ী সন্দেহ আর অবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকলাম না। অস্বাভাবিক হলেও যে সব অতিভৌতিক শক্তি ও তার প্রক্রিয়া এবং গুহ্য বিদ্যার বা যোগের

দ্বারা যা ঘটতে পারে তা বরাবরই আমার স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে নিয়েছে। চেতনা যে কেবল পাশব বা মানবীয় সাধারণ চেতনাতেই সীমাবদ্ধ তা নয়, তার আরো স্তর আছে। অপূর্ব কাব্য রচনা বা অপূর্ব সঙ্গীত রচনা যেমন অস্বাভাবিক বা অবিশ্বাস্য জিনিস নয়, যোগ শক্তি বা গুহ্য শক্তির কাজও তেমনি অবিশ্বাস্য বা অস্বাভাবিক নয়; খুব কম লোকই তেমন কিছু রচনা করতে পারে—কোটির মধ্যে একজনও নয়, কারণ কাব্য বা সঙ্গীত আসে ভিতরকার সত্তা থেকে, আর ঐ সব জিনিস যারা রচনা করে তাদের বাহ্য মনের সঙ্গে ভিতরকার সত্তার সেই অংশের যোগাযোগের রাস্তাটা খোলা থাকে। তুমি যে যোগ আরম্ভ করেই কবিতা লেখার একটা শক্তি পেলে তারও ঐ কারণ—যোগ শক্তি রাস্তাটা পরিষ্কার ক'রে দিলে। যোগ চেতনা ও তার শক্তি ঐ কাজই করে, রাস্তা খুলে দেয়—কারণ জিনিসটা তোমার ভিতরেই ছিল। অবশ্য প্রথম কথা হলো বিশ্বাস, আস্পৃহা, প্রচেষ্টা করার দিকে সত্যিকার প্রেরণা।

তুমি জানতে চাও যে যোগের ব্যাপারে সব কিছুকেই পরখ না ক'রে আগের থেকেই মেনে নিতে হবে কিনা—অর্থাৎ পরখ করা মানে সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করা। তার জবাবে আমি শুধু এই কথাই বলতে পারি যে যোগের যে সব অনুভূতি তা হলো ভিতরকার রাজ্যের অন্তর্গত, তার নিয়ম কানুন, তার বোধ প্রণালী ও মূল্য প্রভৃতি সব কিছুই সে রাজ্যের নিজস্ব, স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বুদ্ধিগ্রাহ্য বা বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার রাজ্যের অন্তর্গত নয়। বিজ্ঞানের নিরীক্ষার বেলাতে যেমন তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার সীমা ছাড়িয়ে অসীমের ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের মধ্যে চলে যায় আর স্থূল ইন্দ্রিয়াদি যার সম্বন্ধে কিছুই হদিস পায় না—যেমন ইলেক্‌ট্রনকে কেউ চোখেও দেখে না বা ছুঁয়ে বুঝতেও পারে না যে তার অস্তিত্ব আছে কিনা, যেমন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে না সূর্য ঘুরছে পৃথিবীর চারিদিকে যেরূপ খোলা চোখে দেখা যায় তার সত্য মীমাংসা সহজ বুদ্ধিতে হয় না,—তেমনি আধ্যাত্মিক ব্যাপারগুলি বিজ্ঞানের ও বুদ্ধির রাজ্যকে ছাড়িয়ে যায়, এবং তার সাহায্যে ওর সত্যতাকে পরখ করা বা কোন নিয়মে কি হচ্ছে তা জানতে পারা অসম্ভব হয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন, এখানেও তেমনি তোমাকে অভিজ্ঞ-

তার উপর অভিজ্ঞতা জড়ো করতে হবে, গুরু যেমন নির্দেশ দিচ্ছেন বা অতীতে যেমন যেমন করা হয়েছে ঠিক ঠিক সেই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, বোধির বিচারের দ্বারা অনুভূতিগুলিকে তুলনা করে দেখতে হবে যে কোনটা কতদূর পর্যন্ত খাঁটি ও সমগ্রের মধ্যে কোনটার কতখানি স্থান ইত্যাদি ইত্যাদি, তবেই তুমি এই বিরাট আধ্যাত্মিক ব্যাপারের ক্ষেত্রে সঠিক জ্ঞান নিয়ে চলতে পারবে। আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে পরখ করার এইই একমাত্র উপায়। আমি নিজে অন্যবিধ রাস্তায় চেষ্টা ক'রে দেখেছি এবং বুঝেছি যে এ সব ক্ষেত্রে তা খাটে না। অপরপক্ষে তুমি নিজে যদি অতটা না পারো—অসাধারণ গঠন না থাকলে খুব কম লোকেই তা পারে—তাহলে তোমাকে গুরুর নির্দেশই মানতে হবে, যেমন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নিজে সব কিছু পরীক্ষা ক'রে না দেখে শিক্ষাগুরুর কথাই ঠিক বলে মেনে নাও—অন্তত যতদিন পর্যন্ত নিজের জ্ঞান পুরোপুরি না জমে ওঠে। একে যদি বলো আগের থেকে মেনে নেওয়া, তাহলে হাঁ তোমাকে আগের থেকেই মানতে হবে। কারণ সাধারণ বুদ্ধিতে কেমন ক'রে তুমি বিচার করবে তার উপায় তো দেখছি না।

তুমি ক বা খ-এর বাণীর কথা উল্লেখ করেছ। তাঁরা তাঁদের আধ্যাত্মিক বোধ ও অনুভূতিকে কেমন ভাবে পরখ করবার জন্য প্রকৃতই কি কি প্রচেষ্টা করেছেন তা আগে জানতে চাই, তবে তার মূল্য দিতে পারি। ক কেমন ভাবে ঐ সব অনুভূতির সত্য মূল্য দিচ্ছেন যা সাধারণের কাছে অবিশ্বাস্য, যেমন বিখ্যাত যোগীদের অঘটনের কথাও সহজে লোকে মানে না? খ-এর সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, কিন্তু তিনি কেমন ভাবে জানলেন? কেমন তাঁর প্রণালী বা নির্ণয়? আমার মনে হয় যে বুদ্ধের ছায়ামূর্তি দেয়ালের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা বা হয়গ্রীবের সঙ্গে আধ ঘন্টা ধরে কথা বলা, এ সব কেউ কোনো প্রমাণেই সত্য বলে বিশ্বাস করবে না। হয় খ বলছেন বলেই তাকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে, কিংবা মনের ভুল বা কানের অমূল প্রত্যক্ষ বলে ছেঁটে দিতে হবে। ঐ নিয়ে "যাচাই" কেমন ক'রে হতে পারে? আমি যে নিজের মধ্যে নির্বাণের অনুভূতি পেলাম তাকে সাধারণ মন দিয়ে যাচাই করতাম কেমন ক'রে? আর সাধারণ বুদ্ধির বিচারে কোনরূপ মীমাংসাই বা করা যেতে পারতো? যা অনুভূতি আমার মধ্যে এসেছে তা সত্য জিনিস কিনা কেমন ক'রে তার যাচাই হতে পারতো? তা আমার ধারণাতেই আসে না। একমাত্র যা তখন করা সম্ভব তাই আমি

করলাম—সুস্পষ্ট সত্য অনুভূতি বলেই তাকে গ্রহণ করলাম, তাকে পুরোপুরি তার কাজ ক'রে যেতে দিলাম এবং তার যা কিছু ফল হবার তাও হয়ে যেতে দিলাম, তার পর যথেষ্ট যোগের জ্ঞান লাভ ক'রে তার যথাযথ মূল্য দিতে পারলাম। অবশেষে বলি, নিজে কোনো আভ্যন্তরীণ জ্ঞান বা অনুভূতি না পেলে তুমি বা অন্য কেউ কেমন ক'রে অপরের আভ্যন্তরীণ জ্ঞান ও অনুভূতির বিচার করতে পারবে?

১৮-১১-১৯৩৪

তৃতীয় বিভাগ

শ্রীঅরবিন্দের পথ ও অন্যান্য পথ

শ্রীঅরবিন্দের পথ ও অন্যান্য পথ

শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ ও সাধনার প্রণালী

শ্রীঅরবিন্দ প্রাচীন ভারতের মুনি ঋষিদের দেওয়া শিক্ষা নিয়ে এই শিক্ষা দিতে শুরু করছেন যে আপাত দৃশ্যমান এই বিশ্বের পিছনে রয়েছে কোনো এক আদি সত্তা এবং মহাচেতনা, যা সকল কিছুর ভিতরকার এক অভিন্ন আত্মাস্বরূপ, অদ্বিতীয় এবং চিরন্তন। সকল সত্তাই সেই অনন্য আত্মার মধ্যে মিলিত, কিন্তু চেতনার পার্থক্যের দ্বারা স্বতন্ত্র রূপে বিভক্ত, এবং সেই আদি আত্মার সম্বন্ধে অজ্ঞানতা নিয়ে সকলের মন প্রাণ ও দেহের এরূপ স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক সাধনাকার্যের দ্বারা এই স্বাতন্ত্র্যের ও অজ্ঞানতার আড়াল ঘুচিয়ে সেই মূল আত্মা ও সকলের ভিতরকার ভগবত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ করা যায়।

শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাতে এই কথা বলে যে সেই আদি অদ্বিতীয় সত্তা ও চেতনা এখানে জড়ের মধ্যে নিবর্তিত। বিবর্তন ক্রিয়ার দ্বারা সে নিজেকে ধীরে ধীরে উন্মোচিত করছে; যা ছিল আপাত নিশ্চেতন তার মধ্যে চেতনা স্ফুরিত হচ্ছে, এবং একবার এ কাজ শুরু হয়ে গেলে তার থেকে উত্তরোত্তর আরো উচ্চতর ও বৃহত্তর পরিণতির দিকে তা অগ্রসর হচ্ছে। এই চেতনা-মুক্তির প্রথম ধাপ হলো জীবনের বিকাশ; দ্বিতীয় ধাপ হলো মনের বিকাশ; কিন্তু মন পর্যন্ত এসেই বিবর্তন থেমে যাচ্ছে না, এর চেয়েও বড়ো রকমের আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক চেতনার বিকাশের জন্য এই বিবর্তন অপেক্ষা করছে। অতএব বিবর্তনের পরবর্তী ধাপ হবে চেতন সত্তার মধ্যে আত্মার ও অতিমানসের প্রাধান্য স্থাপন। কেবল তখনই হতে পারবে ভিতরকার ভগবত্তার পূর্ণ মুক্তি এবং জীবনেরও পূর্ণতাপ্রাপ্তি সম্ভব হবে।

কিন্তু এখানে কথা এই যে আগেকার ধাপগুলিতে উদ্ভিদ্‌ ও পশুদের জীবনে যেমন তাদের চেতন ইচ্ছার অভাবে কেবল প্রকৃতিই বিবর্তনের ভার নিয়েছিল, মানুষের বেলাতে তাকেই যন্ত্রস্বরূপ ক'রে নিয়ে তার চেতন ইচ্ছার মাধ্যমে প্রকৃতি সেই কাজ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু মানুষের কেবল মনের

ইচ্ছার দ্বারাই তা সম্পূর্ণরূপে হতে পারে না, কারণ মন শুধু খানিকদূর পর্যন্তই যেতে পারে তার পর সেখানেই কেবল ঘুরপাক খায়। একটা অবস্থান্তর দরকার হয় যাতে চেতনার মুখ ফিরিয়ে দিয়ে মনের পরিবর্তন আসে উচ্চতর ভাবে। এরূপ আনার পদ্ধতি মিলবে প্রাচীন মনস্তাত্ত্বিক সাধনা এবং যোগাভ্যাসে। কিন্তু অতীত কালে এ চেষ্টা করা হতো জগৎ থেকে সরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পরমাত্মায় বিলুপ্তি ঘটিয়ে। শ্রীঅরবিন্দ এই শিক্ষা দিচ্ছেন যে সেই উচ্চতা থেকে উচ্চ বস্তুর এখানে নেমে আসাও সম্ভব, যার ফলে কেবল জগৎ ছেড়ে মুক্তি নয় কিন্তু জগতের মধ্যেই মুক্তি মিলবে; আর তাতে মনের অজ্ঞানতা ও জ্ঞানের সংকীর্ণতার পরিবর্তে আসবে এক অতিমানসের ঋতচেতনা যা আভ্যন্তরীণ আত্মার যন্ত্রস্বরূপ হয়ে এখনকার পশু-মানবকে ভিতরে ও বাহিরে সক্রিয়ভাবে এক দিব্যমানবে পরিণত করবে। মনস্তাত্ত্বিক যোগ-সাধনা সেই উদ্দেশ্য নিয়ে করা যেতে পারে, সত্তার সকল অংশের রূপান্তর ঘটিয়ে, যা সম্ভব হবে আপাতগুপ্ত উচ্চতর অতিমানস বস্তুর অবতরণ ও ক্রিয়ার দ্বারা।

এ কাজ কিন্তু শীঘ্র বা অল্পকালের মধ্যে বা দ্রুত কোনো অলৌকিক রূপান্তরের দ্বারা হতে পারে না। সাধককে অনেক ধাপ পার হতে হয় তবেই অতিমানস নেমে আসতে পারে। মানুষরা অনেকেই জীবন কাটায় উপর-ভাসা মন প্রাণ দেহ নিয়ে, কিন্তু তাদের গভীরে রয়েছে উচ্চতর সম্ভাবনাপূর্ণ এক আভ্যন্তরীণ সত্তা যার মধ্যে তাদের জেগে উঠতে হবে—এখন যার সামান্যমাত্র প্রভাবের ফলেই মানুষ নিত্য ছোটে সৌন্দর্য, সঙ্গতি, শক্তি ও জ্ঞানের সন্ধানে। তাই যোগের সাধকের প্রথম কাজ হবে সেই আভ্যন্তরীণ সত্তার দ্বারগুলি খুলে দিয়ে সেখানকার আলো ও শক্তির দ্বারা বাইরের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা। এই কাজ করতে গিয়ে সে নিজের প্রকৃত আত্মাকে আবিষ্কার করবে, যে আত্মা এই মন-প্রাণ-দেহ নিয়ে একটা মিশ্রিত বাহ্য জিনিস নয়, কিন্তু মূল ভগবৎ বহ্নির একটা স্ফুলিঙ্গ। তাকে তখন শিখতে হবে আপন আত্মাতে অধিষ্ঠিত হয়ে তার দ্বারা আপন প্রকৃতির বাকী অংশগুলিকে সত্যের দিকে ফিরিয়ে বিশুদ্ধীকৃত করা। অতঃপর উপরের দিকে রাস্তা খুলে গিয়ে উচ্চ সত্তার অবতরণ ঘটবে। কিন্তু তখনও তা পুরো অতিমানসের আলো এবং শক্তি নয়। কারণ সাধারণ মানব মন ও অতিমানসিক ঋতচেতনার মাঝখানে চেতনার আরো অনেকগুলি স্তর রয়েছে। সেগুলিকে একে একে খুলে তার শক্তিকে মন-প্রাণ-দেহে নামিয়ে আনা চাই।

তবেই সেই ঋতচেতনার পূর্ণ শক্তি প্রকৃতির মধ্যে কাজ করতে পারবে। অতএব এ সাধনা দীর্ঘ এবং কঠিন, তথাপি এর কিছুটাও লাভজনক যেহেতু তাতেও শেষ পর্যন্ত মুক্তি ও পূর্ণতাপ্রাপ্তি সম্ভব হবে।

আগেকার সাধনা পদ্ধতির অনেক জিনিসই এর পক্ষেও দরকার—যেমন মনের যথেষ্ট বিস্তার ঘটিয়ে তাকে আত্মা ও অনন্তের ভাবে নিয়ে যাওয়া, বিশ্ব চেতনার মধ্যে চলে যাওয়া, কামনা বাসনাকে শাসন করা; তাতে বাহ্য সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়োজন নেই কিন্তু কামনা ও আসক্তিকে জয় করা, দেহের লোভ এবং প্রবৃত্তিকে জয় করা অবশ্যই প্রয়োজন। এই পদ্ধতিতে প্রাচীন সকল পন্থারই সমন্বয় করা হয়েছে, জ্ঞানের পন্থা যাতে মূল বস্তু ও দৃশ্য বস্তুর পরিচয় সম্বন্ধে মনের জ্ঞান জন্মে, ভক্তির পন্থা যাতে হৃদয় প্রেমপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে, কর্মের পন্থা যাতে স্বার্থের দিক ত্যাগ করে ইচ্ছা ভগবৎ সেবার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে। সমগ্র সত্তাকেই এই ভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে রূপান্তর নিতে সে প্রস্তুত থাকে তার জন্য, যখন উচ্চতর আলো এবং শক্তির নেমে এসে প্রকৃতির মধ্যে কাজ করা সম্ভব হবে।

এই সাধনাতে গুরুর প্রেরণা এবং কঠিন কঠিন অবস্থাতে তাঁর পরিচালনা ও উপস্থিতি বিশেষ দরকার—কারণ তদ্ভিন্ন ভুল কাজ করা এবং হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে সাফল্যের সম্ভাবনা নষ্ট হতে পারে। গুরু হবেন তিনি যিনি উচ্চতর চেতনাতে ও সত্তাতে অধিষ্ঠিত, এবং যাঁকে ভগবানের প্রতিনিধি বা প্রতিভূরূপে জ্ঞান করা হয়। তিনি কেবল শিক্ষার দ্বারাই সাহায্য দেন না কিন্তু আপন প্রভাব ও দৃষ্টান্তের দ্বারা ও আপন অনুভূতির দ্বারাও কাজ করেন।

এই হলো শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা ও যোগ প্রণালী। তিনি কোনো ধর্ম স্থাপনা করতে বা ধর্ম সমন্বয় করতে চাইছেন না—কারণ তাতে তাঁর কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। তাঁর এই যোগের একমাত্র লক্ষ্য হলো আভ্যন্তরীণ আত্মবিকাশ, যাতে এর প্রত্যেক সাধকই অদ্বিতীয় আত্মাকে সকলের মধ্যে জেনে মনের চেতনার অপেক্ষা উচ্চতর আধ্যাত্মিক ও অতিমানসিক চেতনাতে গিয়ে তার মানব প্রকৃতি দিব্য প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়।

অগস্ট ১৯৩৪

ইহলোক ও পরলোকতত্ত্ব ও শ্রীঅরবিন্দের যোগ

ভারত আত্মা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তুমি যে ক-এর মন্তব্য উল্লেখ করেছ "পরলোক বাদ দিয়ে ইহলোকের দিকেই ঝোঁক" থাকা নিয়ে, সে সম্বন্ধে আমার একটি কথা বলা দরকার। তিনি ইহলৌকিকতা বলতে কি অর্থ করেন এবং কিসের প্রসঙ্গে ওকথা বলেছেন তা জানি না, কিন্তু এখানে আমার নিজের তরফের কথাটা জানানো দরকার। ভারতে আসা পর্যন্ত আমার জীবন ও আমার যোগ ইহলোক এবং পরলোক দুই নিয়েই ছিল, কোনোদিকেই বেশি ঝোঁক ছিল না। মানুষ মাত্রেরই লক্ষ্য থাকে ইহ-লৌকিক এবং আমার মনের ক্ষেত্রেও তাই ছিল, যেমন রাজনীতির দিকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই অ্যাপোলো বন্দরে পা দেবার পর থেকেই আমার আধ্যাত্মিক অনুভূতি আসা শুরু হয়ে গেল, যদিও তা ইহলোককে বাদ দিয়ে নয় বরং তার সঙ্গে গভীরভাবে যোগযুক্ত, এবং এইরূপ একটি অনুভব যে অনন্তই সর্বত্র ছেয়ে আছে ও অনির্বচনীয় অবস্থান করছেন সকল বস্তুতে ও সকল দেহে। আর আমি দেখলাম যে ভৌতিকের উপরকার স্তরে ও জগতে আমি যেতে পারছি এবং সেখানকার প্রভাব এই বস্তু জগতে এসে পড়ছে, সুতরাং দুই জগতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বা বিরোধ আছে এমন মনে হয়নি, তাই আমি বলেছি যে ঐ দুটি হলো অস্তিত্বের দুই প্রান্ত, এবং তার মাঝখানেও অনেক কিছু। আমার কাছে সকলই ব্রহ্ম, ভগবানকে সর্বত্রই দেখি। ইহলোককে বাদ দিয়ে কেবল পরলোক নিয়ে থাকার অধিকার প্রত্যেকেরই অবশ্য আছে, তাতে যদি কেউ শান্তি পায় তাহলে কিছু বলবার নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি শান্তি পাবার জন্য তার দরকার আছে বলে মনে করি না। আমার যোগের বেলাতেও আমি দুই জগৎকেই অন্তর্ভুক্ত করেছি—আধ্যাত্মিক ও বাস্তব—চেষ্টা করেছি দিব্য চেতনা ও দিব্য শক্তিকে মানুষের হৃদয়ে ও পার্থিব জীবনে এনে ফেলতে, কেবল নিজের মুক্তির জন্য নয় কিন্তু এখানে যাতে দিব্য জীবন আসে। একেই আমি মনে করি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য, আর জীবনের কর্মপরিধির মধ্যে যে পার্থিব জিনিস নিয়ে স্বাভাবিক পার্থিব প্রচেষ্টা রয়েছে তার দ্বারা ঐ আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও তার ভারতীয় চরিত্রের কোনো ক্ষুণ্ণতা বা পরিবর্তন ঘটবে তা আমি মনে করি না। অন্ততপক্ষে বরাবরই আমার নিজের এই অনুভূতি এবং জগতের প্রকৃতি ও ভগবৎ ব্যবস্থা সম্বন্ধে এই আমার মত; একেই আমি যথাসম্ভব

সর্বপূর্ণ সত্য বলে জেনেছি, তাই বলেছি পূর্ণ যোগের এই পথ অনুসরণ করার কথা। যে কেউ অবশ্য আমার এ সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান ও অবিশ্বাস ক'রে বলতে পারে যে আধ্যাত্মিক সাধনাতে ইহজগৎকে বাদ দিয়ে কেবল উহজগতের দিকেই লক্ষ্য থাকা দরকার, কিন্তু তাহলে তার পক্ষে সে ক্ষেত্রে আমার এই যোগ করা অসম্ভব হবে। এ যোগে বস্তুত অন্যান্য জগতেরও পূর্ণ অনুভূতি মিলবে, পরমাত্মা ও তার নিচেকার সকল স্তরের অনুভূতি ও বাস্তব পৃথিবীতে জীবনের ক্ষেত্রে তার প্রভাব জানা যাবে, পরম সত্তা বা ঈশ্বরের যে দিকে তিনি আমাদের প্রভু বা শিব বা কৃষ্ণ বা বিশ্বময় সচ্চিদানন্দ তাঁকেও জানা যাবে, এবং এই যোগের পূর্ণ ফলও পাওয়া যাবে, কিন্তু তার পরে ওর ফল নিয়ে আসতে হবে বস্তুর জগতে যেখানে দিব্য জীবনের আদর্শকেই সফল করতে হবে। এই বিশ্বাস এবং অস্তিত্বের সত্য অনুভূতি নিয়েই আমি "The Life Divine" ও "Savitri" নামক গ্রন্থ দুখানি লিখেছি। অবশ্য ঈশ্বরের উপলব্ধিই সব চেয়ে মূল কথা; কিন্তু প্রেম ও ভক্তি সহকারে তাঁর দিকে যাওয়া, কর্ম দিয়ে তাঁর সেবা করা ও তাঁকে জানা, কেবল বুদ্ধি দিয়ে নয় কিন্তু আধ্যাত্মিক অনুভূতি দিয়ে, তাই হলো এই পূর্ণ যোগের বিশেষ পন্থা।

২৮-৪-১৯৪৯

দিব্য জীবনের যোগ

তুমি যখন ডাক পেয়েছ তখন যোগের পক্ষে উপযুক্তও হতে পারো, কিন্তু এর বিভিন্ন পন্থা আছে যার লক্ষ্য এবং পরিণামও বিভিন্ন। সকল পথেরই নিয়ম কামনা জয়, জীবনের সাধারণ সম্পর্ক থেকে সরে আসা, এবং অনিশ্চয়তার ভিতর থেকে অশেষ নিশ্চয়তার মধ্যে অবস্থান করা। নিদ্রা ও স্বপ্ন, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা প্রভৃতিকেও জয় করার কথা আছে। কিন্তু আমার এই যোগে জগতের সঙ্গে বা জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করা বা ইন্দ্রিয়াদিকে বা তার ক্রিয়াকে নিরোধ করার কোনো নির্দেশ নেই। এ যোগের উদ্দেশ্য জীবনের রূপান্তর আনা, দিব্য সত্যের সুনিশ্চিত ও সক্রিয় আলো, শক্তি ও আনন্দের দ্বারা। এটি জগৎ-ত্যাগী-সন্ন্যাসীর যোগ নয়, কিন্তু দিব্য জীবনের যোগ। কিন্তু তোমার যা লক্ষ্য তা মিলতে পারবে

জাগতিক অস্তিত্বের সকল সম্পর্ক ছেড়ে সমাধি লাভের দ্বারা।

সরে যাওয়ার পথ ও জয় করার পথ

বিশ্বকে দেখায় যেন একটা বিশ্রী রকম অপচয়ের পাশা খেলা যাতে কেবল যত তামসিক শক্তি, অন্যায় ও মিথ্যা ও মৃত্যু ও বেদনারই জয় জয়কার। কিন্তু এই রকমকেই মেনে নিয়ে আমাদের জয় করার পথ খুঁজে পেতে হবে—যদি প্রাচীন তপস্বীদের সরে যাওয়ার পথ আমরা না নিই। আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে জানা গেছে যে এই সব কিছুর পশ্চাতে আছে সমতা, শান্তি ও মুক্তির এক অনাবিল ব্যাপক ভূমি, সেখানে গেলেই আমরা এমন দৃষ্টি পাবো যা সব কিছুই দেখবে এবং জয় করার শক্তিলাভের আশা হবে।

মায়াবাদ, নির্বাণ ও শ্রীঅরবিন্দের যোগ

"আর্য" পত্রিকাতে যখন লিখতাম তখন চেষ্টা করতাম অধিমানসের দৃষ্টিকে মনের গণ্ডীতে এনে মনের ভাষাতে তার কথা বলতে—তাই কখনো কখনো যুক্তির সাহায্য নিতে হয়েছে। কারণ পরাবুদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধির আপোষ করতে হলে যুক্তি সেখানে কাজ করে, কিন্তু তা প্রধান স্থান নিতে পারে না যেমন মনস্তত্ত্বের বেলাতে হয়। যিনি মায়াবাদী তিনি নিছক যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা তাঁর তত্ত্বকে বা অনুভূতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। কিন্তু যেখানে তিনি মায়ার ব্যাখ্যা করেন, সেখানে বিজ্ঞানীর প্রকৃতিব্যাখ্যার মতো কেবল বিশ্বমায়ার প্রণালী সম্বন্ধেই তাঁর ধারণাগুলিকে গুছিয়ে বিবৃত করেন, তা ছাড়া বলতে পারেন না যে কেন এবং কেমন ক'রে এই মায়ার সৃষ্টি হলো। কেবল বলেন, "যা হয়েছে তাই বলছি"।

হাঁ, হয়েছে ঠিকই। কিন্তু প্রথম কথা, জিনিসটা কী? এ কি কেবল মায়া সৃষ্টির শক্তি ছাড়া আর কিছুই না, কিংবা মায়াবাদীর নিজেরই একটা ভুল দেখা, মনের অসম্পূর্ণ দৃষ্টিতে নিজেরই একটা মায়া? দ্বিতীয় কথা, চরমতম দিব্য চেতনাতে কি এই মায়াসৃষ্টিই তার সব চেয়ে বড়ো শক্তি?

যিনি পরাৎপর তিনি নিশ্চয় মায়ামুক্ত পরম সত্য, নতুবা মায়া থেকে মুক্তি পাওয়া কখনই সম্ভব হতো না। তাহলে সেই পরম সত্যের কি আর কোনো সক্রিয় শক্তি নেই এই মিথ্যাসৃষ্টির শক্তি ছাড়া, আর সেই মিথ্যাকে ভেঙে দেবার শক্তিও কি তার নেই, কারণ সৃষ্টির শক্তি থাকলে ভাঙবার শক্তিও তো থাকে---আর এই কেবল চিরদিন চলছে? আমি তাই বলছি যে এটা কেমন গোলমেলে কথা। কিন্তু তথাপি তাই যদি হয় তো তাই, কারণ যিনি অনির্বচনীয় তিনি তো যুক্তির ধার ধারেন না। কিন্তু সেই কথাই খাঁটী কিনা তার মীমাংসা কে করবে? তুমি হয়তো বলবে, যারা ওখানে পৌঁছেচে। কিন্তু সে কোনখানে? যেখানে সেই উচ্চের উচ্চ পূর্ণং পরম্? মায়াবাদীর যে নিরাকার পূর্ণ ব্রহ্ম---তাই কি সেই সর্বোচ্চ স্থান? তার চেয়েও উচ্চতর কি কিছু হতে পারে না, যা পরাৎ পরম্? এটা বুদ্ধির প্রশ্ন নয়, এ হলো পূর্ণ উপলব্ধির আধ্যাত্মিক সত্য। এর মীমাংসা যুক্তিনির্ভর হতে পারে না, কেবল ঊর্ধ্বগামী ব্যাপক আধ্যাত্মিক অনুভূতির দ্বারাই হতে পারে---যে অনুভূতি অবশ্য নির্বাণ ও মায়াকে অতিক্রম ক'রে আরো উপরে উঠেছে, নতুবা তা পূর্ণতম জিনিস নয় ও তার অবিসংবাদী মূল্য নেই।

এখন আমার যোগে প্রথম ফলই ছিল নির্বাণ। তা আমাকে হঠাৎ চিন্তাশূন্য করে মন প্রাণের ক্রিয়াগুলো বন্ধ ক'রে দিলে, অহংবোধ রইল না, জগৎ বাস্তব রইল না---কেবল অসাড় ইন্দ্রিয়াদির ভিতর দিয়ে সেই নীরবতার মধ্যে দেখলাম শূন্য আকারময় জগৎ, যাতে সমস্তই ছায়া ভিন্ন বস্তু কিছু নয়। একও নেই, বহুও নেই, কেবল আছে তাই, যা অরূপ অবর্ণনীয়, অব্যক্ত, অচিন্তনীয়, অনুপাধিক, আর যা খাঁটী ও একমাত্র সত্য। কোনো মনের উপলব্ধি নয়, উপরে কিছু দেখা নয়, নিষ্কর্ষ কিছু নয়, কেবল বাস্তব সত্য---যা স্থানময় জগৎ না হয়েও এই তথাকথিত বস্তুময় জগৎকে পরিব্যাপ্ত ক'রে তার মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে, এবং তাই কেবল স্বয়ং বাস্তব ছাড়া অন্য কোনো কিছুকে বাস্তব রাখেনি। এই বিশেষ অনুভূতি যখন এলো তখন তার মধ্যে উল্লাসের বা আনন্দের কিছু ছিল না---অনির্বচনীয় আনন্দ আমি পেয়েছি ওর অনেক বছর পরে---কিন্তু তখন পেলাম এক অব্যক্ত শান্তি, প্রগাঢ় নীরবতা, সব কিছু থেকে ছাড়া পাওয়া মুক্তি। এই নির্বাণের মধ্যে দিবারাত্র থাকতে থাকতে পরে ওরই মধ্যে অন্যান্য কিছু প্রবেশ করতে পেরেছিল, কিন্তু ওর স্মৃতি এবং প্রভাব শেষ পর্যন্ত রয়ে গেল যতক্ষণ পর্যন্ত আরো উপরকার বৃহত্তর চেতনা এসে তার স্থান অধিকার

না করলে। ইতিমধ্যে ওর উপরে আরো উপলব্ধির পর উপলব্ধি এসে ওর সঙ্গে যুক্ত হতে থাকল। প্রথম অবস্থাতেই ঐ মায়াময় জগতের অনুভূতিকে ছাড়িয়ে তার পিছনে ও তাকে ছাপিয়ে এক বিরাট সত্যের ভগবৎ অস্তিত্ব হৃদয়কে ছেয়ে দিলে, যা প্রথমে সিনেমার ছায়া বলে মনে হয়েছিল তার উপরে। তখন আর কোনো ইন্দ্রিয় নিরোধ নয়, অনুভূতির অবস্থা থেকে পতন নয়, কেবল উচ্চ থেকে উচ্চতর সত্যেরই প্রতিভাতি; তখন আর ইন্দ্রিয়াদি নয়, আত্মাই সব কিছু দেখছে, আর অনন্তের মধ্যে যে শান্তি নীরবতা ও মুক্তি তা কালাতীত সেই শাশ্বত ভগবানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে প্রলম্বিত রূপেই সকল জগৎকে অবলোকন করছে।

অতএব মায়াবাদ সম্বন্ধে এখানেই আমার বিপত্তি। নির্বাণ থেকেই আমার উপলব্ধির আরম্ভ, পূর্ণ অবস্থার দিকে মাত্র প্রথম পদক্ষেপ, ওটাই শেষ কথা নয়। সে জিনিস এসেছিল সম্পূর্ণ অনাহুত রূপে, যদিও সমাদরে নিয়েছিলাম। ওর সম্বন্ধে আগে কোনোরূপ ধারণাই ছিল না, যা আস্পৃহা ছিল তা বরং ওর বিপরীত, আমি চেয়েছিলাম আধ্যাত্মিক শক্তি, জগতের সাহায্যে কাজ করতে, তবু ঐ নির্বাণ এসে গেল আমাকে একটুও না জানিয়ে কিংবা "আসতে পারি কি" বলে কোনো অনুমতি না নিয়ে। এসে এমন চেপে বসল যেন চিরদিনের জন্য ছিল এবং থাকবে। তার পর ওর থেকেই আরো উত্তরোত্তর শুরু হয়ে গেল এমন জিনিস যা ঐ প্রথম জিনিস থেকে আরো বড়োর চেয়ে বড়ো। তাহলে আমি কেমন ক'রে মায়াবাদকেই মেনে নিয়ে শংকরের যুক্তির আরো উপরকার সত্যকে নাকচ করতে পারি?

অবশ্য সকলেই যে আমার মতো অনুভূতি পেয়ে তার ফলে এই সত্যকেই মানুক এমন কথা আমি বলছি না। কেউ যদি মায়াবাদকে তার আত্মার বা মনের সত্য বা জগৎ বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় বলে গ্রহণ করে তাতে আমার আপত্তি করবার কিছু নেই। আমার আপত্তি সেইখানে যখন কেউ আমার বা জগতের গলার মধ্যে জোর ক'রে গিলিয়ে দিতে চায় ঐ কথা যে মায়াবাদই জগতের প্রহেলিকার একমাত্র সর্বসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা। কারণ বাস্তবিক তা নয়। ওর আরো অনেক রকম ব্যাখ্যা হতে পারে; ঐ ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত নয় কারণ ওতে বোঝায় না কিছু; আর ওর যা যুক্তিতর্ক তা একরোখা, সর্ব পরিপূরক নয়। কিন্তু তাতেও যায় আসে না। কোনো একটি তত্ত্ব অপূর্ণ বা ভুল বা একরোখা হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা কাজের হতে পারে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন অনেক দেখা গেছে। বস্তুত বৈজ্ঞা-

নিক বা দার্শনিক তত্ত্ব মাত্রই মনের একটা অবলম্বন ছাড়া আর কিছু নয়, অর্থাৎ তার কাজের একটা ব্যবহারিক ভিত্তি যার উপর নির্ভর ক'রে সে নিঃসংশয়ে তার কঠিন গন্তব্যপথে অগ্রসর হতে পারবে। এই একরোখা মায়াবাদ তোমাকে উৎসাহ দিয়ে নিয়ে যাবে এমন আধ্যাত্মিক সাধনার পথে যা হবে নিতান্তই একরোখা। সে তোমার মনকে নিজের থেকে ও জীবন থেকে রিক্ত করে সটান নিয়ে যাবে উর্ধ্বচেতনাতে। কিংবা বরং বলা যায় তোমার মনোময় পুরুষ মনের ও প্রাণের সীমাকে ছেড়ে যেতে চাইবে অনন্তের উর্ধ্বচেতনাতে। তত্ত্বের দিক দিয়ে মন তার সব কিছু অনুভবকে ও প্রাণের ক্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান ক'রে বলবে যে সমস্তই মায়া। আর ব্যবহারিক দিক দিয়ে মন নিজের মধ্যে গুটিয়ে গিয়ে সহজেই চলে যাবে নিরালম্ব শান্তিতে, যেখানে কোনো কিছুই যায় আসে না—কারণ তার মধ্যে কোনো কিছুরই মানসিক বা প্রাণিক মূল্য নেই—আর মন তার সংক্ষেপ করা পথে শীঘ্রই চলে যায় মনরিক্ত উর্ধ্বচেতনার সুষুপ্তিতে। এরূপ ক্রিয়াতে আগেকার সবরকম বোধই হয়ে পড়ে অবাস্তব—মায়া। সে তখন তার নির্গমনের পথে।

সুতরাং মায়াবাদ নির্বাণের দিকে প্রধান ঝোঁক নিয়ে তত্ত্বের ক্ষেত্রে যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক, কিন্তু কাজের দিক দিয়ে আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে যাবার উৎকৃষ্ট রকমের একটি পথ এবং তা অনেক উচ্চে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এমন কি মনই যদি আমাদের শেষ কথা হতো, আর তার পরেই বিশুদ্ধ আত্মা, তাহলে ওতে আমার আপত্তি হতো না। কারণ এই জগতে মন তার অনুভবাদি ও প্রাণ তার কামনাদি নিয়ে যে জটিলতা পাকিয়েছে তার চেয়ে ভালো কিছু হবার আশা যদি আর না থাকতো, তাহলে ঐ উপায়ে বেরিয়ে যেতে পারাই সব চেয়ে ভালো বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু আমার অনুভূতি এই কথা বলে যে মনের উপরেও আরো কিছু আছে, আত্মার অভিব্যক্তিতে মনই শেষ কথা নয়। মন হলো একরূপ অজ্ঞানময় চেতনা, সুতরাং বোধগুলি কেবল মিশ্রিত ও অপূর্ণ ও মিথ্যা ভিন্ন আর কিছু হয় না—যদি সত্যও হয় তাও আংশিক সত্যের প্রতিফলন মাত্র, মূল সত্য নয়। অথচ রয়েছে এক প্রকৃত সত্য-চেতনা যা কেবল স্থিতীয় নয় কিন্তু গতীয় এবং সৃষ্টিক্রিয়; আমি চাই সেইখানে গিয়ে পৌঁছতে এবং দেখতে যে আসল ব্যাপারটা কি, অজ্ঞানে যা চরম বলে দেখাচ্ছে তাকে সরাসরি এড়িয়ে যাবার পথ না নিয়ে।

শংকরের মায়াবাদ ও পূর্ণযোগ

পরমাত্মা চিরন্তনভাবে মুক্ত এই অপূর্ণ ভিত্তির উপর আমার যোগ প্রতিষ্ঠিত নয়। ও কথা মেনে নিলে তার পরে আর কিছুই থাকে না, আর ঐ তত্ত্ব ধরে থাকলে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে সৃষ্টি এবং কর্মসমূহের কোনোই তাৎপর্য অথবা মূল্য নেই। প্রশ্ন তা নয়, প্রশ্ন এই যে তাহলে এই সৃষ্টির অর্থটা কী, এমন কোনো পরাৎপর আছেন কিনা যিনি কেবলই অবিভাজ্য বিশুদ্ধ চেতনা ও সত্তা হয়ে থাকেন না কিন্তু উৎসরূপে সক্রিয় সৃষ্টিশক্তিকেও বিকাশ করেন, এবং তাহলে এই সৃষ্ট জাগতিক অস্তিত্বের কোনো তাৎপর্য এবং মূল্য আছে কিনা। এ প্রশ্নের জবাব কোনো বাক্য-বহুল ও ধারণাপূর্ণ দার্শনিক তর্কের দ্বারা মিলতে পারে না, তা মিলবে এমন আধ্যাত্মিক অনুভূতির দ্বারা যা মনের রাজ্যকে ছাড়িয়ে চলে যাবে আধ্যাত্মিক বাস্তবে। প্রত্যেক মনই তার আপন বিচারেই আস্থাবান, কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সে আস্থার কোনো দাম থাকে না, কেবল এইটুকু নির্দেশ ছাড়া যে আধ্যাত্মিক অনুভূতির ক্ষেত্রে কে কতখানি অগ্রসর হতে পারছে। তোমার বিচার যদি বলে যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে শংকরের কথাই ঠিক, তবে তার থেকে এই নির্দেশ মিলবে যে বেদান্ত অদ্বৈতের পথই (মায়াবাদ) তোমার অগ্রগতির পক্ষে উপযোগী।

এই যোগ কিন্তু জাগতিক অস্তিত্বের একটা বাস্তব মূল্য আছে বলে মেনে নিয়েছে; এর লক্ষ্য হলো সেই উচ্চতম সত্য-চেতনাতে বা অতিমানস চেতনাতে প্রবেশ করা যার সৃষ্টি এবং ক্রিয়া কোনো অজ্ঞানতা বা অপূর্ণতার থেকে আসে না, কিন্তু আসে সেখানকার দিব্য সত্য ও আলো ও আনন্দ থেকে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে সেই উচ্চতম চেতনার কাছে আমাদের নশ্বর মন প্রাণ ও দেহের সমর্পিত হওয়া অপরিহার্য, কারণ এই নশ্বর মানব সত্তার পক্ষে তার নিজের চেষ্টাতে সেই মনের উপরকার অতিমানস চেত-নাতে উঠে যেতে পারা অতি দুরূহ, কারণ সেখানকার ক্রিয়া মনের শক্তির অতিরিক্ত এক অন্যরূপ শক্তিতে। এইরূপ পরিবর্তনের ডাকে যে সাড়া দেবে সে এই যোগের পথে প্রবেশ করতে পারবে।

২-১০-১৯৩৮

বাস্তববাদের ও মায়াবাদের অদ্বৈত

অদ্বৈত কথাটা মায়াবাদেরও হতে পারে বাস্তববাদেরও হতে পারে। "The Life Divine" গ্রন্থের যে তত্ত্ব তা বাস্তববাদী অদ্বৈতের। জগৎ হলো এক বাস্তব সত্তার অভিব্যক্তি সুতরাং সেও বাস্তব। সেই বাস্তব সত্তা হলেন অনন্ত ও শাশ্বত ভগবান, যিনি অনন্ত সৎ ও অনন্ত চিৎ-শক্তি ও আনন্দময়। এই অনন্ত ভগবান তাঁর আপন অনন্ত সত্তার মধ্যে আপন শক্তিতে এই জগতের সৃষ্টি বা অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন। কিন্তু তিনি এই বাস্তব জগতে বা এর মূলে নিজেকে গোপন রেখেছেন এক বিপরীত প্রকারে, যা অসৎ, অচেতন ও অসাড়। আমরা এখন তাকেই বলছি অচেতন যার অচেতনার শক্তিতে এই বস্তুবিশ্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তা কেবল আপাতদৃষ্টিতে, কারণ আমরা শেষকালে দেখতে পাই যে জগতের সব কিছু ব্যবস্থাই সম্ভব হতে পেরেছে গোপন কোনো এক পরমতম বুদ্ধির ক্রিয়াতে। সেই তথাকথিত অচেতন শূন্যতার ভিতর থেকে ঐ গুপ্ত সত্তা প্রথমে দেখা দেয় জড়বস্তু রূপে, তার পরে দেখা দেয় প্রাণ রূপে, তার পরে মন রূপে, অবশেষে আত্মা রূপে। সেই অচেতন সৃষ্টিকারী শক্তি বস্তুতপক্ষে ভগবানের চিৎ-শক্তি আর জড়-বস্তুর ভিতরকার গুপ্ত চেতনা তাই বেরিয়ে আসতে পারে প্রাণ রূপে, তার পরে আরো বেশি হয়ে মন রূপে, আরো বেশি সত্য হয় অধ্যাত্ম চেতনা রূপে, শেষে যখন অতিমানস চেতনাতে আসে তখন আমরা সেই পরম সত্তাকে জেনে তার মধ্যে প্রবেশ ক'রে তার সঙ্গে মিলিত হতে পারি। একেই আমরা বলি চেতনার বিবর্তন এবং সব কিছুর মধ্যে আত্মার বিবর্তন, যাকে আমরা বলি প্রজাতি বিবর্তন। তেমনি অস্তিত্বের আনন্দও প্রথম অসাড়তা থেকে বেরিয়ে বিপরীত ভাবে দেখা দেয় সুখ ও বেদনা হয়ে, শেষে তা হয় আত্মার আনন্দ, উপনিষদ যাকে বলেন ব্রহ্মানন্দ। বিশ্বের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যাই মূলতঃ দেওয়া হয়েছে "The Life Divine" গ্রন্থে।

শংকর ও মায়াবাদ

প্রঃ "প্রবুদ্ধ ভারতে" একজন লিখছে যে শংকরের তত্ত্ব

> আপনি ঠিক বুঝে দেখেননি। তার বক্তব্য এই যে শংকরের ব্রহ্মবাদ বা ভক্তিবাদ যা আছে সে দিকটা আপনি দেখতে পাননি। বিবেকানন্দ বা রামকৃষ্ণ শংকরকে পুরোপুরি মানতেন কিনা সন্দেহ।

উঃ ওরা দেখাতে চাইছে যে শংকর অতটা কট্টর গোঁড়া মায়াবাদী ছিলেন না——জগতের অস্থায়ী বাস্তবতা, শক্তির অস্তিত্ব প্রভৃতি তিনি স্বীকার করতেন। কিন্তু তা হলেও তাঁর তত্ত্বের যা মূল যুক্তি যে কেবল ব্রহ্মই আছেন আর বাকী সব কিছু মায়া, তার সঙ্গে ওগুলি খাপ খায় না। ও সবই কেবল ক্ষণিকের ব্যাপার সুতরাং মায়ার অন্তর্গত মায়িক বাস্তব। তিনি আরো বলেন যে কর্মের দ্বারা ব্রহ্মে পৌছানো যায় না। এই যদি তত্ত্ব না হয়, তবে কী তাঁর সঠিক তত্ত্ব আমি জানতে চাই। অন্ততপক্ষে সকল লোকই জানে যে ওটাই তাঁর তত্ত্ব। তবে এখন অতটা কঠোর মায়াবাদের দিকে ঝোঁকটা কমে যাওয়াতে অনেক অদ্বৈতবাদী ওর থেকে সরে এসে শংকরকেও সরিয়ে আনতে চাইছে।

বিবেকানন্দ শংকরের তত্ত্ব মানতেন কতকগুলি ব্যতিক্রম রেখে, যেমন তাঁর দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা, যেটা এসেছে বৌদ্ধ করুণা ও আধুনিক লোকহিতের মিশ্রণে।

৮-২-১৯৩৫

শ্রীঅরবিন্দের যোগে নূতন জিনিস

রূপান্তর মানে প্রকৃতির পরিবর্তন বলি না——যেমন সাধুসন্ন্যাসী হওয়া বা নৈতিক বিশুদ্ধিলাভ বা যোগসিদ্ধি পাওয়া (তান্ত্রিকের মতো) বা চিন্ময় দেহ লাভ করা, এ সব কিছু নয়। রূপান্তর বলতে চাই এক বিশেষ অর্থে, তা হলো চেতনার এমন আমূল ও পরিপূর্ণ পরিবর্তন যাতে সত্তাটি তার আধ্যাত্মিক বিবর্তনে দৃঢ় পদে তার বর্তমান ধাপ পার হয়ে বিশেষ এক ধাপ এগিয়ে যাবে বৃহত্তর ও উচ্চতর পর্যায়ে, এবং এর আগের পর্যায়ে যখন পশু জগতের মধ্যে মনোময় সত্তার প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল তখন যেমন পরিবর্তন ঘটেছিল তার চেয়েও আরো বৃহত্তর ও ব্যাপকতর পূর্ণতার সঙ্গে

এ পরিবর্তন আসবে। এর চেয়ে কম কিছু হলে বা অন্তত এই ভিত্তিতে শুরু হয়ে ঐদিকে প্রকৃত অগ্রগতি না হলে আমার ঐ লক্ষ্য নেওয়া হলো না। জীবনে ও যোগে আমি যা চাই তার কোনোরূপ আংশিক বা মিশ্রিত পূরণেও কাজ হবে না।

উপলব্ধির আলো আর শক্তির অবতরণ এক জিনিস নয়। কেবল উপলব্ধিতে সমগ্র সত্তার রূপান্তর আসে না; ওতে আসবে হয়তো কেবল চেতনার উচ্চ অংশের উন্নয়ন বা বিস্তার যাতে পুরুষের কিছু উপলব্ধি ঘটবে, কিন্তু প্রকৃতির বিশেষ কিছু পরিবর্তন হবে না। চেতনার অধ্যাত্ম উচ্চতায় কিছু উপলব্ধির আলো পেলেও নিচেকার অংশগুলি যেমন ছিল তেমনি থাকবে। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আমি দেখেছি। আলো নেমে আসা চাই কেবল মনে বা তার কোনো অংশে নয় কিন্তু সর্বসত্তায় ও দেহের নিচে পর্যন্ত, তবেই প্রকৃত রূপান্তর আসবে। মনের আলো কেবল মনকেই অধ্যাত্মগত রূপে বা অন্য কোনোরূপে পরিবর্তিত করবে কিন্তু প্রাণ প্রকৃতির কিছু হবে না; প্রাণের আলো এলে প্রাণসত্তাকে বা তার ক্রিয়াগুলিকেই নীরব নিশ্চল করবে, কিন্তু দেহ ও দেহচেতনা যেমন ছিল তেমনি থাকবে কিংবা জড়বৎ হয়ে যাবে। আর শুধু আলো পেলেই চলবে না, তার সঙ্গে নেমে আসা চাই উচ্চতর চেতনা এবং তার শান্তি, শক্তি, প্রজ্ঞা, প্রেম, আনন্দ। আরো কথা, সেই অবতরণ যথেষ্ট না হলে তাতে মুক্তি এলেও পূর্ণতা না আসতে পারে, আভ্যন্তরীণ সত্তায় যথেষ্ট পরিবর্তন এলেও বাহ্য সত্তা থেকে যেতে পারে অপুষ্ট, দুর্বল, ভোঁতা যন্ত্রের মতো। আর শেষ কথা, সাধনাতে রূপান্তর এলেও সত্তার অতিমানসগত পরিবর্তন না আসা পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ হলো না। কেবল চৈত্যগত হওয়াই যথেষ্ট নয়, তা কেবল আরম্ভ মাত্র; উচ্চ চেতনা আসা ও অধ্যাত্মগত হওয়াও যথেষ্ট নয়, তা কেবল মধ্যপথে আসা; শেষ পর্যন্ত চাই অতিমানস চেতনা ও শক্তির ক্রিয়া। ওর চেয়ে কম কিছু যদিও ব্যক্তিগত ভাবে যথেষ্ট হতে পারে, কিন্তু পার্থিব চেতনার অগ্রগতির দিক থেকে যথেষ্ট নয়।

আমি কখনো এমন কথা বলিনি যে আমার যোগে সব আনকোরা নতুন জিনিস আছে। একে বলেছি পূর্ণযোগ, তার মানে প্রাচীন সমস্ত যোগগুলির সারবস্তু ও অনেক কিছু পদ্ধতি এর অন্তর্গত হয়েছে—এর যা নূতনত্ব তা কেবল লক্ষ্যের দিক দিয়ে এবং এর সামগ্রিক পদ্ধতিতে। আগে-কার ছোট ছোট বইগুলিতে কেবল এর লক্ষ্য এবং এর সর্বসমন্বয়ী তাৎপর্য্য

ছাড়া কোথাও একে প্রাচীন যোগ থেকে আলাদা কিছু বলা হয়নি; কিন্তু এর মনস্তত্ত্ব ও ক্রিয়াপদ্ধতি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে গুছিয়ে বলা না হওয়াতে যারা এতে কিছুমাত্র পরিচিত বা অভ্যস্ত নয় তারা ঠিক বুঝতে পারে নি। আর এ যোগের শেষ পরিণতির সম্বন্ধে, যা কারোই জানা নেই, তার কথা আমি প্রকাশ করে কিছু বলিনি এবং আপাতত তা বলতেও চাই না।

এরই অনুরূপ আগেকার যুগের যে সব আদর্শ বা প্রত্যাশা হয়েছিল সেগুলির কথা আমার জানা আছে—যেমন জাতিগত পূর্ণতাপ্রাপ্তি, তান্ত্রিক সাধনা পদ্ধতি, কোনো কোনো যোগের পূর্ণ-দৈহিক সিদ্ধির প্রয়াস, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি নিজেই তার উল্লেখ ক'রে বলেছি যে আগেকার কালের ঐতিহ্য কেবল যে প্রকৃতিকে প্রস্তুত ক'রে দিয়েছিল জগতাতীত ভগবান লাভের জন্য তাই নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে পার্থিব চেতনার বিবর্তনে এক ধাপ এগিয়ে যাবার দিকেও। সুতরাং আমার সঙ্গে ঐ সকল আদর্শের কতকটা মিল থাক বা নাই থাক তাতে কিছু যায় আসে না,—কেউ এই যোগ এবং এর পদ্ধতিকে নতুন বলছে কি না বলছে সেটা অতি তুচ্ছ কথা। একে সত্য বলে জেনে কেউ যদি এর অভ্যাস করতে থাকে এবং তাতে কিছু ফল পেয়ে এর সত্যতা প্রমাণ হয়, সেটাই হলো আসল কথা; একে নতুন বলা হোক বা লুপ্ত জিনিসের পুনরুদ্ধারই বলা হোক তাতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কয়েক জন সাধকের চিঠিতে আমি লিখেছিলাম এর নূতনত্বের কথা, এই হিসাবে যে প্রাচীন যোগের লক্ষ্য ও ধারণাগুলি আমার চোখে যথেষ্ট বিবেচিত হয়নি, আমি চেয়েছি এমন লক্ষ্যে পৌছতে যা আগে কখনো করা হয়নি, সে লক্ষ্য আগে কখনো দৃষ্টিগোচর হয়নি, যদিও গুহ্যভাবে সেই পরিণতির দিকে কিছু গতি ছিল।

প্রাচীন যোগের সঙ্গে এই যোগের তুলনায় নতুন কথা এই ঃ

(১) যেহেতু এই যোগ জগৎ ও জীবনকে বর্জন ক'রে স্বর্গ বা নির্বাণের পথে যায় না, কিন্তু এতে চায় জীবন ও অস্তিত্বেরই পরিবর্তন, আনুষঙ্গিক রূপে নয় কিন্তু তাই হবে সুস্পষ্ট কেন্দ্রগত উদ্দেশ্য। আর অন্যান্য যোগে যদিও উচ্চ আরোহণের পথে কিছু শক্তির অবতরণ হয়ে থাকে কিন্তু তাতে আরোহণ করাই ছিল প্রধান কথা। কিন্তু এই যোগে উচ্চে আরোহণ প্রথম ধাপ মাত্র, এবং চেতনার অবতরণের উপায় স্বরূপ। নতুন চেতনার অবতরণ ঘটানোই এর সাধনার মূল কথা। এমন কি

তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব সাধনাতেও শেষ পর্যন্ত চায় জীবন্মুক্তি; আর এই যোগে চাই জীবনেরই দিব্য পরিণতি।

(২) যেহেতু এখানে উদ্দেশ্য কেবল যে ব্যক্তিগত সিদ্ধির কারণে ব্যক্তিগত ভগবৎ উপলব্ধি তা নয়, কিন্তু গোটা পার্থিব চেতনাতে কিছু উন্নতি ঘটানো, পার্থিব অবস্থা থেকে উত্তরণ নয় কিন্তু পার্থিবেরই উন্নয়ন। অর্থাৎ চিৎশক্তিকে (অতিমানস) এখানে নামিয়ে আনার কথা, যা এখনও পর্যন্ত পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে কার্যকরী হয়ে আসেনি, এমন কি আধ্যাত্মিক জীবনেও নয়, তারই কাজ চাই।

(৩) যেহেতু এর উদ্দেশ্যও যেমন সর্বসম্পূর্ণ এর পদ্ধতিও তেমনি সর্বসম্পূর্ণ করে নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ—যাতে চেতনা ও প্রকৃতির পূর্ণ পরিবর্তন আসে সেই ভাবে প্রাচীন পদ্ধতিগুলিকে আংশিক ভাবে মাত্র নেওয়া হয়েছে অন্যান্য বিশিষ্ট ক্রিয়ার সাহায্যকারী রূপে। এই পদ্ধতি (সম্পূর্ণ-ভাবে) বা এই ধরনেরও কিছু যে প্রাচীন কোনো যোগে ছিল তা আমি খুঁজে পাইনি। যদি এমন কিছু আছে বলে দেখতে পেতাম, তাহলে এই ত্রিশ বছর ধরে অনুসন্ধান ও আভ্যন্তরীণ আবিষ্কারের দ্বারা পথ কেটে বের করবার জন্য বৃথা সময় নষ্ট না ক'রে অবলীলাক্রমে সোজা কদমচালে বাঁধা রাস্তা ধরে আমার লক্ষ্যে কবেই পৌঁছে যেতাম, যে রাস্তা সাধারণের জন্য গড়ে পিটে তৈরি করা হয়ে খোলাই ছিল। কিন্তু আমাদের যোগ পুরানো পথে হাঁটার জিনিস নয়, নতুন আধ্যাত্মিক অ্যাড্ভেঞ্চারের জিনিস।

৫-১০-১৯৩৫

রূপান্তর ও শুদ্ধি

"রূপান্তর" কথাটি আমি নিজে ব্যবহারে এনেছি (যেমন "অতিমানস") এই পূর্ণযোগের বিশেষ কতকগুলি আধ্যাত্মিক অবস্থান্তর ও ঘটনাবলীকে প্রকাশ করবার জন্য। লোকে এখন এই কথাটি নিয়ে যে ভাবে তাকে প্রয়োগ করছে তার সঙ্গে আমার ঐ তাৎপর্যের কোনো সম্পর্ক নেই। আত্মার "প্রভাবের" দ্বারা প্রকৃতির যে শুদ্ধি আসে তাকে আমি রূপান্তর বলছি না; শুদ্ধি মানে খানিকটা চৈত্য বা চৈত্য আধ্যাত্মিক পরিবর্তন—তা ছাড়া ও কথার প্রায়ই যে নৈতিক দিক দিয়ে অর্থ করা হয় তার সঙ্গে আমার

উদ্দেশ্যের কোনোই মিল নেই। আমি আধ্যাত্মিক রূপান্তর বলি একটা সক্রিয় অর্থে (যা কেবল আত্মার মুক্তি বা ভগবৎ উপলব্ধি নয় কারণ ওগুলি চেতনার অবতরণ ছাড়াও মিলতে পারে)। এ হলো এমন এক অধ্যাত্ম চেতনা আসা যা উভয়ত গতীয় এবং স্থিতীয় হবে সত্তার সর্ব অংশে এমন কি অবচেতন পর্যন্ত। আত্মার প্রভাবের দ্বারা কেবল শুদ্ধি এবং মনের ও হৃদয়ের আলোকদীপ্তি ও প্রাণের তরফের শান্তি আসতে পারে, কিন্তু চেতনা যেমন ছিল তেমনি থাকে, সুতরাং ঐ জিনিস হতে পারে না। এতে উপরের দিব্যচেতনা সকল অংশে সর্বত্রই নেমে আসা চাই যাতে বর্তমান চেতনাও সম্পূর্ণরূপে বদলে যাবে। সেটা দেখা দেবে অবারিত ও অমিশ্র ভাবে মন প্রাণ দেহকে ছাড়িয়ে। অনেকের মধ্যেই ঐরূপ নেমে আসার অভিজ্ঞতা ঘটেছে, এবং আমার নিজের এই অভিজ্ঞতা যে তার পূর্ণ অবতরণ না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত আবরণ ও মিশ্রণ ঘুচে গিয়ে পূর্ণ আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটবে না। কেবল ফাঁকা দার্শনিকতা বা যুক্তিতর্কের দ্বারা বলা যে "পরমাত্মা" কি করবে বা করবে না, বা তার করা দরকার কিংবা দরকার নয়, তাতে কোনো কাজ হয় না। এখানে আরো বলা দরকার যে এই যোগের এই রূপান্তর আসার মতো কথা অন্য কোনো যোগেই নেই—কেবল আছে ততটুকু শুদ্ধি ও পরিবর্তন চাওয়া যাতে মুক্তি ও পরলোক সিদ্ধি মেলে। আত্মার প্রভাবে অবশ্যই তা হতে পারে—কিন্তু আদ্যন্ত সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে নতুন চেতনার অবতরণ হয়ে জীবনেরই রূপান্তর ঘটানো, এ জিনিসের প্রয়োজন হয় না যেখানে জীবন থেকে আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভ করাই কাম্য।

ও অতিমানসিক, এ-কথাগুলি প্রথমে আমিই ব্যবহার করি, কিন্তু তার পর থেকে লোকে মনের উপরকার সব কিছুকেই বলছে অতিমানসিক। Psychic বা চৈত্য কথাটি এখন সাধারণত প্রয়োগ করা হচ্ছে চেতনার আভ্যন্তরীণ সব কিছু ক্রিয়া বা মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়ার সম্পর্কে। আমি কিন্তু ঐ কথাটি ব্যবহার করি গ্রীক ভাষার psyche মানে আত্মা এই অর্থে। সাধারণ লোকে আত্মা ও মন-প্রাণগত চেতনার মধ্যে কোনো তফাৎ করে না, তাদের কাছে তা একই জিনিস। কুণ্ডলিনীর উত্থান—অবতরণ

নয়, যতদূর পর্যন্ত জানি——সকলেই জানে, আমাদের যোগেও তা আছে চেতনার দেহ-প্রাণ থেকে উচ্চতর চেতনার দিকে উঠে যাওয়ার অনুভূতি। এরূপ জিনিস যে চক্রগুলির ভিতর দিয়েই হবে এমন কথা নয়, সর্ব দেহেই তা অনুভূত হয়। তেমনি আবার উচ্চতর চেতনার অবতরণ চক্রগুলির ভিতর দিয়ে অনুভূত না হয়ে মাথা, গলা, বুক, পেট, সর্বদেহেই হয়।

১৮-৬-১৯৩৭

আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ও অতিমানসিক রূপান্তর

আধ্যাত্মিক এবং অতিমানসিক যদি একই জিনিস হতো, যেমন আমার পাঠকেরা ভাবে, তাহলে সর্বকালের যত সাধু ও ভক্ত ও যোগীরা সকলেই হয়ে যেতো অতিমানসগত সত্তা, আর তাহলে অতিমানস নিয়ে এত কিছু লেখা সবই হতো বৃথা অযথা বাহুল্যোক্তি। তাহলে যারই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হতো সেই হতো অতিমানসিক সত্তা; এই আশ্রম এবং ভারতের অন্যান্য আশ্রমও তাহলে অতিমানস সত্তাতে ভরে যেতো। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ঘটলে আভ্যন্তরীণ চেতনাতে স্থায়ী হয়ে তাকে বদ্‌লে দিতে পারে; ভগবান সর্বত্র, আত্মা সর্বভূতে ও সর্বভূত আত্মাময়, বিশ্বশক্তির দ্বারাই সব কিছু ক্রিয়া, নিজেকে বিশ্বাত্মার মধ্যে বা অনাবিল ভক্তির মধ্যে বা আনন্দের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা,——এ সব কিছুই তাতে বোধ হতে পারে। কিন্তু তবু প্রকৃতির বাহ্য অংশে তুমি চিন্তা করবে বুদ্ধি বা বোধিগত মনের দ্বারা, ইচ্ছা করবে মনের ইচ্ছার দ্বারা সুখ দুঃখ বোধ করবে প্রাণের অংশে, দেহে সংগ্রাম চলতে থাকবে নানাবিধ রোগের সঙ্গে ও মৃত্যুর সঙ্গে। পরিবর্তনের মধ্যে এই হবে যে আভ্যন্তরীণ সত্তা এই সব দেখতে থাকবে নিজে বিচলিত বা বিভ্রান্ত না হয়ে আপন সমতা বজায় রেখে, মনে ক'রে নেবে যে প্রকৃতির পক্ষে এগুলি অপরিহার্য, অন্ততপক্ষে আত্মা যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে না নিচ্ছে। এই রকমের রূপান্তর আমার দৃষ্টিতে কাম্য নয়। আমি চাই এমন অতিমানসিক রূপান্তর যাতে জ্ঞানের শক্তি হবে অন্যপ্রকার, ইচ্ছা হয়ে যাবে অন্য রকমের, নীতিবোধ সূক্ষ্মবোধ ও হৃদয়াবেগাদি অন্যরূপ দীপ্তিলাভ করবে, দেহাত্মক চেতনা বদ্‌লে অন্যরূপ হয়ে যাবে,——এমন রূপান্তরের কথাই আমি বলি।

দেহাত্মক প্রকৃতির রূপান্তর ও সিদ্ধি

দেহাত্মক প্রকৃতি বলতে কেবল দেহমাত্রকেই বোঝায় না, ওর রূপান্তর বলতে বোঝায় দেহ, মন, প্রাণ ও স্থূল প্রকৃতি সব কিছুকে নিয়ে––ওগুলির মধ্যে সিদ্ধি ঘটিয়ে নয়, কিন্তু ওকে এমন প্রকৃতিতে নতুন ক'রে তোলা যাতে নতুন বিবর্তনের ক্ষেত্রে তা হবে অতিমানস সত্তার উপযুক্ত আধার। এই-রকম জিনিস যে কোনো হঠযোগ বা অন্য যোগে করা কখনো হয়েছে তা আমার জানা নেই। মন বা প্রাণের গুহ্যশক্তির ফলে কেবল ব্যক্তিগত সিদ্ধি মেলে উচ্চতর স্তরে––যেমন সেই সন্ন্যাসী যিনি নিরাপদে সব রকম বিষ খেয়ে হজম করতেন, কিন্তু একবার সিদ্ধির শর্তগুলি রক্ষা করতে ভুলে গিয়ে বিষ খেয়েই মারা গেলেন। অতিমানস শক্তির দ্বারা দেহগত এমন কোনো অস্বাভাবিক ক্ষমতা মেলে না, কিন্তু দেহের মধ্যে প্রবেশ ক'রে তাকে সম্পূর্ণরূপে অতিমানসগত দেহেতে পরিণত করে। বেদ বা উপনিষদ থেকে এ তত্ত্ব আমি পাইনি, এমন কিছু তাতে আছে কিনা জানি না। অতিমানস সম্বন্ধে জ্ঞান আমি সরাসরি পেয়েছি, ধার করা নয়; তবে পরবর্তী কালে আমি বেদে ও উপনিষদে এর সঙ্গে কিছু কিছু মিল পেয়েছি।

১১-৯-১৯৩৬

প্রাচীন যোগে অবতরণ ছিল না

> প্র ঃ অন্যান্য যোগে নীরবতা কি নেমে আসে না মনই নীরবতার মধ্যে উঠে যায়? রাজযোগে বা বৈদান্তিক জ্ঞানযোগে কিছু একটা অবতরণের প্রক্রিয়ার মত কিছু আছে বলে তো মনে হয় না। উপরন্তু, রাজযোগে জাগ্রৎ চেতনায় নীরবতার উল্লেখই কোথাও নেই। সমাধিতে প্রবেশ করাই হল একমাত্র প্রশ্ন। তবে জ্ঞানযোগে, মনে হয়, জাগ্রৎ চেতনা দীপ্তিমান হয়ে ওঠে, হয় শান্তি ও ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ।

অন্যান্য যোগে নীরবতার অবতরণের কথা কখনো শুনিনি––কেবল মনকে নীরব করার কথাই আছে। কিন্তু আমি আরোহণ ও অবতরণের

কথা বলার পর থেকে দেখছি অনেকেই বলছে যে এ যোগের সেটা নতুন কিছু কথা নয়---হয়তো তারা অজান্তেই আরোহণ অবতরণ অনুভব করেছে, তার প্রণালী না বুঝেই! যেমন মাথার উপরে উঠে গিয়ে সেখানেই অবস্থান করা, যা এই যোগে আমার ও অন্য কারো কারো বেলাতে ঘটেছে। প্রথম যখন আমি ঐ কথা বলি তখন লোকে অবাক হয়ে চেয়ে ভাবলে আমি প্রলাপ বকছি। অবশ্য প্রাচীন যোগে চেতনার বিস্তার নিশ্চয়ই ছিল নতুবা নিজের মধ্যে বিশ্ব অনুভব করা কিংবা দেহচেতনা থেকে বিমুক্ত হওয়া কিংবা অনন্ত ব্রহ্মে মিলে যাওয়া সম্ভব হতো না। কিন্তু তান্ত্রিক যোগে বলা হয়েছে চেতনার ব্রহ্মরন্ধ্রে উঠে যাওয়ার কথা। আর রাজযোগে সমাধিকেই চরম উপলব্ধি বলা হয়েছে। কিন্তু যদি জাগ্রত অবস্থাতে ব্রাহ্মী স্থিতি না ঘটে তাহলে উপলব্ধি সম্পূর্ণ হবে না। গীতায় স্পষ্টই বলা হয়েছে যে সমাহিত অবস্থা (সমাধির অনুরূপ) এবং ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করেও জাগ্রত থেকে কর্ম করা চলবে।

৯-৬-১৯৩৬

×

প্র ঃ অন্যান্য যোগীরা যদি উত্তরণ-অবতরণের এইরকম একটা স্থূল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতেন তা'হলে এটা কারো দৃষ্টি এড়াতে পারত না---তাঁরা তো ব্রহ্মরন্ধ্রে কুণ্ডলিনীর উঠে যাবার কথা বলেন। কেন তবে তাঁরা নেমে আসার কথাটা বলেননি, যেমন ধরুন, ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে একটি প্রবাহ বা জ্যোতি মূলাধারে কুণ্ডলিনীর মধ্যে নেমে আসা? যদি ধরে নেওয়া যায় যে তাঁরা একথা বলেননি কারণ তখন এ জিনিসটি ছিল সাধনার এক গোপন রহস্য তাহলে কেমন করে তাঁরা কুণ্ড-লিনীর উঠে যাওয়ার কথা বললেন?

যদি এই যোগে নতুন কিছুই না থাকে তা হলে হয় পতঞ্জলি বা হঠযোগ-প্রদীপিকা কিম্বা পঞ্চদশী এবং অন্যান্য বৈদান্তিক গ্রন্থাবলী থেকে অবতরণের তুল্যমূল্য কোন কথা উদ্ধৃত করে তাঁদের দেখানো উচিত।

আমি ঐরকমই ভেবেছি। বলেছি যে প্রাচীন যোগে চেতনার অবতরণ ছিল না যেহেতু তা কেবল চৈত্য-আধ্যাত্মিক ও গুহ্যশক্তির অনুভূতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল—স্থির নিশ্চল মনে বা একাগ্রতাপ্রাপ্ত হৃদয়ের মধ্যে সে অনুভূতি আসতো প্রতিফলনের মতো—এবং তার ক্ষেত্র ছিল ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে নিচের দিকে। তার উপরে সাধক উঠে যেতো কেবল সমাধিতে বা স্থিতীয় মুক্তিতে, অবতরণের ক্রিয়া ছিল না। যা কিছু ক্রিয়া ছিল তা কেবল অধ্যাত্মগত মন ও দেহ-প্রাণগত চেতনাতে। এই যোগে—নিম্ন ক্ষেত্র চৈত্য-আধ্যাত্মিক অনুভূতির দ্বারা প্রস্তুত হবার পরে—চেতনা ব্রহ্মরন্ধ্রের আরো উপরে উঠে যায় মূল অধ্যাত্ম চেতনার স্তরে এবং সেখানেই থেকে নিচেকার চেতনার আমূল পরিবর্তন ঘটায়। কারণ সেই অধ্যাত্ম চেতনার প্রকৃতিতেই রয়েছে আলো, শক্তি, আনন্দ, শান্তি, জ্ঞান ও অনন্ত বিস্তার ঘটানোর বেগ, এবং সেইগুলিই তখন আয়ত্ত হয়ে নেমে আসবে সমগ্র সত্তার মধ্যে। নতুবা মুক্তি পেলেও রূপান্তর আসবে না (কেবল আপেক্ষিক ভাবে চৈত্য আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ছাড়া)। কিন্তু এমন কথা যদি আমি বলতে যাই তাহলে চারদিক থেকে রব উঠবে যে আমার এত বড়ো স্পর্ধা, প্রাচীন মুনি ঋষিদের উপর টেক্কা দিয়ে বলি, যে জ্ঞান তাঁদের ছিল না এমন জ্ঞানের কথা। এই প্রসঙ্গে আমি এটুকু বলতে পারি যে উপনিষদে (বিশেষত তৈত্তিরীয় উপনিষদে) এই সকল উচ্চতর স্তরগুলির সম্বন্ধে এবং সমস্ত চেতনাকে একাগ্র ক'রে সেখানে উঠে যাওয়া সম্বন্ধে কিছু কিছু আভাষ আছে। কিন্তু সে সব কথা বিস্মৃত হয়ে পরে কেবল বুদ্ধিকেই সব চেয়ে বড়ো ক'রে তার উপরে পুরুষ বা আত্মার কথা বলা হয়েছে, উপরকার স্তরগুলির স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়নি। কাজেই, সমাধির অবস্থায় কোনো অনির্দিষ্ট ও অনির্বচনীয় কোনো স্বর্গলোকে উঠে যাওয়াই শুধু আছে, কোনোরূপ অবতরণের সম্ভাবনামাত্র নেই—সুতরাং ওখানে কোনোরূপ রূপান্তরের কথা বলতে যাওয়াই অযৌক্তিক ও অসম্ভব, কেবল জীবনকে এড়িয়ে গিয়ে মুক্তিলাভ করাই একমাত্র উপায়, গোলোকে, ব্রহ্মলোকে, শিবলোকে অথবা পরাৎপরে।

১১-৬-১৯৩৬

×

প্র ঃ রামকৃষ্ণ বা চৈতন্য বা প্রাচীন বড়ো বড়ো যোগীদের বেলাতে অবতরণের মতো কিছুই কি হয়নি? তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধি ছিল খুবই গভীর এবং সমাধির উচ্চাবস্থাতেও তাঁরা গিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে ঐরূপ অবতরণের কথা কোথাও বলা হয়নি।

উ ঃ এমন হতে পারে যে অজান্তে অবতরণ ঘটেছে কারণ তার ফলটাই কেবল জানা গেছে। সাধারণ যোগ অধ্যাত্মগত মনের উপরে যায় না—ওতে মস্তকশীর্ষে ব্রহ্ম মিলন অনুভব হয়, কিন্তু তাতে মাথার আরো উপরে চেতনা যাওয়ার কথা অবিদিত থাকে। তেমনি সাধারণ যোগে নিম্নস্থ কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে ওঠে এবং সেখানে প্রকৃতি ব্রহ্মচেতনাতে মিলিত হয়, কিন্তু কোনো অবতরণ অনুভূত হয় না। জিনিসটা হয়তো হয়ে থাকতে পারে কারো কারো বেলাতে, কিন্তু পূর্ণ যোগের সাধনাতে যেমন তার কতটা মূল্য ও কোথায় তার স্থান বোঝা যায় তেমন কিছু বোঝে না। অন্ততপক্ষে আমি নিজের ঐরূপ অনুভূতিলাভের আগে কারো কাছ থেকে ও কথা শুনিনি। তার কারণ এই যে প্রাচীন যোগীরা আধ্যাত্মিক মনের উপরে গেলেই সমাধিপ্রাপ্ত হতেন, তার মানে ঐ সব উচ্চ স্তরে জাগ্রত চেতনাতে থাকতে চেষ্টা করতেন না—তাঁদের লক্ষ্যই ছিল পরাচেতনাতে বিলুপ্তি, কিন্তু আমাদের যোগের যে উদ্দেশ্য ঐ পরাচেতনাকে জাগ্রতে নামিয়ে আনা, সেটা তাঁদের ছিল না।

২৬-৭-১৯৩৫

পূর্ণযোগে মস্তকোর্ধ্বে আরোহণ

প্রশ্ন হতে পারে, প্রথমত, তাহলে বলো না কেন, যদি জীবাত্মারই এইরকম উপলব্ধি হয় তাহলে সেইই তো বিশুদ্ধ "আমি" যার নিম্নতর আমির মধ্যে ঐ অনুভূতি আসছে এবং তারই মাধ্যমে মুক্তি মিলছে; দ্বিতীয়ত, তাহলে মস্তকোর্ধ্বর স্তরে আরোহণের কি প্রয়োজন আছে? তার উত্তর এই যে, প্রথমত, মুক্তিলাভের জন্য, তা নির্ব্যক্তিক ব্রহ্মেই হোক বা যে

কোনো শাশ্বতেই হোক, ঐ বিশুদ্ধ "আমি"র মধ্যস্থ থাকার প্রয়োজন যে আছেই এমন কথা নয়। বৌদ্ধেরা কোনো আত্মা বা বিশুদ্ধ "আমি"র কথা মানে না, তারা চেতনার অবস্থাকে গুচ্ছবদ্ধ ধারাতে সংস্কারমাত্র বলে জেনে সংস্কারগুলিকে সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে একটা স্থায়িত্বে মুক্তিলাভ করে, যার সম্বন্ধে শূন্য ছাড়া আর কিছু তারা বলতে চায় না। অতএব বিশুদ্ধ "আমি" বা জীবাত্মা যে অনুভূতিতে রাখতেই হবে, মুক্তিকামীর পক্ষে এমন কোনো কথা নেই, তা ছাড়াও সে মুক্তি পেতে পারে শাশ্বতের মধ্যে, অধ্যাত্মগত মনের উপরকার আলোর স্তরে না উঠেও। আমি নিজে নির্বাণ ও ব্রহ্মনীরবতা প্রভৃতির অনুভূতি পেয়েছিলাম এই সব মস্তকোর্ধ্ব আধ্যাত্মিক স্তরে ওঠা সম্বন্ধে জানতে পারার অনেক কাল আগে; সে অবস্থাতে প্রথমে এসেছিল একটা পূর্ণ স্থিরতা, মানসিক এবং আবেগাদি সমস্ত আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার বিলুপ্তি ঘটিয়ে—দেহ অবশ্য চলা ফেরা কথা বলা দেখা প্রভৃতি সব কিছুই করছিল কিন্তু ফাঁকা যন্ত্রবৎ মাত্র হয়ে। কোনো বিশুদ্ধ "আমি" বা কোনোরকম আমি সম্বন্ধেই জ্ঞান ছিল না, কেবল জ্ঞান ছিল সেই একমাত্র পূর্ণবাস্তবের, বাকী সব কিছুই ফাঁকা, অবাস্তব। কিন্তু কে ঐ পূর্ণবাস্তবকে জানছিল? সে এক অনামা চেতনা যে নিজেও বোধ করি সেই বাস্তব, কিন্তু তাও ঠিক বলা যায় না কারণ মন তাই নিয়ে কোনো ধারণাই করেনি। আর অমুক নামের অমুক ব্যক্তির বাহ্য বা নিম্ন সত্তা যে ঐরূপ নির্বাণ চেতনাতে পৌঁছেচে তাও আমার জ্ঞানের মধ্যে ছিল না। তাহলে সেখানে বিশুদ্ধ "আমি" বা নিম্নতর "আমি"র স্থান কোথায়? চেতনা (কোনোরূপ "আমি"র অংশ হিসাবে নয়) হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গিয়ে কেবল জানলে সেই অনির্বচনীয় বাস্তবকে আর পারিপার্শ্বিক সব কিছু অবাস্তবকে। যদি বলো যে নিশ্চয় সে চেতনা আপন দ্রষ্টা অস্তিত্বকে জানতো যদিও সে বিশুদ্ধ "আমি" রূপে নয়, তাহলে তাকে কোনো উপযুক্ত রকমের নাম দেওয়া যায় না।

আগে বলেছি যে মামুলী আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে মস্তকোর্ধ্ব স্তরে আরোহণের প্রয়োজন অপরিহার্য নয়—কিন্তু এই যোগের পক্ষে তা অপরিহার্য। কারণ এর লক্ষ্য হলো সমগ্র সত্তার জ্ঞান ও মুক্তি ও রূপান্তর ও মিলন এমন এক ঋত-চেতনার আলোর মধ্যে যা রয়েছে ঊর্ধ্বভূমিতে, আর সম্পূর্ণ ভিতরগামী ও উচ্চগামী ক্রিয়া ছাড়া সেখানে পৌঁছানো যাবে না। সেই কারণেই আমার এত রকম মনস্তাত্ত্বিক কথা বলা, যা মূলতঃ নতুন কথা

নয় কারণ উপনিষদ প্রভৃতিতেও অনেকটা এমন কথা আছে, কিন্তু নতুন এই হিসাবে যে সবগুলিকে একত্রিত ক'রে তা পূর্ণযোগের লক্ষ্যের দিকে বিশেষভাবে প্রয়োগ করা। কেউ যদি এ লক্ষ্য না চায় তাহলে তার পক্ষে এ রাস্তা নেওয়ার প্রয়োজন নেই; অন্যরূপ লক্ষ্য তার থাকতে পারে যেখানে এগুলো অনাবশ্যক ও বাহুল্য।

২২-৭-১৯৩৭

অতিমানস এবং সত্য

সমস্ত স্তরে সত্যের প্রকাশ সে হল এক কথা, অতিমানস হল ভিন্ন, যদিও অতিমানসই হল সব সত্যের উৎপত্তিস্থল।

২৯-৮-১৯৩৬

স্তরগুলি পরস্পর ভেদ্য

স্তরের পরস্পর ভেদ্যতা আমার এই যোগের আধ্যাত্মিক অনুভূতির পক্ষে প্রধান অঙ্গস্বরূপ, তা ছাড়া এর লক্ষ্যই থাকে না। সেই লক্ষ্য হলো উচ্চতর চেতনাতে পৌছে তাকে এই পৃথিবীতে এনে অভিব্যক্ত করা, পৃথিবী ছেড়ে ঊর্ধ্বলোকে বা পরাৎপরে চলে যাওয়া নয়। প্রাচীন যোগে (সব নয়) তাই ছিল—কারণ বোধহয় তাঁরা দেখেছিলেন যে কোনো আধ্যাত্মিক সত্তার পক্ষে পৃথিবী এক অসম্ভব স্থান, পরিবর্তন সম্বন্ধে এখানকার প্রতিকূলতা সহ্যাতীত; সেইরকম কথা যেমন বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে কুকুরের লেজ যতই সোজা করে দাও আবার তা গুটিয়ে যাবে। কিন্তু উপনিষদ স্পষ্টই ঘোষণা করে দিয়েছেন যে পৃথিবীই হলো ভিত্তিস্থান এবং সমস্ত জগৎই এখানে, কোনো প্রভেদ করতে যাওয়া অজ্ঞতা; অন্য কোনো জগতে গিয়ে নয়, এখানে থেকেই যা কিছু দিব্য উপলব্ধি আসবে। এ কথা অবশ্য বলা হয়েছিল ব্যক্তিগত উপলব্ধির সম্বন্ধে, কিন্তু ব্যাপকতর প্রচেষ্টাতেও এই কথাই সমান প্রযোজ্য।

১৪-১-১৯৩৪

রূপান্তরের বিভিন্ন পর্যায়

দিব্য চেতনার যেমন বিভিন্ন পর্যায় আছে, রূপান্তরেরও তেমনি বিভিন্ন পর্যায় আছে। প্রথম হলো চৈত্য রূপান্তর, যাতে ব্যক্তিগত চৈত্য-চেতনার মাধ্যমে সমগ্র সত্তা ভগবৎ সংস্পর্শ লাভ করে। তার পর আধ্যাত্মিক রূপান্তর, যাতে বিশ্বচেতনার মধ্যে সত্তা ভগবানে মিলিত হয়ে যায়। তৃতীয় হলো অতিমানস রূপান্তর, যাতে সব কিছুই দিব্য বিজ্ঞানময় চেতনাতে অতিমানসগত হয়ে যায়। এতেই হবে মন প্রাণ দেহের পূর্ণ রূপান্তর শুরু—আমার মতে তাই পূর্ণ রূপান্তর।

তুমি দুটি বিষয়ে ভুল করেছ। প্রথম কথা যে এ প্রয়াস নতুন নয় এবং কোনো কোনো যোগীর তাও ঘটেছে হয়তো—কিন্তু আমি যেমন ভাবে চাই সেই ভাবে নয়। তাদের যা হয়েছে তা ব্যক্তিগত যোগসিদ্ধি নিয়ে—প্রকৃতির ধর্ম হিসাবে (বস্তুর রূপান্তর) নয়। দ্বিতীয় কথা অতিমানস রূপান্তর অধ্যাত্ম-মানসিক রূপান্তরের সঙ্গে একই জিনিস নয়। এতে মন প্রাণ দেহের যে পরিবর্তন কাম্য তা মানসিক বা অধ্যাত্ম-অধিমানসিক সিদ্ধিতে মেলে না। যাঁদের তুমি নাম করেছ তাঁরা সকলেই আধ্যাত্মিক ছিলেন, কিন্তু বিভিন্ন প্রকারে। যেমন, কৃষ্ণের মন ছিল অধিমানসগত, রামকৃষ্ণের ছিল বোধিগত, চৈতন্যের ছিল চৈত্য-অধ্যাত্মগত, বুদ্ধের ছিল উচ্চ মানসিক দীপ্তিগত। বিজয় গোস্বামীর সম্বন্ধে আমি জানি না—সম্ভবত সমুজ্জ্বল কিন্তু অনির্দিষ্ট। সবগুলিই অতিমানস থেকে স্বতন্ত্র। এ ছাড়া পরমহংসদের প্রাণসত্তার কথা। শোনা যায় যে তাঁদের প্রাণসত্তা শিশুবৎ (রামকৃষ্ণ) অথবা উন্মাদবৎ অথবা পিশাচবৎ অথবা জড়বৎ (যেমন জড়ভরত) হয়। এ সবের সঙ্গে কিন্তু অতিমানসের কোনো সম্পর্কই নেই। তাহলে?...

যে কোনো রূপান্তরেই তুমি ভগবৎ যন্ত্রস্বরূপ হতে পারো। কিন্তু তা কিসের জন্য?

এপ্রিল ১৯৩৫

×

পরমহংস হলো এক পর্যায়ের উপলব্ধি, ওর চেয়ে উঁচুতে এবং নিচুতে

আরো অনেক রকম আছে। যেটি যেমন পর্যায়ের, তাতে আমার আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আমার এই যোগে সমস্ত প্রাণগত ক্রিয়াকে আনতে হবে চৈত্য ও আধ্যাত্মিক স্থিরতা, শান্তি ও জ্ঞানের প্রভাবের অধীনে। যদি চৈত্য বা আধ্যাত্মিক প্রভাবের বিরুদ্ধে যেতে চায়, তাতে ভারসাম্য নষ্ট হবে আর রূপান্তরের ভিত্তি স্থাপিত হবে না। অন্যান্য পন্থাতে যদি ঐরূপ অব্যবস্থাই গ্রাহ্য হয়, তবে তারা সেই রকমই করুক, আমার পথে তা চলবে না।

মে ১৯৩৫

প্রচলিত পন্থা ও অতিমানস রূপান্তর

বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক পদ্ধতির উল্লেখ করে তুমি বলেছ চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদের কথা। আমি কিছু জানি ঐ সব পন্থার কথা, কিন্তু আমি যে তারই পুনরাবৃত্তি করতে চাই না তার কারণ আমি যেমন পূর্ণ সাফল্য ও উদ্দেশ্যপূরণ চাই তা ওতে মিলবে না। তুমি যে রামপ্রসাদ থেকে উদ্ধৃতি করেছ তাতে আমার কোনো কাজই হবে না, আর তোমারও বক্তব্যকে তা সমর্থন করছে না। রামপ্রসাদ যাঁর কথা বলেছেন তিনি দেহী ভগবতী নন, অদৃশ্য অদেহী ভগবতী অথবা কেবল তাঁকে আভ্যন্তরীণ অনুভূতিতে সূক্ষ্মভাবে দেখা। যখন তিনি বলছেন যে মা তাঁকে কোলে তুলে না নিলে তাঁর দাবী কিছুতে ছাড়বেন না, তখন সেটা দৈহিক বা প্রাণিক সংস্পর্শ পাবার কথা নয়, ওটা আভ্যন্তরীণ চৈত্য অনুভূতিতে পাবার কথা; বস্তুত তিনি এই নালিশ করছেন যে তাঁকে বাহ্য দেহ প্রাণের প্রকৃতির মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছে কেন, মা তাঁকে চৈত্য-আধ্যাত্মিকের স্তরে আধ্যাত্মিক মিলনে তাঁর সঙ্গে মিলিত করছেন না কেন।

এ সবই খুব ভালো এবং চমৎকার কথা, কিন্তু ওতেই যথেষ্ট হয় না; ঐরূপ মিলনের উপলব্ধি অবশ্য প্রথমেই চাই নিশ্চয়, কারণ ও ছাড়া স্থায়ী রকমের কোনো কিছু হতে পারে না; কিন্তু ওর পরে আরো চাই বাহ্য চেতনাতেও এবং জীবনেও, প্রাণ দেহের স্তরেও তারই প্রকৃতিতে ভগবৎ উপলব্ধি। তোমার মন সে কথা না বুঝলেও তুমিও সেই জিনিসই চাইছ, আর আমিও তাই চাইছি; কেবল আমি দেখছি যে প্রাণের রূপান্তর আসা

দরকার, আর তুমি চাইছ যে পুরোপুরি না হলেও এদিকের রূপান্তরটা হয়ে যাক, প্রাণের ব্যাপার যেমন আছে তেমনি থাক। প্রথম অবস্থাতে অতি-মানসের গুহ্য সত্য আবিষ্কারের আগে আমিও চেয়েছিলাম প্রাণের সঙ্গে আধ্যাত্মিক চেতনার একটা রফা ক'রে নিতে কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখলাম যে তাতে নির্দিষ্ট কিছুই মিলছে না—মানব প্রকৃতির দুই প্রান্তের মাঝামাঝি যেখানে যেমন ছিল তেমনি সব থেকে যাচ্ছে। এখানে ঐরূপ মিলিয়ে আনা চলবে না, রূপান্তরই অপরিহার্য।

পরবর্তী বৈষ্ণব ভক্তির ধারাতে চেষ্টা করা হয়েছে প্রাণের আবেগের উদ্গতি ঘটিয়ে মানবীয় প্রেমকে ভগবৎ অভিমুখী ক'রে দিতে। এ কাজ খুব জোরালো হয়ে অনেক সুন্দর ও সমৃদ্ধ রকমের উপলব্ধি ঘটিয়েছিল; কিন্তু ওর অপূর্ণতা সেইখানে যাতে কেবল তা বজায় রইল আভ্যন্তরীণ ভগবানের দিকে আভ্যন্তরীণ অনুভূতির মধ্যে, কিন্তু সেখানেই থেমে গেল। চৈতন্যের প্রেম ছিল চৈত্য ধরনের দিব্যপ্রেম, প্রাণের উদ্গতিমূলক তীব্র অভিব্যক্তির সঙ্গে। কিন্তু তাঁর আগে এবং পরে বৈষ্ণববাদ যেমনি ঝুঁকলো আরো বাহ্য বিকাশের দিকে, তার ফলে যা হলো তা সর্বজানিত—প্রাণ-ধর্মী অধোগতি, পথভ্রষ্ট আচরণ, পতন। চৈতন্যের দৃষ্টান্তকে চৈত্য বা দিব্য প্রেমের বিরুদ্ধে বলতে পারো না; তাঁর প্রেম কেবল যে মানব-প্রাণগত ছিল তা নয়, ভিতরে ভিতরে ছিল রূপান্তরেরই প্রথম ধাপের মতো, সাধক-দের আমরা যেমন নির্দেশ দিয়ে থাকি, তাদের প্রেম যেন চৈত্যধর্মী হয় আর প্রাণ যেন আত্মতোষক না হয়ে আত্মার উপলব্ধির বিকাশ করে। এটি প্রথম ধাপ এবং কারো কারো পক্ষে এই যথেষ্ট, কারণ সকলকেই বলি না অতিমানস পর্যন্ত যেতে; কিন্তু স্থূলের স্তরে পূর্ণ অভিব্যক্তির পক্ষে অতি-মানস অপরিহার্য।

পরবর্তী বৈষ্ণব সাধনাতে মানবীয় প্রেমের সকল দিকই ভগবৎ প্রেমে প্রয়োগ করা হয়েছে; বিরহ, অভিমান, এমন কি বিচ্ছেদ পর্যন্ত (যেমন কৃষ্ণের মথুরা চলে যাওয়া) ঐ যোগে প্রধান স্থান পেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত—সাধনারই ক্ষেত্রে, বৈষ্ণব কাব্যের কথা ছেড়ে—শেষ পর্যন্ত ওগুলি সব কিছুই নিয়ে যাবে মিলনে, পূর্ণ মিলনে। কিন্তু কেউ কেউ এই বৈষ্ণব প্রেমযোগে বিরহ, বিচ্ছেদ, অভিমানকে এমন বড়ো স্থান দিয়েছে যে মনে হয় তা যেন উপায় মাত্র নয়, তাই যেন লক্ষ্য। আরো কথা, এগুলি ছিল কেবল আভ্যন্তর সম্পর্কেই, ভগবৎ সন্ধানের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রূপে, কিন্তু

দেহধারী ভগবান বা প্রতিভূর সম্পর্কে নয়। সেখানে গুরুর সঙ্গে অর্থাৎ অভিব্যক্ত ভগবানের সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্ক তার মধ্যে এই সকলের স্থান নেই, তাতে কোনো দোষত্রুটি না থাকলে। গুরু ও ভক্তের যে সম্পর্ক তা ঐসব থেকে রিক্ত। গুরুবাদে গুরুই দেবতা, তিনি সর্বদাই শ্রদ্ধার্হ, প্রণম্য, তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে তাঁরই নির্দেশ অকুণ্ঠভাবে মেনে চলতে হয়। এই দেহী ভগবানের সঙ্গে যদি ঐরূপ প্রাণধর্মী সম্পর্ক প্রয়োগ করা হয় তাতে যোগের পক্ষে কোনো সুরাহা হয় না।

রামকৃষ্ণের যোগও তাই, আভ্যন্তরীণ ভগবতীকে আভ্যন্তরীণ উপলব্ধি—তার কমও নয় বেশিও নয়। রামকৃষ্ণ যে বলেছিলেন যে সাধক যখন সর্বস্ব ত্যাগ করে কেবল ভগবানকে চেয়েছে তখন ভগবানের উপর তার ন্যায্য দাবী আছে,—সে দাবী বাহ্য কিছু নয়, আভ্যন্তরীণ দাবী, ভগবৎ প্রেমিকের পূর্ণ আধ্যাত্মিক মিলনের দাবী, এবং সেখানে ভগবানও ঐভাবে তাঁর প্রেমিকের কাছে ধরা দেবেন। এতে আপত্তি করার কিছু নেই; সে দাবী সকল সাধকই করতে পারে; কিন্তু কেমন ভাবে সে মিলন ঘটবে তাই নিয়ে কথা। অন্ততপক্ষে যেহেতু আমার লক্ষ্য হলো স্থূলের স্তরেও উপলব্ধি সেই হেতু আমি রামকৃষ্ণের পথই অনুসরণ করতে চাই না। আমি যতদূর জানি রামকৃষ্ণও বহুকাল যাবৎ নীরবে নিজের মধ্যে গুটিয়ে সাধনা করেছেন, সর্বদাই যে শিষ্যবেষ্টিত থাকতেন তা নয়। প্রথমে নিঃসঙ্গ থেকেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন, তার পর যখন বেরিয়ে এসে সকলকে নিয়ে থাকলেন, তার কয়েক বছরের মধ্যেই দেহ ভেঙে গেল। এতে বোধ করি তাঁর আপত্তি ছিল না; কারণ কেশবচন্দ্রের মৃত্যু সম্ভাবনাতে তিনি বলেছিলেন যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে দেহের ক্ষয় হতেই পারে। অথচ যখন জিজ্ঞাসা করা হলো যে তাঁর গলাতে অমন ব্যাধি কেন হলো তখন তিনি বললেন যে তাঁর শিষ্যদের যত পাপ গলাধঃকরণ করেছেন তাই থেকে হয়েছে। অতএব তিনি কেবল আভ্যন্তর মুক্তি নিয়েই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর ঐরূপ ভাবগুলি নিয়েই খুশি হতে পারি না, কারণ আভ্যন্তরীণ জীবনে তা যতই সার্থক হোক কিন্তু স্থূল জীবনের স্তরে ভগবানের সঙ্গে সাধকের মিলন তাতে পুরোপুরি হয় না। কৃষ্ণ নিশ্চয়ই ছিলেন ভগবানের অভিব্যক্তি স্বরূপ এবং তিনি অনেক কিছুই করেছিলেন। কিন্তু মহাভারতে দেখেছি তিনি এমন কথাও বলেছেন যে তাঁর ভক্ত ও শিষ্যেরা যে নিত্য তাদের প্রাণ প্রকৃতির অপূর্ণতা ও দাবী ও অনুযোগ তাঁর

উপর চাপায় তাতে তিনি শান্তি পান না। আর গীতাতে তিনি বলেছেন যে এই মানব জগৎ অনিত্য এবং অসুখের, অর্থাৎ দিব্য ক্রিয়ার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি যেন বলছেন যে এই জগৎকে ত্যাগ করাই শ্রেয়। অতীত ঐতিহ্যের যথেষ্ট মূল্য আছে সন্দেহ নেই কিন্তু তা কেবল অতীতেরই পক্ষে, আমরাও এখন যে তার থেকে আরও না এগিয়ে কেবল তারই পুনরাবৃত্তি ক'রে যাবো এমন কোনো কথা নেই। চেতনার অধ্যাত্ম উন্নতির ক্ষেত্রে মহৎ অতীতের চেয়ে আরো মহত্তর ভবিষ্যৎ আসা উচিত।

একটা কথা তোমরা সকলেই একেবারে ভুলে যাও---স্থূল দেহে অবতীর্ণ হয়ে স্থূলের স্তরে এসে দিব্যের বিকাশ ঘটানোর পক্ষে কত যে দুরূহতা। তোমরা ভাবো যে---হয় ভগবান তাঁর পূর্ণ শক্তিতে এখানে সরাসরি নেমে এসে বিনা বাধাতে বিনা শর্তে বিনা নিয়মে কেবল ম্যাজিক ও মিরেক্‌লের মতো অঘটন ঘটাবেন, আর নয়তো বলতে হবে তিনি তাহলে ভগবান নন। আবার তোমরা বলবে (প্রায় সকলেই) যে ভগবানকে এখানে এসে দিব্য ছেড়ে মানব চেতনাতে থেকে মানব হতে হবে, অথচ মানবের দিব্য হবার চেষ্টার কথা বলতে গেলেই তার প্রতিবাদ করবে। অপরপক্ষে মানব হয়ে যদি দুঃখকষ্ট পেতে হয়, দেহযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, বিরোধী শক্তির সঙ্গে হারজিতের লড়াই লড়তে হয়, বাধা বিঘ্ন ব্যাধি সহ্য করতে হয়, তাহলে বিভ্রান্ত ও হতাশ হয়ে বিরক্তি ও অবিশ্বাস নিয়ে কেউ কেউ বলতে শুরু করবে---"নাঃ এখানে ভগবান বলে কিছু নেই!" অর্থাৎ চাইছ যে দেহে প্রাণে অপরিবর্তিত মানবচেতনা নিয়ে এবং তার সব রকম দাবী পূরণ করতে থেকেও যেন কোনো অবস্থাতেই কোনো সংঘর্ষ বা কষ্ট বা ব্যাধি-পীড়া সইতে না হয়। কিন্তু আমি যদি চাই যে ঐ মানবচেতনা দিব্য ক'রে এনে তার মধ্যে অতিমানসের ঋত-চেতনা আসুক, তার আলো এবং শক্তি নিয়ে এসে স্থূল অস্তিত্বকে রূপান্তরিত ক'রে তার মধ্যে সত্য, আলো, শক্তি, আনন্দ ও প্রেম দিয়ে তাকে ভরিয়ে তুলুক, অমনি তোমরা ভয়ে বা অনিচ্ছায় বেঁকে দাঁড়াবে---কিংবা সন্দেহ ক'রে বলবে যে তাই কখনো সম্ভব। তোমা-দের দাবী এই যে রোগপীড়া প্রভৃতি কষ্টগুলো যেন একেবারে লোপ পায়, অথচ ঠিক যা করলে তা হতে পারবে তাকে সজোরে প্রত্যাখ্যান করবে। আমি জানি যে মানুষের প্রাণগত মন সাধারণত এই রকমই অবুঝ হয়ে থাকে, যার মধ্যে কোনো মিলের সম্ভাবনা নেই এমন দুই রকমই বিপরীত জিনিস সে একসঙ্গে চায়; আরো বিশেষ ক'রে আমি সেইজন্যই বলি যে

এই অজ্ঞান মানুষী জিনিসের বদলে এর চেয়ে জ্ঞান-জ্যোতির্ময় কিছু আসুক।

কিন্তু তাহলে ভগবত্তা জিনিসটা কি এতই ভয়াবহ ও মারাত্মক যে তা স্থূল মানব অস্তিত্বের মধ্যে প্রবেশ ক'রে তাকে দিব্য ক'রে তোলার কথা বলতে গেলেই তোমাদের মধ্যে আসবে এমন সংকোচ বা প্রতিবাদ বা ভয়? এটা বুঝি যে অসংস্কৃত প্রাণসত্তা তার সুখদুঃখময় জীবনের অন্ধ ও ক্ষণ-স্থায়ী নাটক নিয়েই খুশি থাকে, কোনো পরিবর্তনের কথা বললেই সে সংকু-চিত হয়। কিন্তু যে ভগবৎ প্রেমিক, ভগবৎ সন্ধানী, যে সাধক, সে কেন চেতনার দিব্যত্বপ্রাপ্তির কথায় ভয় পাবে? যাকে সে চাইছে তার দিব্য প্রকৃতি গ্রহণ করতে, তার সঙ্গে সাদৃশ্য মুক্তিতে সে কেন নারাজ হবে? এই ভয়ের পশ্চাতে দুটি কারণ রয়েছে; প্রথমত, প্রাণসত্তার তরফ থেকে এই বোধ হতে থাকা যে এতে তার স্থূল, ঘোলাটে, অহংপ্রধান, অমার্জিত (আধ্যাত্মিক) যত কিছু কামনা বাসনা এবং ছোটোখাটো সুখ এবং ব্যথাকেও (কারণ সে আনন্দও পছন্দ করে না) ছেড়ে দিতে হবে; এ ছাড়া মনের তরফের একটা ভুল ধারণা, যা এসেছে প্রাচীন সন্ন্যাসীর কৃচ্ছ্র-সাধনার ঐতিহ্য থেকে,—যে ভগবৎ প্রকৃতি মানেই যা উত্তাপহীন, রিক্ত, কঠোর, বিবিক্ত, তার মধ্যে অহংপূর্ণ প্রাণগত জীবনের কোনো রসই নেই। এমন একটা ধারণা যেন প্রাণের বেলাতেও ওতে দিব্যপ্রাণ বলে কোনো কিছু থাকবে না, আর সেই দিব্যপ্রাণ যখন বিকাশ পাবে তখন তা এই পার্থিব জীবনকে আরো অনন্তগুণে সুন্দর, জ্যোতির্ময়, প্রেমময়, ও দিব্য তীব্র আবেগে আনন্দময় ক'রে তুলতে পারবে না—আর তা এখনকার অপূর্ণ মানব অস্তিত্বের এই অসার, দুঃখময়, ক্ষণ উত্তেজিত ও ক্ষণ অবসন্ন জীবনের চেয়ে অনেক অনেক গুণে ভালো হবে না!

কিন্তু তুমি বলতে চাইবে যে ভগবানের প্রতি তোমার বিরাগ নেই, বরং তাই তুমি চাও (যদি খুব বেশি দিব্যত্বপূর্ণ না হয়), কিন্তু তোমার আপত্তি কেবল অতিমানস নিয়ে—যা বহু দূরের, যা অবোধগম্য, অনধিগম্য, বিবিক্ত কঠোর নিরাকার ব্রহ্মের মতো। তোমার প্রাণগত মন ওর সম্বন্ধে এমনি ধারণাই ক'রে রেখেছে,—আপন মনোগত ভাবের সাফাই স্বরূপ। এর পিছনে সেই ধারণা এসে গেছে যে অতিমানস হলো বেদান্তের সেই নিরাকার পরব্রহ্মেরই নতুন নাম, যা একেবারে বিরাট, বিবিক্ত, বহু দূরের অগম্য অপ্রাপ্য জিনিস। কিন্তু প্রকৃতই তা নয়, কারণ তা এখানে নেমেও আসতে পারে,—কিন্তু কাজের বেলায় তবুও তো তাই! আশ্চর্যের কথা এই যে

তুমি স্বীকার করছ যে অতিমানস কেমন হতে পারে তার সম্বন্ধে কিছু জানো না, তবুও তা কেমন হতে পারে তাই নিয়েই অত কথা বলছ, আবার আমার নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে নাকচ ক'রে দিয়ে বলছ যে ও কেবল আমি লোকটি ছাড়া অন্য কারো ব্যবহারিক জীবনের সত্যিকার কাজে লাগবে না! আমি জোর করতে চাইনি, বলতে চাইনি যে তুমি মানবীয়তা ছেড়ে দিব্য হয়ে ওঠো, অতিমানস তো দূরের কথা; কিন্তু তুমি যখন ঐ কথাকেই কেন্দ্র ক'রে বারে বারে বলছ তোমার নিরুৎসাহ অবস্থার আক্রমণের কথা, তখন স্পষ্ট জবাব আমাকে দিতেই হয়। তাই বলছি, অতিমানস তেমন অসম্ভব, অপ্রাপ্য, সর্বরিক্ত কোনো কিছু নয়; জীবনের দেহ প্রাণের স্বাভাবিক স্ফূর্তির সঙ্গে ওর কোনো বিরোধ নেই, বরং একমাত্র তারই দ্বারা পৃথিবীতে জীবনের প্রাণশক্তিরও দেহাভিব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ হওয়া সাধ্য এবং সম্ভব। আমি নিজে তাই দেখেছি, আমার কাছে সেই রকমই প্রতিভাত হয়েছে, তাই আমি এত অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাকে অনুসরণ করেছি এবং তার সংস্পর্শে এসে তার প্রভাব এবং তার কিছু শক্তিও নিয়ে আসতে পেরেছি। কেবল এই পৃথিবীকে নিয়েই আমার যা কিছু কাজ কারবার; এর বাইরে আর কোনো জগৎকে নিয়ে নয়। আমি চাই পার্থিব উপলব্ধি, কোনো উচ্চ জগতের শিখরে উঠে যাওয়া নয়। অন্যান্য যোগে জীবনকে বলে ক্ষণস্থায়ী মায়া মাত্র; কেবল এই অতিমানস যোগে বলে যে ভগবান এর সৃষ্টি করেছেন এর উত্তরোত্তর আরো বিকাশ ঘটিয়ে দেহ প্রাণের পূর্ণ পরিণতি আনার জন্য। অতিমানস মানে সত্য-চেতনা ছাড়া আর কিছু নয়, সে যখন নেমে আসবে তখন জীবনের পূর্ণ সত্যকে ও জড়চেতনার পূর্ণ সত্যকে উদ্ঘাটিত করে দেবে। অবশ্য তার নাগাল পেতে হলে তোমাকে তার উচ্চতার দিকে উঠে যেতে হবে, কিন্তু যতই তুমি উঠবে ততই তাকে নিচে নামিয়ে আনতে সক্ষম হবে। অবশ্য তখন তোমার দেহ প্রাণ যেমন অক্ষম, অপূর্ণ, অজ্ঞান হয়ে আছে তেমন আর থাকবে না; কিন্তু দেহ প্রাণের পূর্ণতর শক্তিলাভের জন্য যে পরিবর্তন তাকে অকাম্য ও উত্তাপহীন নীরস অবস্থা মনে করবে কেন? এখন দেহ প্রাণ বড় জোর যেটুকু আনন্দ পেতে পারে তা মন প্রাণের বা স্নায়ুর বা দেহকোষের ক্ষণিক উত্তেজনা মাত্র ছাড়া আর কিছু হয় না, যা অপূর্ণ ও নিতান্ত সীমিত, তখনই লোপ পায়; কিন্তু এই অতিমানসিক পরিবর্তনে দেহের সমস্ত কোষ ও স্নায়ু, সমস্ত প্রাণশক্তি, সমস্ত মনঃশক্তি ওর সহস্রগুণ বেশি এমন তীব্র আনন্দে

পূর্ণ হয়ে উঠবে যা বর্ণনাতীত, আর যা লোপ হবার নয়। তাহলে এমন জিনিস কি নিতান্ত অকাম্য, উত্তাপহীন, নীরস! এই অতিমানসিক যে প্রেম তাতে হয় আত্মার সঙ্গে আত্মার, মনের সঙ্গে মনের, জীবনের সঙ্গে জীবনের সুগভীর মিলন, যাতে দেহচেতনা একত্বের ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে সর্ব অঙ্গে সেই প্রিয়জনের উপস্থিতি অনুভব করবে, দেহের প্রতি কোষগুলিতে প্রমত্ত। এও কি অকাম্য, বিবিক্ত? তুমি যে জিনিস একান্তভাবে চাইছ, অতিমানসিক পরিবর্তন এলে ঠিক সেই জিনিসই মিলবে,——রূপায়িত ভগবানের সঙ্গে মুক্তভাবে সাধকের দৈহিক মিলন, কোনো বিরোধ বা বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা না থেকে। তাও কি বলবে অকাম্য? আমি এ নিয়ে আরো অনেক পাতা লিখতে পারতাম——কিন্তু আপাতত এই যথেষ্ট।

১৪-১-১৯৩২

অতীত ও ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিক উন্নয়ন

বই পড়ার সময় আমার প্রায়ই থাকে না। বই খুব কমই কাছে থাকতো, এখন কিছুই নেই। বিজয় গোস্বামীর সাধনা থেকে আমি কোনো প্রেরণা পাইনি, বরং এক সময় যথেষ্ট পেয়েছি রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ থেকে। আমি কেবল এই কথাই বলতে চেয়েছি মোটের উপর যে মানুষের আধ্যাত্মিক ইতিহাস, বিশেষত এই ভারতের, একটা ভগবৎ উদ্দেশ্য পূরণের দিকে অবিরাম অগ্রসর হয়ে চলেছে, এমন কোনো সমাপ্ত-করা গ্রন্থ নয় যার নির্ধারিত করা পূর্ব-সূত্রগুলিরই কেবল নিত্য পুনরাবৃত্তি চলবে। এমন কি উপনিষদ এবং গীতাও শেষ কথা নয়, যদিও সব কিছুই তার মধ্যে আছে বীজ রূপে নিহিত হয়ে। এই উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের সাম্প্রতিক আধ্যাত্মিক ইতিহাস বেশ গুরুত্বপূর্ণ; তখন যে নামগুলি আমি করেছিলাম তাদের বিশেষ প্রাধান্য আছে——এই হিসাবে যে তাঁরা দেখিয়ে গেছেন কোন পথে ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিক উন্নয়নের কাজ অগ্রসর হবে, এখানেই না থেমে। তুমি যে ভাষাতে জানতে চাও তেমন ভাষাতে আমি কিছু বলতে চাই না। কেবল এইটুকু বলব, যে ভবিষ্যৎ মানুষের জন্য কোনো নতুন বা পুরাতন ধর্মকে প্রচার করা আদৌ আমার উদ্দেশ্য নয়। যে রাস্তাটি এখনো বন্ধ আছে সেই রাস্তাই কেবল খুলে দিতে চাই,

কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে নয়।

১৮-৮-১৯৩৫

গীতা এবং শ্রীঅরবিন্দের বাণী

গীতা যে শ্রীঅরবিন্দের বাণীর সমগ্র ভিত্তিভূমি এ কথা তথ্য হিসেবে ঠিক নয়। কেন না, মনে হয় গীতা তার চরম লক্ষ্য হিসেবে, অন্ততঃ যোগের চরম চরিতার্থতা হিসেবে, পৃথিবীতে পুনর্জন্মের অবলুপ্তিকে মেনে নেয়। আধ্যাত্মিক বিবর্তনের ধারণা বা উচ্চতর লোকগুলি এবং অতি-মানস সত্যচেতনার ধারণা আর সেই অতিমানস চেতনাকে পার্থিব জীবনকে রূপান্তরের জন্যে নামিয়ে আনার কথাও গীতায় বিবৃত হয়নি।

অতিমানস সম্পর্কে, ঋতচিৎ সম্পর্কে ধারণা-ভাবনার কথা ঋগ্বেদে আছে,—শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যানুযায়ী। উপনিষদেরও দু'এক স্থানে আছে, তবে সেখানে আছে তা বীজাকারে—মানসিক, প্রাণিক ও দৈহিক সত্তাকে অতিক্রম করে রয়েছেন বিজ্ঞানময় পুরুষ। ঋগ্বেদে মূলভাবটি রয়েছে তত্ত্ব-হিসেবে মাত্র, তত্ত্বটিকে ফলানো হয়নি, আর হিন্দু সাধনা ধারায় এমন কি সেই তত্ত্বটিও অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

হিন্দু সাধনধারার সঙ্গে তুলনা করলে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে এই-গুলির মধ্যেই রয়েছে শ্রীঅরবিন্দের বাণীর নূতনত্ব। এই জগৎ মায়ার সৃষ্ট নয় কিম্বা ভগবানের একটি লীলা মাত্র নয়, অথবা অজ্ঞানের মধ্যে পুনর্জন্মের চক্রাবর্ত, যার থেকে আমাদের নিষ্ক্রান্ত হতে হবে—তাও এ নয়। এ হল ক্রমবিকাশের এক ক্ষেত্র। এখানে জড়ের অন্তর্বর্তী আত্মা ও প্রকৃতির ক্রমাভিব্যক্তি চলেছে জড় হতে প্রাণে, প্রাণ হতে মনে, মন হতে মনের উপ-রের ভূমিগুলিতে, যতদিন না এই পার্থিব জীবনে সচ্চিদানন্দের পরম প্রকাশ সংঘটিত হয়। এই জিনিসটিই হল যোগের ভিত্তি যা জীবনকে দান করেছে একটা নতুন অর্থ।

আমাদের যোগ ও গীতার যোগ ঠিক একই জিনিস নয়, যদিও গীতার যোগের সমস্ত সার কথা আছে এর মধ্যে। আমাদের যোগ শুরু হয় পূর্ণ সমর্পণের মনোভাব, ইচ্ছা ও আস্পৃহা নিয়ে, কিন্তু সেই সঙ্গে নিম্ন প্রকৃতিকে প্রত্যাখ্যান ক'রে আমাদের চেতনাকে তার থেকে সরিয়ে আনতে হয়, যে আত্মা নিম্ন প্রকৃতির মধ্যে নিবর্তিত রয়েছে তাকে মুক্ত ক'রে উচ্চতর প্রকৃতিতে তাকে তুলে আনতে হয়। এই দুই তরফা ক্রিয়া না করলে সমর্পণ করা তামসিক ও অবাস্তব হয়ে যাবার আশংকা থাকে, যাতে চেষ্টাও থাকে না তপস্যাও থাকে না, সুতরাং কোনো অগ্রগতি হয় না; কিংবা সমর্পণ রাজসিক হয়ে তা আর ভগবৎ উদ্দেশে না গিয়ে আপনগড়া কোনো মিথ্যা ভগবানকে ধরে, যা মুখোসঢাকা রাজসিক অহং বা তার চেয়েও খারাপ কিছু।

×

গীতার ভাষা অনেক স্থলে পরস্পরবিরোধী বোধ হয় কারণ তাতে দুই বিপরীত সত্যকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা রয়েছে। তাতে বলেছে যে সংসার ত্যাগ ক'রে ব্রহ্মে চলে যাওয়াও যেতে পারে; আবার ভগবানের মধ্যে (বলেছেন "আমার" মধ্যে) মুক্তভাবে শরণ নিয়ে থেকে জগতে জীবন্মুক্ত অবস্থাতে কাজ করতে থাকাও যেতে পারে। এই শেষের দিকটাতেই বেশি ঝোঁক দেওয়া হয়েছে। আর রামকৃষ্ণ বলেছেন, যারা "ঈশ্বরকোটি" অর্থাৎ সিঁড়ি বেয়ে উপরেও উঠতে পারে আবার নেমেও আসতে পারে, তারা আরো বড়ো "জীবকোটি"দের চেয়ে যারা উপরে উঠে আর ভগবানের কাজ করতে নেমে আসতে পারে না। অতিমানস চেতনাতে রয়েছে পূর্ণ সত্য, কারণ তাতে ওর মধ্যে থেকেই জীবন ও জড়ের উপর কাজ করবার শক্তি রয়েছে।

কর্ম এবং পূর্ণযোগ

প্রাচীন যোগের প্রতিবাদ কখনই আমি করিনি—নিজেই উপলব্ধি করেছি বৈষ্ণব ভক্তি ও ব্রহ্মে নির্বাণ; ঐ সব যোগের সত্যকে আমি মানি

তাদের আপন ক্ষেত্রে ও আপন উদ্দেশ্যে---অনুভূতির দিক দিয়ে---যদিও তার উপরে যে দার্শনিক তত্ত্ব খাড়া করা হয় সেগুলো মানি না। তেমনি আমার এই যোগও এর আপন ক্ষেত্রে সত্য---এবং আমি মনে করি আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে সত্য---ও তার আপন উদ্দেশ্য নিয়ে সত্য। আগেকারগুলির উদ্দেশ্য জীবনকে ছেড়ে ভগবানের দিকে যাওয়া, সুতরাং কর্মকে বাদ দাও। এই নতুন যোগের উদ্দেশ্য ভগবানকে পেয়ে যা সম্পদ মেলে তার সমস্ত পূর্ণতাকে জীবনের মধ্যে নামিয়ে আনো---এর জন্য কর্মযোগ অপরিহার্য। এর মধ্যে কোনো হেঁয়ালি বা অবোধ্য কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না, কারণ এ তো যুক্তিগ্রাহ্য কথা এবং অপরিহার্য। কেবল তুমি বলছ তা অসম্ভব; কিন্তু কাজটা করতে পারবার আগে সকলেই তাই বলে।

স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে কর্মযোগ নতুন জিনিস নয়, এ খুব প্রাচীন যোগ। গীতা কালকের লেখা নয়, আর গীতার আগেও কর্মযোগ ছিল। তোমার ধারণা যে কর্মকে কিছুতে এড়ানো যায় না বলেই অগত্যা কর্মযোগ মেনে নিয়েছে, এ ধারণা নিতান্ত স্থূল। অমন কিছু হলে গীতা হতো একজন মূর্খের রচনা, তাহলে তাই নিয়ে আমি দুই খণ্ড গ্রন্থও লিখতাম না, কিংবা সমগ্র জগৎ গীতাকে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রগ্রন্থ বলেও মানতো না, বিশেষত ওতে যেখানে আধ্যাত্মিক সাধনাতে কর্মের স্থান দেওয়া হয়েছে তাই নিয়ে। তা ছাড়া ওর মধ্যে আরো কথা আছে। যাই হোক্ তোমার যে সন্দেহ যে কর্মের দ্বারা উপলব্ধি পাওয়া অসম্ভব, এ কথা তারা কিন্তু বলে না যারা বাস্তবিক উপলব্ধি পেয়ে এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। তুমি বলো যে কর্ম চেতনাকে নামিয়ে ভিতর থেকে বাইরের দিকে আনে---তা ঠিক কথা, যদি তুমি ভিতরের দিক থেকে কর্ম না ক'রে নিজেকে বহির্মুখী ক'রে ফেলো; কিন্তু যাতে তা না হতে পারে তাই তো শেখা চাই। এই ভাবে চিন্তা এবং অনুভবও তোমাকে বহির্মুখী ক'রে দিতে পারে; কিন্তু এখানে দরকার আভ্যন্তরীণ চেতনার মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে চিন্তা অনুভব ও কর্মকে তার সঙ্গে যুক্ত ক'রে সব কিছুকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা। কঠিন কথা? তা, ভক্তিও খুব সহজ কথা নয় আর নির্বাণ তো অনেকের পক্ষে আরো কঠিন।

মানবপ্রেম, মানব সেবা, গণসেবা প্রভৃতি কথাগুলি কেন যে তুমি এর মধ্যে টেনে এনেছ জানি না। এর কোনোটাই আমার যোগের অঙ্গ নয় আর কোনোটার সঙ্গেই আমার কাজের সঙ্গতি নেই। আমি কখনই এমন

কথা ভাবিনি যে রাজনীতি বা দরিদ্র ভোজন বা কাব্য রচনা সরাসরি বৈকুণ্ঠে বা পরাৎপরে পৌঁছে দেবে। তা যদি হতো তাহলে একদিকে রমেশ দত্ত এবং অন্য দিকে বদিলেয়ার আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়ে আমাদেরও ডেকে নিতো। কেবল কর্মের প্রকৃতি বা তৎপরতা মাত্র কর্মযোগ নয়. কর্মযোগের মূল কথা হলো ভগবানের দিকে চেতনা ও ইচ্ছা নিয়ে কাজ করা; সে কাজ কর্মের প্রভু ভগবানের সঙ্গে মিলন ঘটাবার যন্ত্রস্বরূপ মাত্র, তোমার অজ্ঞানময় ইচ্ছা ও শক্তিকে জ্যোতির্ময়ের আসল ইচ্ছা ও শক্তির দিকে নিয়ে যাওয়া।

আর তুমি কেনই বা মনে করো যে আমি ধ্যান বা ভক্তির বিরোধী? তুমি ওর মধ্যে কোনো একটি বা দুই পথেই যদি ভগবানকে পেতে চাও তাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। কেবল বলেছিলাম যে কর্মকে ছোটো ক'রে দেখা বা তার দ্বারা সত্যলাভ যারা করেছে তাদের কথা অস্বীকার করার কারণ কিছু দেখছি না, কারণ গীতায় বলে যে কর্মের দ্বারা পূর্ণ উপলব্ধি ও ভগবৎ মিলন হতে পারে, সংসিদ্ধিম্ সাধর্ম্যম্ (যেমন জনক রাজা ও আরো অনেকের হয়েছে); যে ঐরূপ ভুল কথা বলেছে সে ওর ভিতরকার গভীরতম গুহ্য সত্যের কথা না জেনেই বলেছে—সেই কারণেই আমি কর্মকে সমর্থন করেছিলাম।

২৩-১২-১৯৩৪

×

ব্যবসা করাকে আমি মন্দ বলে ভাবি না, এবং প্রাচীন আধ্যাত্মিক ভারতেও তা মন্দ বলা হতো না। তা যদি ভাবতাম তাহলে ক-এর বা অন্য ভক্তদের কাছ থেকে টাকা নিতাম না, যারা বোম্বাইতে পূর্ব আফ্রিকার সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করে। তাহলে তাদের বলতাম যে ব্যবসা ত্যাগ ক'রে কেবল আধ্যাত্মিক নিয়ে থাকো। তাহলে অমুক যে কারখানা চালাচ্ছে ও আধ্যাত্মিক আলো চাইছে‐ তা কেমন ক'রে হতে পারত? তাহলে তাকে বলতাম কারবার ছেড়ে কোনো আশ্রমে গিয়ে ঢোকো। এমন কি আমি নিজেও যদি রাজনীতি করার মতো ব্যবসা করার আদেশ পেতাম তাহলে আমিও তাই করতাম। সবই নির্ভর করে কেমন মনোভাব নিয়ে করছি তার উপর। আমি দুর্দান্ত রকমের বিপ্লববাদী রাজনীতি করেছি, যা ঘোরম্

কর্ম, যুদ্ধে ভক্তদের পাঠিয়েছি, যাকে কোনোমতে আধ্যাত্মিক বলা চলে না। কৃষ্ণ অর্জুনকে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হতে বলেছিলেন, মানুষকে সর্বকর্মাণি করতে বলেছিলেন। কৃষ্ণ কি অনাধ্যাত্মিক ছিলেন? তিনি বলেছিলেন যে সমুচিত মনোভাব নিয়ে যে কর্মই করো আপন ধর্ম অনুযায়ী তাতেই ভগবানের দিকে নিয়ে যাবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ধর্ম সকলকেই তিনি সমর্থন করেছেন। ব্যবসা করে অর্থলাভ করার মধ্যেও যোগ করা ও আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করা যেতে পারে। গীতা বলেছেন যে কর্মযোগের সঙ্গে ভক্তি ও জ্ঞান যোগও চলতে পারে। তবে কর্ম হবে কামনাবিহীন, আসক্তিবিহীন, ফলপ্রাপ্তির আশাবিহীন, স্বার্থবুদ্ধি বিহীন। এই ভাবে কর্ম করাই সমুচিত ধর্ম।

অবশ্য সন্ন্যাস ধর্মেরও স্থান আছে। অর্থ সম্বন্ধে ও খাদ্যাদি সম্বন্ধে আসক্তিবিহীন হয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করা ব্যতীত আধ্যাত্মিক পূর্ণতা আসে না। কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে থাকাই যে প্রয়োজন তা আমি বলি না। আত্মজয়, ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন, অহংবুদ্ধি ও কামনা ত্যাগ করে কর্ম করা, যে কোনো কর্মই হোক, এটাই ভগবানের কাম্য। তা না হলে জনক ও বিদুর প্রভৃতি কখনো আধ্যাত্মিক পূর্ণতা প্রাপ্ত হতেন না, আর কৃষ্ণও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে রথী না হয়ে বা মথুরা ও দ্বারকার রাজা না হয়ে সন্ন্যাসী হয়ে থাকতেন। মহাভারতে ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে আধ্যাত্মিকতা ও কর্মজীবন দুইএরই স্থান আছে। ওর মধ্যে কেবল একটাই ভারতীয় ঐতিহ্য নয় এবং সর্বকর্মাণি গ্রহণ করা অভারতীয় নয়, কর্ম নিয়ে থাকা কেবল ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্ত্য ঐতিহ্য নয়।

কর্ম ও ধ্যান

ধ্যান ও একাগ্রতা এক জিনিস নয়। তুমি ধ্যানেও একাগ্র হতে পারো আবার কর্মে বা ভক্তিতেও একাগ্র হতে পারো। আমি যদি আমার সময়ের ১০ ভাগের ৯ ভাগ কেবল একাগ্রতা নিয়ে থাকতাম এবং কর্মের জন্য কোনো সময় না দিতাম, তাহলে তার ফল ভালো হতো না। আমার কোনো বিশেষ কর্মের মধ্যে আমি একাগ্রতা আনি—জীবনবর্জিত কোনো ধ্যানের মধ্যে নয়। আমি যখন একাগ্র হই তখন আমি ক্রিয়া করি অন্যে-

দের উপর, জগতের উপর, অন্যান্য শক্তিগুলির ক্রিয়ার উপর। আমি বলি যে সব সময় পড়া ও চিঠি লেখাতে নিযুক্ত থাকাতে উদ্দেশ্যপূরণ হয় না। আমি কোনো ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসী হতে চাই না।

....কিন্তু তার মানে এই নয় যে চিঠি লেখার কাজের সময় আমার উচ্চতর চেতনা থাকে না। তা যদি হতো তাহলে আমি অতিমানস তো হতেই পারতাম না, এমন কি পূর্ণ যোগ-চেতনার থেকে আমি অনেক দূরে সরে যেতাম....

যদি অনিষ্টকর আক্রমণের বিরুদ্ধে আমায় কাউকে সাহায্য করতে হয়, তা কেবল চিঠিতে লিখেই করতে পারি না, তার জন্য আমাকে শক্তি প্রেরণ করতে হয়, কিংবা একাগ্রতা এনে তার জন্য কিছু কাজ করতে হয়। তা ছাড়া লোককে সুন্দর সুন্দর চিঠি লিখেই আমি অতিমানসকে নামিয়ে আনতে পারি না। ধ্যান ধারণা করবার জন্য আমি নিশ্চিন্ত অবসর পেতে চাইছি না। আমি স্পষ্টই বলেছি যে চিঠি লেখার কাজ ছাড়া আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে, সেগুলি সম্পন্ন করবার পক্ষে একাগ্রতার জন্যই সময়ের দরকার।

তোমাদের এই একটা ভুল ধারণা হচ্ছে যে হয় আমাকে শুধুই কর্ম করতে হবে নতুবা শুধুই ধ্যান করতে হবে। হয় কর্মই পন্থা, নতুবা ধ্যানই পন্থা, কিন্তু *দুইই যেন হতে পারে না!* এমন কথা আমি কখনই বলিনি যে ধ্যান করতে হবে না। কর্ম আর ধ্যানের মধ্যে এই যে খোলা বা লুকোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এ কেবল ভাগকরা মনের ও প্রাচীন যোগের একটা কৌশল। দয়া ক'রে এই কথাটি স্মরণ রেখো যে আমি বরাবরই বলে আসছি এমন পূর্ণযোগের কথা যাতে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম—চেতনার আলো, আনন্দ ও প্রেম, কর্মের ইচ্ছা ও শক্তি—ধ্যান, উপাসনা, ভগবৎ সেবা—সব কিছুরই স্থান আছে। "আর্য" পত্রিকার সাতটা ভল্যুম কি আমি বৃথাই লিখলাম? কর্মযোগের চেয়ে ধ্যানযোগ বড়ো নয়, আর কর্মযোগও জ্ঞান-যোগের চেয়ে বড়ো নয়—দুইই সমান জিনিস।

আর এও খুব ভুল কাজ, অন্য কারো অনুভূতিকে গ্রাহ্য না ক'রে কেবল নিজের পাওয়া সংকীর্ণ অনুভূতিটুকু থেকেই যোগ সম্বন্ধে একটা বড়ো রকমের সাধারণ সিদ্ধান্ত ক'রে নেওয়া। অনেকেই তাই করে, কিন্তু এতে অনেক দোষ হয়। বড়ো রকমের উপলব্ধির কোনো অভিজ্ঞতা না পেয়েই তুমি সিদ্ধান্ত ক'রে নিয়ে বসবে যে তা সম্ভব নয়। কিন্তু তাদের বেলা কি

হবে যারা তা পেয়েছে---এই আশ্রমেও এবং অন্যত্রও? তার কি কোনো দাম নেই? তুমি বলতে চাও যে কর্মের দ্বারা আমার কোনো লাভ হয়নি? কেমন ক'রে তা জানলে? আমার সাধনার কোনো ইতিহাস আমি লিখিনি---যদি লিখতাম তাহলে দেখতে যে আমি যদি কাজ ও কর্মকে আমার উপলব্ধির প্রধান উপায় ক'রে না নিতাম---তাহলে কোনো সাধনা বা উপলব্ধিই হতে পারত না, কেবল সেই নির্বাণ ছাড়া।

কর্মযোগে আরো কি কি হতে পারে তা হয়তো পরে লিখব, আজ আর নয়।

তাই বলে ধরে নিওনা যে কর্মকেই আমি উপলব্ধির এক মাত্র উপায় বলে বড়ো করছি, তা নয়, আমি তাকে তার যথাযোগ্য স্থান দিচ্ছি।

এর মধ্যে যে বিদ্রূপের আভাষ একটু দিয়েছি তার জন্য কিছু মনে কোরো না,---কিন্তু যখন আমাকে এমন কথা বলা হয় যে আমার নিজের দৃষ্টান্তই আমার সমস্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও জ্ঞান ও অনুভূতির ব্যর্থতা প্রমাণ করছে, তখন এটুকু প্রতিক্রিয়ার খোঁটা মেনে নিতেই হয়।

১৯-১২-১৯৩৪

বৈদান্তিক সর্বেশ্বরবাদের অপূর্ণতা

রামদাসের কোনো লেখা আমি পড়িনি, তাঁকে চিনিও না বা তাঁর উপলব্ধির মাত্রা কতখানি তাও জানি না। তাঁর লেখা থেকে যা তুমি উদ্ধৃতি দিয়েছ তাতে সরল বিশ্বাসও বোঝায় কিংবা সর্বেশ্বরবাদের অনুভূতিও বোঝায়; যদি তার থেকেই বোঝাতে চাওয়া হয় যে ভগবান সর্বত্রই বর্তমান সুতরাং সব কিছুই ভালো, সবই যখন ভগবানময়, তাহলে ঐ উদ্দেশ্যে তা বলা যথেষ্ট হলো না। কিন্তু অনুভূতির বেলাতে, এরূপ অনুভূতি পাওয়া বৈদান্তিক সাধনাতে খুব সাধারণ জিনিস---তা ছাড়া বেদান্তের সাধনাই হয় না---এ-অনুভূতি আমি চেতনার বিভিন্ন স্তরে নিজেও পেয়েছি এবং অনেককেই দেখেছি যারা প্রকৃতই এ-অনুভূতি পেয়েছে,---বুদ্ধিগত তত্ত্ব বা বোধ হিসাবে নয় কিন্তু তা নিরেট আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, যা সাধারণ বুদ্ধিতে হয় না বললেও তারা সে কথা মানবে না।

অবশ্য তাতে এমন মানে হয় না যে এখানকার সবই ভালো কিংবা সে

হিসাবে একটা আশ্রমও যেমন ভালো একটা গণিকালয়ও তেমনি ভালো, কিন্তু ওতে এই বোঝায় যে সবই এক অভিব্যক্তির অংশস্বরূপ, আর সাধু-সজ্জনের আভ্যন্তরীণ হৃদয়ে যেমন তেমনি একজন গণিকার আভ্যন্তরীণ হৃদয়েও একই ভগবান রয়েছেন....

১৫-৫-১৯৩৫

প্রাচীন যোগকে ছোটো করা

প্রাচীন যোগ করা খুবই সহজ কথা, তার বিশেষ কোনো মূল্যই নেই এমন কথা বলা, আর বুদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহাজনদের ছোটো করা, এসব কি নিতান্তই অসঙ্গত আচরণ হলো না?

১৪-৪-১৯৩৬

×

বেশ কথা! আত্মার উপলব্ধি ও অহংভাব থেকে মুক্তি, অদ্বিতীয়ের চেতনাই সর্বত্র বোধ করা, বিশ্বগত অজ্ঞানতাকে স্থায়ীভাবে উত্তরণ করা, শাশ্বত অনন্ত পরাৎপরের সঙ্গে চেতনাতে স্থায়ীভাবে মিলিত হওয়া,---এগুলো এমন কিছু নয় যা কাউকে প্রয়াস বা সাধনা করতে বলার মতো---যা "এমন কিছু শক্ত কাজ নয়"!

আর নতুন কিছু নয়? নতুনই বা হবে কেন? কালের হিসাবে যা নতুন নয় কিন্তু যা চিরন্তন সত্য তাকে খুঁজে পাওয়াই তো আধ্যাত্মিক সাধনার উদ্দেশ্য।

প্রাচীন যোগ ও যোগীদের সম্বন্ধে এই চমৎকার মনোভাবটি কোথায় তুমি পেলে? বেদান্তের ও তন্ত্রের যা প্রজ্ঞা তা কি তুচ্ছ সামান্য জিনিস? এখানকার এই আশ্রমের সাধকরা কি তাহলে আত্মোপলব্ধি পেয়ে জীবন্মুক্ত হয়ে গেছে, তারা কি অহং ও অজ্ঞানতা থেকে মুক্তি লাভ করেছে? তা যদি না হয়ে থাকে তবে অমন সব কথা বলেছ কেন---"শক্ত কাজ নয়", "তাদের লক্ষ্য খুব উচ্চ নয়", "দীর্ঘ প্রচেষ্টা দরকার হয় না" ইত্যাদি?

আমি এই যোগকে "নতুন" বলেছি এই কারণে যে এর লক্ষ্য হলো এই

জগতেই ভগবৎ পূর্ণতা, কেবল জগতোত্তরে নয়, আর অতিমানস উপ-লব্ধি। কিন্তু তাই বলে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে হেয় করতে হবে কেন, যা সকল যোগেরই প্রধান লক্ষ্য?

৩-৪-১৯৩৬

শ্রীরামকৃষ্ণের মহত্ত্ব

আমি নাকি এমন কথা বলেছি (আরো একজন উন্নত সাধক বলেছেন) যে শ্রীরামকৃষ্ণ সামান্য মাত্র একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি ছিলেন—এমন ধরনের কথা শুনে আগে আমি আশ্চর্য হতাম, এখন আর হই না। আমি এত রকমের কথা নাকি বলেছি যা আমার মনেও কখনো হয়নি, আর এত রকমেরই কাজ করেছি যা স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি! একদিন হয়তো শুনবো (কোনো উন্নত বা অনুন্নত সাধকের জবানিতে) যে বুদ্ধ ছিলেন ফাঁকিদার বা শেক্‌সপিয়র একজন অতিঘোষিত কবি বা নিউটন ছিলেন প্রতিভাশূন্য কলেজ মাস্টার। এ কথা কি আমার বলা দরকার যে এটুকু আধ্যাত্মিব মূল্যবোধ আমার আছে যাতে অমন ধরনের কোনো কথা আমি ভাবতেও পারি না বলতেও পারি না? রামকৃষ্ণের মহত্ত্ব ও মূল্য যে কতখানি তা আমি আমার " The Synthesis of Yoga "তে বিশদভাবেই বলেছি।

৩-২-১৯৩২

বৈদিক ঋষিরা ও শ্রীঅরবিন্দ

> প্র ঃ আপনার " The Riddle of this world " বই-খানির সমালোচনা ক'রে এক স্বামী মন্তব্য করেছেন যে আপনার এতখানি সাহস যে বলেন বৈদিক ঋষিরা যা করেনি তাই আপনি করেছেন। এর মধ্যে কতটা সত্য?

উ ঃ কেবল আমিই যে তা করেছি এমন নয়। চৈতন্য এবং আরো অনেকে ভক্তির এমন প্রাবল্য এনেছেন যা বেদে কখনো ছিল না; এমনি-

তরো আরো অনেক দৃষ্টান্ত বলা যায়। অতীতে যা ছিল তাকেই আধ্যাত্মিক অনুভূতির চূড়ান্ত সীমা বলতে হবে কেন?

১৯-১২-১৯৩৪

শ্রীঅরবিন্দ ও অতীতের মহাজনেরা

নবজাতির সৃষ্টি কোনো ন্যায়যুক্তি অনুযায়ী হয় না এবং কখনো তা হয়নি। কিন্তু নব সৃষ্টি অযৌক্তিক হবে কেন? আর অতীতের মহাজন-দের পথ ছেড়ে এগিয়ে যাওয়া যদি মারাত্মক কাজ হয়ে থাকে তাহলে বুদ্ধ, শংকর, চৈতন্য প্রভৃতি সকলেই তো তাই করেছেন। তাঁরা আগেকার থেকে নতুন রকমের দর্শন, যোগরীতি, ও ধর্ম সংস্থাপনা করে কি মারাত্মক কাজ করেছেন? অতীতের মহাজনদের গতানুগতিক পথ অনুসরণ না ক'রে তাঁরা নতুন রাস্তা বাৎলাতে গেলেন কেন? অবশ্য তুমি বলতে পারো যে তাঁরা সেই পুরোনো সত্যকেই নতুন রকম ভাবে অভিব্যক্ত করেছেন,— তাহলে তাতে বোঝাচ্ছে এই যে আগেকার লোকেরা সেই সত্যকে বুঝতে পারেনি ভালো ক'রে—সেটা বেঠিক বলা হবে। কিংবা বলতে পারো যে শংকর রামানুজ মাধব প্রভৃতি নতুন যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সেই আগেকার জনদের কথাই পুনরুক্তি করে গেছেন। কিন্তু তাহলে এমন নতুনতরো ভাবে সেই একই কথা বলতে গেলেন কেন? প্রাচীন জিনিসের প্রতি অন্ধ আনুগত্য অতি আশ্চর্য কথা হয়ে যায়। ভগবান অনন্ত, ভগবৎ সত্যও অনন্ত ভাবেই বিকাশপ্রাপ্ত হয়, অন্ততপক্ষে নতুন সত্য আবিষ্কারের ও নতুন অভিব্যক্তির স্থান বরাবরই থাকে, নতুন উপলব্ধিরও সুযোগ থাকে, এমন নয় যে প্রাচীন গুবাকের খোসা ভেঙে নতুন করে আবার সেই জিনিসই চালিয়ে যেতে হবে।

৮-১০-১৯৩৫

কৃষ্ণ ও স্থূলের রূপান্তর

শ্রীকৃষ্ণ কখনো চাননি স্থূলের রূপান্তর আনতে, সুতরাং তাঁর বেলাতে ও প্রশ্ন আসে না।

বুদ্ধ বা শংকর বা রামকৃষ্ণ কেউই দৈহিক রূপান্তরের কথা ভাবেননি। তাঁদের লক্ষ্য ছিল কেবল আধ্যাত্মিক মুক্তি। কৃষ্ণ অর্জুনকে শিখিয়েছিলেন কর্মের দ্বারা মুক্তিলাভ, কিন্তু দেহ রূপান্তরের কথা কখনই বলেননি।

যুধিষ্ঠির নরদেহেতে হিমালয়ে উঠে স্বর্গে গিয়েছিলেন, এটা ঐতিহাসিক সত্য কিনা জানি না। স্বর্গ রাজ্য হিমালয়ে নেই, চেতনার অন্যরূপ স্তরে ও ক্ষেত্রে তার স্থান। সুতরাং ও কথার অর্থ যাই হোক, পার্থিব দেহচেতনার রূপান্তরের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

১-৬-১৯৩৭

কৃষ্ণ এবং অতিমানস

২৪শে নভেম্বর ১৯২৬ তারিখে কৃষ্ণের অবতরণ হয়েছে স্থূল জগতে।

কৃষ্ণ অতিমানসের আলো নন। কৃষ্ণের অবতরণ মানে অধিমানসের দেবতার অবতরণ, যাতে নিজে তাই না হলেও তাতে অতিমানস ও আনন্দের অবতরণের জন্য প্রস্তুতি ঘটায়। কৃষ্ণ হলেন আনন্দময়; অধি-মানসের মাধ্যমে জগতের বিবর্তনকে সমর্থন ক'রে তাকে আনন্দের দিকে পরিচালিত করেন।

২৯-১০-১৯৩৫

শ্রীঅরবিন্দ ও কৃষ্ণ

কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক মহত্ত্বের সঙ্গে আমি নিজের তুলনা করব এটা আশা করতে পারো না। এমন তুলনা করা যেতে পারতো যদি বৈষ্ণববাদী ও অরবিন্দবাদী বলে দুটো আলাদা আলাদা ধর্মসম্প্রদায় থাকতো এবং প্রত্যেকে বলতো যে আমার ভগবানই বড়ো। এখানে সে কথা নয়। আর কোন কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনাতে দাঁড়াবো—গীতাতে যে কৃষ্ণকে বলেছে তিনি পরাৎপর পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, পুরুষোত্তম, জগৎপ্রভু, বিশ্বপ্রভু যিনি সর্বময় বাসুদেব রূপে সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত,—না যিনি অবতার রূপে ছিলেন বৃন্দাবন ও দ্বারকাতে ও কুরুক্ষেত্রে, যিনি আমার যোগের দিশারী হয়েছেন

ও যাঁর সঙ্গে আমি একাত্মতা উপলব্ধি করেছি? এসব আমার কাছে কোনো দার্শনিক বা মানসিক কথা নয়, এ আমার প্রত্যহের প্রতি ক্ষণের উপলব্ধি ও আমার চেতনার অন্তরতম বস্তু। তাহলে কোন দিক থেকে আমি এই তুলনাদ্বন্দ্বের মীমাংসা করব? অমুক ভাবে যে আমি আরো বেশি বড়ো, তুমি ভাবো যে কৃষ্ণের চেয়ে বড়ো আর কিছু হতেই পারে না; প্রত্যেকেরই আপন আপন অভিমত বা বোধ নিয়ে থাকবার অধিকার আছে, তা ঠিক হোক বা নাই হোক। এ কথাকে ঐ পর্যন্তই থাকতে দাও; এর জন্য তোমার আশ্রম ছেড়ে চলে যাবার কোনো কারণ নেই।

২৫-২-১৯৪৫

×

আমি বোধহয় তোমাকে বলেই দিয়েছি যে তোমার কৃষ্ণের দিকে টান হওয়া সাধনার পক্ষে কোনো বাধা নয়। যাই হোক তোমার প্রশ্নের উত্তরে ঐ কথাই স্পষ্ট ক'রে বলছি। যদি ভেবে দেখ যে আমার নিজের সাধনাতে কতখানি প্রধান স্থান কৃষ্ণ অধিকার করেছিলেন, তাহলে তোমার সাধনার বেলাতে যে তা বাধাস্বরূপ হবে এটা আশ্চর্যের কথা। সাম্প্রদায়িকতা কেবল ধর্মের গোঁড়ামি ইত্যাদি, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জিনিস নয়। কৃষ্ণের দিকে একাগ্র হওয়া মানে ইষ্টদেবতার কাছে আত্মনিবেদন। কৃষ্ণে পৌঁছতে পারলে তুমি ভগবানেই পৌঁছবে; তাঁকে আত্মদান করলে তার মানে আমাকেও আত্মদান করা হলো। তুমি যে তা এক ক'রে দেখতে পারছ না, তার কারণ চেতনে বা অচেতনে তুমি চেহারার দিকের কথাই বেশি ভাবছ।

১৮-৬-১৯৪৩

কৃষ্ণ ও খ্রীষ্ট

র যা বলেছেন খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণকে নিয়ে সে সম্বন্ধে আমার কিছু মন্তব্য করা কঠিন। তিনি যে খ্রীষ্টের প্রতি আকর্ষণের কথা বলেছেন তা আমার

কখনো হয়নি, তার কারণ প্রথমত এই যে ইংলণ্ডে কৃশ্চান ধর্মের নিষ্প্রাণ শুষ্কতা দেখে বিরক্তি এসেছিল, আর খানিকটা এই কারণে যে বাইবেল প্রভৃতির বর্ণিত খ্রীষ্ট যদিও অবশ্য জ্যোতির্ময়, কিন্তু তা অপূর্ণ ও ছায়াযুক্ত : অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বা দিব্য মানবের চেয়ে তাঁকে নৈতিক ভাবেই বেশি ক'রে দেখানো হয়েছে। যে খ্রীষ্ট পাশ্চাত্ত্যের সাধুসন্তদের আরাধ্য তিনি হলেন আসিসির সেন্ট ফ্রান্সিসের, সেন্ট টেরেসা প্রভৃতিদের খ্রীষ্ট। তা ছাড়া, কৃশ্চানেরা প্রকৃতই কি খ্রীষ্টকে গভীরভাবে ভালোবেসেছে? খুব কম লোকেই বলে আমার মনে হয়। আর কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই কথা যে খ্রীষ্টের জীবন ও ঐতিহ্য নিয়ে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বিচার করতে যাওয়া সম্ভব নয়। দুজন হলেন দুই বিভিন্ন জগতের। খ্রীষ্টের মধ্যে তেমন কিছু নেই গীতাতে যে সব বিরাট আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও উপলব্ধির শক্তি সম্বন্ধে কৃষ্ণ বলেছেন, প্রতীক হিসাবে বলা গোপীদের সেই প্রেম ও মাধুর্যের কিছু নেই, কৃষ্ণের বহুমুখী অভিব্যক্তির মতো কিছু নেই। খ্রীষ্টের গুণ ছিল অন্যান্য রকমের। দুজনকে পাশাপাশি রেখে ওজন ক'রে দেখার চেষ্টাতে কোনো লাভ নেই। কৃশ্চান মনের এই একটা বিশ্রী দোষ, এমন কি ডক্‌টর স্ট্যানলি জোন্‌সের মতো উদার ব্যক্তির মধ্যেও : সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে বিমুক্ত হয়ে এরা প্রত্যেক ভগবৎ সত্তাকে তাদের আপন আপন আভ্যন্তরীণ জগতে থাকতে দিয়ে যার যেদিকে টান তাকে সেদিকে স্বাধীনভাবে যেতে দিতে চায় না। এইরকম ভুলকে এড়াবার জন্য আমার কোনো লেখাতে আমি এই ধরনের তুলনামূলক কিছু কখনো বলিনি। আমি নিজের পক্ষে নিজের যা ভালো মনে করি—অন্যকে ঠিক সেইরকমই ভাবতে বলতে পারি না।

৪-১-১৯৩৬

পূর্ণযোগের গ্রহিষ্ণুতা

> আমার মনে হয় না যে বেশি সংখ্যক মানুষ পূর্ণযোগ গ্রহণ করতে পারবে।

সংখ্যাতে কিছু যায় আসে না। বৌদ্ধ ও ক্রীশ্চান সংখ্যায় এত বেশি হ'য়েছিল কারণ তাতে বাহ্য জীবনের কোনো পরিবর্তন করতে হয়নি।

যেখানে বৃহত্তর চেতনা বা সত্য চেতনা আসার কথা সেখানে প্রকৃত পরি-বর্তন হওয়াই দরকার।

২৯-৪-১৯৩৪

×

প্রঃ আমাদের যোগের চেয়ে বরং পূর্ব-প্রচলিত সাধন-প্রণালীগুলি থেকেই সাধারণ মানুষ কিছু সদ্যসদ্য ফললাভের আশা করতে পারতো। এই সব সাধনপ্রণালী থেকে অলৌ-কিক ক্রিয়াকলাপাদির সাহায্যে অনেকেই উপকৃত হয়ে থাকবে। আমাদের যোগে তারা দেখতো যে তাদের সেই পথ রুদ্ধ। স্বভাবতঃই এর থেকে তারা সরে যেতো।

উঃ বরং উল্টোটাই ঘটতো। পৃথিবীর উপরে যে একটা বৃহত্তর জ্যোতি আর শক্তি নেমে এসেছে এটা না দেখতে পাওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব হতো।

২৯-৪-১৯৩৪

×

প্রঃ মোটের উপর আমাদের যোগে খুব অল্প লোকেরই কিছু সুযোগ-সুবিধে আছে। পৃথিবীর মানুষের পক্ষে এই জিনিসটির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কঠিন।

উঃ কেমন করে তুমি জানলে যে সাধারণ মানুষের উপরে এর কোনো কার্যকারিতা থাকবে না? এই জিনিসটি অনিবার্যভাবেই তাদের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেবে। এর অর্থ হল পৃথিবীর পক্ষে একটা বিরাট পরিবর্তন।

২৯-৪-১৯৩৪

×

প্রঃ পৃথিবীর মানুষের আত্ম-অভিনিবেশ এত বেশী বলে মনে হয় যে খুব অল্প কয়েকজনই এই যোগ করতে চাইবে। বেশীর ভাগই যাবে (আর যাচ্ছে) পুরনো হঠযোগ আর রাজ-যোগের দিকে কিছু সদ্যসদ্য সন্তোষজনক ফলের সম্ভাবনা আছে বলে। এমন কি ঐকান্তিক সত্য-সন্ধানীদের মধ্যে থেকেও অনেকেই আমাদের রূপান্তর-যোগের সত্যটিকে দেখতে সক্ষম হয় না। আর সাধারণ মানুষ যেমন বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদ, অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবী, এদের কথা বলতে গেলে—এরা যে কোনদিন অধ্যাত্মজীবন গ্রহণ করবে সে সম্ভাবনা তো দেখা যায় না।

উঃ আশা করি তাদের এ যোগ গ্রহণ করতে বলাও হচ্ছে না। কেবল এখনকার তুলনায় একটা উচ্চতর চেতনায় যারা উঠতে চায় তাদের জন্যে একটা পথ খুলে দেওয়া যেতে পারে।

প্রঃ আপনি বলেছেন যে আমাদের যোগের লক্ষ্য হল নির্বাণকে ছাড়িয়ে ওঠা। কিন্তু এমন কি নির্বাণের স্তর পর্যন্ত উঠেছে বা উঠবার চেষ্টা করেছে, এই আশ্রমে পর্যন্ত এমন লোক খুব অল্পই আছে। নির্বাণ পর্যন্ত উঠতে হলেও বাসনা, দ্বিত্বভাব ও অহঙ্কার বর্জন করতে হয় এবং কিছুটা সমতা ও শান্তি অর্জন করতে হয়। এমন কথা কি বলা যায় যে আশ্রমের সাধকদের মধ্যে বহুসংখ্যক এই ব্যাপারে সক্ষম হয়েছে? অন্ততঃ প্রত্যেকেই কিছুটা চেষ্টা তো করেইছে। তা হলে কেন তারা সফল হয়নি? এটা কি এই কারণে যে কিছুদিন পর তারা তাদের লক্ষ্য ভুলে গিয়ে এখানে সাধারণ জীবন যাপন করছে?

উঃ আমার তো মনে হয় যে নির্বাণের আদর্শ তাদের সামনে ধরা হলে অনেকেই তার উপযুক্ত হতে পারতো। কেন না, আমরা যে লক্ষ্য

আমাদের সম্মুখে ধরেছি তার তুলনায় নির্বাণের লক্ষ্য আরো সহজলভ্য, আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারা তাদের পক্ষে খুব কঠিন হতো না। এখানে সব রকমের, সব পর্যায়ের সাধক আছে। কিন্তু যারা বেশ এগিয়ে গিয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও আসল মুস্কিল হল বাইরের মানুষটাকে নিয়ে। প্রাচীন যোগাদর্শের অনুবর্তী যে সব সাধক, তাদের ক্ষেত্রেও, তারা যখন কোনো একটা লক্ষ্যে পৌঁছেছে, তখনো তাদের বাইরের মানুষটা প্রায় একই রকম থাকে। অন্তঃপুরুষ মুক্ত হয় কিন্তু বহিঃসত্তা প্রকৃতির বাঁধা ছকেই চলে। যদি বাইরের মানুষটাও পরিবর্তিত হয় তখনই কেবল আমাদের যোগের সাফল্য আসতে পারে, কিন্তু সেটাই হল সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার। উচ্চতম আলো প্রকৃতির নিম্নতম অংশে নেমে আসার ফলে দৈহিক প্রকৃতির পরিবর্তন হলে তবেই কেবল এটা সম্ভব হতে পারে। এখানেই এখন চলেছে সংগ্রাম। এখানকার সাধকদের অধিকাংশেরই আন্তর সত্তা যতই অপূর্ণ হোক না কেন, তবু সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের একটা পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু বাইরের মানুষটা পুরনো অভ্যাস, পুরনো ধরণধারণ নিয়ে পুরনো খাতেই চলে। এমন কি অনেকেই পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত উপলব্ধি করে না। এই কাজটি সার্থকভাবে করা হলে তখনই কেবল এই যোগের পূর্ণ সাফল্য এই আশ্রমেই আসতে পারে, তার আগে নয়।

৩০-৪-১৯৩৪

চতুর্থ বিভাগ

পার্থিব চেতনার জন্য সাধনা

পার্থিব চেতনার জন্য সাধনা

অতিমানসকে চাওয়ার কারণ

আমার প্রাণশক্তি অমন অহংভাবে কাজ করে না। উচ্চতর সত্যকে আমি চাই, তাতে কাউকে বড়ো করবে কিনা সে প্রশ্ন নয়, কিন্তু মানুষকে সত্যে ও শান্তিতে ও আলোতে রেখে তাদের জীবনকে এই সংঘর্ষময় অজ্ঞান-ময় অসত্যময় ব্যথা বেদনার জীবনের চেয়ে কিছু ভালো করবে কিনা তাই হলো কথা। তাতে যদি মানুষ আগেকার মানুষদের চেয়ে কম মহৎ হয়ে যায় তথাপি আমার উদ্দেশ্য তাতে সিদ্ধ হবে। আমার কাছে মনের শুধু ভাবনাশক্তিই শেষ কথা নয়। আমি জেনেছি যে অতিমানস হলো সত্য বস্তু।

ব্যক্তিগত ভাবে বড়ো হবার জন্য আমি অতিমানসকে নামিয়ে আনতে চাইছি না। মানুষের হিসাবে বড়ো হওয়া বা ছোটো হওয়াকে আমি গ্রাহ্য করি না। আমি কেবল চাই পার্থিব চেতনার মধ্যে কিছু আভ্যন্তরীণ সত্য, আলো, সঙ্গতি, শান্তির ধারা নামিয়ে আনতে; দেখতে পাচ্ছি তা উপরে রয়েছে, কেমন জিনিস তা জানতে পারছি—আমার চেতনার মধ্যে তার জ্যোতির্বিকাশ টের পাচ্ছি—তাই চাইছি তার আপন শক্তিতে তা সমগ্র সত্তাকে অধিকার করুক, যাতে মানুষের প্রকৃতি আর এমন আধা-আলো আধা-অন্ধকারের মধ্যে না থাকে। আমি এ কথা বিশ্বাস করি যে পার্থিব বিবর্তনের শেষ পরিণতিই হবে তাই, এই সত্যই শেষ পর্যন্ত নেমে এসে এখানে দিব্য চেতনার বিকাশের দ্বার খুলে দেবে। আমার চেয়ে মহত্তর ব্যক্তিরা যদি এ দৃষ্টি না পেয়ে থাকেন ও এমন আদর্শ না নিয়ে থাকেন, তথাপি আমি কেন আমার সত্য-বোধ ও সত্য-দৃষ্টিকে অনুসরণ করব না তার কোনো যুক্তি নেই। মানুষের বুদ্ধি যদি বলে আমি নিতান্ত নির্বোধ, যেহেতু কৃষ্ণ যা করেননি তাই আমি করতে চাইছি, তাতে আমার বিন্দুমাত্র যায় আসে না। এখানে অমুক বা তমুক কি বলছে তা নিয়ে কোনো কথাই নয়। কথা কেবল ভগবানকে ও আমাকে নিয়ে—অর্থাৎ ভগবানের তাই

ইচ্ছা কিনা, আমাকে তিনি ঐ অতিমানসের নেমে আসার রাস্তা খুলে দেবার জন্য বা তাই সম্ভব ক'রে তোলার জন্য পাঠিয়েছেন কিনা। সকল লোকেই আমাকে বিদ্রূপ করুক কিংবা এমন ধারণার জন্য নরক পাতই হোক—আমি এ কাজ চালিয়েই যাবো, জিতি কিংবা ডুবি। এই ভাব নিয়েই আমি অতিমানসকে চাইছি, নিজেকে বা কাউকে বড়ো করার জন্য নয়।

১০-২-১৯৩৫

×

আমার সাধনা সম্পর্কে আমার মূল বক্তব্যটা ছিল এই—আমার সাধনা আমার জন্যে নয়, তা হল পৃথিবী-চেতনার জন্যে, আলোর দিকে যাবার একটা দিক্‌নির্দেশ হিসেবে। পৃথিবী-চেতনার মধ্যে যা কিছু সম্ভব বলে আমি দেখিয়েছি—আভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি, রূপান্তর, নতুন সব ক্ষমতার বিকাশ—এগুলি যে অন্যদের পক্ষে গুরুত্বহীন তা মোটেই নয়; এগুলি হল, যা করণীয় তারি জন্যে নানা পথ ও উপায় খুলে দেওয়া। এর মধ্যে মহত্ত্বের পরিমাপের প্রশ্নটি একেবারেই আসছে না।

মে, ১৯৩৩

শ্রীঅরবিন্দের সাধনা ও অবতারবাদ

আমার সাধনা কোনো খাপছাড়া রকমের অলৌকিক মিরেক্‌ল্‌ কিছু নয় যা প্রকৃতির নিয়মের বা পার্থিব চেতনার বহির্ভূত। আমি যদি একটা করতে পেরে থাকি এবং আমার যোগে তা সম্ভব হতে পারে তার মানে একটা করা সাধ্য এবং সুতরাং পার্থিব চেতনাতে সে রূপান্তর আসা সম্ভব।

৯-২-১৯৩৫

×

না, অতিমানস এখনও দেহে বা জড়বস্তুতে নেমে আসেনি,—এমন জায়গাতে এসে রয়েছে যাতে তার নেমে আসা কেবল সম্ভবই নয়, তা

অপরিহার্য। আমি অবশ্য নিজের অনুভূতিতে এ কথা বলছি: কিন্তু আমার অনুভূতি হয়েছে কেন্দ্রস্বরূপ, সুতরাং তাই যথেষ্ট।

আমার মুশকিল এই যে তোমরা চাও পরীকাহিনীর মতো অদ্ভুত ভোজবাজিতে পরিবর্তনটা এসে যাক, এটা বুঝে দেখনা যে আমার সাধনার লক্ষ্য হলো বিবর্তনক্রিয়াকে ঘনীভূত ক'রে যাতে নিচের এবং উপরের ভিতরকার ফাঁকগুলির উপযুক্ত ভরাটের ব্যবস্থা করে কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে যেতে পারে--কিন্তু এমন কোনো হঠাৎ সৃষ্টি নয় যাতে একটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সব কিছু ঘটে যাবে। অতিমানসের প্রণালী হলেও তা অযৌক্তিক প্রণালী নয়। যা করা হবার তা নিশ্চয় হবে--হয়তো তাড়াতাড়িও হবে--কিন্তু তা কার্যকরীভাবেই হবে, আজগুবীর মতো নয়।

১৪-১১-১৯৩৩

×

না, অতিমানস এখনও পর্যন্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়নি, যদিও তা যোগের শক্তিতে হঠাৎ এসে পড়তে পারে। তার প্রমাণ আমি নিজে। সাধারণ চরিত্রের সাধারণ মানুষ কি যোগের দ্বারা নতুন মানুষ হতে পারে না? আমি প্রমাণ করেছি যে তা হতে পারে সাধনার দ্বারা। যদি বলো যে আমি অবতার (!) বলেই তা পেরেছি অন্যের পক্ষে তা অসম্ভব, তাহলে আমার সাধনাও অবাস্তব আর অবতারও অবাস্তব। আমি যোগ করি আমার নিজের জন্য নয়, নিজের কিছুই চাই না, তা করি পার্থিব চেতনাতে একটা পরিবর্তন আনার জন্য। এটা করবার জন্য কি স্বয়ং ভগবানের নেমে আসার দরকার হয়, অথবা এটা কি তাঁর নিজের প্রয়োজনে? তোমার তর্ক এই যে আমি অবতার না হলেও মস্ত বড়ো একজন। তাও যদি হয় তথাপি আমি যা পেরেছি তা মানুষের পক্ষে করা সম্ভব। কোনো রাস্তার ভিখারী তা করতে পারে কিনা সেটা কোনো প্রশ্ন নয়, কিন্তু অন্যের পক্ষে তা সম্ভব।

১০-২-১৯৩৫

×

বলতে চাই যে সব কিছুই সম্ভব—সুতরাং তুমি বলতে পারো না যে ভগবান এটা পারেন না বা ওটা পারেন না। তবে তিনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করেন, বিনা কারণে আপন সর্বশক্তিমত্তা দেখান না। যা কখনো করা হয়নি এমন কিছু তিনি করতে পারেন না বললে পরিবর্তন আসার ও বিবর্তনের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা হয়, ভগবৎ শক্তিকে ও ভগবৎ কৃপাকে অস্বীকার করা হয়, সবই গতানুগতিক হয়ে থাকে। বুঝলে?

আমার ও মায়ের সম্বন্ধে লোকে বলে, "যদি অতিমানস আসে তবে আগে ওঁদের মাধ্যমেই বা আসবে কেন, সরাসরি আসবে না কেন?" এর মধ্যে যুক্তি আছে। কিন্তু তার আসার একটা শর্ত আছে, অজান্তে কারো মধ্যে মিরেক্‌লের মতো এসে পড়তে পারে না—কেউ তা চেষ্টা করতে গেলে ভেঙে পড়তে পারে। দিশারী না নিয়ে যদি সংকীর্ণ দুর্গম পথে পর্বতের চূড়াতে উঠতে যাও তাহলে কিনারা না চিনে হঠাৎ শূন্যের মধ্যে পা বাড়িয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারো।

১৬-২-১৯৩৫

×

আমার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ছিল না, আমি তা অর্জন করেছি। আমি দার্শনিক ছিলাম না, দার্শনিক হয়ে পড়েছি। চিত্রবিদ্যা বুঝতাম না, আমি চিত্রকলা চিনেছি আমার যোগের সাহায্যে। আমার পূর্বেকার প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করতে পেরেছি এক বিশেষ প্রণালীতে। দেখাতে চেয়েছি যে তা করা যায়। আমার নিজের প্রয়োজনে মিরেক্‌লের দ্বারা তা করা হয়নি। তা যদি হতো তাহলে আমার যোগ হতো নিরর্থক, আমার জীবন একটা ভ্রান্তি। তোমরা ভাবো যে এ জিনিস আমি ছাড়া আর কারো প্রয়োজনে লাগবে না—এটা আমার কাজের একটা মারাত্মক বিচার। আর এ কাজ আমি এই অরবিন্দও করেনি। কৃষ্ণের ও ভগবৎ আদ্যাশক্তির সাহায্যেই তা হতে পেরেছে তা ছাড়া মানুষের কাছেও সাহায্য পেয়েছি।

১৩-২-১৯৩৫

×

অবতারদের কথা জানিনে। কার্যতঃ যেটুকু জানি তা হল এই যে শুরুতে আমার প্রয়োজনীয় সব ক্ষমতা ছিল না, যোগের সাহায্যে সেগুলিকে বাড়াতে হয়েছে, অন্ততপক্ষে আরম্ভে আমার মধ্যে এদের অনেকেরই অস্তিত্ব ছিল না, তাদের ও উঁচু পর্দায় চড়িয়ে নেবার চর্চা করতে হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার নিজের ধারণা, অবতারের জীবন ও কর্ম অলৌকিক কিছু নয়। তা যদি হতো তাহলে তাঁর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বৃথা হয়ে যেতো, তা হতো প্রকৃতির একটা অদ্ভুত খেয়াল। তাঁকে পার্থিব অবস্থাগুলি মেনে নিতে হয়, উপায় উদ্ভাবন করতে হয়, মানুষকে তিনি পথ দেখান ও সাহায্য করেন। তা না হলে তাঁর প্রয়োজনটাই বা কি আর কেনই বা তিনি এখানে আছেন?

আমি বরাবরই অধিমানসে ছিলাম না, যদি দয়া করে বোঝো কথাটা। মন ও প্রাণের স্তর থেকে সেখানে আমায় উঠতে হয়েছে।

১৩-২-১৯৩৫

×

অবতার সম্বন্ধে যা বলেছি তা মনে রেখো। ওর মধ্যে দুটো দিক আছে, এক হলো ভগবৎ চেতনা, আর এক যন্ত্রস্বরূপ ব্যক্তিবিশেষ। ভগবৎ চেতনা সর্বশক্তিমান কিন্তু আধার রয়েছে প্রকৃতির মধ্যে, তাই বুঝে তাকে চলতে হয় যদিও প্রকৃতির নিয়মকে সে লঙ্ঘন করে। অবতার খাপছাড়া জিনিস নয়। তারও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শক্তিবিকাশ করতে হয়, এই কথাটাই আমি মানি।

১৩-২-১৯৩৫

×

আমি কেমন করে লোকেদের বাছাই করি সে বিষয়ে কখনো কিছু বলিনি। আমি কেবল এই যুক্তিরই উত্তর দিচ্ছিলাম যে প্রকাশিত জগতে যা কোনোদিন ছিল না, আজও নেই, তা কোনোদিন আসতেও পারে না। স্পষ্টতঃই আমাদের আলোচনায় এইটিই ছিল বিচার্য বিষয় যে এখনো যা প্রকাশিত হয়নি ভগবান তার প্রকাশ করতেও পারেন না, এমন কি তিনি এ কাজে অক্ষম। পর্বেই যা প্রকাশিত হয়েছে কিম্বা তিনি যে ক্ষেত্রের

(ব্যক্তির) উপরে কাজ করছেন সেই ক্ষেত্রেই যা নিহিত আছে কেবল তারই বিকাশ তিনি করতে পারেন। আমি বলি---না, তিনি নতুন জিনিসও আনতে পারেন। তিনি বিশ্বের মধ্যে থেকে নিয়ে আসতে পারেন কিম্বা বিশ্বাতীত থেকে নামিয়েও আনতে পারেন। কেন না, বিশ্বব্যাপী আর বিশ্বাতীত ভগবানের মধ্যেই সব কিছু আছে। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি কাজটি করবেন কি না সে একেবারেই ভিন্ন ব্যাপার। এই যে "পারেন না, পারেন না"---বাদ দিয়ে লোকেরা উন্নতির সব সম্ভাবনা বন্ধ করে দিতে চায় তার বিরুদ্ধেই আমি আমার যুক্তি প্রয়োগ করেছি।

১৫-২-১৯৩৫

×

আমি যা কিছু লিখেছি তা প্রমাণ করতে নয় যে আমি একজন অবতার! তুমি ব্যক্তিগত প্রশ্নটাই ধরছো, কিন্তু আমি বলেছি সাধারণভাবে। আমি ভগবত্তার কিছুটা অভিব্যক্ত করতে চেষ্টা করছি, যা আমি অনুভব করতে পেরেছি---তাতে আমি অবতার হই বা না হই তা নিয়ে কিছুই যায় আসে না। আমি সেই ভগবৎ চেতনাকে বাইরে এনে চারিদিকে ছড়াতে চাই যাতে অন্যেরাও তা গ্রহণ করতে বোধ করতে পারে।

৮-৩-১৯৩৫

শ্রীঅরবিন্দ ভগবৎ অবতার

প্র : আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনি ভগবৎ অবতার। সেটা কি ঠিক নয়?

উ : তোমার বিশ্বাস নিয়ে চালিয়ে যাও---তাতে তোমার কোনো ক্ষতি করবে না।

১২-৮-১৯৩৫

অতিমানসপ্রাপ্তির শর্ত

আমি কেবল নিজের জন্য অতিমানস চাইছি না——নিজের জন্য আমার কোনো কিছুই দরকার নেই, মোক্ষও নয় অতিমানসও নয়। আমি তা চাইছি কারণ পার্থিব চেতনার জন্য তাকে আনা দরকার, আর আমার দ্বারা যদি তা না হয় তাহলে আর কারো দ্বারা তা হবে না। আমার মধ্যে তা হলে এমন একটা চাবি মিলবে যাতে ওর দ্বার খুলে গিয়ে পার্থিব চেতনাতে ওর প্রবেশ ঘটবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমার মধ্যে অতিমানসপ্রাপ্তি হলে সকলের মধ্যেই তাই হবে। যারা ওর জন্য প্রস্তুত হবে এবং যখন হবে তখন তাদের মধ্যে তা হতে পারবে——আমার হওয়া তাতে যথেষ্ট সাহায্য করবে। সুতরাং তোমরা অবশ্যই আস্পৃহা করতে পারো, কিন্তু কতকগুলি শর্তে——

(১) তুমি একে নিতান্তই ব্যক্তিগত লাভের ব্যাপার করবে না কিংবা নীট্‌সেবাদের মতো নিজেকে অতিমানব ক'রে তুলতে চাইবে না।

(২) এ জিনিস অর্জন করতে যা কিছু অবস্থার ভিতর দিয়ে যা কিছু ধাপ অতিক্রম করতে হবে তার জন্য তুমি প্রস্তুত থাকবে।

(৩) তুমি ঐকান্তিক হয়ে একে ভগবৎ সাধনার অংশ স্বরূপ জ্ঞান ক'রে নিজের মধ্যে ভগবৎ ইচ্ছা পূরণের জন্য আকিঞ্চন করবে তা যেমন প্রকারেই হোক, চৈত্যগত বা অধ্যাত্মগত বা অতিমানসগত ভাবে। একে তোমার ব্যক্তিগত সুযোগ বা ব্যক্তিগত প্রাপ্তি না ভেবে জানবে যে ভগবানের ইচ্ছা জগতে এই ভাবে সাধিত হচ্ছে।

এপ্রিল ১৯৩৫

×

এ কথা সত্যি যে আমি অতিমানসকে চাই পৃথিবীর জন্যে আর পৃথিবীতে যে সব আত্মা জন্মেছে তাদের জন্যে, আমার নিজের জন্যে নয়; তাই কেউ যদি অতিমানসকে চায় আমি তাতে নিশ্চয় আপত্তি করতে পারিনে। তবে জিনিসটা সর্ত-সাপেক্ষ। প্রথমে ভগবৎ-ইচ্ছাকেই তার চাইতে হবে, পরে চলার পথে আত্মার সমর্পণ আর কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও নিজের সর্বাঙ্গীন পূর্ণতার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি। ১৫-৪-১৯৩৫

শ্রীঅরবিন্দ ও অতিমানব

নিজেকে অতিমানব বলেছি বলে আমার মনে হয় না। অবশ্য আমি সাধারণ মানব মনের স্তরের উপরে উঠতে পেরেছি, নতুবা অতিমানসকে দেহগত ক'রে নামিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করার কথা ভাবতেই পারতাম না।

১৫-৯-১৯৩৫

পার্থিব আনন্দ

আমার নিজের অনুভূতি কেবল 'জ্যোতির্ময় শান্তিতেই' সীমাবদ্ধ নয়। আমি ব্রহ্মানন্দ থেকে শারীর আনন্দ পর্যন্ত সব রকম আনন্দ প্রাবল্যের কথা জানি, যেটা খুশি যে কোনো সময়ে পেতে পারি। কিন্তু এ সম্বন্ধে যা কিছু বলার তা আমার কাজ শেষ হবার পরে বলতে চাই---কারণ উপরে যেখানে আনন্দ সর্বদাই বিরাজিত সেখানে যাওয়া নিয়েই নয় কিন্তু এখানে চেতনাকে রূপান্তরিত করার মধ্যেই আমি তার স্থায়িত্বের ভিত্তি গড়তে চাই।

মানবতা ও শ্রীঅরবিন্দের কর্ম

তুমি নিশ্চয়ই এটা ভুল ধারণা করে নিয়েছ যে দরিদ্রের দুঃখ দূর করবার জন্যই আমরা আধ্যাত্মিক প্রয়াস করছি। আমি কখনই তা করিনি। বর্তমান মানবের কাঠামোতে যে সামাজিক ব্যাপার রয়েছে তার মধ্যে আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আমি চাই এমন উচ্চ ধরনের আধ্যাত্মিক আলো এবং শক্তিকে নামিয়ে আনতে যাতে পার্থিব চেতনা সম্পূর্ণ বদ্‌লে যাবে।

২২-১২-১৯৩৬

×

বিবেকানন্দ থেকে আমি যা উদ্ধৃতি করেছি তা ঠিক মানবপ্রেমিকতার

কথা নয়। তুমি লক্ষ্য ক'রে দেখবে যে ওর মধ্যে দরিদ্র ও পাপী ও অপ-রাধী নারায়ণের কথা নেই। ওতে আছে সর্ব জগতের ভগবানের কথা, যিনি গীতার সর্বভূতানি। তার মধ্যে কেবল মানবই নয়, আর দরিদ্র ও দোষী তো নয়ই, কারণ যারা ভালো এবং ধনী তারাও ওর অন্তর্গত, আর যারা ভালও নয় মন্দও নয় ধনীও নয় দরিদ্রও নয় তারাও। তা ছাড়া আমার বক্তব্যের মধ্যে মানব সেবার কোনো প্রশ্নই নেই এবং দরিদ্রের সেবাও নেই। আগেকার দিনে আমার দৃষ্টিভঙ্গী মানবজাতির দিকে থাকলেও মানবপ্রেমিকতার দিকে ছিল না——যদিও তার কিছুটা হয়তো 'আর্য' পত্রিকায় আমার উক্তির মধ্যে এসে গেছে। কিন্তু এখন আমার দৃষ্টিভঙ্গী "মানবজাতির জন্য" বদ্‌লে গিয়ে হয়েছে "ভগবানের জন্য আমাদের যোগ"। ভগবান বলতে কেবল বিশ্বোত্তরকেই বোঝায় না, বিশ্বগত এবং ব্যক্তিগত-কেও বোঝায়——কেবল নির্বাণ ও পরাৎপরের অবস্থাই নয় কিন্তু জীবনকে নিয়েও সর্বাবস্থা। সেই দিকেই আমি সর্বদা ঝোঁক দিয়ে থাকি।

২৯-১২-১৯৩৪

×

মৃত ধারণাগুলিকে বর্জন করতে ক যে উপায়ের কথা বলেছেন তার সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু বলতে পারি না। প্রত্যেক মনেরই ক্রিয়ারীতি স্বতন্ত্র। আমার পদ্ধতি হলো পূর্ব অবস্থাকে সংশোধন ও পুনর্বিন্যাস ক'রে নেওয়া, যাকে বলা যেতে পারে বোধিমূলক বিচারণা ও নির্বাচনের পদ্ধতি। আগের দিনে "মানবতা" জিনিসটাকে খুব বড়ো স্থান দিয়ে তেমনি কতকগুলি ধারণা ক'রে রেখেছিলাম, পরে সেগুলিকে সংশোধন করার দরকার হলো। কিন্তু সংশয়ের দ্বারাতে সে পরিবর্তন এলো না, কিন্তু এমন এক নতুন আলো পেলাম যাতে ঐ "মানবতা" আপনা হতেই স্বস্থানে নেমে গিয়ে সব কিছু যথাস্থানে পুনর্বিন্যাস করা হলো। কারণ হয়তো এই যে আমি স্বভাবতই কিছু কুঁড়ে (চিঠি লেখার বর্তমান তৎপরতা সত্ত্বেও) আর আমি তাই সব চেয়ে সহজ ও স্বয়ংক্রিয় রাস্তাটাই পছন্দ করি। কিন্তু তবু সন্দেহ হচ্ছে যে ক'এর প্রণালী ও আমার প্রণালী প্রায় একই, কেবল তাঁরটা আরো জোরদার ও বেশি সচেতন। তিনি যে বলেছেন ধারণাগুলো পথের পতাকা মাত্র, চলার উপায় নয়, তাতেই তা বোঝায়।

২৬-১০-১৯৩৪

প্রেমের বোঝা

আমাকে যে বোঝা বইতে হয় তা কেবল দিব্য প্রেমের দ্বারাই সম্ভব, যা প্রত্যেককেই বইতে হয় যারা সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে একমাত্র লক্ষ্য নিয়েছে যাতে এই পৃথিবীকে অন্ধকার থেকে ভগবানের দিকে ওঠাতে পারে। গ্যালিওর মতো সেই "থোড়াই কেয়ার করি" মন্ত্রে আমার কোনো কাজ হবে না; সেটা দিব্য কিছু তো হবেই না। একটা অন্যরকমের এমন কিছু আছে যার জোরে আমি কোনো দুঃখ গ্রাহ্যমাত্র না ক'রে বা কাঁদুনি না গেয়ে সটান আপন লক্ষ্যের দিকে চলি।

এপ্রিল ১৯৩৪

আমি যে সাধারণ মনের ভাষাটা ব্যবহার করি তার কারণ অন্য কোনোরকম ভাষাতে বললে মানুষ তা বুঝতে পারবে না—যদিও এ ভাষাও অধিকাংশ লোকে বেঠিক ভাবে বোঝে। আমি যদি জয়েসের ধরনে অতি-মানসের ভাষা ব্যবহার করতাম, তাহলে তা বোঝবার কল্পনাও করতে পারতে না; কিন্তু আমি তাঁর মতো আইরিশম্যান নই, কাজেই সে চেণ্টা করি না। তবে অবশ্য একটা কথা, পাথিব প্রকৃতিকে যে কেউ বদ্‌লাতে চাইবে তাকে প্রথমে সেই প্রকৃতিকে মেনে নিতে হবে, তবেই তার মাধ্যমে সে কাজ হতে পারবে। আমার কবিতাতে তাই লিখেছি—

স্বর্গকে যে নামাতে চায়
নিজে সে নামুক কর্দমেতে,
পৃথিবীর বোঝা মাথায় নিয়ে
চলতে হবে কাঁটার পথে....

২৫-৮-১৯৩৫

নরকে নামা

না, স্বর্গ নিয়ে আমি এখন ব্যস্ত নই: হলে তো ভালোই হতো। কিন্তু

বরং আমাকে ওর উল্‌টো প্রান্তে নরকের মধ্যে নেমে পড়তে হচ্ছে, যাতে দুই প্রান্তের মাঝে একটা সেতু গড়তে পারি। এটা যখন আমার কাজের অন্তর্গত তখন তা করতেই হবে।

৩০-৫-১৯৩৬

বিপত্তির দ্বারা সহায়তা

বিশ্বাসের কথা বলেছ, যেন আমার কখনো কোনো সন্দেহ কিংবা বাধা ছিল না। মানুষের মন যতখানি ভাবতে পারে তার চেয়ে ঐসব অনেক বেশি আমার হয়ে গেছে। আমি বাধাকে এড়িয়ে গেছি তা নয়, আমি সু-স্পষ্ট ভাবে তা এত বেশি দেখেছি এবং ভোগ করেছি যা এখন বা এর আগে কেউ কখনো ভোগ করেনি, আমি সেই সব কিছুরই সম্মুখীন হয়ে তার ওজন বুঝেছি, তবেই আমার কাজের সাফল্য সম্বন্ধে আমি সুনিশ্চিত হয়েছি। কিন্তু তবুও যদি দেখতাম যে কিছু হবার নয় (যা অসম্ভব) তথাপি আমি অবিচলভাবে লেগে থাকতাম, কারণ আমি জানতাম যে আমার যা করণীয় ছিল তা আমি সাধ্যমত ভাবে করেছি, আর হিসাবমতো বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তার কিছু ফল আছেই। কিন্তু তাই বা আমি ভাবতে যাবো কেন, যখন আমি চোখের সামনে দেখছি যে প্রতি সপ্তাহে প্রতিদিনের প্রতি পদক্ষেপ আমাকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে—আগে ছিল প্রতি বছরে ও প্রতি মাসে, এর পর হবে প্রতি দিনের প্রতি ঘণ্টাতে—নিয়ে চলেছে আমার লক্ষ্যের কাছাকাছি? পথের মাথায় রয়েছে বৃহতের আলো, তাতে প্রত্যেক বাধা বিপত্তিও সহায়তার কাজ করে, আর স্বয়ং রাত্রির অন্ধকারও ভবিষ্যৎ আলোর সম্পদ বহন করে।

ডিসেম্বর ১৯৩৩

সংগ্রাম ও সংঘর্ষের জীবন

এসব আবার কি অদ্ভুত ধারণা!—যে আমি নাকি অতিমানসের ধাত নিয়েই জন্মেছি, আমাকে নাকি কোনো কঠোর বাস্তবের পরিচয় পেতে

হয়নি! হায় ঈশ্বর! আমার সারা জীবনটাই তো কঠোর বাস্তবের সঙ্গে লড়াই, ইংলণ্ডে থাকতে খাদ্যাভাব ও কঠিন দুঃখকষ্ট ও নিত্য বিপদের সম্মুখীন হওয়া থেকে শুরু ক'রে এই পণ্ডিচেরিতে এসে আরো অনেক বেশি বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ উভয় রকমের বিপত্তি নিত্য ভোগ করতে থাকা পর্যন্ত। আমার জীবন ছেলেবেলা থেকেই একটা সংগ্রাম এবং এখনও তাই; আমি যে উপরতলার ঘরে বসে আধ্যাত্মিক পথে সে লড়াই ক'রে যাচ্ছি এবং বাহ্যভাবেও তা হচ্ছে, এতে লড়াইএর গুরুত্ব কিছু বদলাচ্ছে না। তবে এই সব কথা নিয়ে আমরা কোনো চেঁচামেচি করিনি, তাই সকলে স্বভাবতই ভেবে নেয় যে আমি মহামহিম জ্যোতির্মণ্ডিত কমলভোজী স্বপ্নজগতে বাস করছি যেখানে জীবনের বা প্রকৃতির কোনো কঠিন ব্যাপার ঢুকতেই পারে না। কিন্তু এ কী তোমাদের ভ্রান্তি!

×

তোমরা ভাবো যে আমি (মায়ের কথা বাদ দিয়ে) কখনো কোনো সন্দেহ বা হতাশা ভোগ করিনি, ঐ ধরণের কোনো বিপত্তি আমার ঘটেনি। কিন্তু মানুষে যত রকমের আক্রমণ সইতে পারে সবই আমি সয়েছি, নতুবা তোমাদের বলতে পারতাম না যে ওগুলোকেও জয় করা যায়। তা বলবার অধিকারই হতো না। তোমার যা মনস্তত্ত্ব তা অনমনীয়। ভগবান যখন পার্থিব প্রকৃতির ভার গ্রহণ করেন তখন তা পুরোপুরিই করেন, তার মধ্যে কোনো ফাঁকি থাকে না। তিনি যখন এমন কিছু আনেন যা পশ্চাতে আবরণ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন তা সেই জিনিসই হয় যা অন্যেদের মধ্যেও রয়েছে—সেই জিনিসকে জাগিয়ে তুলতেই তিনি আসেন। মানুষের চৈত্য-সত্তাও তাই করে যারা আধ্যাত্মিক পথের জন্য নির্দিষ্ট তাদের মধ্যে—তারা কোনো অসাধারণ সত্তা নয়। তোমরা এই ভুলটাই করো যে তারা সব অসাধারণ ব্যক্তি, যেন মস্ত কেউ ভিন্ন আধ্যাত্মিক হয় না।

৮-৩-১৯৩৫

বিপজ্জনক জীবন

প্রত্যেকের মধ্যেই একজন ভীরু আছে—বিশেষত যে "নিরাপত্তা"য় থাকতে চায়, সেটা সাহসের পরিচয় নয়। আমিও চাইতাম নিরাপত্তা পাবার হলে—কিন্তু তার বদলে আমি বিপজ্জনক জীবনই গ্রহণ করেছি এবং —এর মতো আমার ভক্তদের সেই বিপজ্জনক পথে টেনে এনেছি।

৫-১-১৯৩৫

ঝড়ঝাপটা ও সূর্যালোকদীপ্ত পথ

এই ধরনের আরো বিরুদ্ধ আক্রমণ আমিও পছন্দ করি না। ইচ্ছাতে না হলেও দায়ে পড়ে আমাকে বীর যোদ্ধা হতে হয়েছে—সংগ্রামাদি আমি ভালোবাসি না, অন্তত সূক্ষ্মের স্তরে নয়। সূর্যালোকদীপ্ত পথের কথা আকাশকুসুম হতে পারে—যদিও জানি তা নয়—কারণ আমি অনেককে বছরের পর বছর তেমনি পথেই চলতে দেখেছি; যাই হোক তবু স্বাভাবিক রকম খানিকটা পর্যন্ত দুর্যোগের উপর দিয়ে যাওয়া, প্রবল ঝড়ঝাপটা না হয়ে, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব—এমন বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। দুর্গম পথস্তাৎ কথাটা যদিও মিথ্যা নয় আর লয় বা নির্বাণের পথ তো খুবই কঠিন (যদিও আমার বেলাতে ইচ্ছা না করেই নির্বাণে পৌছলাম কিংবা নির্বাণই আমাকে না জানিয়ে আমার মধ্যে চলে এলো, আমার যোগ জীবনের আরম্ভের কিছু আগে)। কিন্তু এ পথে মাঝে মাঝে প্রবল ঝড় উঠে থামিয়ে দেওয়া জিনিসটা না হওয়াই উচিত, যদিও অনেকের তাই হয় দেখছি। তথাপি তারাও যদি জোর ক'রে লেগে থাকে, তাহলে কিছু পরে সে ঝড় কমে যায়, বা থেমে যায় বা তা বারে কম হয়। সেইজন্যই তোমাকে আমি বার বার বলি লেগে থাকতে—তাতে ওটা কেটে যেতে বাধ্য। কতকগুলি সাম্প্রতিক আশ্চর্য দৃষ্টান্তের কথা আমি জানি, যেখানে বছরের পর বছর এমনি প্রবল ঝড়ে কষ্ট পেয়ে এই ভাবে তা থেমে এসেছে।

১১-২-১৯৩৭

শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের মন্ত্র

সাধনার পথে অন্ধকার, হতাশা ও নিরুৎসাহ আসা বরাবরই আছে—প্রাচ্য বা প্রতীচ্য সকল রকম যোগেই তা যেন নির্ধার্য। আমার নিজের বেলাতেও তা হয়েছে জানি—যদিও আমার অভিজ্ঞতা থেকে এই ধারণা জন্মেছে যে তা নিতান্ত অপরিহার্য নয়, ইচ্ছা করলে ওগুলোকে এড়ানো যায়। তাই যখনই দেখি তোমার বা আর কারো মধ্যে ঐ ভাব এসেছে তখনই তোমাদের সামনে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের মন্ত্র তুলে ধরি। তবুও যদি আসে, তবে যত শীঘ্র সম্ভব তা কাটিয়ে উঠে আবার সূর্যালোকে ফিরে যাওয়া চাই।

৯-৪-১৯৩০

×

> প্র ঃ। আনন্দ নেই, উৎসাহ নেই, লেখাপড়া করতে পারি না। মরা মানুষের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার দুঃখটা বুঝলেন? এমন কি আপনার হয়েছে?

উ ঃ। বুঝতে পারছি, আমার প্রায়ই অমন যথেষ্ট হয়েছে। তাই আমি সকলকে বলি জোর ক'রে স্ফূর্তি-আনতে। যতটা পারো স্ফূর্তি এনে বলতে হবে—"রোম নগর একদিনে গড়ে ওঠেনি।" যদি তা না পারো তো মনমরা হয়ে কাটিয়ে দাও যতদিন না সূর্য ওঠে আর পাখিরা আনন্দে ডেকে ওঠে আর সব বাধা ঘুচে যায়।

তোমার বোধহয় বৈরাগ্যের শিক্ষা হচ্ছে। বৈরাগ্য আমি পছন্দ করি না, কিন্তু আংশিকভাবে তা নিতে হয়েছিল, তার পরে ওর চেয়ে ভালো "সমতার" রাস্তা খুঁজে পেলাম। সমতা অবশ্য বৈরাগ্যের চেয়ে কঠিন জিনিস, তবে বৈরাগ্যে মনমরা ক'রে দেয় ও তাতে প্রচুর অস্বস্তি হয়।

৩-৬-১৯৩৬

শত্রুতার বাড়াবাড়ি

শক্তি ও শুদ্ধিলাভের কথাটা ভুলবোঝা নয়, তা প্রকৃত জিনিস। কিন্তু প্রাণসত্তা ওতে উৎসাহিত হয়ে বলে "তবে বিপদ কেটেছে", সে কথা ঠিক নয়, বরং বলা দরকার "এবার শীঘ্র বিপদ কাটবে"। কারণ ঠিক ঐ সময়ে দুর্দান্ত বিরোধী এসে প্রকৃতির দুর্বল অংশটা ধরে নাড়া দেয়, তাতেই এমন মারাত্মক হয় যে বুঝতে হয় এখনও সব কাটেনি। আমার নিজের বেলাতে এমন ব্যাপার অসংখ্যবার হয়েছে। আমাদের বিবর্তনমুখী প্রকৃতির জটিলতা ও মন্থরতার জন্যই তা হয়, যোগ তাকে কাটিয়ে দিতে পারে কিন্তু এক ঘায়ে নয়। কিন্তু এগুলো যা হয় তা প্রকৃতির ত্রুটির অনুপাতে অনেক বেশি বাড়াবাড়ি করার মতো। সুতরাং তাই দেখেই নিরুৎসাহ হয়ে না পড়ে শত্রুতার বাড়াবাড়ির মাত্রা কতখানি তা দেখে তাকে সার্থকভাবে ব্যর্থ ক'রে দিতে হবে, অপরপক্ষে নিজের বেলাতেও বাড়াবাড়ি ক'রে এমন কথা ভাববে না যে পুরোপুরি তুমি সব কিছু জয় করেছ, আর সকল বাধা একেবারে কেটে গেছে।

২৪-৬-১৯৩৬

প্রাণসত্তার তৎপরতা প্রকাশ

প্রাণসত্তা হঠাৎ খুব তৎপর হয়ে ওঠার কথা যোগের ক্ষেত্রে যথেষ্টই জানা আছে, ওতে প্রমাণ হয় না যে তুমি নেমে গেছ, কেবল এই প্রমাণ হয় যে পার্থিব প্রাণপ্রকৃতির মূল প্রবৃত্তিগুলির সঙ্গে এখন পরিচয় মাত্র নয়, তার সঙ্গে হাতাহাতি লেগেছে। আমি নিজেও অনেক উপরে উঠে যাওয়রে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি যথেষ্ট হবার পরেও এক সময় এমন অভিজ্ঞতা পেয়েছি, যে সব জিনিস আগে কখনো ছিল না এবং বিশুদ্ধ যোগের জীবনে যা একেবারেই থাকার কথা নয় তেমন প্রবৃত্তিও বেরিয়ে এসেছে। এগুলো আসবেই কারণ এরা আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে চেয়ে লড়াই শুরু করে—এ কেবল তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, আর এর আক্রমণ হচ্ছে তোমার ব্যক্তিগত প্রকৃতি "খারাপ" বলেও নয়। বোধ করি দশ জনের মধ্যে সাতজন সাধকের মধ্যেই এ ব্যাপার হয়ে থাকে। পরে যখন এগুলি দেখে

যে এদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলো, অর্থাৎ সাধককে তার সাধনা থেকে হটাতে পারলে না, তখন ও সব মিলিয়ে যায় এবং পরে আর কোনো গণ্ডগোল হয় না।

২৪-৬-১৯৩২

ক্রোধের উদয়

এই পিছু হটা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই। ক্রোধের অভাব আমার নিজেরও বৈশিষ্ট্য ছিল যোগের পথে আসার আগেকার যুগে। যোগের একটা বিশেষ পর্বে এই জিনিসটা একেবারে অগ্ন্যুৎপাতের মত আমার মধ্যে জেগে ওঠে আর এটাকে দূর করতে আমার অনেকদিন সময় লাগে। আমি অতীতের একটা বিশেষ পর্বের কথাই বলছি, অবচেতন সম্বন্ধে বলতে পারি-নে। জিনিসটা নিশ্চয় বিশ্বপ্রকৃতি থেকেই এসে থাকবে।

৫-৮-১৯৩৬

সাধনায় পতন

প্র ঃ। কোনো ভুল না করেও হঠাৎ পতন—কেন এই ভ্রষ্টতা?

উ ঃ। সবারই পতন হয়। সাধনার সময় আমারও হাজারবার পতন হয়েছে। কী সব গোলাপ-পাঁপড়ি-রাজকুমারী সাধকেরা আমার!

২-৪-১৯৩৭

সাধনার সাময়িক বিরতি

সাধনার পক্ষে সব চেয়ে খারাপ জিনিস হলো মনমরা হয়ে কেবল যত নিম্নশক্তিদের আক্রমণ প্রভৃতি নিয়েই ভাবতে থাকা। সাধনা যদি

কিছু সময়ের জন্য থেমেও যায়, তা হোক, তুমি নীরব হয়ে সাধারণ কাজ-গুলো ক'রে যাও, বিশ্রাম দরকার হলে বিশ্রাম করো,—দেহচেতনা প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আমার সাধনা যখন তোমার চেয়ে অনেক বেশি দূর এগিয়েছিল তখনও তা ছয় মাসের মতো থেমে গিয়েছিল। তা নিয়ে আমি কোনো উচ্চবাচ্য করিনি, বিরতির সময়টা না কাটা পর্যন্ত চুপচাপ ছিলাম।

৮-৩-১৯৩৫

বার্গসন পদ্ধতির সংশোধন

> প্রঃ। বার্গসন লিখেছেন যে জীবনের উন্নতির পদ্ধতিই হলো মাঝে মাঝে বিলক্ষণ বেগ পাওয়া তার পর খানিক-টা ফুটে ওঠা। ঐ মান্য দার্শনিক যা বলেছেন আমরাও তো তেমনি ভাবে নানা বেগ ও সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে আনন্দের দিকে চলেছি, এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

উঃ। হুঁ! পদ্ধতিটার কথা ভালোই বলেছেন, কিন্তু জীবনের মধ্যে আর এই আশ্রমেও ও জিনিস এতই বেশি যে আমি ওর চেয়ে অন্যরকম কিছু অ-বার্গসনীয় বিবর্তন পদ্ধতির জন্য আকিঞ্চন করি। প্রভু ভগবান ও বার্গসন যদি দুজনে মিলে অমন পদ্ধতি ছকে রেখে থাকেন, তবে আমি ওর সংশোধনের প্রস্তাব করি।

তারিখ দিয়ে বলা সম্ভব নয়

রবীন্দ্রনাথ আমার সম্বন্ধে দুই বছরের কথা বলেছেন শুনে আশ্চর্য হচ্ছি; নিশ্চয় তিনি আমার কথা ভুল শুনেছেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে এখানে থেকে আভ্যন্তরীণ সাধনার ভিত্তি সম্পূর্ণরকম স্থাপিত হলে তখন আমি আত্মপ্রকাশ করব, কিন্তু তা কোনো তারিখ দিয়ে বলিনি। ব'কে অনেক আগে চিঠিতে লিখেছিলাম দুই বছরের কথা, কিন্তু তখনকার

দৃষ্টিতে কাজের পরিধির ধারণা এখনকার চেয়ে অনেক কম ছিল—এখন তারিখ বলা সম্বন্ধে খুব সতর্ক হতে হয়েছে। কেবল দুই জায়গা ভিন্ন আর কোথাও সময় নির্দেশ করা যায় না—এক হলো জড়বস্তুর ব্যাপারে যেখানে অংকের হিসাব ঠিক থাকে, আর হয় অতিমানসে যা দিব্য নিশ্চয়তার ক্ষেত্র। মাঝখানকার স্তরে যেখানে জীবনের ধাক্কা খাওয়া বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়ে যেতে হয় সেখানে সময় ও শক্তিক্রিয়ার কোনো ঠিকঠিকানা নেই, সেখানে নির্দিষ্ট ক'রে কোনো তারিখ বা প্রোগ্রাম দিতে গেলেই হোঁচট খেতে হবে।

১৬-৮-১৯৩১

হতাশাজনক জগতাবস্থা ও নতুন সৃষ্টি

> প্রঃ। জগতের অবস্থা দেখে আমি বিভ্রান্ত। চতুর্দিকেই কেবল দুর্গতি, লোকে বিশ্বাস পর্যন্ত হারিয়েছে, এমন কি রবীন্দ্রনাথ রাসেল ও রোলাঁ প্রভৃতি বড়ো বড়ো জ্ঞানীরাও চাইছেন যে এ-যুগ শেষ হয়ে যাক। এমন অধঃপতন কেন হচ্ছে? আমার ভয় হয় শেষে আপনি আর শ্রীমাও এই দুর্বহ জগৎকে এই অবস্থাতেই ফেলে রেখে পাছে কোনো জগতোত্তর সমাধিতে প্রয়াণ করেন। কে জানে —তাই হয়তো ভলো কাজ হবে?

উঃ। তেমন ইচ্ছা আমার আদৌ নেই—সব কিছু যদি ধ্বংসও হয়ে যায় তবু আমি তার পরের নতুন সৃষ্টির দিকে চাইব। জগতে যাই কিছু ঘটছে তাতে আমাকে বিচলিত করছে না, কারণ আমি বরাবরই জানি যে এই রকমটাই হবে; বড়ো বড়ো জ্ঞানীরা যেমনটা আশা করতেন তা আমি কখনো করিনি, সুতরাং আমি একটুও হতাশও হচ্ছি না।

১০-৮-১৯৩৩

অতিমানস আসার কথা

আমি তোমায় এমন কথা বলিনি যে এখানে যে শক্তি এখন কাজ করছে তা একেবারে চূড়ান্ত; বরং বলেছি যে আমি চেষ্টা করছি একে চূড়ান্ত ক'রে আনতে আর সেইজন্যই চাইছি অতিমানস এসে পড়ুক। কিন্তু যখন তা চূড়ান্ত রকমের নয়, তখন তা কোনো শক্তিই নয়, এটা বলা ঠিক যুক্তিসঙ্গত হয় না।

২৮-৮-১৯৩৪

পার্থিব জীবনে অতিমানস আসার ফল

> প্রঃ। লোকে যেমন ভাবে অতিমানস অবতরণের সম্বন্ধে আলোচনা করে তাতে আমাকে কিছু অবিশ্বাসী ক'রে দেয়। তারা বলে অতিমানস এলেই সব কিছু আধ্যাত্মিক হয়ে যাবে, এমন কি বাহ্য রাজনৈতিক জীবনের গণ্ডগোলও তৎক্ষণাৎ মিটে যাবে—এই নিয়ে ওদের মধ্যে খুব উত্তেজনা।

উঃ। সমস্তই বাজে কথা। অতিমানসের অবতরণ মানে কেবল এই যে তার শক্তি এই পার্থিব চেতনাতে জীবন্ত হয়ে উঠবে, ঠিক যেমন চিন্তক মনের ও উচ্চতর মনের শক্তি এখন এখানে জীবন্ত রয়েছে। কিন্তু যেমন কোনো পশুতে এই মনের সুযোগ নিতে পারে না, কোনো বর্বর মানুষ উচ্চতর মনের শক্তির সুযোগ নিতে পারে না—তেমনি অতিমানসের শক্তি এলেও সকলেই তার সুযোগ নিতে পারবে না। আমি অনেকবারই বলেছি যে তা প্রথমে আসবে অল্প কয়েকজনের জন্য, সমগ্র পৃথিবীতে নয়—তবে পার্থিব জীবনে তার প্রভাব ক্রমশ বেড়ে যাবে।

১৫-১২-১৯৩৪

প্রঃ। পৃথ্বীচেতনায় যখন অতিমানসের অবতরণ হবে তখন সব সাধকই কি তা জানতে পারবে—আমি বলতে চাইছি যে অবতরণ পৃথিবীতে, তাদের মধ্যে নয়?

উঃ। সবাই যে জানতে পারবে এমন কোন কথা নেই। তাছাড়া, যদিও বা অবতরণ এখানেই হয় তা হলেও শেষ পরিবর্তনের জন্যে সাধককে আগে প্রস্তুত হতে হবে।

অতিমানস আসার নিশ্চয়তা

জগতের মন্দ অবস্থার কথা নিয়ে আমি আগেও বলেছি। গুহ্যবাদীরা বলে যে অবস্থা যত খারাপ হবে, উপর থেকে নতুন আলো বা নতুন কিছু আসার সম্ভাবনা ততই সুনিশ্চিত হবে। সাধারণের মন তা জানবে না—তারা বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করবে বা অপেক্ষা করে দেখবে।

ভগবান যথার্থই একটা কিছু ঘটাতে চান কিনা, সে সম্বন্ধে আমার ধারণা যে তিনি সেইরকমই ইচ্ছা করেন। আমি নিশ্চিতরূপে জানি যে অতিমানস খুবই সত্য এবং এমন অবস্থাতে তার আসা অপরিহার্য। কেবল প্রশ্ন এই যে তা হবে কখন এবং কেমন ক'রে। তাও উপরে কোথাও আগের থেকে স্থির করা আছে; কিন্তু এখানে যত বিরোধী শক্তিদের সঙ্গে সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে তার রাস্তা করতে হচ্ছে। কারণ এই পার্থিব জগতের কাছে ধার্য করা জিনিসটা থাকে লুকোনো, আমরা কেবল দেখি নানা শক্তি নানা সম্ভাবনা নিয়ে একটা কিছু পরিণতিতে আসতে চায় যা মানুষের চোখের অন্তরালে রয়েছে। তবে এতে কোনো ভুল নেই যে অনেকগুলি আত্মাকে এখানে পাঠানো হয়েছে যাতে কাজটা এবার হয়ে যায়। এই হলো এখনকার অবস্থা। আমার বিশ্বাস ও ইচ্ছা এই যে তা এখনই হবে। আমি অবশ্য বলছি মানব বুদ্ধির স্তর থেকে—বাস্তবে ও গুহ্যে একত্রে মিশিয়ে। এর চেয়ে বেশি বলতে গেলে গণ্ডী পার হতে হয়। তুমি নিশ্চয় আমাকে দিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করাতে চাও না? বাস্তববাদী হয়ে তা তুমি পারো না।

২৮-১২-১৯৩৪

দৈহিকের স্তরে ঢোকা

প্রঃ আপনি লিখেছেন: "তুমি রয়েছ দৈহিক চেতনাতে" এ কথার মানে কি? তার মানে কি আমি পশুর মতো বা উদ্‌ভিদের মতো রয়েছি, আমার এই "দৈহিক চেতনা" থেকে বেরিয়ে মনের স্তরে আসা দরকার?

উঃ। আমি নিজেও রয়েছি দৈহিক চেতনার স্তরে এবং তা কয়েক বছর ধরে। প্রথমে তা ছিল নিতান্ত দৈহিকের অন্ধকার ও জড়তার মধ্যে,—অতঃপর ওখানে থেকেই পথ খুলে ঠেলে ওঠা গেল উচ্চতর চেতনার দিকে এই দৈহিক চেতনার রূপান্তর আনার সংগ্রামে, যাতে একে অতিমানস রূপান্তরের জন্য প্রস্তুত ক'রে তোলা যায়।

এখান থেকে মনের স্তরেও ফিরে যাওয়া যায়, মন উন্মুক্ত ও তীক্ষ্ণ হয়ে থাকলে সহজেই মানসিক উপলব্ধি তাতে মিলবে। কিন্তু এ সাধনার সাধারণত সেই পথ নয়।

২৯-১২-১৯৩৪

দৈহিক নিশ্চেষ্টতা থেকে অব্যাহতির উপায়

প্রঃ। আমার সাধনা ১৯৩৩ সালে কি প্রকৃত সাধনা ছিল? না তা ছিল কেবল কিছু মানসিক অনুভূতি, নিরেট কিছু নয়? নতুবা এই দুই বছরে এতটা নেমে এলাম কেন?

উঃ। প্রকৃত সাধনা নিশ্চয়ই হয়েছিল এবং মনের প্রাণের স্তরে বেশ স্থায়ী প্রস্তুতিও হয়েছিল। তা যদি না হতো তাহলে শান্তি নেমে আসা শুরু হতো না। তুমি নেমে এসেছ কারণ প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবার জন্য যখন তুমি দৈহিক চেতনাতে নামলে তখন একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে গেলে, তপস্যার ইচ্ছা ছেড়ে দিলে, কাজেই যৌনশক্তি তার সুযোগ নিয়ে নিজেকে প্রকট করলে। দৈহিকের স্তরে নামাতে অনেকেরই এমনি শক্তিগুলির দিকে

নিশ্চেষ্টতা আসে; ঐসব বিভিন্ন শক্তি তখন চেতনার উপর কাজ করে মনের প্রাণের কোনো প্রতিক্রিয়ার পূর্বশক্তির অভাবে––কখনো উপরের শান্তি প্রভৃতি থাকে, কখনো ঐসব শক্তি। এই অবস্থার ভিতর দিয়ে আমাকেও অতিক্রম করতে হয়েছে, একে কাটাতে দুই বছর লেগেছে। স্বয়ং দেহের মধ্যেই উচ্চতর চেতনাকে নামিয়ে আনবার নিরন্তরের ইচ্ছা জাগিয়ে তোলা––বিশেষত উপরের শান্তি ও তেজ, এই হলো ওকে দূর করার প্রকৃষ্ট উপায়।

৮-৭-১৯৩৫

> প্রঃ। কিছু একটা আমাকে উপরে উঠতে বাধা দিচ্ছে যদিও নিম্ন প্রকৃতিকে উপর থেকে দমন করা যেতো।

উঃ। অমন আমারও হয়েছিল। সর্বদা উপরে উঠে থাকার বদলে আমাকে নিম্ন দেহসত্তায় নেমে আসতে হয়েছিল। অবশ্য উপরে উঠে থাকতে পারলে ভালো, কিন্তু প্রায় সকলকেই দেহের দিকে নেমে আসতে হয়, এই হলো ঝন্ঝাট।

৫-৯-১৯৩৫

দেহচেতনার রূপান্তর সম্পর্কে

> প্রঃ। দেহচেতনার রূপান্তর যদি অত মন্থর হয় তাহলে উচ্চদিকের অগ্রগতির সঙ্গে তা সমান তালে চলতে পারে না। সব পিছিয়ে পড়ে থাকে। উচ্চ অংশগুলি যখন মনোত্তীর্ণ হয়েছে তখন দেহ সবে বোধিলাভের দিকে যাচ্ছে। তেমনি উচ্চ অংশে যখন অতিমানস আসছে, দেহচেতনা তখন রয়েছে অধিমানসের প্রভাবে। এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য কি আপাতত দেহের প্রশ্ন ফেলে রেখে এগিয়ে যাওয়া যায় না, অথবা প্রত্যেক বার

দেহের রূপান্তরের জন্য অপেক্ষা ক'রে থেকে তবে অগ্রসর হতে হয়?

উঃ। তা সম্ভব নয়। দেহচেতনাকে ফেলে রাখা যায় না, উচ্চ অংশের পরিবর্তন এনে তার পর দেহের পরিবর্তন করা যায় না, কিংবা একটা দিক সম্পূর্ণ ক'রে অন্য দিকে যাওয়া যায় না। আমি তা চেষ্টা করে দেখেছি, তাতে কাজ হয়নি। মন ও প্রাণকে মানসোত্তীর্ণ অবস্থায় আনা যায়, কিন্তু দেহচেতনা থাকে নিম্নক্রিয়াতে অপরিবর্তিত হয়ে তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খুঁটিনাটি নিয়ে। তা করতে গেলে অতিমানস শক্তিকে অধিমানসের মধ্যে টেনে আনতে হয়, তখন দেহচেতনা কতকটা অধিমানসগত হতে পারে। এর আর অন্য কোনো উপায় নেই, সেইজন্যই সাধনা এত দীর্ঘ-কালব্যাপী হয়।

১৮-১১-১৯৩৫

অতিমানস গ্রহণে জগতের প্রস্তুতি

প্রঃ। এমন জগতে থেকে আমি তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছি, এখান ছেড়ে কোনো সূক্ষ্মতর অস্তিত্বে চলে যেতে চাইতাম, যদি আপনি একে বদ্‌লে দিয়ে এর চেয়ে ভালো কিছু এনে ফেলার ফিরিস্তির কথা না বলতেন। কিন্তু এই জগৎ কি আপনার আনা সে জিনিস গ্রহণ করতে চাইছে, তার যা রয়েছে ও যেমন ব্যাপার করছে সে সমস্ত ত্যাগ ক'রে?

উঃ। যে জিনিস জগতে নেই তা সে চাইছে এবং চাইছেও না। অর্থাৎ অতিমানস যা দিতে পারে তা চাইছে জগতের আভ্যন্তরীণ মন, কিন্তু তার বাহ্য মন, তার দেহ প্রাণ সত্তা ওর দাম দিতে নারাজ। সে যাই হোক, কিন্তু আমি এই জগৎকে হঠাৎ একেবারে বদ্‌লে ফেলতে চাইছি না, কিন্তু কেন্দ্রগত ভাবে এনে ফেলতে চাইছি এমন কিছু যা এর মধ্যে এখনো পর্যন্ত নেই, অর্থাৎ একটা নতুন চেতনা ও শক্তি। ৩১-৭-১৯৩৫

দুর্দশাগ্রস্ত গ্রহটির জন্যে শ্রেয়স্কর কিছু

প্রঃ। যেদিকেই চোখ ফেরাই দেখছি যেন সেই একই মানবজাতি তার সমস্ত অজ্ঞান আর অক্ষমতা নিয়ে।

উঃ। অবশ্যই। সর্বদা সেই কথাই তো আমি বলে আসছি। আমি এই দুর্দশাগ্রস্ত অথচ সদিচ্ছাসম্পন্ন গ্রহটির মধ্যে শ্রেয়স্কর কিছু দেখার জন্যে যে ব্যগ্র সে তো আর অহেতুক নয়।

৩-৮-১৯৩৫

অতিমানস ঋত-শক্তির ক্রিয়া

তুমি নিজের বিভ্রান্তি নিজে ঘটিয়েছ নিজস্ব কতকগুলি সূত্র ধরে। অতি-মানসের সম্বন্ধে ধোঁয়াটে ব্যাপার কিছু নেই; তার কাজ হবে যথাসম্ভব নিখুঁত ভাবে। আর নিরেট রকম হবার কথা যদি বলো, তা আমি ওর চেয়ে অনেক নিম্নতর শক্তিদের দ্বারা যখন এত কিছু নিরেট জিনিস পেয়েছি, তখন সেই উচ্চতম শক্তির কাছে কেবল ধোঁয়াটে জিনিস পাবো কেন। কিন্তু মানুষের মনের ভাবটাই বুঝি ঐরকম: যা কিছু পার্থিব বাস্তব তাই হলো নিরেট, আর যা উচ্চতর তা নিশ্চয় অবাস্তব ও ধোঁয়াটে—নিচেকার কেঁচো হলো বাস্তব, উপরের ঈগল অবাস্তব।

যাই হোক ন-কে আমি এমন কথা বলিনি যে আমি আকাশমার্গে উড়ছি—বরং বলেছি যে রীতিমত কঠিন ব্যবহারিক জিনিস নিয়েই আমার কারবার। আমি কেবল বলেছি যে গত নভেম্বর থেকে যে সমস্যা আমাকে পীড়িত করছিল তার মীমাংসার ফর্মুলা আমি পেয়ে গেছি, তাই ধরে এখন কাজ করছি।

এবার অতিমানসের কথায় আসি: অতিমানস হলো সরাসরি স্বয়ম্ভু ঋতচেতনা ও স্বয়ংক্রিয় ঋত-শক্তি। সুতরাং ওর মধ্যে কোনো ভেল্কির প্রশ্ন হতে পারে না। খাঁটী সত্য যা নয় তা অতিমানস নয়। আর স্থিরতা ও নীরবতার কথা, তার জন্য অতিমানস পর্যন্ত যাবার দরকার হয় না। মানব বদ্ধির উপরে উচ্চমানসের স্তরে গেলেই তা মিলবে। ২৭ বছর আগে

১৯০৮ সালেই আমি তা পেয়ে গেছি, আর নিশ্চিত বলতে পারি যে তা যথেষ্টই চমৎকার ও নিরেট ছিল, তার চেয়ে আরো বেশি নিরেট করতে অতিমানসের প্রয়োজন হয়নি। আর তুমি যে বলেছ "এমন স্থিরতা যা তৎপরতার মতো দেখাবে" এমন জিনিস আমি জানি না। স্থিরতা ও নীরবতাই স্থায়ীভাবে পেয়েছিলাম—তার প্রমাণ এই যে সেই নীরব মন নিয়েই আমি চার মাস যাবৎ "বন্দে মাতরম্" পত্রিকা চালিয়েছি, ছয় ভল্যুম "আর্য" পত্রিকা লিখেছি, তা ছাড়া এই সব চিঠিপত্র ও বাণী প্রভৃতি তো আছেই। যদি বলো যে লেখা জিনিসটা কোনো তৎপরতা নয়, কেবল দেখায় সেইরকম, কেবল চেতনার হাতসাফাই—আচ্ছা, তবে বলি যে ঐ নীরবতা ও স্থিরতার মধ্যেই আমি কঠিন রকমের রাজনৈতিক কাজ চালিয়ে গেছি, আর আশ্রমকে বজায় রাখার কঠিন কাজেও বেশ অংশগ্রহণ করেছি, এগুলোকে অন্তত ইন্দ্রিয়গোচর ভাবে নিরেট ও বাস্তব কাজ বলবে? তাও যদি অস্বীকার করো (দার্শনিক মায়াবাদে তা করতে পারো) তাহলে তুমি শংকরের মায়াবাদের রাজ্যে চলে গেলে, সেখানেই তোমাকে ছেড়ে দিলাম।

তুমি বলতে পারো যে এ তো অতিমানস নয়, বড় জোর অধিমানসই আমাকে এমন ভাবে কাজ করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু অতিমানস বলতেই বোঝায় যে তা মানস বা অধিমানসের চেয়ে আরো বেশি সক্রিয় হবে। আগে বলেছি যে সত্য যা নয় তা অতিমানস নয়, আরো বলছি যে কার্যকরী যা নয় তা অতিমানস নয়। অবশেষে বলি যে ন-কে এমন কথা বলিনি যে অতিমানসকে আমি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত ক'রে ফেলেছি—এই পর্যন্ত বলব যে তার খুবই কাছাকাছি এসেছি। কিন্তু "খুব কাছে" হলো একটা আপেক্ষিক বাক্য, মানুষের বলা অন্যান্য বাক্যের মতো।

র-কে কেমন ভাবে জবাব দেবে তা জানি না। আমার দুটি ফর্মুলার কথা বলতে পারো, কিন্তু তা সন্দেহজনক হবে। কিংবা বলতে পারো যে অতিমানস হলো নীরবতা, কিন্তু তা অসত্য হবে! অতএব তোমার মুশকিল তোমারই মীমাংসার জন্য ছেড়ে দিলাম—তা ছাড়া আর কি করতে পারি। যতদিন না আমি অতিমানসকে দৃঢ় বাস্তবের আয়ত্তের মধ্যে এনে মনওয়ালা মানুষদের কাছে বলতে পারি তাদের বোধ্য ভাষাতে—ততদিন আমি বোবার মতো থাকব, কারণ আজ পর্যন্ত যা সামান্য কিছু প্রকাশ পেয়েছে আমার লেখাতে, তা সমস্তই লোকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছে।

২৩-৮-১৯৩৫

এখনকার কাজ

প্রঃ। অতিমানস সম্বন্ধে কিছু লিখুন না। অতিমানসের কথা এদের বড় কঠিন লাগছে।

উঃ। কী হবে লিখে? কতটুকু বোঝা যাবে? তা ছাড়া এখনকার কাজটা হল অতিমানসকে নামিয়ে এনে এখানে তার প্রতিষ্ঠা, তাকে ব্যাখ্যা করা নয়। যদি এখানে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সে নিজেই নিজের ব্যাখ্যা করবে। যদি সে তা না করে তাহলে তাকে ব্যাখ্যা করেও কোনো লাভ নেই। আমি পূর্বে আমার লেখায় অতিমানস সম্বন্ধে কিছু বলেছি, কিন্তু তাতে কাউকে আলোকদানের সাফল্য আসেনি। অতএব আবার কেন এ উদ্যম?

৮-১০-১৯৩৫

×

অতিমানসকে যদি বোঝা যায় তবেই শুধু অতিমানস প্রকৃতিকে বোঝা যেতে পারে। কিন্তু মন যতক্ষণ না ঊর্ধ্বতর স্তরগুলির দিকে নিজেকে খুলে ধরছে ততক্ষণ তা সম্ভব নয়। অতিমানসের মানসিক বর্ণনা যতটা দেওয়া যায় আমি তা দিয়েছি 'আর্য'তে।

শ্রীঅরবিন্দের ক্রিয়া বুঝতে পারার আসল উপায়

প্রঃ। যেহেতু ভগবানই সব কিছু করছেন, তাহলে সাধারণ ঘটনাবলী আর আপনার সচেতন বিশেষ ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য কী?

যে ঘটনাটি আপনার পূর্বদৃষ্ট আর যেটি আপনি সচেতনভাবে ঘটিয়ে তুলছেন এ দুয়ের মধ্যে মূলে কোনো পার্থক্য আছে কি? যেহেতু সব ঘটনাই দিব্য চেতনার মধ্যেই ঘটে সেই হেতু কোনো ঘটনা আপনার দ্বারা পূর্ব-

দৃষ্ট হওয়ার এই মাত্র অর্থ হতে পারে যে আপনি আপনার মনোযোগ সেদিকে এমনভাবে ফেরান যাতে আপনি আপনার বাহ্য চেতনায় সে বিষয়ে সচেতন হতে পারেন। তাহলে তাদের উপর আপনার সচেতন ক্রিয়ার প্রকৃতি কি?

উঃ। তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমাকে এমন এক চেতনার ভাষায় কথা বলতে হবে যার কোন চাবিকাঠি মনের কাছে নেই, আর সেই সঙ্গে যে নিম্নচেতনায় এখন ব্যাপারগুলি ঘটছে তার সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ তাও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে হবে। এ করে লাভ কি? মন হয় কিছুই বুঝবে না কিম্বা ভুল বুঝবে কিম্বা ভাববে যে সে ঠিকই বুঝেছে যখন সে কিছুই বোঝেনি।

কিম্বা এই প্রশ্নের একটা মানসিক উত্তর আমাকে তৈরী করতে হবে যা আসল জিনিস হবে না, হবে প্রশ্নকারী মনকে চুপ করানোর মত একটা কিছু।

এ সব ব্যাপারের মধ্যে ঢোকার আসল পথটি হল, মনকে স্তব্ধ করে যে চেতনার থেকে এই সব করা হচ্ছে তার দিকে খুলে ধরা। তখন প্রথমতঃ দিব্য চেতনা বিভিন্ন স্তরের কীভাবে কাজ করেন তার একটা সরাসরি অভিজ্ঞতা তোমার হবে আর দ্বিতীয়তঃ এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটা জ্ঞানের আলোও তুমি লাভ করবে। এই হল আসল পথ—বাদবাকী সবই হচ্ছে কেবল কথা আর বন্ধ্যা মনের যুক্তিবাদ।

১৯২৮

একটি সীমারেখা অতিক্রম

দর্শন অনুষ্ঠানটি (১৫ অগস্ট ১৯৩৬ জন্মদিনের) মোটামুটি ভালোই হয়েছে। এখন আর আমি চমকপ্রদ কিছু এনে ফেলতে চাইছি না, কেবল লক্ষ্য ক'রে দেখছি, যে-চেতনা ও শক্তি ইতিমধ্যে এখানে উপস্থিত হয়ে কাজ করছে, উপর থেকে যে বৃহত্তর আলো এবং শক্তি এখানে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে তার কাজের উন্নতি কতখানি হয়, কারণ তা এমন এক কঠিন সীমারেখা

অতিক্রম করেছে যাতে অদূর ভবিষ্যতে অনেক কিছু আশা করা যায়। অনেক কাল থেকে যে চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছিল তা এতে সফল হয়েছে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। এখন আমি তা ব্যাখ্যা ক'রে বলব না, কারণ এ হলো অভীপ্সিত সমগ্র জিনিসের একটা অংশ মাত্র, সেটি সম্পূর্ণ হলে তবেই বোঝানো যাবে। কিন্তু এর থেকে বাস্তব রকমের নিশ্চয়তা মিলছে যে তাও হয়ে যাবে।

২৬-৮-১৯৩৬

পর্দার আড়ালে প্রস্তুতি

জানি আমি যে এই সময়টা তোমার পক্ষে ও সকলেরই পক্ষে কষ্ট-দায়ক। সারা জগতের পক্ষেই তাই। বিচল অবস্থা, বিভ্রম, বিশৃঙ্খলা, বিড়ম্বনা এখন সর্বত্রই। ভালো যা কিছু তা প্রস্তুত হচ্ছে পর্দার অন্তরালে, আর মন্দ যা কিছু তাই এখন প্রকট সর্বত্র। একমাত্র কাজ হলো আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা ক'রে থাকা, যতক্ষণ পর্যন্ত আলো হবার সময় না আসে।

২-৬-১৯৪৬

বিজয়ের আলো

বাংলা দেশের বর্তমান অবস্থা নিশ্চয়ই খুব খারাপ; ওখানকার হিন্দু-দের অবস্থা মারাত্মক, এবং দিল্লীতে সুযোগমত বোঝাপড়া কিছু মধ্যবর্তী রকমের হলেও আরো খারাপ অবস্থা আসতে পারে। কিন্তু আমাদের প্রতি-ক্রিয়া মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে কিংবা হতাশার ভাব আনলে চলবে না। বাংলায় রয়েছে অন্তত দুই কোটি হিন্দু, তাদের খতম ক'রে দেওয়া যায় না,— এমন কি হিটলারই তার বৈজ্ঞানিক ধ্বংস করার প্রণালীতে ইহুদিদের খতম করতে পারেনি, তারা এখনও দিব্য বেঁচে আছে। আর হিন্দু ঐতিহ্য এমন পল্‌কা জিনিস নয় যে সহজে তাকে লোপ করা যাবে; পাঁচ হাজার বছরের মতো কাল যখন টিকে আছে তখন আরো অনেক কাল টিকে থাকার শক্তি সে সঞ্চয় করেছে। আজকাল যা হচ্ছে তা জেনে আমি আশ্চর্য হচ্ছি না।

বাংলা দেশে থাকতেই আমি দেখেছিলাম যে এমন হবে, তখনই সকলকে বলেছি যে এইরকম হওয়া অপরিহার্য, এর জন্য যেন তারা প্রস্তুত থাকে। তখন এ-কথাতে কেউ বিশেষ কান দেয়নি। কিন্তু পরে যখন গণ্ডগোল শুরু হলো তখন কেউ কেউ সে কথা স্মরণ ক'রে বলেছিল যে আমি ঠিকই জানতাম; কেবল সি. আর. দাশ যখন পণ্ডিচেরিতে আসেন তখন এই আশংকাতেই বলেছিলেন যে এই মারাত্মক সমস্যা যতদিন না মেটে ততদিন ব্রিটিশরা যেন ভারত ছেড়ে না যায়। কিন্তু এখন যা হচ্ছে তাতেও আমাকে নিরুৎসাহ করছে না, কারণ আমি এমন অভিজ্ঞতা শত শত বার পেয়েছি যে ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে যে থাকে তার জন্য গভীরতম অন্ধকারের পিছনেও ভগবানের বিজয়ের আলো তৈরি থাকে। জগতে অমুক জিনিসটা হোক এমন কোনো দৃঢ় ইচ্ছা কখনো আমি করিনি—ব্যক্তিগত জিনিসের কথা বলছি না—এমন ঐকান্তিক অভিলাষ কখনো করিনি যার শেষ পর্যন্ত পূরণ হয়নি, যথেষ্ট বিলম্ব এবং বিপর্যয় ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও। এক সময়ে হিটলার যখন সর্বত্রই জয়ী হচ্ছিল তখন মনে হয়েছিল বুঝি সারা জগতকে এবার অসুরের কালো জোয়াল বইতে হবে, কিন্তু এখন কোথায় বা হিটলার আর কোথায় বা তার শাসন? মানব ইতিহাসের ঐ অধ্যায়টি বার্লিন ও নুরেমবার্গেই শেষ হয়ে গেছে। আরো অনেক রকম তমসা মানবজাতিকে ঘিরে ফেলতে চাইছে, কিন্তু তারও সমাপ্তি হবে ঐরকম ভাবে। আমার এ বিশ্বাস কিসের জন্য তা আমি এই চিঠির মধ্যে বলতে চাই না—হয়তো একদিন বলা যেতে পারবে।

১৯-১০-১৯৪৬

উষার আগে গভীর অন্ধকার

তোমার বাধাবিপত্তিগুলো এত তীব্র হয়ে ওঠার কারণ এই যে যোগের ক্রিয়া নেমে এসেছে নিশ্চেতনার কঠিন ভূমিতে, যেখানে রয়েছে সকল বাধার ভিত্তিমূল, তা ব্যক্তির পক্ষেও এবং বিশ্বের পক্ষেও, এবং তা বাধাস্বরূপ দাঁড়িয়েছে আত্মার ও ভগবৎ কর্মের জয়যাত্রার দিকে অগ্রগতির মুখে। তাই এখন সর্বত্রই এমন বাধাবিপত্তি, এই আশ্রমেও এবং এর বাইরের সারা জগতেও। সংশয়, নিরুৎসাহ, অবিশ্বাস, আদর্শগত উৎসাহের অভাব,

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাভঙ্গ, এই হলো তার সাধারণ লক্ষণ। এর চেয়েও খারাপ লক্ষণ দেখবে বাইরের জগতে, যেমন কুটিলতা, সব কিছুতে অবিশ্বাস, খলতা, অন্যায় অসাধুতার ও দুর্নীতির প্রাচুর্য, উচ্চতর সব কিছুকে ছেড়ে কেবল অর্থ, আহার, আরাম ও সুখের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক, এবং এর চেয়েও খারাপ অনেক কিছু দুষ্কৃতি জগতে প্রকট হয়ে ওঠার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু যতই যাই হোক, সমস্তই সাময়িক ঘটনাচক্র, এর জন্য তারা প্রস্তুতই ছিল যারা বিশ্ব আত্মা ও বিশ্বশক্তির কর্ম পদ্ধতির কথা জানে। আমি নিজেও অনেক আগে জেনেছি যে এমনি খারাপ অবস্থাই আসছে, উষার উদয়ের আগে রাত্রির অন্ধকার সব চেয়ে প্রগাঢ়ই হয়, সুতরাং আমি একটুও হতাশ হইনি। আমি জানি যে এই অন্ধকারের পিছনে কোন জিনিস তৈরি করা হচ্ছে, এমন কি তার অভ্যুদয়ের প্রথম লক্ষণও দেখতে পাচ্ছি। যারা ভগবানকে চায় তারা দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে সেই লক্ষ্যের দিকেই নিবিষ্ট হয়ে থাকুক; কিছু কাল পরে এই সাময়িক অন্ধকার কেটে গিয়ে আলো এসে পড়বে।

৯-৪-১৯৪৭

বর্তমান প্রচেষ্টা

আমি যদি অতিমানসের স্তরে দাঁড়িয়ে জগতের উপর অতিমানসের যন্ত্র স্বরূপ হয়ে কাজ করতাম, তাহলে এখন যেমন হচ্ছে তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি এবং এর চেয়ে অন্যরকম ভাবে জগতের পরিবর্তন এসে যেতে পারতো। কিন্তু আমার বর্তমান প্রচেষ্টা তাই নিয়ে নয়, আমি চাইছি এখানে নতুন কিছুকে নামিয়ে আনতে এবং তারই উপর দাঁড়িয়ে কাজ করতে। এখনকার প্রথম দরকারী কাজ হলো অধিমানসের স্তরকে ক্রমশ অতিমানসগত ক'রে আনা; আর দ্বিতীয় কাজ হলো, নিশ্চেতনার যে গুরু-ভার মানব অজ্ঞানতাকে সমর্থন দিয়ে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বিশ্বকে ও ব্যক্তিকেও কোনোরকমে বদলাতে দিচ্ছে না, সেই বাধাকে হাল্কা ক'রে দেওয়া। এ কথা আমি বরাবরই বলেছি যে আমি মনুষ্য ব্যাপারে যে আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োগ করেছি, যেমন যুদ্ধের সময়, তা অতিমানস নয় কিন্তু অধিমানসের শক্তি, আর বাস্তবের জগতে তা কাজ করতে গিয়ে

নিচেকার নানা শক্তির সঙ্গে এমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পড়ে যে তার উদ্দেশ্য যতই জোরালো হোক তার ফল যা দাঁড়ায় তা আংশিক। সেই-জন্যই দেখ ১৫ই অগস্ট আমার জন্মদিনের উপহার হিসাবে স্বাধীন ভারত মিলল, কিন্তু তাকেও উপসর্গের মতো দুইভাগে ভাগ ক'রে দেওয়া হলো দুটি স্বাধীন ভারত ক'রে দিয়ে: এমন উদারতা না দেখালেও চলত, অবিভক্ত একটিমাত্র স্বাধীন ভারত পেলেই আমি যথেষ্ট খুশি হতাম।

৭-৭-১৯৪৭

দৃঢ়চিত্তে থাকো

এই অন্ধকারের পর্বে দৃঢ়চিত্তে থাকো, আলো আসছে এবং তার জয় হবেই।

৪-২-১৯৪৮

যে শান্তির জন্ম নিশ্চয়তা থেকে

বিজয়ের নিশ্চয়তা থেকে যে শান্তির জন্ম তাই তোমার নিজের মধ্যে বাড়িয়ে তোলা চাই।

বর্তমান আঁধার ও নতুন জগৎ

তোমাকে যারা বর্তমান অবস্থা নিয়ে অত দুঃখ জানিয়ে লিখেছে তাদের আমি খুব কমই সান্ত্বনা দিতে পারি---অন্ততপক্ষে উপস্থিত সময়ে। অবস্থা তো খারাপই, আরো খারাপ হচ্ছে এবং এর পর খারাপের চেয়েও খারাপ হতে পারে যে কোনো সময়ে---এই ডামাডোলের জগতে যে কোনো বিপরীত ব্যাপার সম্ভব হতে পারে। ওদের পক্ষে এই কথা বুঝে দেখা চাই যে এরও প্রয়োজন ছিল, কারণ যে সকল সম্ভাবনা চাপা হয়ে ছিল তার বেরিয়ে আসা দরকার, নতুবা তা নিঃশেষ হয়ে গিয়ে নতুন ও ভালো রকম জগৎ গড়ে উঠতে পারবে না; এগুলোকে অন্য কোনো সময়ের জন্য স্থগিত রেখে

দেওয়া চলতো না। যোগের ক্ষেত্রে যেমন হয় এখানেও তাই, ভিতরের দিকে যা সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় হয়ে জমা থাকে তাকে আলোতে টেনে বের ক'রে আনতে হয়, যাতে তাকে ছেঁটে ফেলে দেওয়া যায় কিংবা বিশুদ্ধী-কৃত ক'রে নেওয়া যায়। আর এই সত্য তাদের স্মরণ করিয়ে দাও যে ঊষার আগে যখন রাত্রির অন্ধকার সব চেয়ে ঘোরালো হয় তখন বুঝতে হবে যে এবার ঊষার উদয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এও যেন তারা মনে রাখে যে আসন্ন নতুন জগৎ এই পুরানো জগতেরই বুনুনি বজায় রেখে কেবল প্যাটার্ন বদলানো জিনিস হবে না, আর তা আসবে অন্য পথে——বাইরের দিক থেকে নয় কিন্তু ভিতরের দিক থেকে। অতএব বাইরের জগতে যা কিছু ঘটছে তাই নিয়েই নিত্য ভেবে ভেবে বিলাপ করতে না থেকে তাদের পক্ষে সব চেয়ে ভালো কাজ হবে ভিতরে ভিতরে নিজের মধ্যে নিজে তৈরি হয়ে ওঠা নতুন জগতের জন্য, তা যেমনই আকার নিক।

১৮-৭-১৯৪৮

তোমার একটি চিঠিতে বলেছিলে জগতে এখন যে অন্ধকার আমাদের চারিদিকে ঘিরে আছে তার সম্বন্ধে ভাবনার কথা,——আমার বোধ হচ্ছে যে তোমার এতখানি উচাটন হয়ে ওঠার এবং বিরুদ্ধ আক্রমণকে প্রতিরোধ করার অক্ষমতার সেটাই অন্যতম কারণ। কিন্তু আমি নিজে এই অন্ধকার অবস্থাতে বিচলিত হচ্ছি না, কিংবা দর্প করে এমন ইচ্ছা করবার দরকার বোধ করছি না যে জগৎকে আমি "খাড়া ক'রে দেবো", কারণ আমি জান-তাম যে এই সব হবে; জগৎপ্রকৃতির মধ্যে এগুলি ছিল, বেরিয়ে এসে ফুরিয়ে যাবার দরকার ছিল ভালোরকম জগতের জন্য। কিন্তু বাইরের ক্ষেত্রে কিছু কাজ হয়েছে যাতে ভিতরের ক্ষেত্রেও কাজের প্রস্তুতি বোঝাচ্ছে। যেমন, ভারত স্বাধীন হয়েছে, যার দরকার ছিল দিব্য কর্মের জন্য। তার এখনকার বাধাবিঘ্নগুলো আরো কিছুকাল বাড়তে পারে, বিশেষত পাকি-স্তানের জট, এরও দরকার ছিল পরিষ্কার হবার জন্য। তাও নিশ্চয় হয়ে যাবে, যদিও মাঝখানে অনেক মানুষ কষ্ট পাবে, যা এক্ষেত্রে অপরিহার্য। শেষ পর্যন্ত ভগবানের জন্য কাজ ঠিকই হবে, আর এই স্বপ্ন যে ভারত সমগ্র জগৎকে আধ্যাত্মিক আলোর দিকে পথ দেখাবে তাও সত্য হয়ে উঠতে

পারে। সুতরাং জগৎকে পতন থেকে রক্ষা করতে ইচ্ছা করার এখনও কোনো কারণ আমি দেখছি না।

৪-৪-১৯৫০

পঞ্চম বিভাগ

গুরু ও দিশারী

গুরু ও দিশারী

শিষ্য গ্রহণের সর্ত

আমি বড় সহজে শিষ্য গ্রহণ করিনে। এই যোগের পথ বেশ কঠিন। ভিতর থেকে বিশেষ ডাকটি পেলে তবেই এই যোগের পথে চলা যায়।

×

আমার যোগ যদি সে নিতে চায়, তাহলে আমি যে সত্যকে নামিয়ে আনছি তারই দিকে তাকে অটল সংকল্প ও আস্পৃহা নিয়ে থাকতে হবে, যেখান থেকে আলো আসছে সেই দিকে নিস্তরঙ্গ নিশ্চলতা নিয়ে নিজেকে নিত্য খুলে দিতে হবে। দিব্য শক্তি তার উপরে কিছু কাজ করতে শুরু করেছে, সে যদি এই মনোভাব নিয়ে আমার উপরে পূর্ণ আস্থা বজায় রাখে, তাহলে তার সাধনাতে নিরাপদে অগ্রসর হতে না পারবার কোনোই কারণ নেই।

৯-১২-১৯২২

×

ঐ জমিদার লোকটি বোধহয় প্রচলিত ধরনে আমার কাছে দীক্ষা নিতে চায়, কিন্তু সেটা আমি পারব না। তাকে বলা দরকার যে দীক্ষা আমি দিই না, আমার অন্য রকমের পদ্ধতি। তাকে এ কথা বোঝানো বা তার পক্ষে বোঝা হয়তো কঠিন। তাকে বরং এই কথা বলা যেতে পারে যে এখানে এসে কেউ যোগ করতে চাইলে তাকে তখনই গ্রহণ করা হয় না, কখনো কখনো দীর্ঘকালের পরীক্ষার পরে তাকে নেওয়া হয়। এই বলে দেখা যাক সে তাতে কি করে, তবুও যদি সে আসতে চায় তখন বিবেচনা করা যাবে।

১১-৭-১৯৪৯

×

ঐ ব্যক্তির প্রকৃত কিছু যোগ প্রবণতা থাকলে তবু কথা ছিল, কিন্তু আমরা তা একটুও দেখছি না। ওকে বলে দিও যে তার পক্ষে অন্য রাস্তা দরকার—এ যোগ তার সহ্য হবে না।

আমার পক্ষে তাকে কোনো সাহায্য বা নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়—কারণ তাতে যে প্রভাব গিয়ে পড়বে তা ওর বর্তমান অবস্থাতে বহন করবার মতো শক্তি ও সামর্থ্য নেই। এ যোগ সে নিতে পারবে না। যা সে নিতে পারবে এমন কিছু তার পক্ষে দরকার।

৪-৭-১৯৩৬

×

তোমার চিঠি পড়েছি আর যে সুযোগ তুমি প্রার্থনা করেছ তা তোমাকে দেওয়া স্থির করেছি। তুমি দু-তিন মাসের জন্যে আশ্রমে থাকতে পার। এইভাবে আরম্ভ কর আর নিজেই দেখে নাও, যে পথ আর স্থান তুমি খুঁজছ এ আসলে তাই কিনা। আমরাও তোমার আধ্যাত্মিক সম্ভাবনাগুলি আরো কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করে কীভাবে তোমাকে সাহায্য করা যায় তা নির্ণয় করতে পারি, বুঝতে পারি এই যোগ তোমার উপযুক্ত হবে কি না।

নানা কারণেই পরীক্ষার প্রয়োজন আছে, বিশেষ করে এই যোগের পথ কঠিন বলে। মানুষের স্বভাবের উপরে এর যা দাবী তা সত্যি সত্যি অনেকেই বরদাস্ত করতে পারে না। তুমি লিখেছ যে তুমি আমার মধ্যে এমন একজনকে দেখেছ যিনি বুদ্ধির পরিপূর্ণতার সাহায্যেই তাঁর আধ্যাত্মিক ও দিব্য রূপান্তর এনেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনের পূর্ণ নীরবতার মধ্যে দিয়েই আমি এসেছি, আর আমার মনের যা কিছু অধ্যাত্ম বা দিব্য রূপান্তর ঘটেছে তা ঘটেছে বুদ্ধিকে অতিক্রম করে রয়েছে যে উচ্চতর জ্ঞান তা সেই নীরবতার মধ্যে নেমে আসার ফলে। Essays on the Gita বইটিও লেখা হয়েছিল মনের ঐ নীরবতা থেকে কোনো বুদ্ধিগত প্রয়াস ছাড়াই, ঊর্ধ্ব হতে একটা জ্ঞানের অবাধ ক্রিয়ার ফলে। এই জিনিসটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই যোগের মূলতত্ত্বই হল বর্তমান মানুষী প্রকৃতির পূর্ণতা নয়, তা হল প্রথমে অন্তশ্চেতনা ও পরে ঊর্ধ্বচেতনার ক্রিয়ার সাহায্যে সত্তার সমস্ত অংশগুলির চৈত্যিক ও আধ্যাত্মিক রূপান্তর। এই অন্তশ্চেতনা আর ঊর্ধ্ব-

চেতনা সত্তার বিভিন্ন অংশগুলির উপর কাজ করে সেখানকার পুরনো যত প্রবৃত্তি দূর করে দিয়ে সেগুলিকে নিজের আদলে গড়ে তোলে। এইভাবে নিম্নপ্রকৃতি উর্ধ্বতন প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়। বুদ্ধির পূর্ণতা ততটা নয় যতটা তার অতিক্রমণ, মনের রূপান্তর, মনের স্থূলাভিষিক্ত করতে হবে জ্ঞানের একটা বৃহত্তর মহত্তর তত্ত্বকে। সত্তার অন্যান্য অংশগুলি সম্পর্কেও ঐ একই কথা।

এ হল এক মন্থর ও দুরূহ প্রক্রিয়া। পথ সুদীর্ঘ, এমনকি প্রয়োজনীয় ভিত্তিটিও স্থাপন করা খুবই কঠিন। বর্তমান পুরনো প্রকৃতি বাধা দেয়, একের পর এক উঠতে থাকে নানান্ বিঘ্ন আর বারবার তাদেরকে জয় করতে হয়। সেইজন্যে শেষ সিদ্ধান্ত নেবার আগে এই পথে চলবার ডাক সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া দরকার।

তুমি যদি চাও, যে পরীক্ষা তুমি প্রার্থনা করেছ তার সুযোগ দিতে আমরা প্রস্তুত। তোমার উত্তর পেলে মা তোমার আশ্রমে থাকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করবেন।

২৬-৩-১৯৩৭

×

তোমার বন্ধুকে লিখে দাও যে তোমার বাবার কাছ থেকে কোনো আর্থিক সাহায্য আমরা চাইনি, আর তাই তোমার পক্ষে তার চিঠির প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আশ্রমের কাজে সাহায্যের অধিকার প্রত্যেককে দেওয়া হয় না।

একমাত্র যাদের আশ্রমের সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আছে, অন্ততপক্ষে শ্রীঅরবিন্দের উপর আস্থা আছে তারাই এর অধিকারী।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর শিষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে খুব ব্যাকুল নন। কেবল তাদেরি গ্রহণ করা হয় যারা যোগের ডাক পেয়েছে আর যোগসাধনার ক্ষমতা ধরে আর সর্তগুলি পালন করতে রাজি থাকে।

১৪-১০-১৯২৮

×

আমি যদি কেবল এমন সব কথা বলতাম যা মানুষের প্রকৃতি বেশ সহজ ও স্বাভাবিক বলে নিতে পারতো, তাহলে তা শিষ্যদের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক হতো, কিন্তু তাতে এই আধ্যাত্মিক লক্ষ্য বা প্রয়াসের কিছুই থাকত না। আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও তার প্রণালী সহজ ও স্বাভাবিক হয় না (যেমন সহজ হয় কলহ, যৌনসম্ভোগ, লোভ, কুঁড়েমি, নানারকম অপূর্ণতার ক্রিয়া)—আর যারা এর শিষ্য হতে চাইবে তাদের ঐরূপ আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও প্রণালীকেই অনুসরণ করতে হবে, তা যতই কঠোর ও সাধারণ প্রকৃতির অতিরিক্ত হোক, যা সহজ ও স্বাভাবিক তাই খুঁজলে চলবে না।

৩-৫-১৯৩৭

×

> প্রঃ পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি বানপ্রস্থের অভিলাষী। তিনি মনে করেন আমাদের আশ্রমই তাঁর পক্ষে উপযুক্ত স্থান। তিনি বলছেন যে আশ্রম জীবনের জন্যে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। দোষের মধ্যে কেবল স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে তাঁর একটু আফিমের অভ্যাস আছে। তাঁকে কী লিখব?

উঃ ধন্যবাদের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান। আফিম এখানে চলবে না। তা ছাড়া এটা বানপ্রস্থ-আশ্রম নয়।

১৭-৭-১৯৩৬

> প্রঃ একটি গ্রাম্য বালিকা, অল্প বয়সে বিধবা। স্বপ্নে সে আপনার আহ্বান শুনেছে আর এখানে আসবার জন্যে উৎসুক হয়েছে।

উঃ বয়েস অত্যন্ত অল্প। এ জাতীয় স্বপ্নের স্থির-নিশ্চয়তা কিছু নেই। তাছাড়া তার বক্তব্যের সুরটি অতিরিক্ত রকম প্রাণস্তর-ঘেঁষা। যা হোক এখন এ সব কিছু বলার দরকার নেই। ১৪-১০-১৯৩৮

সত্যকে ইচ্ছামত বেছে নাও

যে সত্য আমি এনে দিলাম তা যদি তোমার পক্ষে বোঝা কিংবা বহন করা খুবই কঠিন হয়, তুমি তোমার ইচ্ছামত কোনো অর্ধসত্য বা অজ্ঞানতাকেও বেছে নিতে পারো। আমি এখানে কাউকে দীক্ষা নেওয়াতে আসিনি, জগতে প্রচার করতেও আসিনি আর আমার কাছে এসো বলে কাউকে ডাকতেও চাই না। কেবল যারা আপনা থেকে কোনো টানে আমার কাছে এসেছে এবং আঁকড়ে রয়েছে তাদের মধ্যে দিব্য জীবন এনে আমি দিব্য চেতনার প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি এই মাত্র। আমি কিংবা এখানকার মা কেউই বলছি না যে আমাদের তুমি মেনে নাও। যেদিন খুশি তুমি চলে যেতে পারো এবং তোমার পছন্দমত সাংসারিক জীবন বা ধর্মজীবন নিয়ে থাকতে পারো। কিন্তু তুমিও যেমন স্বাধীন, অন্য জনেরাও তেমনি এখানে থাকা ও নিজেদের পথে চলা সম্বন্ধে স্বাধীন। এখানে তোমার গণ্ডগোল পাকানো বা তাদের শান্তি ও আধ্যাত্মিক সাধনাকে নষ্ট করার কোনো অধিকার নেই।

২৩-১০-১৯২৯

সাধকরা ও চিঠিপত্র

আমি যদি কেবল পর্বতপ্রমাণ চিঠির স্তূপ লেখাকেই আমার জীবনের চরম লক্ষ্য ক'রে তুলতাম আর সব কিছু উচ্চতর লক্ষ্যকে ফেলে রেখে, তাহলে তো আমি একটা নিতান্ত মস্তিষ্কবিহীন আহাম্মক হয়ে দাঁড়ালাম! চিঠিপত্র লেখাকে যে এতটা গুরুত্ব দিয়েছি, তার কারণ আমার মূল উদ্দেশ্যের কাজে এও একটা যন্ত্রস্বরূপ—এমন অনেক সাধক আছে যারা ওতে সাহায্য পেয়ে আলস্য ঘুচিয়ে আধ্যাত্মিক অনুভূতির দিকে ভালো ভাবে অগ্রসর হতে পেরেছে, এমনও আছে যারা ছোটোখাটো অনুভূতি থেকে উপলব্ধির পর উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হয়েছে, এমনও আছে যারা বছরের পর বছর হতাশ হয়ে অন্ধকারের মধ্যে থাকার পরে আলোর দরজা খোলা পেয়েছে। আবার কেউ কেউ অবশ্য কোনো উপকারই পায়নি কিংবা সামান্যই পেয়েছে। কেউ কেউ এমন আছে যারা এলোমেলো যা খুশি লিখে কেবল আমাদের সময়

নষ্ট করেছে। কিন্তু এ কথা বোধ হয় বলতে পারি যে অধিকাংশ সাধ-কেরই এর দ্বারা যথেষ্ট মাত্রাতে প্রকৃত উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু কেবল চিঠিতেই তা হয়নি, ওর সঙ্গে যে শক্তি গিয়ে উত্তরোত্তর তাদের প্রকৃতির উপর চাপ দিয়েছে তাতেই অতটা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু সেখানে একটা কেন্দ্রী-করণ আনা দরকার ছিল, ওতে সেই কাজ হয়েছে। অনেক কেউ রয়েছে যাদের পক্ষে এটার দরকার ছিল না, যাদের পক্ষে অনুকূল কাজ হয়নি। কেবল বুদ্ধিগত প্রশ্নের জবাবে কোনো কাজ হতো না, কিন্তু ওর বেশির ভাগ স্থলে সাধনা ও অনুভূতির কথা থাকাতে খুবই সাফল্য মিলেছে।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে চিঠির মাত্রা এত বেড়ে গেল যে তা বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল, অথচ থামানোও যায় না, আর বেছে বেছে লিখলে ভুল বোঝা এসে পড়ে; এর উপায় খুঁজতে গিয়ে সামান্যই ফল হয়েছে। তা সম্ভব হবে কেবল যদি সাধকেরা এখন প্রধানত আভ্যন্তরীণ সংযোগের উপর নির্ভর ক'রে থাকে এবং কেবল নিতান্ত দরকারের সময় কিছু জানতে চায়——কেউ কেউ তাই করছে। আশা করি অবশেষে তা সাধ্য সীমার মধ্যে বসে যাবে।

১২-১-১৯৩৪

×

তুমি বলেছ যে আমার দৈনিক দশ ঘন্টা ক'রে "তুচ্ছ" চিঠিপত্র লেখার দ্বারা কোনো নব সম্প্রদায় গড়ে উঠবে না,——এ কথার মানে বুঝলাম না। অবশ্যই তা হবে না——কোনো অতুচ্ছ জরুরী চিঠিপত্রের দ্বারাও নয়। এমন কি যদি আমি সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখে সময়টা কাটাতাম তাতেও তা হতো না। প্রত্যেকটি কাজের সার্থকতা তার আপন ক্ষেত্রে——একটি ইলেক্‌ট্রন কিংবা অণু পরমাণু কিংবা একটা কণা মাত্র খুবই তুচ্ছ ও সামান্য জিনিস হতে পারে, কিন্তু জগৎ গড়ার কাজে তার নিজের স্থানে সেগুলি অপরিহার্য; কেবল পাহাড় পর্বত বা সূর্যাস্ত বা অরুণোদয়ের দীপ্তিচ্ছটা দিয়েই জগৎ গড়া যায় না——যদিও এগুলিরও তাতে নিজের নিজের স্থান আছে। সবই নির্ভর করে সেই শক্তির উপর যা উদ্দেশ্য নিয়ে ওর পিছনে কাজ করছে——যাকে বলা হয় বিশ্ব আত্মা; আর তা কাজ করে মানুষের মন বা মানুষের নিরিখ নিয়ে নয়, তার চেয়ে অনেক বড়ো চেতনা নিয়ে যা ইলেক্‌ট্রন থেকে

শুরু ক'রে এত বড়ো জগৎ গড়ে তোলে,---এবং যা স্নায়ুমণ্ডলীকে ভিত্তি ক'রে জড়স্থিত মন ও আত্মাকে নিয়েই তার থেকে বানিয়ে দেয় একজন রামকৃষ্ণ, একজন নেপোলিয়ন বা একজন শেক্‌সপিয়র। আর খুব একজন বড়ো কবি কি কেবল খুব দামী দামী জিনিস দিয়েই তৈরি? কত রকমের তুচ্ছ জিনিসের তোড়জোড় ক'রে তবে একটি 'কিং লিয়র' বা একটি 'হ্যামলেট' রচিত হয়েছে তা জানো? আর তোমারই যুক্তিতে বলি, লোকে কি এমন কথা ঠাট্টা ক'রে বলতে পারে না---যদিও আমি বলছি না---যে তুমি কবিতার ছন্দ ও চরণ নিয়ে ও পদাংশের পড়বার ধরন নিয়ে অনর্থক লেখালেখি ক'রে মাথা ঘামাচ্ছ? তারা বলবে, এই সব নীরস ব্যাপারে সময় নষ্ট না ক'রে তুমি তো সুন্দর সুন্দর গান বানাতে পারতে? কিন্তু যে জন কর্মের কর্মী সে জানে তার জিনিসের দাম, সে জানে যে তার "তুচ্ছ" জিনিসগুলোর কোথায় কি প্রয়োজন আর তার কাজের সার্থকতার পক্ষে কোথায় তার স্থান।

ডিসেম্বর ১৯৩৩

মনের তরফের প্রশ্ন হলেও সেগুলোর জবাব কেনই বা দেবো না তা বুঝলাম না। আমার তো বোধ হয় যে দিব্য উদ্দেশ্যে তার প্রয়োজন হলে তাও করা চাই। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং এমন হাজার হাজার প্রশ্নের জবাব দিতেন। কিন্তু জবাবগুলি তিনিও যেমন ভাবে দিতেন এবং আমিও দিতে চেষ্টা করি, তা হওয়া চাই উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির দিক থেকে, গভীর জ্ঞানের মূল থেকে, তর্কবুদ্ধির অজ্ঞানতা সমর্থক কচ্‌কচি নয়। তা ছাড়া দিব্য সত্যকে বুদ্ধির বিচারের কাছেও হাজির ক'রে দেওয়া যেন না হয়, যাতে অনধিকারী বুদ্ধি তাই নিয়ে ন্যায় বিচার করতে বসে তাকে দণ্ড দিতে বা খালাস দিতে না যায়।

প্রঃ আপনি আমাদের যে সব চিঠি দেন তার মধ্যে কি প্রচুর শক্তি দেওয়া থাকে না?

উঃ হাঁ, তার মধ্যে শক্তি প্রয়োগ করা হয়।

×

প্রঃ যারা আপনাকে নিত্য চিঠি পাঠায় না, তারাও তো তাতে ঠকে না। এর কারণ কি?

উঃ হয়তো তাদের মধ্যে সাধনার তেমন চাপ আসেনি, কিংবা হয়তো স্পষ্ট কিছু অনুভূতির ধারা না পাওয়া পর্যন্ত তারা তাদের কোনো মুশকিলের কথা খুলে বলতে চায় না।

২৪-৯-১৯৩৩

×

প্রঃ কিন্তু এমন কি যারা নিজের অনুভূতি নিয়ে থাকে এবং আপনাকে কিছু লিখে জানাতে চায় খুব কমই, তাদের কি ভুল রাস্তায় যাবার অথবা অনুভূতির একঘেয়েমি আসার সম্ভাবনা থাকে না?

উঃ হাঁ, দুই রকমেরই আশংকা থাকে। কঠিন কোনো বিপত্তি যাদের ঘটেনি, তাদের বেলাতেও একই স্তরের অনুভূতির মধ্যে থাকারও আশংকা আছে। কিন্তু আবার অনেকে বেশি চাপ পেয়ে তাড়াতাড়ি এগোবার জন্য প্রস্তুত নয় বলেই কিছু লিখে জানায় না।

২৫-৯-১৯৩৩

×

প্রঃ প্রশ্ন করাতে কি যোগে সাহায্য হয়?

উঃ তোমার ভিতরে যা হচ্ছে তার সম্বন্ধে আলো পাবার জন্যই প্রশ্ন

হবে, সে কথা জানালে তাতে সমর্পণের পক্ষে সাহায্য হবে।

৩-৪-১৯৩৪

×

প্রঃ অনেক সময় এমন প্রশ্ন জাগে "ভগবান কী"? তাও কি লেখা উচিত?

উঃ লিখতে পারো, জবাব প্রত্যাশা কোরো না। নিজেদের সাধনায় বিপত্তির কথা ও অনুভূতির কথা জানাবার জন্যই লিখবে। দরকার হলে আমি জবাব দেবো, কিন্তু সর্বদা নয়।

×

যোগের কথা ছাড়া তুমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কি করবে তাই নিয়ে লেখার দরকার নেই। তার ব্যবস্থা নিজেই করবে। কেবল সাধনার ব্যাপারেই আমাকে জানাবে, তাতে ভুল হচ্ছে কি ঠিক হচ্ছে তাই নিয়ে আমি জবাব দেবো।

৭-৫-১৯৩৬

×

ঠিক কথা বললে জবাব দিই না, মনের দিকের ভুল বললে তা সংশোধন করি।

১০-৫-১৯৩৬

×

আমার চিঠি বুঝতে না পারা প্রাণগত মনের কারসাজি। মনকে শান্ত নীরব রেখে আলো পেতে চাইবে। নীরব মন ঠিক জবাব পেয়ে যাবে, আমি কিছু না লিখলেও।

৯-৬-১৯৩৩

প্রঃ আপনার চিঠি পড়তে হৃদয়ে একটা আলোড়ন জাগে, তা কি চৈত্যসত্তার?

উঃ যেখানেই প্রেম বা ভক্তি থাকে সেখানেই হয় চৈত্যের ক্রিয়া। জবাবগুলি পেলে তখন চৈত্যের সংস্পর্শ ঘটে, আমি যা বলেছি তা চৈত্যের কাছে পৌছয়।

২৬-৬-১৯৩৬

×

প্রঃ যেদিন আমার নূতন উন্মীলন হবে তা কি আগের থেকে জানানো যায় না?

উঃ নিশ্চয়ই না। ওরূপ মানসিক রীতিতে কাজ চলে না। অনুভূতি আসবে আপনা হতেই।

২-৫-১৯৩৬

×

বাহ্য নির্দেশ যা দেওয়া হয় তা ভিতরের ক্রিয়াকে সাহায্য করতে, বিশেষত যদি কোনো ভুল ক্রিয়াকে সংশোধন করতে হয় এবং সঠিক রাস্তার নির্দেশ দিতে হয়। প্রথম অবস্থাতেই এগুলোর দরকার হয়, যাতে মনের প্রশ্নের জবাব দেবার দরকার হয় প্রথম অবস্থাতেই মনের ক্রিয়াকে উৎসাহিত করতে।

×

প্রঃ বিরোধীশক্তিরা ফুসলায় যে আপনি পক্ষপাতিত্ব করছেন। তাতে মনে বিদ্রোহ জাগে।

উঃ হাঁ, সেটাই তো তাদের উদ্দেশ্য—ওতেই তাদের উদ্দেশ্য সফল

হয়---সাধককে ওতে তার আত্মার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয়।

৩-৫-১৯৩৫

চিঠির সাহায্য ও আভ্যন্তর সাহায্য

আমার লেখাগুলি কেবল মনকেই সাহায্য দেয় এবং তাও খুব কম, কারণ আমি যা লিখি তা কেউই ঠিক মতো বোঝে না---তাদের নিজেদের মনগড়া অর্থ ক'রে নেয়। কিন্তু আভ্যন্তরীণ সাহায্য হলো আলাদা জিনিস, তাতে কোনো গণ্ডগোল থাকতে পারে না, কারণ তা একেবারে চেতনার ভিতরে গিয়ে পৌঁছয়, কেবল মনে নয়।

আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ও স্কুলমাস্টার প্রণালী

আমাকে তেমন বলার সুযোগ না দিলে আমি কাউকে তার দোষগুলি দেখিয়ে দিতে যাই না। সাধকের নিজে চেতন হয়ে নিজেকে আলোর দিকে খুলে ধরা চাই, নিজের দোষ দেখে তাকে বর্জন ক'রে পরিবর্তন আনা চাই। আমাদের পক্ষে সব তাতে দোষ ধরে লেকচার দিয়ে এটা ওটা ত্রুটি দেখিয়ে দেওয়া ঠিক কাজ হয় না। ওটা হলো স্কুলমাস্টার প্রণালী---আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের ব্যাপারে তা চলবে না।

১০-৫-১৯৩৬

সাহায্যের বিরুদ্ধে দ্বাররুদ্ধতা

কাউকে সাহায্য দিতে আমি বিমুখ নয়, কিন্তু তাকে তার গ্রহণ করাও চাই। ঐরূপ অবস্থা এলে হয়তো তখন তুমি তিক্ততা ও রাগের বশে যাদের কাছে সাহায্য চাও তাদের বিরুদ্ধে দরজা বন্ধ ক'রে থাকো। এই ভাব থাকলে সাহায্যকে গ্রহণ করাও যায় না আর সাহায্য কোনো কাজেরও হয় না। আমি শুধু তোমাকে শক্তিই পাঠাতে পারি যা তুমি গ্রহণ করলে

তোমার অবস্থা পরিবর্তনের পক্ষে সহায়ক হবে; তাই আমি বরাবরই করি। কিন্তু দরজা যদি বন্ধ করা হয় তাহলে তা সার্থকভাবে কাজ করতে পারে না—অন্ততপক্ষে তখনই পারে না।

শ্রীঅরবিন্দের স্পর্শ

আমার স্পর্শ সর্বদাই রয়েছে; কিন্তু তা কেবল বাহ্য মাধ্যমের দ্বারা—অর্থাৎ কলমের লেখার দ্বারা—বোধ করলেই চলবে না, সরাসরি তার ক্রিয়া নিজের মনে ও হৃদয়ে ও প্রাণে ও দেহে বোধ করা চাই। তাহলে কঠিন কিছুই হবে না—কোনো বাধাই হবে না।

২৭-৩-১৯৩৩

×

বাহ্য স্পর্শ যদিও সাহায্যকারী, কিন্তু বাস্তব ভাবে নিতে জানলে আভ্যন্তরীণ স্পর্শ আরো বেশি সাহায্যকারী—তা ছাড়া বাহ্য স্পর্শ পাওয়া সব সময়ে সম্ভব হয় না, কিন্তু আভ্যন্তরীণ স্পর্শ সব সময়েই মিলতে পারে।

ব্যক্তিগত স্পর্শ ও নির্ব্যক্তিক প্রচেষ্টা

আমি তাই বিবেচনা করছি যে ইংলণ্ড বা আমেরিকার বেলাতে নির্ব্যক্তিক ভাবে দার্শনিক দিক ও যোগের দিক নিয়ে কাজ শুরু করা যায়, আপাতত ব্যক্তিগতের দিকটা পিছনে রেখে, যতদিন তারা ব্যক্তিগত ভাবে স্পর্শ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে না ওঠে—সেই চেষ্টাই আমরা এখন করছি। ভারতের কথা আলাদা, এখানকার সাধারণ মনস্তত্ত্ব অন্য রকমের, তা ছাড়া এখানে একটা ঐতিহ্যের ব্যাপার রয়েছে গুরু-শিষ্য সম্পর্কের।

মে ১৯৪৩

গুরু-শিষ্য

> প্রঃ কেমন গুরুর কেমনতর সব শিষ্য আমরা! আমার তো মনে হয় আপনি যদি আরো ভাল কোনো আধার নির্বাচন করতেন তা হলেই ভাল হতো—ধরুন অমুকের মত কেউ।

উঃ শিষ্য সম্বন্ধে আমি এক মত! তবে কথা হচ্ছে, যদি ধরেই নেওয়া যায় যে আরো ভাল আধার পাওয়া যেতো, তারা কি হতো সাধারণ মানুষের নমুনা? কয়েকজন অসাধারণ মানুষের নমুনা নিয়ে সমস্যার সমাধান হতো না। আর একটি প্রশ্ন হল—তারা কি আমার পথে চলতে রাজি হতো? আরো একটি প্রশ্ন—তাদের যদি পরীক্ষায় ফেলা হতো তখন হঠাৎ তাদের মধ্যে থেকে সাধারণ মানুষটি কি বেরিয়ে আসতো না?

৩-৮-১৯৩৫

আশ্রমের বাইরে যাওয়ার অনিষ্টকারিতা

> প্রঃ আপনি যে আশ্রমবাসীদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেন তার মানে কি বাইরে যাওয়ায় তাদের কোনো ক্ষতি হয় না?

উঃ না, তার মানে তা নয়। এর মানে হল এই যে, যাদের প্রাণ সর্বদা 'যাই যাই' করছে আর তারাও তার সমর্থন করছে, এইসব লোকেদের আমরা সর্বদা আটকে রাখতে পারিনে। তারা যাবার অনুমতি পায় আর ঝুঁকিটাও তাদের নিজেদেরই নিতে হয়।

১৮-৩-১৯৩৭

যোগে আগ্রহ এবং অর্থদান

> প্র : অমুক টাকার জন্যে ধনীদের দ্বারস্থ হতে চায়, কিন্তু সে জানে না কেমন করে তা করতে হবে....সে বলছে যদি তাদের কাছে সোজাসুজি টাকার জন্যে যাওয়া যায় তাহলে সাড়া পাওয়া যাবে না। তার পরিকল্পনা হল, কোনোরকমে তাদেরকে আমাদের কাজে আগ্রহ-সম্পন্ন করা, যাতে তারা নিজে হতেই টাকা দেয়....এ বিষয়ে আপনার উপদেশ নিতে আমাকে সে অনুরোধ করেছে।

উ : যদি ওভাবে কাজ করা হয় তাহলে অমুককে বছরের পর বছর অপেক্ষা করে থাকতে হবে ফললাভের জন্যে। লোকেরা যদি আগ্রহান্বিতও হয়, এমন কি তারা যদি যোগাভ্যাসও করে তবু না চাইলে টাকা দেবার কথাটা তাদের মনে হয় না—প্রাণপ্রকৃতিতে ঔদার্যসম্পন্ন কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া। এই কাজে আর এই যোগে লোকেদের উৎসাহিত করা, সে না হয় হল—তবে শুধু এইটাই যথেষ্ট হবে না, তাদের এটাও জানা দরকার যে টাকার প্রয়োজন আছে আর দেবার কথাটা তাদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া চাই।

১৩-৩-১৯৩৩

শ্রীঅরবিন্দের করুণা

> প্র : যে ফুলটি আপনার করুণার প্রতীক তা এমন ক্ষণ-স্থায়ী ও শীঘ্র শুকোয় কেন?

উ : আমার করুণা ফুলের প্রতীকের মতো তাড়াতাড়ি শুকোয় না। ফুল জিনিসটাই শাশ্বত জিনিসের ক্ষণিক মুহূর্তের প্রতীক মাত্র।

৯-৮-১৯৩৬

কাজ ও সময়

তুমি এ কথা ভেবে দেখ না যে চিঠিপত্র লেখা ও রিপোর্ট দেখা প্রভৃতির জন্য আমার ১২ ঘন্টা সময় লাগে; এই নিয়ে আমি বিকেলে ৫ ঘন্টা আর ভোর ৬টা পর্যন্ত সারা রাত্রি কাটাই। কাজেই যখন অনেক রকম প্রশ্ন করা খুব লম্বা চিঠি আসে তখন তার জবাব তৎক্ষণাৎ দেওয়া যায় না। কিন্তু তারই জন্য এত বিচলিত হয়ে ওঠা আর যোগ ছেড়ে দিতে চাওয়ার কোনো মানে হয় না।

১৭-৬-১৯৩৩

×

বই পড়ার সময় আমার নেই। আমায় যে কাজ করতে হয় তার জন্য এই চব্বিশ ঘন্টাই যথেষ্ট নয়।

৩-৯-১৯৩০

×

প্র ঃ আমার টাইপ-করা লেখাটির কী হল? নিষ্ক্রিয় সুখোপভোগরত?

উ ঃ ওগো প্রিয় মহাশয়, তুমি যদি একবার দেখতে যে আমি বিকেল থেকে সকাল কাগজের মধ্যে নাক গুঁজে কেবল পাঠোদ্ধার আর পাঠোদ্ধার, কেবল লেখা, লেখা আর লেখা, এই নিয়ে আছি তাহলে শিষ্যের পাষাণ-হৃদয়টিও বিচলিত হতো, আর তুমি টাইপ-করা কাগজগুলো আর নিষ্ক্রিয়-তার কথা বলতে না। আমি (অন্তত এখনকার মত) চিঠিপত্রের পাগলা-ঝোরাকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি। প্রসাদ ও ভক্তসঙ্ঘ উপ-দ্রুত অমুকের মত আমিও আমার ভাগ্যকে মেনে নিয়েছি। কিন্তু অন্ততঃ টাইপ-করা কাগজের কথা বলে গোদের উপর বিষফোঁড়া আর চাপিয়ো না।

কৃষ্ণ ও চিঠিপত্র

প্রঃ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় আপনার চেয়ে বেশী অবসর-যাপনের সুযোগ পেতেন। সেকালে লিখনশাস্ত্রের এত উন্নতি হয়নি, তাই তাঁকে এত প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হতো না। তবে অবশ্য মাঝে মাঝে হঠাৎ বিপন্ন ভক্তের আহ্বানবাণী পেতেন, যেমন পেয়েছিলেন যখন দুর্বাসা এক-পাল শিষ্য নিয়ে ভোজনার্থে হঠাৎ হাজির, অথচ এক গ্রাসও অন্ন ছিল না হেঁসেলে। হয়তো শ্রীকৃষ্ণকে আপ-নার চেয়ে বেশী অলৌকিক-কাণ্ড ঘটাতে হতো, তবে অবশ্য এ কথাও আমার ভোলা উচিত হবে না যে রোগা-দির ব্যাপারে আপনার কাছেও নিশ্চয় অনবরত প্রার্থ-নাদি আসছে, আরো অনেক কিছু আসছে নানাভাবে। উপরন্তু শ্রীকৃষ্ণকে প্রকৃতপক্ষে কিছু সংখ্যক লোকের গুরুগিরি করতে হয়নি।

উঃ বটেই তো, এ বিষয়ে তিনি বিবেচনার কাজই করেছিলেন, আর তাঁর ভাগ্য ভাল বলতে হবে যে সেকালে চিঠিপত্রের এত রেওয়াজ ছিল না––তবে তাতেও তিনি রক্ষা পাননি। মহাভারতের একটা মর্মান্তিক অধ্যায়ে কৃষ্ণের দুর্দশা বর্ণিত হয়েছে দ্বারকায় তাঁর আপন জনেদের ব্যাপার নিয়ে। ব্যাপারটি বেশ আলোকপ্রদ––তবে দুর্ভাগ্যক্রমে কোথায় যে ঘটনা-টির উল্লেখ আছে তা ভুলে গিয়েছি। আহ্বানাদিতে বিশেষ কিছু এসে যায় না। কারণ শক্তিদান ব্যাপারটি অন্তর্লোকের, তাতে বেশী সময় নেয় না, তবে দৈনন্দিন বা অনবরত ফিরে ফিরে আসছে এই রকম সব বাধাবিঘ্নের ক্ষেত্রগুলি ছাড়া। দুর্বাসার কথা বলতে গেলে, সে যদি আসতো তাহলে অমুককে বলা যেতো––"যাও, গিয়ে সামলাও" কিম্বা দুর্বাসাকে যুক্তিহীন না হবার জন্যে একটি আন্তঃসংবাদ পাঠানো যেতে পারতো।

৪-৯-১৯৩৬

অন্তরালবর্তী থাকার কারণ

অন্তরালে থাকা আমার পক্ষে নতুন নয়, আর চিঠির মাধ্যমে সংস্পর্শ দেওয়াও নতুন নয়---বহুদিন থেকে তাই চলছে। কোনো ব্যক্তিগত কারণে বা পছন্দ অপছন্দের জন্য এমন নিয়ম করা হয়নি; একে তো চিঠি প্রভৃতি-তেই অধিকাংশ সময় ও শক্তি লেগে যাওয়াতে এমন আশংকাই হচ্ছিল যে আমার আসল কাজ বাকী পড়ে থাকবে, যদি এ অবস্থার পরিবর্তন করা না হয়,---আর বাইরে যতটুকু যা করতাম তার ফল আশ্রমের উন্নতির দিক দিয়ে খুবই কম। এখনকার এই জগৎ-সংকটের সময়ে আমাকে সর্বক্ষণই হুঁশিয়ার হয়ে একাগ্রতা নিয়ে থাকতে হচ্ছে যাতে কোনো দুর-পনেয় দুর্গতি এসে না পড়ে,---আর তা ছাড়া ভিতরকার বড়ো রকমের আধ্যাত্মিক কাজের জন্যও আমাকে সমানেই অবহিত থাকতে হচ্ছে---তাই এখন আর ও নিয়ম বদলানো সম্ভব নয়। (তা ছাড়া ব্যক্তিগত সাধকের পক্ষেও তারই ভালোর জন্য এই বৃহৎ আধ্যাত্মিক কাজ সাধিত হওয়া দরকার, কারণ এর সাফল্য ঘটলে তখন সাধকের সকল বাধা-বিপত্তি সহজেই দূর করা যাবে।) কিন্তু তথাপি আমি কেবল তোমারই জন্য ও নিয়ম ভেঙেছি! তবুও বুঝলাম না যে কেমন ক'রে সেটা আমার স্নেহের অভাব বা কঠিন অবহেলা বলে ধরে নেওয়া হতে পারে।

২৯-৫-১৯৪২

×

না, এই যোগে কোনো গোমড়া মুখ, রুক্ষ ব্যবহার, কাঠিন্য বা শুষ্ক গাম্ভীর্যের স্থান নেই। আমি যে আমার ঘরের মধ্যে নিঃসঙ্গ রয়েছি তা নির্জনতা ভালোবাসি বলে নয়, আর যদি বলো যে এই বাহ্য ব্যবস্থা আমার যোগের উচ্চাবস্থাতে ওঠার একটা বিশেষ লক্ষণ কিংবা নির্জনতাই তার লক্ষ্য, তাহলে কথাটা হাস্যকর হবে। কিন্তু তোমার কোনো ভাবনা নেই; তোমাকে নির্জনে থাকতে বলা হচ্ছে না।

১৯৩২

×

ভবিষ্যতে সব সম্পর্ক কেটে দেবো এমন কোনো বাসনা আমার নেই। যা কিছু নিষেধ ব্যবস্থা দেখ তা অনিবার্য কারণে। অন্তরালবর্তী হওয়া আমার পক্ষে অপরিহার্য হয়েছিল, নতুবা এখন যেমন লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছি তা হতো না। লক্ষ্যে পুরোপুরি গিয়ে পড়লে তখন অন্য-রকম হবে। তুমি যে অনেকক্ষণের মতো অমন অপূর্ব শান্তি লাভ করে-ছিলে তা আমারই আভ্যন্তরীণ চাপের ফলে; ওর দামটা আমি কোনো দ্বিতীয়জন কৃষ্ণকে দিতে রাজী নই।

১৪-৮-১৯৪৫

×

আমি যে অন্তরালবর্তী হয়ে তফাতে থাকি তা চৈত্যের দরুন নয়—যে বিরাট বাধার সম্মুখীন আমাকে হতে হচ্ছে তারই মোকাবিলার জন্য। ঐ চৈত্যের সাহায্যে আর তোমার মতে তথাকথিত (কিছু মনে কোরো না!) অতিমানসের সাহায্যে যখন সে সব বাধা কেটে যাবে, তখন এই তফাতে থাকাও ঘুচে যাবে।

×

প্রঃ এখান থেকে যাবার আগে আমি আর একবার শ্রীঅরবিন্দের দর্শন পেতে চাই। এটা নিয়ম বহির্ভূত হলেও আশা করি একটি ভক্তের জন্য সে নিয়ম ভঙ্গ করবেন।

উঃ সেটা অসম্ভব হবে। এখনকার অবস্থাতে কাউকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি-গত ভাবে দর্শন দেওয়া চলে না—এটা নিয়ম বলে নয়, শ্রীঅরবিন্দ যে কাজে এখন নিযুক্ত তার জন্যই এটা প্রয়োজন।

১৭-৮-১৯৩৪

×

প্রঃ কখন আপনি অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসবেন?

উঃ সে কথা এখন বলার নয়। যে উদ্দেশ্যে অন্তরালে থাকা তার পূরণ হোক আগে।

২৫-৮-১৯৩৩

×

প্রঃ বছরে তিনবারের বদলে মাসে একবার দর্শন দিলে ভালো হয়। তা কি সম্ভব?

উঃ মাসে একবার বাইরে দেখা দিলে আমার দেখা দেওয়াতে যে ফল হয় তার গুণ এক তৃতীয়াংশ কমে যাবে।

২-৩-১৯৩৩

×

প্রঃ অতিমানসের অবতরণের পর কি আপনি অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসবেন?

উঃ সেটা তখনই স্থির করা হবে।

২৩-৯-১৯৩৫

×

প্রঃ সর্দার বল্লভভাই গ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কবে আপনি বেরিয়ে এসে দেশের নেতৃত্ব নেবেন। গ তাঁকে বলেছে যে সেরূপ আশা করা যায় না। হয়তো বল্লভভাইএর ঐ প্রশ্নের কিছু একটা অর্থ ছিল যা গ বুঝতে পারেনি।

উঃ হতে পারে। বল্লভভাই হয়তো অন্যেদের চেয়ে ভালো ভাবে এ কথা বোঝেননি যে বৃহত্তর ভারতের (বা জগতের) বৃহত্তর উন্নতির জন্য বাইরে না বেরিয়েও আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার জীবনে তা চলতে পারে। রবীন্দ্রনাথও ঐরূপ প্রত্যাশা করেছিলেন, আমি তা না করাতে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

৯-৩-১৯৩৫

শ্রীঅরবিন্দের আলো

শ্রীঅরবিন্দের আলো প্রভাসিত মনের আলো নয়---এ হল দিব্য দীপ্তি যা যে কোনো স্তরে কাজ করতে পারে।

৭-৯-১৯৩৩

×

প্রঃ দুদিন পূর্বে স্বপ্নে দেখলাম শ্রীঅরবিন্দ আমার দিকে আসছেন, তাঁর দেহ এবং পোষাক সমস্তই নীল রংএর। অন্য কোনো রংএর বদলে ঐ রংই কেন দেখলাম?

উঃ মূলতঃ ঐ নীল রংএই শ্রীঅরবিন্দের অভিব্যক্তি হয়।

২৩-৬-১৯৩৩

×

ফিকে নীল রং আমারই। যাকে বলে ফিকে ল্যাভেণ্ডার ব্লু, কিন্তু তাতেই খুব উজ্জ্বল।

৬-৮-১৯৩২

×

নীল রং‌এর ঘনত্বের উপর নির্ভর করছে। ফিকে নীল রং হয় সাধারণত দীপ্ত মানসের বা কতকটা বোধির। শুভ্র নীল হলো শ্রীঅরবিন্দের বা কৃষ্ণের আলো।

×

নীল রং অনেক রকম আছে, কোনটা কি বলা কঠিন। সাধারণত গভীর নীল হলো উচ্চ মানসের, ফিকে নীল দীপ্ত মানসের——সাদাটে নীল ষ্ণর (শ্রীঅরবিন্দেরও তাই)।

×

বিভিন্ন নীল বিভিন্ন শক্তির (প্রকৃত নীলের সঙ্গে বিষের সম্পর্ক নেই)। সাদাটে নীলকে আমারই বলা হয়——কিন্তু এমন কথা নয় যে কেবল ঐ রংই আমার থেকে ঘটবে।

২২-১১-১৯৩৩

×

প্রঃ আজকাল শ্রীঅরবিন্দের আলো প্রায়ই দেখি কিন্তু বিভিন্ন রূপে——কখনো একটি বড়ো নক্ষত্রের মতো, কখনো চাঁদের মতো, কখনো ঝলকের মতো। একই রূপে কেন দেখি না?

উঃ ঘটনার বিভিন্নতায় সেটা হয়। একই রকম সব সময়ে হবে কেন?

২১-৪-১৯৩৩

×

প্রঃ শ্রীঅরবিন্দের আলো মনের মধ্যে কি উপায়ে পেতে

পারি?

উঃ ধৈর্য ধরে আস্পৃহা করতে থাকলে নিশ্চয় তা মিলবে। কিন্তু মূল কথা হলো, যদি সেই আলো পেতে চাও তাহলে অন্য সব মানসিক প্রভাবগুলি বর্জন করতে হবে।

×

প্রঃ "অন্য সব মানসিক প্রভাবকে বর্জন করতে হবে" এ কথার মানে কি? তার মানে কি এই যে আমি শ্রীঅরবিন্দের বই ছাড়া অন্য কোনো বই পড়ব না, বা অন্য কোথাও কিছু শুনে বা জেনে শিখব না?

উঃ বই পড়া বা শেখার প্রশ্ন নয়। কোনো মেয়ে যখন কাউকে ভালোবাসে, তার মন তখন আপনা হতেই তার সেই প্রিয়জনের ছাঁচে গড়া হয়ে যায়, সে ভাবটা কেটে গেলেও তার প্রভাব তখনও থেকে যায়। এখানে কেবল বিশেষ ক'রে কোনো অমুকের প্রভাবের কথাই বলা হচ্ছে না। এ কেবল সাধারণ ভাবেই বলা হয়েছে যে অন্য কোনো প্রভাব যেন না আসে।

৩০-৫-১৯৩২

×

প্রঃ রিসেপ্শন রুমে আপনার ফোটোর সামনে গেলে বোধ হয় যেন আপনার বিভূতি প্রকাশ পাচ্ছে, বিশেষ রকমের একটা আলো ওতে রয়েছে।

উঃ সাধকরা ফোটোর সামনে বোধ হয় নিজেরাই সে আলো নিয়ে যায়।

২৪-৮-১৯৩৪

কয়েকটি সূক্ষ্ম-দর্শনে শ্রীঅরবিন্দকে দেখা

প্র ঃ আমি ধ্যানের পর রিসেপ্শন রুমে আপনার ফোটোর দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট দেখলাম যে ছবির কাঁধদুটো নড়ছে, যেন নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলছে।

উ ঃ প্রাণস্তরে একটা গতিস্পন্দ চলছিল আর তোমার সূক্ষ্ম দৃষ্টি সে দিকে খুলে ধরেছিল।

২২-৩-১৯৩৩

×

প্র ঃ প্রার্থনায় বসে দেখলাম যেন শ্রীঅরবিন্দ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে দাঁড়ালেন। এর অর্থ কি হবে?

উ ঃ বোধ করি এই যে দিব্য চেতনাকে ধাপে ধাপে নামিয়ে তাকে বস্তুর স্তরে নিয়ে আসা হলো।

২৩-৯-১৯৩৩

×

প্র ঃ আজ ধ্যানে বসে দেখলাম যে শ্রীঅরবিন্দের আলোর মধ্যে নটরাজ শিব বহু হাত বিস্তার ক'রে নিজেকে অভি-ব্যক্ত করছেন। এর অর্থ কি হবে?

উ ঃ তা ভগবৎ অভিব্যক্তিরই লক্ষণ।

×

প্র ঃ তার পর দেখি শ্রীঅরবিন্দের আলো ও একটা লাল আলো গোল পৃথিবীর আকার নিলে। তার মানে কি ঐ

আলো পার্থিব স্তরে অভিব্যক্ত হচ্ছে?

উঃ হাঁ।

×

প্রঃ তার পর দেখি শ্রীঅরবিন্দের আলো অন্য রকম এক ফিকে নীল আলোর সঙ্গে সমুদ্রের উপরে। তার মানে কি বিশাল চেতনাতে ঐ আলো বোধিগত মনশ্চেতনার দ্বারা কাজ করছে?

১৫-১০-১৯৩৩

উঃ হাঁ।

×

প্রঃ কাল রাত্রে আমি দেখলাম যেন
চেয়ারে বসে কিছু লিখছেন। তাঁর মাথার পিছনে ঘিরে আছে এক সবুজ আলো। এর অর্থ কি হবে?

উঃ সবুজ আলো হলো সক্রিয় প্রাণশক্তির (কর্মের)। আমি যখন লিখছিলাম––অর্থাৎ কাজ করছিলাম––তখন আমার মাথার পিছনে সবুজ আলো দেখা যাবে এটা স্বাভাবিক।

৫-১১-১৯৩৩

×

প্রঃ গত রাত্রে স্বপ্নে আপনাকে দেখলাম আপনি বাইরে বেরিয়ে এসেছেন, বয়স কম, শ্যামল দেহ। ভাবলাম, এমনই কি শ্রীঅরবিন্দের পর্বেকার চেহারা ছিল?

উঃ তা নয়। ওটা বোধ হয় একরূপ সূক্ষ্ম দেহ, আমার ভিতরকার শিব অংশ হবে। নিজেকেও আমি ঐরূপ দেখেছি আমার শিব অংশ সম্পর্কে।

১২-০২-১৯৩৪

অলক্ষ্যে দর্শন ও বাণী শ্রবণ

> প্রঃ দর্শন ও বাণীর দ্বারা গুরুর সাহায্য মেলে, ওতে আমরা আপনার ও মায়ের কাছে অনেক সাহায্য পেতে পারি, চিঠি লেখার দরকার হয় না। সরাসরি জানতে পারি।

উঃ হাঁ, কিন্তু আগে জানা দরকার যে তুমি সঠিক ভাবে তা নিতে পারবে কিনা। আগে তেমন জ্ঞান ও বিচারণা শক্তি অর্জন করো।

৯-৭-১৯৩৬

×

সূক্ষ্মদর্শন ও সূক্ষ্মস্বর সম্পর্কে অমুক যে তাঁর শিষ্যদের নিরুৎসাহ করেছিলেন তার কারণ অন্তঃপুরুষ ও বোধির উপলব্ধি—অন্য কথায় অধ্যাত্ম-মানসের পূর্ণতা—তাঁর লক্ষ্য ছিল। সূক্ষ্মদর্শন ও সূক্ষ্মস্বর গুহ্য অন্তরিন্দ্রিয়ের অন্তর্গত। তাই তিনি এ ব্যাপারটার প্রতি তাদের আগ্রহান্বিত হতে দেননি। আমিও সূক্ষ্মদর্শন ও সূক্ষ্মস্বরের সম্পর্কে কাউকে কাউকে নিরুৎসাহ করি। তার কারণ আমি দেখতে পাই যে তারা মিথ্যা দর্শন আর মিথ্যা স্বরের দ্বারা ভুল পথে চালিত হচ্ছে বা হবার উপক্রম করছে। এর অর্থ অবশ্য এ হয় না যে সূক্ষ্মদর্শন ও সূক্ষ্মস্বরের কোনো মূল্য নেই।

৯-৭-১৯৩৬

১৫ই অগস্টের দর্শন

প্র : ক আমাকে বললে যে ১৫ই অগস্ট দর্শন দিনের আর মাত্র দশদিন বাকি। আমি বললাম, প্রত্যেকটা দিনই দর্শন দিন মনে করা উচিত।

উ : ঠিক কথা। প্রত্যেকটি দিনেই উচ্চশক্তির অবতরণ ঘটতে পারে, উচ্চ চেতনা নেমে আসতে পারে। এই ভাব নিলে ১৫ই অগস্ট তারিখটি আরো সার্থক হয়।

৪-৮-১৯৩৪

×

প্র : দর্শন দিনে আনন্দ বা আলো বা শক্তি পাবার বদলে দিনটা নীরস হলো।

উ : তা নির্ভর করে তোমার নিজের অবস্থার উপর, তখন আলো বা আনন্দ দেখা দেবে অথবা বিরোধী ভাব জাগবে। দেহচেতনার সেই অন্ধ অজ্ঞান সাধারণ বিরোধী ভাবটাই জেগেছিল। ঐ দিনটি যেমন প্রচুর আলোর দিন তেমনই প্রচুর বিরোধিতারও দিন।

×

প্র : দর্শন করতে গিয়ে আমি দেখলাম স্বয়ং শিব বসে আছেন, প্রচুর আনন্দও পেলাম। সেই ভাবটা দুই তিন দিন ছিল তার পর মিলিয়ে গেল।

উ : তাতে হতাশ হয়ো না। ভাবটা মিলিয়ে যায়নি, কেবল ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়েছে। উচ্চ চেতনা না আসা পর্যন্ত এই রকমই হয়। এতে যেন তুমি কোনোরূপ উদ্যমহারা হয়ো না, জিনিসটা ভিতরে থিতিয়ে যেতে সময় দাও, নীরব হয়ে শান্ত থেকে সময় দাও নতুন অনুভূতি আসবার জন্য

অথবা নতুন কোনোরূপ উন্নতি আসবার জন্য।

শ্রীঅরবিন্দের শক্তির ক্রিয়া

নিশ্চয়, আমার শক্তি কেবল এই আশ্রম ও তার অবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তুমি তো জানোই যে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা হচ্ছে যুদ্ধের শুভ পরিণতির জন্য আর মানব জগতের পরিবর্তন আনবার জন্য। তা ছাড়া আশ্রমের বাইরে এবং যোগ সাধনার ক্ষেত্র ছাড়াও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এ শক্তিকে প্রয়োগ করা হয়, যদিও তা করা হয় নীরবে আধ্যাত্মিক ক্রিয়াতে। তবে এই আশ্রমই হলো সে কাজের কেন্দ্র, আর যোগ করা না হলে সে সব কাজও হতে পারত না এবং তার কোনো ফলও হতো না।

১৩-৩-১৯৪৪

যোগশক্তির স্থূল বাস্তবতা

অদৃশ্য শক্তি ভিতরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই ধরা ছোঁওয়ার মত ফল প্রসব করবে——এই হল যৌগিক চেতনার সমগ্র অর্থ। যোগশক্তি সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য যে যোগশক্তি কেবল একটা শক্তির অনুভূতিই আনবে কিন্তু কোনো ফল নয়——এ ভারি অদ্ভুত কথা। এ রকম মিথ্যা-মায়ায় কে সন্তুষ্ট হবে আর তার নাম দেবে শক্তি? আমরা যোগশক্তি সম্বন্ধে যা বলি তা বলতাম না যদি না আমাদের এমন হাজার হাজার উপলব্ধি হতো যে আন্তর শক্তি মনের পরিবর্তন আনতে পারে, তার শক্তি বাড়াতে পারে, নতুন শক্তি এনে দিতে পারে, নিয়ে আসতে পারে জ্ঞানের নতুন সব স্তর, প্রাণের গতিবিধির উপরে কর্তৃত্ব আনতে পারে, চরিত্রের পরিবর্তন করতে পারে, মানুষ ও অন্যান্য জিনিসের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, নিয়ন্ত্রণ করতে পারে দেহ-যন্ত্রের অবস্থাদি ও ক্রিয়াবলী, একটা বাস্তব চলিষ্ণু শক্তি হিসেবে অন্যান্য শক্তির উপরে কাজ করতে পারে, ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তা ছাড়া এই শক্তি যে ধরা-ছোঁওয়ার মত আর স্থূল বাস্তব তার পরিচয় কেবল তার ফলে নয়, তার গতিবিধিতেও।

আমি যখন যোগশক্তির অনুভূতির কথা বলি, তখন কেবল একটা অস্পষ্ট অনুভবের কথা বলিনে, বলি এমন একটা বাস্তব উপলব্ধির কথা যার ফলে সেই শক্তিকে চালনা করা যায়, নিজের প্রয়োজন মত তাকে নাড়াচাড়া করা যায়, লক্ষ্য করা যায় তার গতিবিধি, সচেতন হওয়া যায় তার ঘনত্ব ও তীব্রতা সম্বন্ধে, আর একই ভাবে অন্য শক্তিদের, হয়তো বা বিরুদ্ধ শক্তিদের সম্বন্ধেও। যোগসাধনার ফলে এ সবই সম্ভব আর স্বাভাবিক।

এ এমন শক্তি নয় যা সর্ত বা সীমা না মেনে কাজ করে, অবশ্য যদি তা অতিমানস শক্তি না হয়। যে সব সর্ত বা সীমা মেনে নিয়ে যোগ বা সাধনা সম্পন্ন করতে হবে তা স্বেচ্ছাচারী বা খামখেয়ালী কিছু নয়; বস্তুর প্রকৃতি থেকেই তারা জাগছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে সাধকের সঙ্কল্প, গ্রহণ-সামর্থ্য, অঙ্গীকার, আত্ম-উন্মীলন আর সমর্পণ। এ সব মেনে নিয়েই, এই অনুসারেই যোগশক্তিকে কাজ করতে হয়। তবে যদি যোগশক্তি পরাৎ-পরের অনুমতি পায় তাহলে সে সব কিছুকে অতিক্রম করে যা করার তা করতে পারে, কিন্তু সে অনুমতি কদাচিৎ মেলে। একমাত্র অতিমানস-শক্তি যদি পুরোপুরি নেমে আসে, কেবল অধিমানসের মধ্যে দিয়ে প্রভাব বিস্তার না করে', একমাত্র তখনই এ সব বিষয়ে চরম ও চূড়ান্তভাবে কাজ করা যেতে পারে। পরমের অনুমতি তখন আরো অনায়াসলভ্য হবে। কারণ সত্যের ধর্ম তখন কর্মরত হবে, অজ্ঞানের ধর্মের পাল্লাটা কেবল উল্টোদিকে ঝুঁকতে পাবে না।

তবু যোগশক্তি সর্বদাই ধরাছোঁওয়ার মত বাস্তব, তার ফলও স্পর্শ-গোচর যার বর্ণনা আমি দিয়েছি। কিন্তু তা অদৃশ্য—একটা ঘুঁষি দেওয়া হলে বা মোটরগাড়ীর ধাক্কায় কেউ পড়ে গেলে যে দৈহিক ইন্দ্রিয়-সংবেদন জাগে, এ তা নয়। যোগশক্তি যে আছে আর কাজ করছে তা মাত্র দৈহিক মন কেমন করে জানতে পারে? ফলের দ্বারা? কিন্তু কেমন করে তা জানবে যে ফলটা আসছে যোগশক্তি থেকেই, অন্য কিছুর থেকে নয়? দুটো উপায় আছে, তার একটা অবলম্বন করতেই হবে। হয় দৈহিক মন চেতনাকে ভিতরে যেতে দেবে, আন্তর জিনিসগুলির সম্বন্ধে যাতে সচেতন হওয়া যায়, অদৃশ্য আর অতিদৈহিক অভিজ্ঞতাগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে। নতুন নতুন সামর্থ্যের উন্মোচনে দৈহিক মন তখন এই সব শক্তি সম্বন্ধে সচে-তন হয়ে ওঠে, এই সব শক্তির ক্রিয়া দেখতে পায়, সেগুলোকে অনুসরণ করতে পারে, ব্যবহার করতে পারে ঠিক যেমন বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির অদৃশ্য

শক্তিগুলিকে ব্যবহার করেন। কিম্বা থাকা দরকার শ্রদ্ধা, এই শ্রদ্ধা নিয়ে সাধক সব কিছু লক্ষ্য করবে আর নিজেকে উর্ধ্ব-শক্তির দিকে খুলে ধরবে। সে লক্ষ্য করবে যে যখন শক্তিকে ডাকা হয়েছিল তার কিছুদিন পর থেকেই ফল পাওয়া যেতে লাগল, তারপর তা ফিরে আসতে লাগল, কেবলি ফিরে আসতে লাগল, আরো পরিষ্কার ধরাছোঁওয়ার মত ফল পাওয়া যেতে লাগল, ক্রমবর্দ্ধিত মাত্রায়, ক্রমবর্দ্ধিত ফলপ্রাপ্তির ঘনত্বে, ক্রিয়ারত শক্তি সম্পর্কে জাগল অনুভূতি আর অবগতি, শেষে উপলব্ধিটি হয়ে দাঁড়াল দৈনিক, নিয়মিত, স্বাভাবিক, সম্পূর্ণ। এই হল দুটি প্রধান উপায়। একটি হল ভিতরের যা ভিতর থেকে বাইরের দিকে কাজ করে চলে। আর একটি হল বাইরের, যা বাইরে থেকে আন্তর শক্তিকে ডেকে আনে যতক্ষণ না সেই শক্তি জড় আবরণ ভেদ করে বাইরের চেতনায় দেখা দেয়। কিন্তু এ দুটির কোনটিই হতে পারে না যদি কেউ কেবল বহির্মুখী মনোভাবকেই আঁকড়ে ধরে থাকে; যদি বাইরের স্থূল বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেয়, ভিতরের বাস্তবতাকে এর সঙ্গে যোগ করে দিতে অস্বীকার করে, কিম্বা দৈহিক মন যদি প্রতিপদে সন্দেহের তুফান তুলে যে সব অভিজ্ঞতা জন্ম নিচ্ছে তাদের বাড়তে না দেয়। এমন কি বৈজ্ঞানিকও যদি নতুন কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় তাঁর মনকে ঐরকম আচরণ করতে দেন তাহলে তিনিও কখনই সফল হতে পারেন না।

তা আমার ভুল হয়ে গেছে "কলম দিয়ে চেঁচিয়ে বলা" ঐ কথাটি যে আমার শক্তি প্রয়োগ করেছিলাম তোমার গানের গ্রামোফোন রেকর্ডের সাফল্য ঘটাবার জন্য। যেহেতু আমার এখন একমাত্র কাজই হলো এই শক্তিকে নিত্য কাজে লাগানো—কেবল চিঠি লেখা ছাড়া, কিন্তু তা বাস্তব ক্রিয়া হলেও ঐ শক্তিকে প্রয়োগ করা ভিন্ন তাও করতে পারতাম না—সেই হেতু অসাবধানে ঐ ভুলটা ক'রে ফেলেছি। অবশ্য তা বোকামি হয়েছে, কারণ আধ্যাত্মিক শক্তি এবং তার ক্রিয়া তো চোখে দেখা যায় না, তাহলে তা বিশ্বাস হবে কেমন ক'রে? কেবল তার ফলটাই দেখবে, কিন্তু তা যে ঐ শক্তিরই ফল তা কি ক'রে জানবে? তা যে বাস্তব নয়।

কিন্তু তুমি বাস্তবের যে দৃষ্টান্তগুলি বলেছ তাতে আমার গোলমাল

ঠেকছে। কোনো কল্পকের পরিকল্পনা কেমন ক'রে বাস্তব হয়? কোনো একটা ব্যাপার যখন ঘটল, তুমি বললে এটি তার পরিকল্পনার ফল। কিন্তু সেই পরিকল্পনা আগে ছিল তার মনের মধ্যে, আমি যোগী কিংবা চিন্তাদ্রষ্টা না হলে অন্যের মনের কথা জানব না, তাকে বাস্তব বলতে পারব না। সে হয়তো তাই নিয়ে কিছু বলেছে বা করেছে, কিন্তু তা আমি নিজে দেখিনি বা শুনিনি, সুতরাং আমার কাছে তা বাস্তব নয়। আর যদিও কিছু দেখে থাকি বা শুনে থাকি, তবু সেটা যে তারই পরিকল্পনা ছিল বা তারই পরিকল্পনার ফলে কিছু ঘটেছে, এ-কথা মানতে আমি বাধ্য নই। এমন হতে পারে যে হঠাৎ একটা ঝোঁক আসাতে সে কতকগুলো কাজ করে গেছে তার দ্বারা দৈবাৎ সেই ফলটা ঘটে গেছে, আসলে কোনো পরিকল্পনাই ছিল না।

আর তুমি যখন সমবেত সঙ্গীত পরিচালনা করো তখন কি করো? বাক্য ও ইঙ্গিতের দ্বারা যা কিছু করো তা অবশ্য বাস্তব। কিন্তু তার দ্বারা অন্য বাদকের দল নিয়ন্ত্রিত হয় কেমন ক'রে? যা কিছু হয় তা কেবল তোমার ও তাদের চেতনার মধ্যে, সেগুলো বাস্তব কিছু নয়।

বিজ্ঞানীরা বলে ইলেক্‌ট্রিসিটি বা বিদ্যুৎশক্তির কথা, সব কিছুই নাকি হচ্ছে সেই শক্তির জোরে, আমার নিজের দেহসত্তার মধ্যেও এবং মন ও প্রাণের শক্তির মূলেও তাই কাজ করছে। কিন্তু তা আমার কাছে বাস্তব নয়। আমি কখনো নিজের সত্তার মধ্যে তা বোধ করিনি, আমার চিন্তাতে বা প্রাণের ব্যাপারে তা কাজ করছে বলেও বোধ করি না—তাহলে কেমন ক'রে ওটা বিশ্বাস করি বা মেনে নিই?

আমি যে শক্তিকে প্রয়োগ করি তা মধুঢালা আশীর্বাদ বাক্য নয়—আর নীরব আশীর্বাদও একটা পাথর বা মুষ্ট্যাঘাত বা কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারের মতো বাস্তব জিনিস নয়; আমি যদি মনে মনে শুধু ইচ্ছা করি যে "এটা হোক", তাও বাস্তব হলো না। তেমনি আমার এই চেতনার শক্তি যা কোনো ব্যক্তি বা বস্তু বা ঘটনার উপর প্রযুক্ত করা হয় তাও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, সুতরাং তাও বাস্তব নয়। আমি সেটা বোধ করি এবং যার উপর প্রযুক্ত হচ্ছে সেও তা বোধ করতে পারে, কিন্তু সে বোধ ভিতরের জিনিস, অন্যে তা বাইরে দেখতে পায় না, সুতরাং তাকে বাস্তব বলে বিশ্বাস করতে বা মেনে নিতে কেউ বাধ্য নয়। যেমন ধরো, আমি কাউকে জ্বর থেকে আরোগ্য ক'রে (বিনা ওষুধে) সবল ও সুস্থ ক'রে দিয়ে তার কাজে

পাঠিয়ে দিলাম, আর এক রাত্রির মধ্যেই সে আরোগ্য হয়ে গেল, তবু কোনো তৃতীয় ব্যক্তি কেন সে কথা বিশ্বাস করতে যাবে যে আমারই শক্তিতে সে আরোগ্য হলো? হয়তো প্রকৃতির দ্বারা বা আপন মনের কল্পনার দ্বারাই সে সেরে গেছে (অতএব প্রকৃতি ও কল্পনারই জয় হোক।)– কিংবা হয়তো এমনিই আপনাআপনি সেরেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ও কথা সত্য বলে প্রমাণ করবার কোনো আশাই নেই––কিছুমাত্র না।

৬-১২-১৯৩৫

আধ্যাত্মিক শক্তি ও রাজসিক উচ্ছ্বাস

উৎসাহ ও উদ্যম থাকা খুবই ভালো কথা, এবং তার প্রয়োজনও আছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক অবস্থাতে থাকবে স্থিরতার সঙ্গে তীব্রতা। চৈত্য বহ্নিতেজ অন্যরকম জিনিস––কিন্তু তুমি যা বলছ তা হলো রাজসিক প্রাণের তেজ, আত্মপ্রয়াস, আত্মসমর্থন, ন্যায্য দাবীর জোর ইত্যাদি।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। আমার নিরেট রকম শক্তি রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে সে আগুন নেই যা কেউ আমার ন্যায্য পাওনা না দিলে তার বিরুদ্ধে দপ্ ক'রে জ্বলে উঠবে। কিন্তু তবু আমি দুর্বল বা মৃতবৎ মানুষ নই। এটা আমি স্থায়ী রকমের নিয়ম ক'রে নিয়েছি যে কিছুতে অস্থির চিত্ত হবো না, সব রকম অস্থিরতা দূর ক'রে দেবো––কিন্তু তবুও আমি প্রয়োজনমত আমার শক্তিকে নিরেট ভাবেই কাজে লাগিয়েছি। তোমার কথাতে বোঝাচ্ছে যেন রাজসিক ধরনের উচ্ছ্বাস থাকাই একমাত্র শক্তির পরিচয়, নতুবা অন্যরকম কিছু হবে মরা দুর্বলতা। তা ঠিক কথা নয়–– নীরব আধ্যাত্মিক শক্তি ওর চেয়ে শতগুণে বলবান ; তা হঠাৎ জ্বলে উঠে আবার নিভে যায় না বটে––কিন্তু স্থায়ী ও অটল ও নিত্য ক্রিয়াশীল হয়।

২১-১০-১৯৩৩

রুদ্র শক্তির প্রয়োগ

রুদ্র শক্তি প্রয়োগ করা আমি ছেড়ে দিয়েছি; ওর যা ফল হতো তা

মারাত্মক, এখন তাই অনেক কালের বিনা ব্যবহারে ওতে মরচে পড়ে গেছে। অবশ্য আমি সত্যাগ্রাহী বা অহিংসাবাদী হইনি, কিন্তু হিংসাতেও অনেক অসুবিধা আছে। অতএব ও আগুন চাপা রইল।

আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা রোগ আরোগ্য

লোকের রোগ আরোগ্য করতে আমি যে শক্তিকে প্রয়োগ করি তা কেমন ক'রে ও কোন অবস্থাতে কাজ করে সে কথা বোঝাতে চেষ্টা করব (যদিও তা অতিমানস শক্তি নয় বা সর্বসফল নয় বা বীচাম্‌স্ পিল্‌সের মতো সকল বোগেই গ্যারান্টি দেওয়া নয়)। দ'-এব বেলাতে ছাড়াও আরো শত শত ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করেছি (নিজের বেলাতেও প্রথমে এবং পরেও) এবং এই সব ক্ষেত্রে তার সাফল্য ও বাস্তবতা সম্বন্ধে আমার কোনোই সন্দেহ নাই।

সেই শক্তি সম্বন্ধে আমি এতদিন লিখিনি কারণ অল্প কথায় তা বুঝিয়ে বলা কঠিন আর এ কয়দিন আমার বড়ো ক'রে কিছু লেখার সময় ছিল না। যাই হোক আসল জিনিস হচ্ছে ঐ শক্তি শূন্যের মধ্যে এবং সম্পূর্ণ অমোঘ ভাবে কাজ করে না, সেই ফর্মুলা ফাঁকাতে বা সাদা কাগজে লিখে দেবার মতো—"এখানে আলো হয়ে যাক অমনি আলো হয়ে গেল"। যেখানে কতকগুলো জটিল শক্তি একত্রে জট পাকিয়ে একটা স্বাভাবিক ক্রিয়াবৈগুণ্য ঘটিয়েছে সেখানে এই শক্তি গিয়ে তার বিরুদ্ধে একটা নতুন অবস্থান্তর এনে নতুন কিছু কাজ দেখাবে, এই ওর গুণ।

কিন্তু তা করতে গিয়ে তাকে ঐ সব পূর্বাধিকারপ্রাপ্ত শক্তির তরফের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। তাকে কাটিয়ে উঠতে তিন রকম জিনিসের দরকার: (১) এ শক্তির নিজেরই যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা চাই যাতে কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ এখানে সেই মানব দেহের উপর সরাসরি সার্থক-ভাবে চাপ প্রয়োগ করতে পারে; (২) তোমার নিজেরই তাকে নেবার সামর্থ্য; (৩) যন্ত্রসাহায্য, চিকিৎসা ও ঔষধ প্রভৃতির সাহায্যও দরকার

হয়।

আমি ঐ শক্তিকে কোনো সাহায্য ব্যতীতও প্রয়োগ প্রায়ই ক'রে থাকি, কিন্তু সবই নির্ভর করে গ্রহীতার ও তার গ্রহিষ্ণুতার উপর——যদি না অন্য কোনো অদৃশ্য সত্তা বা শক্তি এসে তার সহায় হয়ে পড়ে।

আর রোগীর সঙ্গে যদি কোনো যন্ত্রমাধ্যমের প্রত্যক্ষ যোগ থাকে, যেমন কোনো ডাক্তার বা এমন কেউ যে এই শক্তিকে একাগ্রভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ——তাহলে এই শক্তির ক্রিয়া তৎক্ষণাৎ খুব জোর পায়——অতএব অনেকটাই নির্ভর করে পাত্রের উপর, তার আস্থার উপর, তার চেষ্টা ও নেবার শক্তির উপর। যেখানে প্রবল বাধা রয়েছে, সেখানে সমুচিত ফল পেতে এতেও যথেষ্ট হয় না, তখন দরকার হয় অন্য যন্ত্রের সাহায্য (চিকিৎসা বা ঔষধাদি)। বিশেষত যেখানে দেহেতেই বাধা রয়েছে বা দেহচেতনাতে বিরোধী শক্তিরা চেপে বসেছে সেখানে ঔষধাদির সাহায্যও চাই।

কিন্তু ডাক্তারটি যদি চৈত্য ভাবাপন্ন না হয়, কিংবা যদি ভুল ওষুধ বা কড়া চিকিৎসা দেওয়া হয়, তাতে বাধার মাত্রা বরং বেড়ে যায়, তখন তাকেও সামলাতে হয়।

মোটামুটি এই কথা, অসম্পূর্ণ হলেও মোদ্দা কথাটা বোধ করি বলা হলো।

পুঃ। একটা কথা বলা হয়নি যে পরিবেশটি, বিশেষত যে সব লোক রোগীর কাছে কাছে থাকে তাদের মনোভাব বা তারা যে সব মন্তব্য তাকে শোনায়, এগুলির গুরুত্বও সেখানে অনেকখানি।

২৪-১-১৯৩৬

দেহ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণের যে মনোভাব ছিল তার সম্বন্ধে একটা কথা বলা যেতে পারে। তিনি মনে করতেন যে দেহ রক্ষার জন্য বা দেহের রোগাদি সারাবার জন্য আধ্যাত্মিক শক্তিকে নিয়োগ করলে তার অপব্যবহার করা হয়। অন্যান্য যোগীরা——যারা সিদ্ধি খোঁজে তাদের কথা ছেড়ে——তারা কিন্তু দেহকে এত অগ্রাহ্য করতেন না; যোগের পরিণতির জন্য বাস্তব আধার স্বরূপ জেনে তাকে সুস্থ রাখতে তাঁরা যত্নবান হতেন। আমি

এই মতকেই বরাবর সমর্থন করি। ন্যায্য প্রয়োজনে এবং নিজের ও অন্যের স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষা করবার জন্য আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করতে আমি কখনই ইতস্তত করিনি। বস্তুত শ্রীমাও এইজন্য ফুল দেন কেবল আশীর্বাদ হিসাবে নয় কিন্তু আরোগ্যলাভে সাহায্যেরও জন্য। দেহকে যন্ত্র হিসাবে রক্ষা করা আমি ধর্মসাধন রূপে প্রথম কর্তব্য বলে মনে করি; বিশেষত দেহ হলো অভিব্যক্ত ব্যক্তিত্বের ক্রিয়ার কেন্দ্র স্বরূপ, পৃথিবীতে শুধু প্রাণের সাধারণ ক্রিয়ার জন্য নয় কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি রূপেও এর ঠিক থাকা দরকার,—আর আমার দৃষ্টিতে দেহ মন ও প্রাণ সবই হলো সমগ্র ভগবত্তার অংশ, আত্মারই স্বরূপ, সুতরাং আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্য স্থূল রকমের অন্তরায় ভেবে দেহকে অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা করা উচিত নয়। জড় বস্তুও গোপনে আত্মারই একটা রূপায়ণ যা পরে বিবর্তনের ফলে ভিতরের ভগবত্তার বিকাশ করবে। আমার মতে দেহ মন ও প্রাণকে অধ্যাত্মগত বা দিব্যত্বে এনে ফেলতে হবে, যাতে তা ভগবানকে উপলব্ধির সার্থক আধার স্বরূপ হতে পারে। ভগবানের লীলাতে এর অংশ আছে, এমন কি বৈষ্ণব সাধনাতেও দিব্য প্রেমের আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের উপভোগের জন্য এর দরকার। তার মানে এই নয় যে দেহকে তার নিজের জন্যই স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হবে কিংবা ভবিষ্যৎ বিবর্তনে দিব্য দেহে পরিণতি লাভই হবে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য—তা মনে করলে মস্ত ভুল হবে। যাই হোক, তেমন দিব্যত্ব প্রাপ্তি অনেক দূরের কথা, অদূর ভবিষ্যতের আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে তাই নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

৭-১২-১৯৪৯

অন্যের রোগকে নিজের দেহে টেনে আনতে পারা নিশ্চয়ই সম্ভব, ইচ্ছার জোরে তা করা যায়। ইতিহাসে গ্রীক রাজা এন্টিগোনাস ও তাঁর পুত্র দিমিত্রিয়াসের দৃষ্টান্তে এর নজির সর্বজানিত। যোগীরাও কখনো কখনো এ কাজ করেন; কিংবা যারা কোনো যোগীর কাছে থাকে তাদের দরজা ক'রে নিয়ে বিরুদ্ধ শক্তিরা ঐ যোগীর উপর রোগ এনে ফেলে, অথবা লোকের অশুভ কামনার ফলেও তা হয়। কিন্তু এগুলি হলো বিশিষ্ট

ঘটনা, তাঁর ব্যক্তিগত যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; সাধারণত এমন হবেই যে তা নয়। অপর পক্ষে যোগ চেতনার দ্বারা বিপরীত কাজও হতে পারে; নিজের দেহ থেকে রোগকে তাড়ানো বা প্রতিরোধ করাও যায়, এমন কি বহুকালের স্থায়ী ব্যাধি ও পুরানো স্বাস্থ্যহীনতা সম্পূর্ণ সারিয়ে ফেলা যায়, ও এমন কি ধার্য মৃত্যুকেও অনেক কাল পর্যন্ত স্থগিত রাখা যায়। কলকাতার প্রসিদ্ধ নারায়ণ জ্যোতিষী তখনকার দিনে আমার রাজনৈতিক খ্যাতি হওয়ার পূবে আমাকে না চিনেই বলেছিলেন যে ম্লেচ্ছ শত্রুদের সঙ্গে আমার সংগ্রাম হবে, তিনবার অভিযুক্ত হয়ে তিনবারই আমি ছাড়া পাবো, আরো বলেছিলেন যে আমার কোষ্ঠীতে যদিও ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যু রয়েছে, কিন্তু যোগশক্তির জোরে আমি অনেক কাল পর্যন্ত বেঁচে পূর্ণ বার্ধক্যে পৌছবো। আর বস্তুত, আমি যোগের চাপে আমার দেহের কতকগুলি স্থায়ী পুরানো ব্যাধিকে প্রকৃতই দূর করেছি। তবে এই সব দৃষ্টান্তের কোনোটাই সাধারণ নিয়ম হিসাবে ধরে নেওয়া চলে না, যুক্তির সপক্ষেও না বিপক্ষেও না। মানুষের যুক্তি এ সব ব্যাপারে আপেক্ষিক জিনিসকে পুরোপুরি প্রমাণ হিসাবে ধরতে গিয়ে ভুল করে।

৮-১২-১৯৪৯

শ্রীঅরবিন্দের শক্তি, দিব্যশক্তি ও যোগশক্তি

এটা ভাবাই ভুল যে শ্রীঅরবিন্দের শক্তি হয় একটা অলৌকিক শক্তি আর না হয় কিছুই না। অলৌকিক শক্তি কিছু নেই আর আমি অলৌকিক নিয়ে কারবার করিনে। দিব্যশক্তি মানে যদি এই হয় যে তাকে সর্বদা সর্বশক্তিমান হয়ে কাজ করতে হবে তাহলে এখানে দিব্য কথাটি অবান্তর। যোগশক্তি কথাটি বরং ভাল; এর মানে এইটুকুই যে এটি এমন একটি উচ্চতর চেতনা যা সরাসরি জড়-জগতের উপরে কাজ করছে তার আধ্যাত্মিক ও অতিদৈহিক শক্তি নিয়ে। এই শক্তির বাহক হবার জন্যে যন্ত্রটিকে শীলিত করে নেওয়া দরকার। এই শক্তি কতকগুলি নিয়মকানুন ও সর্ত মেনে কাজ করে। ভগবান পৃথিবীর উপরে স্বেচ্ছাচারী বা ঐন্দ্রজালিকের মত কাজ করেন না। যে জগতে আমরা বাস করি তার প্রকৃতি আর উদ্দেশ্যগত যে সব বিধিবিধান তা মেনেই তিনি কাজ করেন এই জগতের

উপর—যে জিনিসটি বিকশিত হতে চলেছে তারই অন্তর্নিহিত ক্রমবর্দ্ধিত প্রবেগকে আশ্রয় করে, একটা দৈবাতের বশে বা সব সর্ত নাকচ করে দিয়ে নয়। যদি তাই হতো তাহলে তো যোগের বা সময়ের বা মানবীয় কর্মের বা যন্ত্রের বা গুরুর বা শিষ্যের কিম্বা একটা অবতরণের, এসব কিছুরই দরকার হতো না। শুধু একটা 'তথাস্তু' হলেই চলতো, আর কিছুই নয়। কিন্তু সেটা হতো নিতান্তই অযৌক্তিক, যদি বোঝো কথাটা, কিম্বা অযৌক্তিকের চেয়েও খারাপ—"ছেলেমানুষী"। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে একটা দিব্য হস্তক্ষেপ বা অলৌকিক গোছের কিছু ঘটতে পারে না—তা ঘটে। তবে সব কিছুই এরকম হয় না।

৬-২-১৯৩৫

×

শ্রীঅরবিন্দের শক্তি কি জিনিস? তা দেহের বা মনের কোনো ব্যক্তিগত সামর্থ্য নয়। একটা উচ্চ শক্তি যা আমার ভিতর দিয়ে প্রযুক্ত হয়। অবশ্য তা ভগবৎশক্তি কারণ জগতে সেই একমাত্র শক্তিই কাজ করে, যন্ত্রের প্রকৃতি অনুসারে। যোগশক্তি স্বতন্ত্র জিনিস, তা আধ্যাত্মিক চেতনার একটা বিশিষ্ট শক্তি।

যে দৃষ্টান্তের কথা সে বলেছে সেখানে বিশেষ ঘটনা অনুযায়ী তার ক্রিয়া হয়েছে। এটা প্রায়ই হতে পারে। যেমন, আমার কাকার মেয়েটির শেষ অবস্থা হয়েছিল, ডাক্তারেরা জবাব দিয়ে গেল। তিনি প্রার্থনায় বসলেন —যখন প্রার্থনা শেষ হলো তখন মৃত্যুলক্ষণ থেমে গেল, মেয়েটি বিনাচিকিৎসায় আরোগ্য হয়ে উঠল (টাইফয়েড হয়েছিল)। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আমার জানা আছে।

ঐ শক্তি সম্বন্ধে আরো বেশি লিখতে হলে সময়ের দরকার, সে সময় আজ নেই। তবে যদি কেবল কয়েকটি রোগের বেলাতেই তা খাটে তাহলে তার গুরুত্ব থাকে না। কিন্তু এ শক্তি হলো চেতনারই একটা অংশ যার মূল্য সর্বক্ষণই থাকে, কেবল রোগ আরোগ্যের বেলাতেই নয়, কিন্তু যে কোনো ব্যাপারেই তা খাটে। তা কোনো অলৌকিক উপায়ে নয়, কিন্তু ধীর স্থির সুনিদিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে সেই শক্তি উপর থেকে আপন শৃঙ্খলা সহকারে নেমে আসে। যে স্তর থেকে তা আসছে তারই উচ্চতা ও প্রবেগ

অনুসারে তার ক্রিয়া হয় (উচ্চমানস থেকে অধিমানস পর্যন্ত) যে ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হচ্ছে তারই অবস্থা অনুযায়ী সাধারণ অথবা সবিশেষ ভাবে। এ জাদুকরের খেলা নয়, এ শক্তি রীতিমত অর্জন করা দরকার এবং খুব কম লোকেই তা পারে। এই হলো সূচনা।

আমি সূচনা মাত্র বলেছি। এর মধ্যে দুইরকম আছে,---যোগশক্তি যা ভগবৎ আধ্যাত্মিক শক্তি মাত্র ও সর্বশক্তিমান, আর যোগশক্তি যা জগতের বর্তমান বিবর্তনের ক্ষেত্রে কাজ করবে।

এখানে পারা বা না-পারার কোনো প্রশ্ন নেই। সব কিছুই সম্ভব, কিন্তু ওর একটা পদ্ধতি আছে। দিব্যশক্তির নিজের সীমা আছে, বাধা আছে, উত্থান পতন আছে। একটা গাধাকে হাতি বানানো সম্ভব হতে পারে কিন্তু তা করা হয় না, কারণ তার কোনো পদ্ধতি নেই। মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন-গুলো হতে পারে। আমি এক সময় ভীরু থেকে বীর হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু তা যোগশক্তি ছাড়া আভ্যন্তর শক্তিতেও হতে পারে। কার মধ্যে কোন জিনিস লুকোনো আছে বা কি নেই তা কেমন করে বলবে? আমি যোগের দ্বারা বিনা ইচ্ছাতে অনেক কিছু অর্জন করেছি যা আগে আমার প্রকৃতিতে ছিল না। আমার আগে যা ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে সম্পূর্ণ প্রকৃতি-টাই রূপান্তরিত হয়েছে। এ শক্তি আধ্যাত্মিক স্তরে গেলে চরম হতে পারে। বাকি যা কিছু তা ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করে। কোনোদিন হয়তো আমি চেষ্টা করব দৃষ্টান্তের দ্বারা পুরোপুরি ভাবে এ শক্তির ব্যাখ্যা করতে যে পৃথিবীর স্তরে এ শক্তি কেমন ভাবে কাজ করে, কোনরূপ অবস্থাতে তার কেমন কার্যকারিতা হয়---বাঁধাধরা কোনো নিয়মে নয় কিন্তু সাবলীল ও নমনীয় ভাবে।

৬-২-১৯৩৫

শক্তি সম্বন্ধে কতকগুলি গোড়ার কথা বলি, যা তোমরা বোঝো না।

১। এ হলো একটা দিব্যশক্তি, যে কোনো দিকে কাজ করতে পারে। কবির মধ্যে, সৈনিকের মধ্যে, ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিক সকলের মধ্যেই এ শক্তি আসতে পারে।

২। এটা মানসিক শক্তি নয়, প্রয়োগকর্ত্রা একে মনের দ্বারা গুছিয়ে নেয় না, মনের দ্বারা গ্রহিতার কাছে পাঠায় না। যা করতে হবে তা সামগ্রিকভাবে সরাসরি করে। মনের দ্বারা মনের কাছে পাঠানো নয়। যে প্রয়োগ করে সে একে ছেড়ে দেয় আপন কাজ করতে, নিজে সে অন্য কাজে লিপ্ত হয়। এ শক্তি গোপনে সমগ্রভাবে আপন কাজ করে। এর বীজ থাকে লুক্কাইত এবং বিবর্তনের সঙ্গে আপনাআপনি কাজ করে। বীজ থেকে গাছ কেমন হবে বা জীব কেমন হবে তা জানা যায় না।

৩। যেখানে কেউ ঐ শক্তির আধাররূপে কাজ করে সেখানে সে কেমন ভাবে তাকে গ্রহণ ও প্রয়োগ করবে তার উপর সব নির্ভর করে। সে তো যন্ত্র মাত্র। ঠিক ভাবে নিতে না পারলে তার ক্রিয়া অপূর্ণ হয়। সুতরাং যন্ত্র নিখুঁত হওয়া দরকার। নতুবা এত সাধনার দরকার হতো না,—যে কেউ সে শক্তিকে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করতে পারতো।

৪। যে ব্যক্তি প্রয়োগ করবে তার সবজান্তা হবার দরকার নেই। কোনো আইনজ্ঞকে সাহায্য করতে যে আইন জানতে হবে এমন নয়। তার নিজের যন্ত্র ও বিদ্যাকে যদি সে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারে তাহলেই কাজ হবে। কখনো কখনো এই শক্তিকে বারে বারে নতুন ক'রে প্রেরণ করার দরকার হয়, তা অবস্থাগতিকের উপর নির্ভর করে। এই হলো সাধারণ কথা, এর কোনো নিয়ম নেই। এ শক্তি মনের নয় তাই যথেষ্ট নমনীয়।

৫। আমি বলছি কেবল এক আধ্যাত্মিক শক্তির কথা, তা অতিমানসের নয়।

৬। এ শক্তি কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে কাজ করে, তার জন্য দাতার এবং গ্রহিতার মধ্যে কোনো আগের থেকে বোঝাপড়ার দরকার হয় না।

আমার যদি ডাক্তারি জ্ঞান থাকতো তাহলে তো নিজেই ডাক্তারখানা চালিয়ে দিতাম। তবে আর ক খ গ-দের দরকার কেন হতো? এ কী-যুক্তি! যে আমি কিংবা মা ইঞ্জিনিয়ার নই বলে ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে বোধি প্রেরণ করতে পারব না? আমরা গুজরাটি জানি না বলে গুজরাটি কবিকে প্রেরণা দিতে পারব না?

হা ভগবান! এ কেমন প্রশ্ন! বাহ্য নির্দেশ দেবার চেয়ে আভ্যন্তর

নির্দেশ প্রেরণ করা যে লক্ষ গুণে সহজ। যদি আমি চাই যে সৈন্যাধ্যক্ষ ক সৈন্যাধ্যক্ষ খএর সেনাবাহিনীকে হটিয়ে দিক, তাহলে তেমনি শক্তি তাকে প্রেরণ করব যাতে সে সঠিকভাবে সক্রিয় হয়ে জয় করতে পারে। কিন্তু তার বদলে যদি তাকে লিখে জানাই যে তুমি অমুক আর অমুক কাজ করো, তাহলে সেও তা করতে পারবে না আর আমিও তেমন কিছু বলতে পারব না। এ হলো চেতনার আলাদা স্তরের ক্রিয়া। এটা না বুঝে তুমি যুক্তি খুঁজছ। বোধ আর প্রেরণা হলো আভ্যন্তরীণ জিনিস, বাহ্য মনের নয়। তুমি কেমন ভাবে বাংলা কাব্য লিখবে তা আমি কি বাইরের থেকে বলি, ভিতর থেকে প্রেরণা পেয়েই তুমি অমন লেখো।

প্রঃ একজন স্পেন-দেশীয় সৈন্যাধ্যক্ষের সম্বন্ধে আলোচনার সময় আপনি "ঠিক শক্তি" কথাটা ব্যবহার করেছিলেন। "ঠিক" কথাটা বললেন কেন? "ভুল শক্তি"-ও আছে নাকি?

উঃ ঠিক মনে পড়ছে না কী লিখেছিলাম—ভালভাবে বলতে পারছি নে। তবে "ভুল শক্তি" তো নিশ্চয় আছে। আসুরিক শক্তি আছে, রাজসিক শক্তি আছে, সব রকমের শক্তি আছে। তা ছাড়া কেউ হয়তো মানসিক বা প্রাণিক শক্তি ব্যবহার করতে পারে যা করা হয়তো ঠিক হবে না। কিম্বা শক্তিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে তা সফল হল না বা সেনাপতির মাথায় তা ঢুকলো না, অথবা বিরুদ্ধ শক্তিদের সমশক্তিসম্পন্ন তা নয়। (বিরুদ্ধ শক্তি সব সময় আসুরিক হতে হবে তার কোনো মানে নেই, তারা বেশ ভদ্রলোকজাতীয় শক্তি হতে পারে এই কথা মনে করে যে তারা ঠিক পথেই চলেছে। আরো হতে পারে যে দুটোই দিব্য শক্তি পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করছে একটু মজা করবার জন্যে। শক্তির খেলায় অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে, বুঝলেন মহাশয়!)

ভুল কাকে বলে। স্পষ্টতঃই যে শক্তিকে প্রয়োগ করা হয় তা সেই শক্তি যার প্রয়োগ নির্দ্ধারিত। যদি তা সফল হয় তাহলে সমগ্রের মধ্যে তা নিজের কাজ করেছে, আর যদি বিফল হয় তাহলেও সে সমগ্রের মধ্যে

নিজের কাজটি করেছে। "ন তত্র শোচতে বুধঃ"---জ্ঞানীরা এর জন্য শোক করেন না।

কীভাবে? কোনো শক্তিকে প্রয়োগ করা যেতে পারে সম্বোধির সাহায্য বিনাই---শক্তির সঙ্গে কোনো নিকট সম্পর্ক ছাড়াই সম্বোধি আসতে পারে। অবশ্য সম্বোধিরই শক্তি যদি হয় সে আলাদা কথা। উপরন্তু যে কোনো রকমের সম্বোধির উপরকার কোনো শক্তিরও প্রয়োগ হতে পারে।

১৭-৪-১৯৩৭

×

> প্রঃ আপনি আমাদের ডাক্তারের কাছে যেতে বলেন কেন। দিব্য অতিমানস চেতনা তো সরাসরি কাজ করতে পারে, তাতে সাধারণ মানুষের দ্বারা রোগ চিনতে দরকার হয় না।

উঃ তা যদি হতো তাহলে এত ডাক্তার ও ডাক্তারখানার কি দরকার ছিল? তাহলে তোমার ২০,000 এর কি দরকার হতো? আমরাই ভিতরে বাইরে কাজ করে যাবো এমন হয় না। কাজের জন্য তুমি ডাক্তারের যেমন দরকার তেমনি বাড়ি গড়তে ইঞ্জিনিয়ারেরও দরকার। কে তোমাকে বলেছে যে আমরা অতিমানস থেকে ক্রিয়া করি? জড়ের উপর জয় না হলে তা হয় না।

১-২-১৯৩৫

×

> প্রঃ জড়ের উপর জয় করা মানে কি? তা কি সাধক-দের সম্পর্কে বলেছেন?

উঃ সাধকদের কথা নয়, আমি বলেছি পার্থিব প্রকৃতির জড়ঘটিত অংশের কথা। ছেলেমানুষি বুদ্ধি না ছাড়লে এ-কথা তোমরা বুঝবে না।

২-২-১৯৩৫

×

প্রঃ আমি ভাবছি যে এখানে ডাক্তার ও ডাক্তারখানা থাকার কি এমন দরকার! এটা কি অদ্ভুত কথা নয়, ভগবান তাঁর ভক্তদের পাঠাচ্ছেন ডাক্তারের কাছে?

উঃ কি বাজে বকছ! ওহে বাপু, জগৎটা হলো বিভিন্ন শক্তিদের লীলাক্ষেত্র, তার মধ্যে ডাক্তারও এক শক্তি। সে শক্তিকে ভগবান কেনই বা কাজ করাবেন না? এটা বুঝে দেখ যে ভগবান যদি নিজেই সব কিছু করতেন তাহলে তো জগৎই থাকত না, সবই হতো পরীরাজ্য।

২-২-১৯৩৫

×

অর্ধ গুরু-গম্ভীর ভাব নিয়ে বলতে গেলে, আমি এখানে কোনো খরিদ্দারের পছন্দ মাফিক অলৌকিক কাণ্ড প্রস্তুত করতে আসিনি। আমি এসেছি এই পৃথিবীর কোথাও একটা নতুন চেতনা নামিয়ে আনার অভিপ্রায়ে—তবে অবশ্য এই প্রচেষ্টাই একটা অলৌকিক ব্যাপার। যদি এটা করতে গিয়ে দৈহিক অঘটনগুলি ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়, সে তো বেশ ভাল কথা। কিন্তু তাই বলে তুমি তোমার ডাক্তারী পিস্তলটা আমার মাথার উপরে ধরে তোমার হুকুম মাফিক মাল সরবরাহের দাবী জানাতে পার না। শক্তির কথা বলতে গেলে আমার শক্তি প্রয়োগ (অতিমানসের কথা বাদ দিচ্ছি) মানে হল নানা শক্তির ঘাত প্রতিঘাত; তাতে সাফল্য নির্ভর করে এই কটি জিনিসের উপর—(১) যে শক্তি পাঠানো হয়েছে তার প্রাবল্য আর নির্বন্ধ বা জিদ, (২) গ্রাহকের গ্রহণ-সামর্থ্য, (৩) তাঁর অনুমতি যিনি অনুল্লেখ্য—মার্জনা করবেন, আমি বলতে চেয়েছিলাম যিনি অনামধেয়, অনির্বচনীয়, অজ্ঞেয়। তুমি যেমনটা লক্ষ্য করেছ, অমুকের দৈহিক চেতনা একগুঁয়েই বটে আর তাই তার গ্রহণসামর্থ্য নেই। সে হয়তো মাকে অন্তরে অনুভব করতে পারে, কিন্তু মায়ের ইচ্ছা বা শক্তির আদেশ-পালনে সে ততটা অভ্যস্ত নয়।

জানুয়ারী, ১৯৩৫

×

আমি ডাক্তারি কিছুই বুঝি না। তা যদি জানতাম তাহলে নিজেই চিকিৎসা করতাম। আমার কাজ হলো ওষুধের সঙ্গে কিংবা বিনা ওষুধে শক্তি প্রয়োগ করা। তিনরকম উপায়ে তা হয়। এক হলো রোগটি না জেনে শক্তি প্রয়োগ করা––সেখানে রোগীর ইচ্ছা ও সহযোগিতার দরকার। দ্বিতীয় হলো রোগের লক্ষণ অনুযায়ী শক্তি প্রয়োগ করা––সেখানে সঠিক লক্ষণগুলি জানা বিশেষ দরকার। তৃতীয় হলো রোগটিকে চিনে শক্তি প্রয়োগ করা––সেখানে বিরোধী শক্তিরা খুব বলবান হয় এবং রোগী তার দখলে পড়ে শক্তির ক্রিয়াকে বাধা দেয়। সে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রোগটি সেরেও আবার ফিরে আসে, আবার বেড়ে ওঠে। উন্মাদ প্রভৃতি রোগে এমন হয়। স্নায়ুরোগেও হয়।

২-২-১৯৩৫

×

> প্র: রোগের ক্ষেত্রে আপনি কেমন করে স্থির করেন যে এটা পুরনো রোগের পুনঃপ্রকোপ কিম্বা কোনো অপশক্তির কাজের ফল, এমনকি কোনো অভিজ্ঞতা? আপনার কাছে যে বিবরণ পাঠানো হয় তার থেকেই কি?

উ: হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়। ঠিক যেমন তুমি রোগের লক্ষণ দেখে বা রোগীর কথা শুনে রোগ নির্দ্ধারণ কর।

১৮-১০-১৯৩৬

হোমিওপ্যাথি ও অ্যালোপ্যাথি প্রভৃতি

> প্র: রোগ না জেনে কেবল লক্ষণ দেখে হোমিওপ্যাথি কি রোগ সারায়?

উ: তাই তো শুনেছি যে হোমিও পদ্ধতি হলো লক্ষণ সারিয়ে রোগকে সারানো। তুমি কি বলতে চাও যে ঐভাবে হোমিওপ্যাথরা রোগ সারায়নি?

যদি তাই তারা সারিয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয় তাদের পদ্ধতিতে এমন কিছু আছে যা অ্যালোপ্যাথ পদ্ধতির সঙ্গে না মিললেও তাতে রোগ সেরেছে। আর আমি নিজেও কেবল লক্ষণ জেনে রোগ সারিয়েছি, কারণ রোগ নির্ণয় সব সময়ে নির্ভুল হয় না, কিন্তু লক্ষণের বেলা কোনো ভুল নেই, অবশ্য সঠিক রোগ নির্ণয় হলে আরো ভালো কথা, কাজটা আরো সহজ ও নিখুঁত হয়। কিন্তু রোগ না চিনেও রোগ সারানো যায়।

×

প্র ঃ যেখানে একই রকম লক্ষণ দুই তিন রকম রোগে হয় সেখানে ওতে কাজ হয় না।

উ ঃ কেন হবে না? লক্ষণের উপর ক্রিয়া করেই রোগকে দমন করতে পারো, মূলকে না ধরেও উপর থেকেও তাকে দূর করা যায়। অন্তত তাই আমি ক'রে থাকি।

কেবল অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার চার দেয়ালের মধ্যেই বিশ্বসংসার আবদ্ধ নয়। কেবল হোমিও নয়, অন্যান্য অনেক রকম চিকিৎসাতেও রোগ সারে, যেখানে অ্যালোপ্যাথ জবাব দিয়েছে। আমার অভিজ্ঞতা বেশি না হলেও এমন অনেক জানি।

২৩-১২-১৯৩৫—২৬-১২-১৯৩৫

×

প্র ঃ হোমিওপ্যাথ ক ব্লাড্‌প্রেসারের রোগীকে হার্ট ফেলি-ওরের মুখে যেমন তেমন খেতে বলেছে, সে বলেছে যে নেচারের হাতে ছেড়ে দাও।

উ ঃ ওটা আমি নিজে দেখেছি যে নেচারের হাতে ছেড়ে দিলে এবং তার উপর নির্ভর করলে কাজ হয়।

২৮-১২-১৯৩৫

×

শক্তির ক্রিয়ার জন্য একজন যন্ত্রের দরকার। ক' এবং তার হোমিও ওষুধ যন্ত্ররূপে কাজ করেছে। হোমিও ওষুধ বলেই যে তার কোনো গুণ নেই এমন কথা আমি মানি না। ক যে কিছু জানে না এবং ঠিক ওষুধ দিতে পারে না তাও আমি বিশ্বাস করি না। আমি ওতে অনেক আশ্চর্য ফল হতে দেখেছি, অনেক সময় তখনই কাজ হয়েছে, এ কেবল কএর মুখের কথা নয়, রোগীরা নিজেরাও বলেছে। আমি যেহেতু অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার নই, সেই হেতু এ কথা আমি উড়িয়ে দিতে পারি না।

×

আমি যে মন্তব্যগুলি করেছি তা অ্যালোপ্যাথির গোঁড়ামির উপরে। নতুবা ঝগড়া ক'রে কোনো লাভ নেই। সব রকমের চিকিৎসাই আমি দেখেছি, একমাত্র সত্য কোনোটারই নয়। প্রত্যেক রকমেরই সার্থকতাও আছে ব্যর্থতাও আছে। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, নেচারোপ্যাথি, কবি-রাজী, হকিমি প্রভৃতি সকলেই প্রকৃতিকে ধরে কাজ করে তার আপন প্রণা-লীতে, তাতে জিৎও হয় এবং হারও হয়। সবই বাহ্য ক্রিয়া যা নিয়ে ঝগড়া ক'রে লাভ নেই। আসলে যা কাজ করে তা হল পিছনের অদৃশ্য শক্তি,—তাতে ঠিক রাস্তা নিতে পারলে তার ফল হবে, ভুল রাস্তা নিলে বিফল হবে।

সাধককে জন্মদিনের বাণী

হৃদয় ও মনের পিছনে পর্দা পড়ে ভগবৎ প্রেম থেকে আমাদের পৃথক করে দেয়। প্রেম ও ভক্তির দ্বারা সে পর্দা ছিন্ন হয়, নীরব মনে তা পাতলা হয়ে মিলিয়ে যায়।

৯-৯-১৯৩৬

×

ভিতরের সূর্য তোমার মনকে আলোকিত করুক এবং হৃদয়কে পরি-

চালিত করুক।

৯-৯-১৯৩৭

×

উচ্চ চেতনাতে আরোহণ করো, তার আলো তোমার প্রকৃতির রূপান্তর আনুক।

৯-৯-১৯৩৯

×

আস্পৃহার উপর জোর দাও। হৃদয়ের প্রেম ও আস্পৃহাতে মন প্রাণের বাহ্য বাধা ঘুচে যাবে।

৯-৯-১৯৪১

×

মন ও হৃদয়কে উপরদিকে খুলে রাখো, যাতে উপরের স্পর্শ এলে তাকে গ্রহণ করতে পারো।

৯-৯-১৯৪২

×

আলোর দিকে ফিরে থাকাই দরকার। আলো খুবই কাছে আছে, হঠাৎ এসে পড়তে পারে।

৯-৯-১৯৪৩

×

ভগবৎ কৃপার জন্য আত্মাকে প্রস্তুত রাখো, যাতে সে এলেই তাকে

গ্রহণ করতে পারো।

৯-৯-১৯৪৪

×

কর্তব্য কর্মের দিকে ইচ্ছা লেগে থাকা দরকার; তার একটা আধ্যাত্মিক ফল নিশ্চয় আছে, তাতে চেতনার বৃদ্ধি হয় এবং আত্মা ভগবৎ আলো ও শক্তির স্পর্শ গ্রহণে প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

৯-৯-১৯৪৫

×

যোগের রথের চারটি চক্র—জ্ঞান ও আভ্যন্তর আত্মদৃষ্টির স্বচ্ছতা, অহংএর দমন, প্রেমভক্তি, কর্মের নিঃস্বার্থ নিবেদন। এই চার রকম যার আছে সে নির্বিঘ্ন নিরাপদে এ পথে অগ্রসর হতে পারবে।

৯-৯-১৯৩৭

ষষ্ঠ বিভাগ

কবি ও সমালোচক

কবি ও সমালোচক

পড়া, কাব্য রচনা ও যোগ

তাঁকেই সাহিত্যিক বলব যিনি সাহিত্যই ভালোবাসেন ও কেবল তারই জন্য সাহিত্যাদি রচনা করেন। কোনো যোগী লেখক হলেও তিনি সাহিত্যিক নন, কারণ তাঁর ভিতর থেকে এক ইচ্ছা এবং বাক্য তাঁকে দিয়ে যা লেখায় তাই তিনি লেখেন। তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের চেয়ে উচ্চতর কোনো কিছুর আধার ও যন্ত্রমাত্র হয়ে তিনি লেখেন। অবশ্য সাহিত্যিক ও শিক্ষিত লোকেরা বই পড়তে ভালোবাসে—এ তাদের মনের খাদ্য স্বরূপ। কিন্তু লেখা হলো অন্য কথা। বিস্তর মানুষ আছে যারা এক কলম লেখেনি কিন্তু প্রচুর বই পড়েছে। লোকে বই পড়ে ভাব সংগ্রহের জন্য, জ্ঞান সংগ্রহের জন্য, জগৎ যে সব কথা ভেবেছে কিংবা ভাবছে তাতে মনকে ওয়াকিবহাল করবার জন্য। রচনা করবার জন্য আমি কোনো কিছু পড়ি না। যোগের মাত্রা যখন বেড়ে গেল, তখন প্রায় কিছুই পড়তাম না—কারণ তখন জগতের সমস্ত ভাবধারা ভিতর থেকে বা উপর থেকে আপনি আমার মধ্যে এত বেশি ভিড় ক'রে আসতো যে বাইরের থেকে মনের খাদ্যের কোনো দরকারই হতো না; বড় জোর জানতে চাইতাম যে বর্তমানে জগতে কি হচ্ছে—কিন্তু তাও জগৎ সম্বন্ধে কোনো সত্য দৃষ্টি পেতে নয়। তখন মুক্ত মন বিশ্ব চিন্তকের সঙ্গে সাযুজ্যলাভ করেছে।

কাব্য এবং ঐ ধরনের ভাবাভিব্যক্তির জিনিস আসে ভিতরের প্রেরণা থেকে, কোনো কিছু বই পড়া থেকে নয়। বই পড়া কেবল ভাষাটিকে সম্পূর্ণ রপ্ত করার পক্ষে সাহায্য করে কিংবা তার সাহিত্যিক কারিগরি বা কলাকৌশল শেখায়। তার পর প্রত্যেকের আপন ভাষার একটা ধরন এসে যায়, আপন একটা শৈলী তৈরি হয়ে যায়। প্রায় দশ কুড়ি বছর হলো দৈবাৎ কখনো ব্যতীত আমি সকল বই পড়া ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু আমার কাব্য রচনার শক্তি দশ গুণ বেড়ে গেছে। আগে যা অনেক কষ্টে লিখতাম, এখন তা সহজেই লিখি।

আমাকে দার্শনিক বলা হয় কিন্তু দর্শনশাস্ত্র আমি কখনই পড়িনি--যা কিছু লিখেছি তা কেবল নিজের যৌগিক অনুভূতি ও জ্ঞান ও প্রেরণা থেকে। তেমনি আমার কাব্যাদি রচনার আরো বৃহত্তর শক্তি ইদানিং এসেছে কোনো বই পড়ে নয় কিংবা অন্যেরা কেমন ভাবে লেখে তাই দেখে নয়, কেবল তা হয়েছে আমার চেতনা আরো উপরে উঠে যাওয়াতে এবং সেই উপরের চেতনা থেকে আরো বড়ো রকমের প্রেরণা আসাতে।

সাহিত্যিকের পক্ষে পড়াতে ও কষ্টজনক পরিশ্রম করাতে ভালোই কাজ হয়, কিন্তু তারও বেলাতে তার নিজের ভালো লিখতে পারার কারণ তাই নয়, কেবল তাতে সাহায্য করে মাত্র। কারণটা থাকে তার নিজেরই মধ্যে। তবে "স্বাভাবিক" জিনিস কিনা সে কথা বলতে পারি না। যার জন্মগত প্রতিভা থাকে ভাব প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হয়ে, তার পক্ষে তা স্বাভাবিক বলা যায়। আবার কখনো বা তার সুপ্ত প্রকৃতির ভিতর থেকে তেমন প্রতিভা পরেও জেগে ওঠে।

১১-৯-১৯৩৪

বুদ্ধির স্বাভাবিক বিকাশ

তেমন কিছু আমার হয়নি যোগ শুরু করার আগে। যোগ শুরু হয়েছে ১৯04 সালে, তার পরেই আমি যা কিছু কাজ করেছি, আগে কেবল কিছু কবিতা লেখা ছাড়া । আমার বুদ্ধিবৃত্তিটা ছিল জন্মগত জিনিস, যোগ করার আগে কোনো শিক্ষা পেয়ে নয় কিন্তু এলোমেলো ভাবে নানা পড়াশুনা এবং অভিজ্ঞতা পেয়ে তা জেগেছিল। তাকে শিক্ষার ফল বলা যায় না, তা হলো স্বাভাবিক বিকাশ।

×

প্রঃ সাধনার পথে চলতে চলতে কি যোগ-শক্তিতে কারও বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ ঘটে? আপনার বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ কীভাবে ঘটেছিল?

উঃ এ বিষয়ে আমাকে কোনও শিক্ষালাভ করতে হয়নি, সাধনার পথে স্বাভাবিক ভাবেই এর বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছিল।

×

প্রঃ ভালভাবে লিখতে হলে, পড়া বিশেষ প্রয়োজন। আপনি অনেক বেশী পড়েছিলেন, তাই বোধ হয় আপনার অসামান্য লিখবার ধারা গড়ে উঠেছিল?

উঃ মাফ করো—আমার লিখবার ধারা আমাকে তৈরী করতে হয়-নি। যে ধারার মধ্যে প্রাণ শক্তি আছে, তা তৈরী করা যায় না। এটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং আর যে কোনও জীবন্ত জিনিসের মত এ বেড়ে ওঠে। অবশ্যই আমি যা পড়েছিলাম তা একে সাহায্য করেছিল—কিন্তু আমি তেমন কিছু বেশী পড়িনি। ভারতবর্ষেই এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা আমার চেয়ে অন্ততঃ ৫০ বা ১০০ গুণ বেশী পড়েছেন। কিন্তু আমি যেটুকু পড়েছি, তা থেকে অনেক কিছু পেয়েছি। বাদবাকী যা হয়েছে, তা যোগ-শক্তির বলেই হয়েছে। এর ফলে আমার চেতনার বিস্তার ঘটেছে, এবং তার সঙ্গে এসেছে, চিন্তা ও দৃষ্টিশক্তির সূক্ষ্মতা ও সঠিকতা, এবং বেড়ে উঠেছে সঠিক বাক্য-বিন্যাস, বিচার প্রভৃতি।

×

প্রঃ আমার মনে হয় আপনি যোগশক্তির সম্পর্কে একটু বাড়িয়ে তুলেছেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে যে এর প্রভাব আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বুদ্ধি-বৃত্তিতে বা শিল্পীর ক্ষমতায় এর যে কোনও অবদান আছে, তা জোর করে বলা যায় না। যেমন ধরুন 'ক'র সম্বন্ধে কী একথা বলা যায় না, যে সে অন্য কোথাও থাকলেও যদি একই রকম ভাবে একনিষ্ঠ বা সচেষ্ট থাকত তা-হলে তার সৃষ্টি একই রকমের হত—যোগশক্তির ফলে হয়েছে একথা বলার কী দরকার?

উঃ আচ্ছা তুমি কি আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারো যে ‘ক’ যে আগে কখনও একটি ভাল কবিতা লিখতে পারেনি বা যার ছন্দ প্রভৃতির উপর কোনও দখল ছিল না; সে এখানে আসার পরে, বিনা প্রচেষ্টায় কী ভাবে কবি ও ছান্দিক হয়ে উঠল? রবীন্দ্রনাথই বা তাঁর সম্বন্ধে কেন ভেবেছিলেন যে তার কাণ্ড ঠিক খঞ্জ লোকের যষ্টি ত্যাগের মত, যখন সে ছন্দের পথে অনায়াসে চলতে থাকে? আমার বিষয়ই ধর না কেন? আমি কখনও ছবি বুঝতাম না, বা তা নিয়ে মাথাও ঘামাইনি, হঠাৎ এক ঘন্টার মধ্যে ছবির রং, রেখা ও গঠন প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার চোখ খুলে গেল কী করে? আমি তো আগে কখনও দার্শনিক আলোচনা বুঝতাম না বা করতাম না—কান্ট, হেগেল, হিউম বা বার্কলের লেখা এক পাতা পড়লেই আমার বিরক্তি ধরে যেত বা তাতে কোনও রস পেতাম না, বা বুঝতাম না। সেই আমিই ‘আর্য্য’ আরম্ভ করার পরেই হঠাৎ পাতার পর পাতা দার্শনিক তত্ত্বে ভরিয়ে তুলতাম এবং লোকের কাছে বড় একজন দার্শনিক হয়ে উঠেছি। এই বা কী করে সম্ভবপর হল? এমন দিন গেছে যখন এক প্যারাগ্রাফ লিখতে আমার কষ্ট হ’ত, বা দু মাসে বড় জোর একটি ছোট কবিতা বহু চেষ্টার পর লিখতে পারতাম। সেই আমিই, প্রাণায়াম আরম্ভ করার পর, কী করে হঠাৎ প্রতিদিন পাতার পর পাতা ভরিয়ে তুলতাম এবং তার সঙ্গে একটি বড় দৈনিক সংবাদ পত্র সম্পাদনা করতাম ও প্রতি মাসে ৬০ পৃষ্ঠা দর্শন সম্বন্ধে লিখতে পারতাম? একটু ভেবে দেখো মামুলী বাজে কথা বোলো না। সাধারণ ভাবে কোনও কিছু করতে যদি বহুদিনের বহু চেষ্টার প্রয়োজন হয়, আর যোগশক্তির প্রভাবে তা যদি এক মুহূর্তে বা কয়েকদিনে করা সম্ভব হয়, তাতেই কী বোঝা যায় না যোগশক্তির ক্ষমতা? যোগশক্তির বলে যে শক্তির কোনও পরিচয় আগে মেলেনি, তা ফুটে ওঠে এবং তাড়াতাড়ি, বা অক্ষমতার বদলে আসে উঁচু ধরণের ক্ষমতা, বা ব্যাহত শক্তি দুর্নিবার জয়ী হয়ে ওঠে। তুমি যদি এসব প্রমাণ অস্বীকার করো, কিছুতেই, তোমাকে স্বীকার করানো যাবে না—কেননা তুমি অন্যরকম ভাবতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

১-১১-১৯৩৫

×

প্রঃ আপনার রচনা-শৈলীর উপর যোগশক্তির কতোটা

প্রভাব ছিল তা বোঝা কঠিন।

উঃ তোমার পক্ষে বোঝা কঠিন হতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে নয়। এর বিকাশ আমি ধাপে ধাপে লক্ষ্য করে গেছি। লেখবার জন্য কোনও চেষ্টা আমাকে করতে হয়নি। আমি শুধু উর্দ্ধতর শক্তিকে কাজ করবার সুবিধা দিয়েছি, এবং যখন তা কাজ করছিল না, নিজে থেকে কোনও চেষ্টা করিনি। আগেকার দিনে যখন বুদ্ধিবৃত্তির উপর আমার আস্থা ছিল, তখন সময় সময় লেখবার জন্য জোর করতাম। কিন্তু যোগশক্তির বলে যখন থেকে আমার গদ্য পদ্য লেখার বিকাশ ঘটছিল, তখন থেকে আর জোর করিনি। তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, যখন আমি 'আর্য্য'তে লিখ-ছিলাম বা তারপর যখন কোনও চিঠি বা জবাব লিখি, কী ভাবে লিখব, বা কোন কথাটা লিখব, তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাই না। মনকে নিস্ত-রঙ্গ করে রাখি, উপর থেকে যা নামে, তাই লেখা হয়ে যায়। এমন কি যখন লেখায় ভুল শোধরাই, তখনও ঐ একইভাবে তা হয়। কাজেই বোঝো এর ভিতর প্রচেষ্টার অবকাশ কোথায়?

প্রসঙ্গতঃ, একথাও বলে রাখি এবং বোঝবার চেষ্টা কোরো যে শুধু অতিমানসের বেলায় নয়, অতিবুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ হয়। এটা পাবার বা এর জন্যে নিজেকে খুলে রাখবার চেষ্টা করা দরকার। কিন্তু একবার এর কাজ সুরু হলে, চেষ্টার দরকার ফুরিয়ে যায়। তোমার বুদ্ধিবৃত্তি সহজে খোলে না, বা খুললেও খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়, কাজেই প্রতিবারই চেষ্টার উপর নির্ভর করতে হয়—হয়তো বা খুব বেশী চেষ্টাই করতে হয়। কিন্তু আপনা থেকে উপর থেকে যা নামে, তোমার বুদ্ধিবৃত্তি যদি তা গ্রহণ করতে পারে, তাহলে আর কোনও অসুবিধা থাকে না বা প্রতিবার চেষ্টাও করতে হয় না। কী বলো?

তুমি যে বলেছ যোগশক্তি, মানসিক বা সাহিত্যের ক্ষেত্রের চেয়ে আধ্যা-ত্মিক ক্ষেত্রেই বেশী জোরদার হয়ে ওঠে, সে কথা আমি মানি না। আমার নিজের বেলাতে দেখেছি, যখন আমি প্রথমে যোগ বা প্রাণায়াম শুরু করি, পাঁচটি বছর ধরে প্রায় রোজ ৫ ঘণ্টা করে একনিষ্ঠভাবে আমায় চেষ্টা করতে হয়েছে, তবুও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কোনও লাভ হয়নি। কিন্তু যখন আধ্যাত্মিক অনুভূতি আসতে লাগল, তা এল আপনিই এবং বিনা কারণে, এবং কবিতা ও গদ্য বন্যার বেগে ছুটে চলল, যেমন চলল মানসিক বা

প্রাণিক ক্ষেত্রের বৃত্তিগুলি। আমি অনেকের বেলায় দেখেছি যে যোগের প্রথম ফল হিসাবে মানসিক বৃত্তিগুলি নানা দিকে বিকশিত হয়ে ওঠে। কেন? কারণ, আধ্যাত্মিক বা চৈত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে যেমন নিম্ন প্রবৃত্তি-গুলি প্রবল বাধা দেয়, মানসিক বা প্রাণের ক্ষেত্রে ততো দেয় না। এটা খুব সহজেই বোঝা যায়। কেমন?

১-১১-১৯৩৫

×

প্রঃ চেতনার বিকাশ ও উর্দ্ধগতির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বাড়ে একথা বুঝতে পারি। কিন্তু পার্থিব জ্ঞান যাকে সাধারণতঃ আমরা জ্ঞান বলে থাকি তার বেলায় কী?

উঃ ভিতরের জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এরও প্রসার হয়। যেমন ধরো, যোগ আরম্ভ করার আগে চিত্রকলা বিদ্যা সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা ছিল না। আলিপুর জেলে থাকার সময় এক মুহূর্ত্তের আলোয় আমার চোখ খুলে গেল আর তখন থেকেই আমি এসব বুঝতে পারছি। অঙ্কন পদ্ধতি আমি জানি না—কিন্তু যাঁর এ-বিষয়ে জ্ঞান আছে, তিনি বললে আমি সহ-জেই ধরতে পারি। যোগ আরম্ভ করার আগে এটা অসম্ভব ছিল আমার কাছে।

২৯-১২-১৯৩৪

×

প্রঃ মনে করুন, আপনি ইংরাজী সাহিত্যের কিছু পড়েননি। যোগশক্তি বলে ঐ সাহিত্য সম্বন্ধে আপনার পক্ষে কিছু বলা কী সম্ভবপর?

উঃ সম্ভব হয়, যদি কোনও একটি বিশিষ্ট সিদ্ধির চর্চ্চা করি। কিন্তু সেটা আয়াস-সাধ্য। তবে আমার মনে হয় আমার যদি যোগশক্তি থাকে,

তাহলে ওটা জানাও সম্ভবপর।

২৯-১২-১৯৩৪

×

> প্র ঃ যখন শুনি যে আপনাকেও অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল, তখন সন্দেহ হয় যে সত্যিই কি বাল্মিকীর কবিতা লেখবার শক্তি হঠাৎ খুলে গিয়েছিল বা এরকম অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে কী?

উ ঃ কোন ব্যাপারে পরিশ্রম করতে হয়েছিল? কোনও কোনও জিনিসের জন্য কষ্ট করতে হয়েছিল বটে—কিন্তু অন্য সমস্ত জিনিস, যেমন, নির্বাণ বা ছবি বোঝবার ক্ষমতা, এক মুহূর্তে বা ২।৩ দিনে এসেছিল। আমার ভিতরের গুপ্ত দার্শনিক কলকাতায় থাকা অবস্থায় এক চোটেই বেরিয়ে আসেনি বটে, কিন্তু যখন 'আর্যে' লিখতে আরম্ভ করি, তখন আগ্নেয় গিরির মত উৎসারিত হয়ে ওঠে। এ-বিষয়ে কোনও ছকে বাঁধা নিয়ম কানুন নেই। শ্যাম্পেনের বোতলের ছিপি খোলার মত বাল্মিকীর কবিত্ব শক্তি হঠাৎ ফুটে উঠতে পারে, কিন্তু সকলের বেলায় তা নাও ঘটতে পারে।

১-৪-১৯৩৫

শিল্পদৃষ্টির উন্মীলন

চিত্রকলার সমঝদার নও বলে অমন হতাশ হয়ো না। আমি নিজে এক সময়ে তোমার চেয়েও বেশি অজ্ঞ ছিলাম; ভাস্কর্য সম্বন্ধে তবু কিছুটা জানতাম, কিন্তু চিত্রকলা সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ। হঠাৎ একদিন আলিপুর জেলের কুঠরিতে বসে ধ্যান করতে করতে দেয়ালে কতকগুলো ছবি আঁকা দেখলাম, আর আশ্চর্য! তাতেই আমার শিল্পদৃষ্টি খুলে গেল, যদিও তার টেক্‌নিক বা কৌশলের স্থূল দিকটা কিছুই জানি না। কেমন ক'রে ও সম্বন্ধে ভাব ব্যক্ত করতে হয় তাও জানি না, কারণ সে জ্ঞানও আমার নেই, কিন্তু তাতেও আমার সঠিকভাবে চিনতে ও মূল্য বুঝতে কিছুমাত্র আটকায়

না। তবেই দেখ, যোগের মধ্যে সব কিছুই সম্ভব।

অনুপ্রেরণার উপরে দখলের অসুবিধা

অনুপ্রেরণা খুবই অনিশ্চিত—খেয়ালখুসী মত আসে, কাজ শেষ হবার আগেই হঠাৎ সরে পড়ে, বা ডাকলেই নামে না। এই অসুবিধা সকল শিল্পীর ক্ষেত্রেই আছে, বিশেষতঃ কবিদের। কেউ কেউ আছেন যাঁরা ইচ্ছা-মত এঁকে নামিয়ে আনতে পারেন। আমার মনে হয় তাঁরা খুব বেশী কবিত্ব-শক্তির অধিকারী এবং সুষ্ঠু লেখায় ততো পক্ষপাতী নন। আবার কেউ কেউ আছেন যাঁরা কলম ধরলেই অনুপ্রেরণাকে জোর করে নামিয়ে আনেন, কিন্তু সেই অনুপ্রেরণা খুব উঁচু ধরণের বা সুসম হয় না। কোন কোন লেখক রোজ ঠিক একই সময়ে লেখা আরম্ভ করে অনুপ্রেরণাকে একটা অভ্যাসের দাস বানাতে চেষ্টা করেন। যেমন ভার্জিল প্রথমে ৯ লাইন লিখে তাঁকে ঘসামাজা করতেন প্রতি সকালে আবার মিল্টন প্রতিদিন তাঁর মহাকাব্যের ৫০ লাইন লিখতেন। এঁদের সম্বন্ধে বলা হয় যে এঁরা অনুপ্রেরণাকে অভ্যাসগত করে ফেলেছিলেন। এর পিছনে সেই একই মূল সূত্র আছে যার জন্য ভারতবর্ষে গুরুরা শিষ্যদের প্রতিদিন একই সময়ে ধ্যান করার উপদেশ দেন। কারও কারও বেলায় এই নিয়ম খাটে, কিন্তু সকলের সম্বন্ধে নয়। আমার বেলায়, যখন অনুপ্রেরণা বিশেষ বেগে নামত না, তখন আমি এক কাজ করতাম। একটু অবসর দিতাম, আর যা করতে হবে, তার ছবি মনের পর্দায় ভেসে উঠত আর কিছু পরেই ক্ষিপ্র গতিতে সব কিছু লেখা হয়ে যেত। তবে আমার মনে হয়, প্রত্যেক কবিরই নিজের কাজ করবার এবং অনুপ্রেরণা নামিয়ে আনবার ধারা আলাদা।

'ক' দিনে ১০।১২টা বা তার চেয়ে বেশী কবিতা লিখত। আমার পক্ষে লিখতে বা ঘসা-মাজা করতে ২।১ বা কখনও কখনও ৩ দিন লাগে। খুব বেশী অনুপ্রেরণা নামলে দিনে দুটো ছোট কবিতা লিখতে পারি এবং পরের দিন তা ঘসামাজা করি। অন্য কোন কবি হয়তো ভার্জিলের মত

দিনে ৯ লাইন লেখেন এবং তার পর সমস্ত সময়টা সেটা ঘসামাজা করেন। আর কেউ বা 'খ'র মত আধখানা লাইন বা এক টুকরো লেখেন তারপর দু সপ্তাহ বা মাস ধরে সেটিকে আকার দেবার চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে সময়ের কোনও দাম নেই---কাজটা সুসম্পন্ন করা বা তার উৎ-কর্ষই প্রধান। কাজেই এগিয়ে চলো---'ক'র মত দ্রুত গতি না পেলেও হতাশ হয়ো না।

৮-১২-১৯৩৫

×

যখন দেখছ যে অতিমানসের অবতার নিজেই 'ক' বা 'খ' যা করছে, মানে দিনে একটা বা তারও বেশী কবিতা লেখা পারছেন না, তখন তাকে আর টান্‌ছ কেন? ইংলণ্ডে আমি দিনে অনেক কিছুই লিখতে পারতাম, কিন্তু তার অধিকাংশই স্থান পেত বাজে কাগজের ঝুড়িতে।

৫-৮-১৯৩৬

×

কবিতা-লক্ষ্মী দেখছি, মাঝে মাঝে তোমাকে দেখা দেন। এটি একটি খুব সাধারণ ব্যাপার। 'ক' বা 'খ', যারা যখন খুসী লিখতে পারে, তারা অসাধারণ। চেতনার গতি সম্বন্ধে আমি ঠিক বলতে পারি না। মনকে নিস্তব্ধ করা আমার নিজের প্রণালী ছিল না---আমার মন সর্বদাই তা'। কিন্তু আমি ভিতরের বা উপরের দিকে মনকে নিয়ে যেতাম। তোমার পক্ষে মনকে শান্ত করা হয়তো বা প্রয়োজন, কিন্তু এটা সহজসাধ্য নয়। তুমি কি এটা চেষ্টা করে দেখেছ?

১৯৩৫

×

ঊর্দ্ধতর চেতনা থেকে না এলে লিখব না এই আমার সংকল্প ছিল বলে আমি বেশ কিছুকাল লেখা বন্ধ করে রাখতাম। কিন্তু সেটা করতে

গেলে তোমার নিজের কবিত্ব শক্তির উপর বিশেষ আস্থা থাকা চাই তা না হলে অব্যবহারে তাতে ঘুন ধরে যেতে পারে।

৪-৯-১৯৩১

কবিতা পুনর্লিখন

প্র ঃ অনুপ্রেরণার উপর যখন আপনার পুরো দখল আছে, তখন আপনাকে কেন কবিতা, যেমন ধরুন সাবিত্রী বার বার লিখতে হয়, বুঝি না। আপনাকে তো আর আমাদের মত নতুন যোগীদের অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় না।

উ ঃ এটা বোঝা খুবই সহজ। উত্তরণের পথ হিসাবে আমি সাবিত্রীকে ব্যবহার করেছি। মানসিক কোনও এক স্তর থেকে আমি 'সাবিত্রী' লিখতে শুরু করি। প্রতিবার যখনই উচ্চ স্তরে উঠতাম, আবার সেইখান থেকে লিখতাম। তাছাড়া আমি খুব সতর্ক থাকতাম—যদি মনে হতো যে কোনও অংশ উচ্চতর স্তর থেকে আসেনি, সেটা কবিতা হিসাবে যতোই ভাল হোক্ না কেন, আমি তাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারতাম না। সবটাই, যতটা সম্ভব, একই ছাঁচে ঢালা হোক, চাইতাম। বস্তুতঃ, একটা কবিতা লিখতে বা শেষ করতে হবে, এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমি 'সাবিত্রী'কে দেখিনি। যৌগিক চেতনা থেকে কবিতা লেখা সম্ভবপর কি না, সেই গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে, আমি 'সাবিত্রী'কে দেখেছি। "Rose of God" বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা আমি বার বার লিখিনি, কেবল লেখবার সময় যা ২।১টা কথা বদ্‌লেছি।

প্র ঃ যদি 'ক' পরিবর্ত্তন না করে, অনুপ্রেরণা পেত, আপনিই বা তা পেতেন না কেন?

উঃ আমিও তাই পারতাম, যদি আমাকে অন্য কিছু কাজ না করতে হ'ত, যদি রোজই শুধু লিখতে পেতাম, আর অনুপ্রেরণার স্তর সম্বন্ধে কিছু-মাত্র সচেতন থাকতাম না যতক্ষণ রোমাঞ্চকর কিছু লিখতাম।

×

প্রঃ অনুপ্রেরণায় কোনও বাধা আসত বলে কী আপনাকে আবার লিখতে হত?

উঃ আমার সামনে একটিই বাধা আসে, তা হচ্ছে সব সময় কবিতা সৃষ্টি করবার মত অবস্থা থাকে না। আমাকে যদি লিখতেই হয়, অন্য কোনও বিষয় থেকে মনকে টেনে এনে।

×

প্রঃ আপনার যেরকম নীরব চেতনা, তাতে আপনার পক্ষে সামান্য অভিনিবেশেই ঊর্দ্ধতম স্তর থেকে টেনে আনা খুবই সহজ।

উঃ ঊর্দ্ধতম স্তরগুলি ঠিক অতোটা সুবিধা দেয় না। তা যদি হত, তাহলে কী অতিমানসকে পার্থিব জগতে নামিয়ে আনা ও প্রতিষ্ঠিত করা অতো কষ্টকর হত? তোমরা সব কেমন বোকার মত দিবাস্বপ্ন দেখ? 'নীরবতা', 'চেতনা', 'অতিমানস' প্রভৃতি কথাগুলি তোমরা ব্যবহার কর, যেন ইলেকট্রিকের বোতাম টেপার মতন, টিপলেই এ সব থেমে আসবে। তা হয়তো একদিন ঐ রকমই অনায়াসসাধ্য হবে, কিন্তু ইতিমধ্যে আমাকে একটি জীবনের মধ্যে এর গতির ছন্দ, নিয়ম কানুন, বিপদের আশঙ্কা, যোগাযোগের সূত্র প্রভৃতি জেনে নিতে হবে, ও আরও দেখতে হবে কি করে এটা ত্রুটিহীন হয়। আর আমার শিষ্যরা আশা বা নৈরাশ্যের তীর ছুড়তে থাকবে দায়িত্বহীনতার শিখরে বসে, আর আশা করবে যে সব কিছু সুস্পষ্টভাবে যেন তাদের জানিয়ে দিই; শুধু ইসারায় নয়—এরই মধ্যে বসে আমাকে

ঐ কাজ করতে হবে। হায় ভগবান।

২৯-৩-১৯৩৬

> প্রঃ ঘষে মেজে ঠিক করা খুবই বিরক্তিকর কাজ। কিন্তু আমরা শুনি যে গদ্য বা কবিতা আপনি বারংবার পরি-মার্জ্জনা করেন। বোধ হয় আপনার এটা ভাল লাগে।

উঃ শুধু কবিতা—গদ্য নয়। আর সব কবিতা নয়, শুধু একটি—'সাবিত্রী'। আমার অন্য সব কবিতা সঙ্গে সঙ্গে লেখা হয়ে যায়, আর যদি কিছু পরিবর্ত্তন করা দরকার মনে করি, সেই দিনই বা তার পরের দিন, খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলি।

৯-৫-১৯৩৭

প্রচেষ্টা ও অনুপ্রেরণা

> প্রঃ কবিতা লিখতে গেলে, অনুপ্রেরণা আর চেষ্টা দুইই প্রয়োজনীয়। অনুপ্রেরণা মাঝে মাঝে সরে পড়ে, আর তখন কবি তাকে নামিয়ে আনবার জন্য বারংবার ধাক্কা মারে, কিন্তু সে আসে না।

উঃ ঠিকই বলেছ। এটা যদি ফলপ্রসূ হয়, তার কারণ এটা নয় যে বারংবার তাকে ধাক্কা মেরেছে কিন্তু ঐ ধাক্কার বিশ্রী শব্দের মধ্যে চকিতের মত সে নেমে আসে। প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে বই কি, কিন্তু তা শুধু অনুপ্রেরণাকে নামিয়ে আনার ছলে। খেয়ালখুসী মত এ আসে, আর না এলে, চেষ্টার পর হয়তো লেখা বন্ধ করতে হয়, বা মনের তৈরী কোনও খেলো জিনিস নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আমার নিজেরই এ-রকম অনেকবার হয়েছে। 'ক'কেও কিছু ভাল লিখতে দেখেছি কিন্তু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়, এবং তাকেও ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছে পরিবর্তনের পর

পরিবর্ত্তন করে, কিন্তু তাতেও আগের চেয়ে ভাল হয় না। কারণ একমাত্র নতুন অনুপ্রেরণাই পুরণো লেখার ত্রুটি সত্যিকারের মত দূরীভূত করতে পারে। তবুও সকলকে চেষ্টা করতে হয়, কিন্তু সেই চেষ্টায় কোনও ফল হয় না, যা কিছু ফল হয় যদি অনুপ্রেরণা সাড়া দেয় চেষ্টার ডাকে। তুমি দরোজায় আঘাত হানো, ভিতরের লোকটি যাতে সাড়া দেয়। কিন্তু সে সাড়া দিতেও পারে, নাও পারে। সাড়া না দিলে, তোমাকে গালাগাল দিতে দিতে সরে পড়তে হবে। এই হচ্ছে প্রচেষ্টা ও অনুপ্রেরণা।

৬-৩-১৯৩৬

প্রঃ আপনি কি বলতে চান যে, উপর থেকে দেবতারা কি দেবেন তার অপেক্ষায় নিস্তব্ধ ধ্যানে বসে থাকায় কিছু লাভ আছে? এরকম ভাবে আপনি অনেক কিছু লিখেছেন জানি, কিন্তু লোকেরা আরও বলে যে দেবতারা, না দেবীরা, আপনার কাছে আসতেন ও বেদের অর্থ বুঝিয়ে দিতেন।

উঃ এটা ঠাট্টার কথা। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে ঐভাবে সব ঘটত। যখন মন শান্ত থাকত, তখন বোধি নেমে আসত পূর্ণ বা আংশিক ভাবে। কিন্তু এটাই একমাত্র পথ নয়। লোকে অনেক কিছু বাজে কথা বলে। ১৯০৯ সাল থেকে আমি ঐ ভাবেই লিখেছি অর্থাৎ কিনা মনের শান্ত অবস্থায়, শুধু মনেরই বা বলি কেন, শান্ত চেতনায়ও। কিন্তু দেব-দেবীগণের এর মধ্যে কোনও হাত ছিল না।

সৃষ্টি প্রেরণার চাপ

আমি জানি এই সৃষ্টি প্রেরণা কেমনভাবে চাপ দেয় নিজেকে প্রকাশ ক'রে সার্থক হবার জন্য। তেমন চাপ এলে তখন তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া কিছুই করবার থাকে না, তার কাজ হতে দিয়ে তবে মনকে নিরস্ত

ও মুক্ত করা যায়ঃ নতুবা দোটানায় পড়ে এমন অবস্থা থাকে না যাতে নির্বিঘ্নে কোনো একাগ্রতার কাজ হতে পারে।

কবিত্বের অনুপ্রেরণা ও গদ্য লেখা

> প্রঃ এখন আমি গদ্য লেখায় খুব ব্যস্ত। কাজেই কবিতার দুয়ার এখন বন্ধ। আমার মনে হয় গদ্য লেখা শেষ হবার পর শরৎ-লক্ষ্মী ফিরে আসবার সুযোগ পাবেন?

উঃ তোমার গদ্য লেখার জন্য কবিতা লেখার অনুপ্রেরণা অপেক্ষাই বা করবে কেন? মাটিতে জঞ্জাল আছে বলে আকাশে উড়ার কোনও বাধা তো হয় না।

১৬-৩-১৯৩৫

নিজের লেখার নিজে নিম্ন সমালোচনার বদ অভ্যাস

নিজের লেখাকে নীচু করে দেখবার বদ অভ্যাস তোমাকে পেয়ে বসেছে। অনেক শিল্পী ও কবির এই অভ্যাস আছে। নিজেদের সৃষ্টির দিকে তাকালেই তাদের মনে হয় সেটা বুঝি খুবই নিম্ন স্তরের বা খারাপ। (আমি নিজে মাঝে মাঝে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরখ করতাম। 'ক'ও এটা করে) কিন্তু লেখার সময় এরকম ভাব রাখা খুবই খারাপ। যদি বাধাহীন অবস্থায় লিখতে চাও তো এই অভ্যাস ত্যাগ করো।

১৪-১২-১৯৩৬

লেখায় সাফল্য অর্জ্জনের জন্য ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা

> প্রঃ বাংলায় কবিতা, গল্প, নানা রকমের রচনা লেখবার

জন্য ভিতর থেকে বিশেষ একটা তাগিদ পাচ্ছি।

উঃ এ ধরনের উচ্চ আশা অস্পষ্ট ও সাফল্যের পরিপন্থী। তুমি যদি সাফল্য লাভ করতে চাও, তাহলে লেখবার ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করতে হবে। আমি তো বৈজ্ঞানিক, চিত্র-শিল্পী বা সৈন্যাধ্যক্ষ হবার চেষ্টা করি না। ভগবান আমাকে দিয়ে যা করাতে চেয়েছেন, আমি তাই করেছি। আর সব কিছু উপরের বা ভিতরের তাগিদে বেরিয়ে এসেছে। ভগবান যতটুকু আমাকে দিয়ে করাতে চেয়েছেন আমি ঠিক ততটুকুই করেছি।

×

প্রঃ সাহিত্যিক হবার চেষ্টা করব, অথচ অন্য বড় সাহিত্যিকদের অবদান সম্বন্ধে অচেতন থাকব, এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়।

উঃ অমার্জ্জনীয় কেন? জাপানী বা সোভিয়েট রাশিয়ার লেখকদের অবদান সম্বন্ধে কিছু জানি না, কিন্তু এই অজ্ঞতায় তো আমার সুখের কিছু ব্যত্যয় ঘটেনি। সাহিত্যিক হবার জন্য ডিকেন্সের লেখা পড়তে হবে, এ ধারণা বাতুলতা মাত্র। তিনি মোটেই সাহিত্যিক ছিলেন না, অথচ সাহিত্যের ক্ষেত্রে নাম করেছেন, আর তাঁর রচনা-শৈলী মরুভূমি প্রায়।

১৯-৯-১৯৩৬

×

প্রঃ মেরেডিথ, হার্ডি, শেলী, কীটস, ও অন্যান্য ইউরোপীয় ও রাশিয়ার লেখকদের লেখাপড়ার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কী বলতে চান?

উঃ ও ভগবান, আমার যদি তোমার মত অতো পড়বার সময় থাকত। এমনকি এ সম্বন্ধে কিছু বলবারও সময় আমার নেই।

×

ফাঁক

প্র ঃ পারস্য দেশের মহাকবি, 'শাহানামা'র রচয়িতা ফার্দ্দুসী সম্বন্ধে আপনি কোথাও কিছু বলেননি। হোমার, বাল্মিকী, ব্যাস প্রভৃতি যাঁদের আপনি প্রথম শ্রেণীর মহাকবি বলে মনে করেন, তাঁদের সঙ্গে একাসনে ওঁকে বসাতে চান? এতো বিভিন্ন ভাষা পড়ে আপনার নিজের সংস্কৃতিকে এতো ব্যাপক করেছেন, অথচ ফার্সী ভাষা না শিখে, তার মধ্যে ফাঁক রেখেছেন, এটা কী করে সম্ভব হ'ল?

উঃ অনেক দিন আগে আমি অনুবাদে ফার্দ্দুসীর লেখা পড়ি, কিন্তু তা পড়ে মূল রচনার মাধুর্য্য সম্বন্ধে কোন ধারণাই আসেনি, আর কৃষ্টিতে ফাঁক সম্বন্ধে যা বলেছ—আমি তো রাশিয়ান, বা ফিনিস জানি না আর নিবেলুনজেনলিয়েদ মূল ভাষায় পড়িনি, না পড়েছি প্রাচীন মিসরীয় ভাষায় লেখা রামেশিসের দেশ বিজয় সম্বন্ধে পেনটাউরের কবিতা, বা তার অংশ বিশেষ যা পাওয়া গেছে। আরবী ভাষাও আমি জানি না, কিন্তু 'এরেবীয়েন নাইটসের' বার্টনের লেখা অনুবাদ পড়ে, আমার মনে হয়নি যে আমার কিছু লোকসান গেছে—বার্টনের লেখা মূল রচনার মতই ক্লাসিক। যাই হোক্, ফাঁক অনেক এবং বড়ই আছে।

১৩-৭-১৯৩৭

প্রেরণা ও কৌশল জানা

ছন্দকৌশলের ব্যাপার অধ্যয়ন ক'রে তোমার প্রেরণাকে খর্ব করার দরকার নেই—নিজের মধ্যে যে ছন্দের জ্ঞান আছে তাতেই যথেষ্ট। আমি নিজে কখনই ছন্দশাস্ত্র শিখিনি, অন্ততপক্ষে ইংরেজীতে; যা কিছু জেনেছি তা পড়ে এবং লিখে এবং আমার নিজের কানকে অনুসরণ ক'রে। তবে যদি তুমি বিদ্যাটা শেখার জন্যই ছন্দশাস্ত্রের চর্চা করো সে হলো আলাদা কথা—কিন্তু ওটা অপরিহার্য নয়। ২৮-৪-১৯৩৪

কাব্যের আধ্যাত্মিক মূল্য

আমি যা লিখে পাঠাই তার উপর অনেকখানি অতিরিক্ত অর্থ চাপিয়ে কোনো লাভ হয় না, তাতে তার প্রকৃত অর্থকে ছাপিয়ে ভুলবোঝা এসে পড়ে। আমি এই কথা বলেছিলাম যে আধ্যাত্মিক ধরনের কবিতায় (ভার্লেন বা সুইন্‌বার্ন কিংবা বদেলেয়ারের মতো নয়) থেকে কেনই বা উপলব্ধি আসবে না। তার মানে এই নয় যে কবিতাই হলো ভগবৎ উপলব্ধির একটা বড়ো উপায়। এমন কথা বলিনি যে ওতেই ভগবানের কাছে পৌঁছনো যাবে কিংবা কেউ তা পৌঁছেচে কিংবা কবিতার দ্বারাই সটান স্বর্গে উঠতে পারা যায়। আমার কথার অমন বাড়াবাড়ি অর্থ করলে তা অবিশ্বাস্য বোকামি হয়।

যা আমি বলেছি তা খুবই স্পষ্ট কথা, যুক্তি বা সাধারণ বুদ্ধির বিরুদ্ধ কিছু বলা হয়নি। বাক্য হলো শক্তিপূর্ণ—এমন কি সাধারণ লিখিত বাক্যেরও কিছু শক্তি থাকে। বাক্য দিব্যপ্রেরণা থেকে এলে তার শক্তি আরো বেশি হয়। কি প্রকারের শক্তি ও তা কিরূপ কাজের দরুন তা নির্ভর করে সেই প্রেরণার প্রকৃতির উপর এবং সত্তার যে ভাবকে বা যে অংশকে তা স্পর্শ করবে তার উপর। সেই বাক্যই স্বয়ং কাজ করে—যেমন বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি বড়ো বড়ো শাস্ত্রগ্রন্থের উক্তি,—তার এমন শক্তি থাকতে পারে যাতে আধ্যাত্মিক ও উচ্চমুখী প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে, এমন কি কয়েক রকমের উপলব্ধিও এসে যেতে পারে। এ কথা অস্বীকার করলে প্রকৃত আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে বলা হয়।

বেদের কবিরা তাঁদের কাব্যকে মন্ত্র বলতেন, কারণ তা আসতো তাঁদের নিজস্ব উপলব্ধির ভিতর থেকে এবং অন্যের মধ্যেও উপলব্ধি আনার মাধ্যম স্বরূপ হতে পারতো। অবশ্য তার মানে প্রধানত জ্ঞানদীপ্তি, যোগের যা লক্ষ্য স্থায়ী উপলব্ধি সে জিনিস নয়—কিন্তু তা সেই লক্ষ্যে যাবার সোপান স্বরূপ বা অন্তত আলোক প্রদর্শক হতে পারতো। আগেকার দিনে আমি নিজে উপনিষদ বা গীতার শ্লোকগুলির মধ্যে ধ্যানমগ্ন থেকে অনেক জ্ঞানদীপ্তি লাভ করেছি। এই ধরনের যে কোনো দীপ্তিদায়ক বাক্য, কথিত বা লিখিত, তারই প্রভাবে অন্তর্দৃষ্টি এনে দিতে পারে। নিজেও তুমি জানো যে তোমার কিছু কিছু কবিতা ভাবপ্রবণ অনেককে উদ্দীপিত করেছে। "আর্য" পত্রিকা পড়ে অনেকের আধ্যাত্মিক উন্মীলন ঘটেছে—সেগুলি কবিতাও নয় বা আধ্যাত্মিক কাব্যের শক্তিও তাতে নেই—কিন্তু তাতেই

বোঝা যাবে যে আধ্যাত্মিক জিনিসের পক্ষেও তা শক্তিহীন নয়। আধ্যাত্মিক জনেরা সকল যুগেই তাদের আস্পৃহা কিংবা অনুভূতিকে কাব্যে বা দিব্য উচ্ছ্বাসের ভাষাতে ব্যক্ত করেছে, তা নিজেদের ও অন্যেদের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। সুতরাং আমি যে ঐ ধরনের কাব্যের চৈত্য বা আধ্যাত্মিক মূল্যের কথা বলেছি ও তদনুরূপ ক্রিয়ার কথা বলেছি তা বাজে কথা নয়।

কাব্য এবং যোগ

সাহিত্য ও শিল্পকলা আভ্যন্তরীণ সত্তাতে প্রথম প্রবেশদ্বার হতে পারে—অর্থাৎ ভিতরের মনে ও প্রাণে; কারণ সেখান থেকেই ওগুলি আসে। আর কেউ যদি ভক্তির কবিতা, ভগবানকে চাওয়া প্রভৃতি নিয়ে কবিতা লেখে, কিংবা ঐ প্রকার সঙ্গীত রচনা করে, তার মানে এই হয় যে তার নিজের মধ্যে একজন ভক্ত বা সাধক রয়েছে যে ঐ ভাবে নিজেকে প্রকাশ করছে। আমি যখন লেলেকে বললাম যে আমি যোগ করতে চাই আমার কাজের জন্য, কোনোরকম সন্ন্যাস বা নির্বাণের জন্য নয়, অনেক বছর চেষ্টা করেও আমি তার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না তাই ওকে ডেকেছি, তখন সে বললে, "তোমার পক্ষে তা সহজ কাজ হবে কারণ তুমি হলে একজন কবি",—তার সে কথার পিছনে ঐরূপ মর্মই ছিল। কিন্তু ন ঐদিক দিয়ে প্রশ্নটা করেনি, কাজেই ঐদিক দিয়ে তাকে আমি উত্তর দিইনি। সে কেবল বলেছিল সাহিত্যের দ্বারা বিশেষ রকমের চরিত্র গড়ার কথা।

১৮-১১-১৯৩৬

ম কি বলেছে তা দেখিনি, কিন্তু যদি সে এমন কথা বলে থাকে যে তুমি আর উত্তেজক প্রেমসঙ্গীত গাওনা বলে তোমার গাওয়ার শক্তি সংকীর্ণ হয়ে কমে গেছে, তা কেমন ক'রে হতে পারে বুঝলাম না। কেউ যদি ও দেশের জাজ্‌ সঙ্গীতের উন্মাদনা ছেড়ে দিয়ে কেবল ওখানকার বড়ো বড়ো সঙ্গীত রচয়িতার সঙ্গীত শুনতেই আনন্দ পায়, তাতে তারা সংকীর্ণমনা হয়ে যায় না; কেউ যদি চিন্তায় বা ভাবে বা শিল্প সৃষ্টিতে নিম্ন স্তর থেকে উচ্চ

স্তরে ওঠে, তাতে তার গুণ কমে যায় না। আমি আগে প্রাণ সম্পর্কীয় প্রেমের কবিতা লিখতাম, এখন আর তা পারব না (যদি প্রেমের কবিতাও লিখি তা হবে দিব্য ও আধ্যাত্মিক প্রেমের—তার কারণ এই নয় যে আমার ক্ষমতা কমে গেছে, কারণ এই যে আমি এখন উচ্চতর চেতনাতে উঠে আসাতে কেবল প্রাণের কথাতে আমার নিজের প্রকাশ হবে না। যে কেউ চেতনার স্তর বদ্‌লে উঠে যাবে তার বেলাতেও তাই হবে। যে মানুষটা আগেকার ছেলেবেলাতে পুতুল নিয়ে খেলতো কিন্তু এখন বড়ো হয়ে উঠে তা আর খেলে না, তার এই পরিবর্তন আসাতে সে সংকীর্ণ হয়ে এখন নেমে গেছে, তাই কি বলা চলবে?

২৭-৮-১৯৩৩

যা তুমি লিখেছ তা খুবই ঠিক কথা, মানুষের মহত্ত্ব ও খ্যাতি ও কৃতী যতই হোক তা অনন্ত ও শাশ্বতের কাছে কিছুই নয়। কিন্তু এর থেকে দুটি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে: প্রথমটি এই যে, অতএব সমস্ত মানবীয় প্রচেষ্টাকে পরিহার ক'রে চলে যাও নির্জন গুহাতে; দ্বিতীয়টি এই যে, আপন অহংকে পরিহার করো যাতে একদিন তোমার প্রকৃতির সকল কাজ সেই অনন্ত ও শাশ্বতের কাজেই পরিণত হবে। আমি তপস্যা করছি বলে কখনো কবিতা লেখা বা অন্য সব সৃষ্টিক্রিয়া পরিত্যাগ করিনি; তবে আভ্যন্তর জীবন প্রবল হয়ে ওঠাতে তা এখন গৌণ স্থান নিয়েছে; আমি তা একেবারে ছেড়ে দিইনি, কেবল কাজের খুব চাপ পড়াতে তার জন্য সময় করতে পারিনি। কিন্তু ঐ অহং ত্যাগ করতে আমার বছরের পর বছর সময় লেগে গেছে; কিন্তু এমন কথা কেউ বলেনি বা আমারও মনে হয়নি যে তাতে এমন প্রমাণ হচ্ছে যে আমি যোগ করার উপযুক্ত হয়ে জন্মাইনি।

তোমার কিংবা অন্য কোনো সাধকের সাধনা সম্পর্কে যে বিপত্তি ঘটে তা প্রকৃতপক্ষে ধ্যানযোগ বনাম ভক্তিযোগ বনাম কর্মযোগ নিয়ে নয়, কিন্তু

তা নিজেদের মনোভাব নিয়ে, কোন দিক দিয়ে যাবে তাই নিয়ে। তোমার বেলাতে দেখছি মনের দিক থেকে চলছে প্রবল প্রয়াস, অপরপক্ষে প্রাণের দিক থেকে একটা নিশ্চিত পরাভবের বিষণ্ণতা, যেন নিঃশ্বাস চেপে রেখে সে বলছে, "আচ্ছা, দেখি কতখানি তোমার দৌড়, কিন্তু"....আর ধ্যান শেষ হলেই তখন বলছে, "দেখছ, আমি আগেই কি বলেছিলাম?"....প্রাণের তরফের এমনই একটা হতাশা যে কবিতা রচনার "জোর প্রবাহ" আসার পরেও হতাশার কথাটা সে বলতেই থাকে! সাধকসুলভ অনেক রকমের বিপত্তির ভিতর দিয়ে আমি অতিক্রম করেছি, কিন্তু এমন কথা মনে পড়ে না যে ভালো কবিতা লেখার বা তাতে মগ্ন হবার আনন্দকে অদিব্য জিনিস ভেবে হতাশ হয়েছি। ওটা নিতান্ত বাড়াবাড়ি বলেই আমার মনে হয়।

২৩-১২-১৯৩৪

" The Life Heavens " কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অখুশি

রবীন্দ্রনাথ যে ঐ কবিতা পড়ে খুশি হননি তার কারণ ভাবগত নয় কিন্তু ব্যক্তিগত—অর্থাৎ তিনি নিজে অমন কিছু অনুভব করেন না তাই ওকে সত্য অনুভূতি মনে করেন না (নিজের পক্ষে), কাজেই তাঁর মনে কোনো ভাবের উদয় হয়নি, অপরপক্ষে আমার "শিব" (Shiva) কবিতাটি পড়ে ঠিক তার উল্‌টো কথা বলেছেন। ও সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না, যদি কেউ বিশেষ কারণে আমার কবিতার সবটাই অপছন্দ করে,— যেমন কাজিন্‌স্ বলেছিলেন যে আমার "In the Moonlight" কবিতাটির গোড়াকার ছত্রগুলি নিচুদরের হয়েছে। তার থেকে আমি অনেক সাহায্যও পেয়েছি, কেমনভাবে আমি ভবিষ্যৎ কাব্যের কথা লিখব সেই সম্পর্কে। আমিও আগে তা জানতাম, কিন্তু ঐ মন্তব্যে আমার মধ্যে সে কথা আরো স্পষ্টতর হলো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথাটার ঠিক মানে বুঝলাম না। কবিতার মধ্যেকার সব জিনিসই আমার কাছে সত্য নয় (যেমন দান্তের নরক বর্ণনা ইত্যাদি) তথাপি ওতে আমার মনে যা ভাব জাগার তা জেগেছিল। কবিতার কাজ হলো যেমন আমাদের ভিতরকার ভাব ও অনুভবাদিকে ভাষাতে গৌরবদান করা তেমনি আবার নতুন জগতের দিকে দৃষ্টি খুলে দেওয়া। "The Life Heavens" কবিতা যদি তা করতে না পেরে

থাকে তাহলে সেটা আমার লেখার দোষ, কিন্তু তাই বলে ভাবটির দোষ নয়।

আধ্যাত্মিক অনুভূতির বুদ্ধিগ্রাহ্য বিবৃতি

আমার এমন মনে হয় না যে মনোবুদ্ধির উপরকার জিনিসের কথা বিশেষ রকমে বুদ্ধিগ্রাহ্য ক'রে বলতে হবে। কারণ সে স্থলে তা ভেবেচিন্তে যে ভাবটি জন্মালো তাকেই প্রকাশ করার ব্যাপার নয়। সেরূপ আধ্যাত্মিক জ্ঞান আসে সরাসরি অনুভূতি ও চেতনার ভিতর থেকে। অতএব তা মূলতঃ কোনো চিন্তা বা ধারণা নয় কিন্তু তা একরূপ চেতনা আসা। যেমন, আমার নিজের সেই প্রথম অনুভূতি যা এসেছিল---যদিও তা চরম জিনিস নয়---যা এসেছিল সকল চিন্তাকে নীরব ক'রে দেবার পরে---প্রথমে স্থিরতা ও নীরবতার একটা সুনিশ্চিত চেতনা, তার পরে একটা পরমতম অদ্বিতীয় অস্তিত্বের বোধ, যার কাছে রূপসকল যেন বাস্তব নয়, কেবল ছায়ামাত্র বোধ হতে থাকল। কিন্তু তা হলো নির্ব্যক্তিক ভাবে এক আধ্যাত্মিক বোধ, যার মধ্যে বাস্তব কি অবাস্তব তার কোনো ধারণাই ছিল না, কারণ মনের ধারণাক্রিয়া তখন স্থিরতার মধ্যে স্তব্ধ। মনের মধ্যে নয় কিন্তু বিশুদ্ধ চেতনার মধ্যেই তা পরিজ্ঞাত হচ্ছিল, সেখানে কোনো বাক্য বা নাম দিয়ে জানার প্রয়োজনই ছিল না। অথচ এই ধরনের আধ্যাত্মিক অনুভূতি কোনো কিছুর দ্বারা সীমিত নয়, অর্থাৎ তা চিন্তা-রহিতও হতে পারে চিন্তা-সহিতও হতে পারে। অবশ্য মন প্রথমেই চাইবে তাকে বুদ্ধিগ্রাহ্যের রাজ্যের মধ্যে নিয়ে আসতে, সেই চেষ্টাই অনেকক্ষণ পর্যন্ত চলতে পারে; কিন্তু আমার মনে হয় যে তা অপরিহার্য নয়---অর্থাৎ যা অনুভূতিতে পেলাম তা বুদ্ধিগ্রাহ্য ক'রে বলা। কিন্তু অন্য একরকম চিন্তা আছে যা ঐ অনুভূতি বা চেতনার (বা তার অংশের) গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে---কিন্তু সে জিনিসও ঠিক বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় না। তার থাকে আলাদা আলো, আলাদা শক্তি, আলাদা একটা ভাবের মধ্যে ভাব। এই সব চিন্তাই আসে বাক্যে রূপায়িত হবার প্রয়োজন না নিয়ে, যা কেবল চেতনার সরাসরি-দেখতে-পাওয়া চিন্তা, এক-রূপ ঘনিষ্ঠ স্পর্শবোধ যা নিজেই নিজেকে জানান দেয় (খুব দুর্বোধ্য বা ধোঁয়াটে হলো না তো)। কিন্তু এমন সব চিন্তাকে বাক্যে বলতে গেলেই অমনি তা বদ্ধির রাজ্যের খপ্পরে যাবে---কারণ বাক্য মাত্রই বদ্ধির ছাপ-

মারা মুদ্রা। কিন্তু তাই কি নিতান্তই অপরিহার্য? আমার বরাবরই বোধ হয়েছে যে মূলতঃ চিন্তক মন থেকে ছাড়াও অন্য কোন রাজ্য থেকে বাক্যের সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু চিন্তক মন তখনই তাকে আপন দখলে নিয়ে ছাপ মেরে নিজের কাজে লাগিয়ে দিলে। কিন্তু ও কথা ছাড়াও, বাক্যকে কি বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাপার ব্যতীতও অন্য কোনো ব্যাপারে প্রয়োগ করা সম্ভব হতে পারে না? হাউসম্যান বলছেন যে কাব্য তখনই হবে খাঁটি কাব্য যখন তা বুদ্ধিগ্রাহ্য হবে না, যখন তা অর্থহীন হবে। এ হয়তো অবিবেচনার মতো কথা, কিন্তু তিনি বোধহয় *এই* কথাই বলতে চান যে কাব্য এমন হবে যা বুদ্ধির নিরীক্ষাতে বাড়াবাড়ি মনে হবে, কারণ তা এমন কিছুর কথা বলছে যা বুদ্ধির চিন্তার বদলে অন্যরূপ দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে। এমন কি সম্ভব নয় যে বাক্য এবং ভাষা তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলো মনোবুদ্ধির উপরকার চেতনারাজ্য থেকে, যেখান থেকে আসে আধ্যাত্মিক অনুভূতি? কিন্তু তা অন্য কথা, আর আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে বুদ্ধিগ্রাহ্য ক'রে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করা হলো অন্য কথা।

গদ্যকে কবিতাতে তর্জমা

কাব্যময় গদ্যকে কবিতায় আনা খুবই ন্যায্য; আমি নিজে তা করেছি The Hero and the Nymph তে, *এই* যুক্তিতে যে কালিদাসের গদ্য মাধুর্য ইংরেজী কবিতার মধ্যে চমৎকার ফুটে উঠতে পারে, অন্ততপক্ষে আমি তা ভালো ভাবেই করতে পারলাম। তোমার সমালোচক যে নিয়মের কথা বলেন তা বড়ো খাড়া খাড়া; অধিকাংশ স্থলে তা চলে কিন্তু অল্প কয়েকটি স্থলে নয় (যেখানে তা উৎকৃষ্ট)। তাতে বোঝাবে যে হোমার ও ভার্জিল কেবল হেক্সামিটারেই তর্জমা করা চলবে। আবার বিপরীত দিক থেকে কি দেখনি—অনেক কবির কাব্যের গদ্য তর্জমা আসলকে ছাড়িয়ে আরো সুন্দরভাবে কাব্যের ভাবটিকে প্রকাশ করেছে? বেশি দূর যেতে হবে না, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ইংরেজী গদ্য তর্জমা দেখলেই হবে। কাব্যকে যদি অমন সুন্দরভাবে গদ্যে রূপান্তরিত করা যায় এবং তা ন্যায্য হয়, তাহলে গদ্যকেই বা কেন ন্যায্যভাবে কবিতায় রূপান্তরিত করা যাবে না? আসল কথা নিয়ম খাড়া করা হয় কেবল সমালোচকদের সুবিধার জন্য,

স্রষ্টাদের বেঁধে ফেলার জন্য নয়।

শব্দানুগত অনুবাদ

শব্দানুগত অনুবাদের নিয়ম এই হবে যে মূল কাব্যের শব্দগুলিকে এমনভাবে অনুবাদে বজায় রাখা যাতে তার ফলে যা দাঁড়াবে তা যেন মূল বাংলা কবিতার মতোই শোনায়, যেন কবিতাটি গোড়ায় বাংলাতেই রচিত হয়েছে।

আমি স্বীকার করছি যে আমি যেমন বলছি তেমন কাজে করিনি—আমি মূল জিনিসকে যখন অনুবাদ করেছি তখনই আমার ইচ্ছামত হেলা-ভরে কলম চালিয়েছি, তাতে মূলকে আঘাত করা হচ্ছে সে কথা না ভেবে। কিন্তু এমন মারাত্মক অপরাধ আমি কাউকে অনুকরণ করতে বলি না। ইদানিং আমি অনেকটা সংযত হয়েছি, তার কি ফল হলো জানি না। তবে এখানেও সেই কথা, "আমি যা বলছি তাই করবে, যা করছি তা নয়"।

১০-১০-১৯৩৪

নতুন কবিদের সাহায্য দান

হাঁ নিশ্চয়, জ-কে আমিই সাহায্য দিচ্ছিলাম। কেউ যখন বাস্তবিকই সাহিত্যশক্তি অর্জন করতে চায়, আমি আমার কিছু শক্তির দ্বারা তাকে সাহায্য করি, পুরুষ কিংবা মেয়ে। যদি তার মধ্যে কিছু গুণসম্ভাবনা থাকে, তা যতই সুপ্ত থাক, এই চাপের দ্বারা তা বেরিয়ে পড়ে, এদিক ওদিক হয় না। অবশ্য ওর মধ্যে কেউ কেউ অন্যেদের চেয়ে অনুকূল আধার থাকে, তারা বেশ তাড়াতাড়ি গজিয়ে ওঠে। অন্যেদের প্রয়োগশক্তি না থাকাতে ছেড়ে দেয়। কিন্তু মোটের উপর এ গুণটি সহজেই ফুটিয়ে তোলা যায়, কারণ গ্রহীতার সেখানে সহযোগিতা মেলে, কেবল মানব মনের যে তামসিক অপ্রবৃত্তি ও অপ্রকাশ তাকেই ঘোচানো দরকার, সেটা তত কঠিন নয় যতটা কঠিন হয় তার অন্য দিক দিয়ে পরিবর্তন আনতে গেলে তখন তার প্রাণসত্তার ভিতর যে প্রতিরোধ ও ইচ্ছার অসহযোগিতাকে

ঘোচাতে চাইলে।

১১-৬-১৯৩৫

ওর বইখানি সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না, কারণ যেখানে আমি কোনো তরুণ ও নতুন লেখককে অনুকূল ভাবে কোনো উৎসাহ দান করতে পারব না, সেখানে আমি চুপ করেই থাকব... তবে প্রত্যেক লেখকই নিজ নিজ উপায়ে উন্নতি করুক।

৩১-৫-১৯৪৩

স এর সম্বন্ধে এই বলব যে তুমি তাকে তার লেখা নিয়ে আমার দেওয়া সুখ্যাতিটুকু জানিয়ে দিতে পারো কিন্তু তার সঙ্গে যেন এ ইঙ্গিতটিও থাকে যে তার লেখাকে আমি অসম বলে মন্তব্য রেখেছি, সুতরাং তার সমস্তটাই চিনির মতো নয়। কিন্তু অ্যালবাম-কবিতা ও ধোঁয়াটে ধরন খুবই উগ্র--নিজে-দের মধ্যেই চলে--এটাও লেখককে বলতে হবে। তার জন্যে ও কথা আমি নরম করেই বলতে চাই। আগেই আমি একবার বলেছি যে যাদের আমি সাহায্য দিয়ে আরো ভালো ক'রে দিতে পারব না তাদেরকে আমি কোনো কিছু বলেই নিরুৎসাহ করতে চাই না। "আর্য" পত্রিকাতে আমি সমালোচনার জন্য অনেক ভারতীয় লেখকের কবিতা পেতাম, কিন্তু পাছে তা খুব কটু হয়ে যায় তাই আমি বরাবর তা এড়িয়ে গেছি। কেবল লিখে-ছিলাম হ-এর বেলাতে, কারণ আমি দেখেছিলাম যে তা বাস্তবিকই অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য।

২৫-৫-১৯৩১

র-এর কবিতাগুলি হলো প্রথম প্রয়াস--তার বয়সের পক্ষে ভালোই বলতে হবে--তাই ভালো লেখা হচ্ছে বলে আমি তাকে উৎসাহ দিই।

তার ইংরেজী কবিতাগুলিকে আমি সংশোধন করে দিই, কিন্তু তার ভাষাটার উপর দখল এখনও কাঁচা। অন্য তিন জন ভাষাতে বেশ পাকা, আর দ হলো উঁচুদরের কবি। ওরা আমার মতামত চাইলে আমি সাধারণ ভাবে তা দিয়ে থাকি। কোনো বিশেষ উপদেশ দিতে যাই না। কেবল ইংরেজী কবিতার বেলাতেই আমার যা অভিমত তা জানাই, সংশোধনও করি, কিছু উপদেশও দিই।

২২-১১-১৯৩৩

বাংলা কবিতার ব্যাপারে কোনো সমালোচনা করা কিংবা কিছু বলতে যাওয়া আমার পক্ষে উচিত নয়, কারণ ভাষা বা ছন্দ সম্বন্ধে আমার কোনো বিশেষ জ্ঞান নেই, কেবল আপন অনুভবের উপরেই নির্ভর করতে হয়।

সাবিত্রী-সত্যবান উপাখ্যানের প্রতীকতা

সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যান মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে স্ত্রীর ভালবাসা কি করে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছিল তারই কাহিনী হিসাবে। কিন্তু ঐ উপাখ্যানের ঘটনাবলী থেকে বোঝা যায় যে এও বেদের প্রতীকতার চক্রের একটি অংশ। সত্যবান হচ্ছে সেই আত্মা যার ভিতর আছে ভগবানের সত্য; কিন্তু যা পড়েছে মৃত্যু আর অবিদ্যার হাতে। সাবিত্রী—দৈব বাক্, সূর্য্য-কন্যা, সর্ব্বশেষ সত্যের দেবী যিনি অবতরণ করেন বরাভয় হাতে মৃত্যুঞ্জয়ী রূপে। অশ্বপতি হচ্ছেন অশ্বের প্রভু, নরদেহে সাবিত্রীর পিতা তপস্যার দেবতা, আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার একীভূত মূর্ত্তি, যিনি মৃত্যুর স্তর থেকে অমৃ-তত্বে নিয়ে যান মানুষকে। সত্যবানের পিতা দ্যুমৎসেন হচ্ছেন জাজ্বল্য-মান সৈন্যদের প্রভু, দৈবী-মানস যা পৃথিবীতে এসে হয়ে গেছে অন্ধ, স্বর্গীয় দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছে, আর তার ফলে হারিয়েছে ঐশ্বর্য্যময় রাজত্ব; তবুও এ সব চরিত্র কেবলমাত্র প্রতীক চিহ্ন নয়, বা নর দেহে গুণাবলী নয়, এঁরা জীবন্ত ও সচেতন শক্তির বিভূতি, এঁদের পরশ আমরা পেতে পারি এবং এঁরা নরদেহ ধারণ করেন আমাদের সাহায্য করবার জন্য মৃত্যুর

জগৎ থেকে দৈব-চেতনাময় অমৃতের জগতে নিয়ে যাবার জন্য।

কাব্যরচনা ও সাধনা

এটা প্রতীয়মান যে কবিতা কখনও সাধনার স্থান নিতে পারে না। বড় জোর সাধনার অঙ্গ হিসাবে যেতে পারে। যদি ভক্তি বা সমর্পণের ভাব আসে, কবিতার ভাবপ্রকাশ দৃঢ়ীভূত করতে পারে। যদি কোনও অনুভূতি আসে, তাকে রূপ বা শক্তি দিতে পারে। উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি বই পড়াতে বা ভক্তি-সঙ্গীত গাওয়াতে যেমন সাধনার কোনও কোনও স্তরে উপকার পাওয়া যায়, কবিতা লেখাতেও তা সম্ভব। তা ছাড়া কবিতা সেতু বেঁধে দেয় বাহ্যিক চেতনার সঙ্গে অন্তরের বা জৈব চেতনার। কিন্তু কেউ যদি এতেই থেমে যায়, তাহলে বেশী কিছু ফল পাওয়া যায় না। সাধনাই হবে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় লক্ষ্য, আর সাধনা মানে স্বভাবের পরিষ্করণ, সত্তার উৎসর্গীকরণ, চৈত্যের এবং ভিতরের মন ও চেতনার প্রস্ফুটন, ভগবানের পরশ ও উপস্থিতি, সর্ব্বভূতে ভগবৎ-দর্শন, সমর্পণ, ভক্তি, চেতনার বিস্তৃতীকরণ বিশ্ব-চেতনায় একমেবাদ্বিতীয়ম ভাবনা, পার্থিব প্রকৃতির চৈত্যিক ও আধ্যাত্মিক রূপান্তর। এসব জিনিসকে অবহেলা করে কেবলমাত্র কবিতা লিখে ও মানসিক উন্নতি করো বা অপরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে যদি সমস্ত সময় কাটে, তাহ'লে সেটা সাধনা নয়। তাছাড়া কবিতা লিখতে হবে ঠিক ভাব নিয়ে, নিজের নামের বা আত্ম-তুষ্টির জন্য নয়, অনুপ্রেরণার ভিতর দিয়ে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বা অন্তঃপুরুষকে বাহিরে প্রকাশ করার উপায় হিসাবে, যেমন ভাবে লিখে গেছেন পূর্ব্বসূরীরা, যাঁদের ভক্তি-গীতি বা আধ্যাত্মিক কবিতা আজও আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। পাশ্চাত্য দেশের সাহিত্যিকের বা শিল্পীদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে লিখলে চলবে না। এমন কি কাজ বা ধ্যানও সাধনার সহায়ক হয় না, যদি না তা করা হয় উৎসর্গীকরণের ভাব নিয়ে বা এমন আধ্যাত্মিক অভীপ্সা নিয়ে যা আমাদের সমস্ত সত্তাকে একীভূত ও পরিব্যাপ্ত করে। সমস্ত জীবনকে ও প্রকৃতিকে এইভাবে একমুখী না করাই আমাদের এখানকার সাধকদের সব চেয়ে বড় ত্রুটি এবং এরই জন্য এখানকার আবহাওয়া নীচু হয়ে যাচ্ছে

এবং এটাই আমার বা মায়ের কাজের বিশেষ অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯-৫-১৯৩৮

×

প্রঃ এটা অনুভব করতে পারি যে আপনার শক্তি কবিতা লেখবার প্রেরণা আমাদের দেয়, কিন্তু ভাবি যে অবিরাম স্রোতের মত কী আপনি তা পাঠান?

যদি তাই হোত, তাহলে কী আমরা একই আসনে বসে ১৫।২০ পংক্তি কখনও কখনও লিখতাম আর তার পর দিনের পর দিন কেটে যেত ৩।৪ পংক্তি লিখতে?

উঃ নিশ্চয়ই নয় কেন আমি তা করব? এর তো প্রয়োজন নেই। মাঝে মাঝে আমার শক্তি পাঠাই যতটুকু কাজ করা দরকার, ঠিক তত-টুকুর জন্যই। এ কথা সত্যি যে কারও কারও কাছে আমার শক্তি ঘন ঘন পাঠাই কেননা, তা না হলে, অনেকদিন তাদের কিছু না লিখে বসে থাকতে হয়, কিন্তু সে সব ক্ষেত্রেও অবিরাম পাঠাই না। এসব করবার আমার সময় নেই।

এও নির্ভর করে মানসিক শক্তির উপর। কেউ কেউ খুব সহজেই লিখতে পারে––আবার কেউ কেউ কোনও এক বিশিষ্ট অবস্থায় পারে।

১২-৬-১৯৩৫।

×

প্রঃ আমি একটি কবিতা লিখতে চেষ্টা করছিলাম কিন্তু প্রার্থনা ও আবাহন সত্ত্বেও সফল হইনি। তারপর আপ-নাকে লিখলাম শক্তি পাঠাবার জন্য। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, চিঠি আপনার কাছে পৌছবার আগেই সেই অঘটন ঘটে গেল। আপনি কী এটা বুঝিয়ে বলতে পারেন, যে কী করে কেবলমাত্র আমার চিঠি লেখাতেই শক্তির সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটল?

উঃ অনেক সময় শক্তির জন্য আবাহনই যথেষ্ট, এবং এটা আমার বাহ্যিক চেতনায় আসার দরকার সব সময় নেই। অনেকেই এই শক্তির পরশ পায় চিঠি লেখার সঙ্গে সঙ্গে—বা তারা যদি বাইরে থাকে, যে মুহূর্তে চিঠি আমার আবহাওয়ার আওতায় এসে পড়ে।

এটা সত্য যে দরকার হ'ল আমার শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হওয়া। এটা হ'ল অনেকটা সেই অদৃশ্য বোতাম টেপার মত।

২১-৬-১৯৩৬

প্রঃ যখন আপনি শক্তি পাঠান, তার কাজ করার কী কোনও সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে? না, কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ফুরিয়ে যায়, বা আধার দেখে ফিরে যায়?

উঃ সময়ের কোনও বাঁধাধরা নেই। এমনও দেখেছি যে আমি শক্তি পাঠালাম কোনও কাজ করবার জন্য, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তা অসমর্থ হ'ল; কিন্তু দুবছর বাদে, ঠিক যেমনভাবে আমি চেয়েছিলাম, ঠিক সেইভাবে কাজটা হয়ে গেল, যদিও আমি আর সেই বিষয়ের কথা একটুও ভাবিনি। তোমার বোধহয় জানা নেই, কিন্তু জানা দরকার, যে ইউরোপে সাইকিক সম্বন্ধে গবেষণা করে, এটা প্রমাণিত হয়েছে যে সাইকিকের ভিতর দিয়ে যা জানা যায়, তা অলক্ষ্যে মনের মধ্যে গেঁথে যায়, এবং অনেক পরে প্রকাশিত হয়। শক্তির ক্রিয়াও ঐভাবে হয়।

২১-৬-১৯৩৬

প্রঃ কারোও যদি বহির্বিষয়ক জ্ঞান ও ক্ষমতা থাকে, সে কী আপনার শক্তি গ্রহণ করতে পারে না?

উঃ এবিষয়ে কোনও বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। কারও বহির্বিষয়ক

জ্ঞান থাকতে পারে, কিন্তু শক্তি গ্রহণ করতে নাও পারে। যদি গ্রহণ করতে পারে, তার বিদ্যা ও ক্ষমতা শক্তির ক্রিয়াকে সর্ব্বাঙ্গীন করে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

[illegible]-৪-১৯৩৭

তোমার ধারণা কী যে আমি তাকে প্রতিটি জিনিসে যেন প্রেরণা দিই যাতে করে সে মাত্র একটি যন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়, আর তা যদি না করি, তাহ'লে তাকে নিয়ে কিছু করবার ক্ষমতা আমার নেই? এ কী রকম যান্ত্রিক মনোভাব?

২৮-৪-১৯৩৭

প্র : আপনি কী আমাদের ইংরেজী ভাষায় রচিত কবিতার সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করে আমাদের বোধি শক্তিকে বাড়িয়ে তোলেন না?

উ : ইংরেজী ভাষায় রচিত তোমার কবিতায় আমি তা করি, কেননা ইংরেজী কবিতায় আমি পারদর্শী। বাংলা কবিতায় তা করি না; শুধু তুমি যেসব বিকল্প শব্দ বা পংক্তি লিখে পাঠাও তার ভিতর থেকে ঠিক করি। লক্ষ্য রেখো যে 'ক'র লেখা সংশোধন বা পরিবর্ত্তন আমি এখন আর করি না, তার নিজের ভিতরের প্রেরণাকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে সুবিধা দেবার জন্য। কখনও কখনও তার যা লেখা উচিত ছিল সেটা আমার মনে আসে, কিন্তু তাকে বলি না। আমার নীরবতা থেকে সে সেটা বুঝে নিক।

১০-৪-১৯৩৭

রবীন্দ্রনাথ

আমাদের যা লক্ষ্য, রবীন্দ্রনাথেরও তাই—তবে তিনি চলেছেন তাঁর নিজস্ব পথে। সেইটাই মুখ্য—কোন স্তর পর্যন্ত তিনি পৌঁছেছেন বা কী-ভাবে চলেছেন, এসব হ'ল গৌণ ব্যাপার। কবি বা ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা হিসাবে তাঁর স্থান কোথায় সেটা ঠিক করবে আমাদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরা—তাঁদের সুচিন্তিত কি মত হবে তা নিয়ে এখন মাথা না ঘামালেও চলবে। তাঁর মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে বা অব্যবহিত পরেই—তাঁর স্থান কোথায় সে সম্বন্ধে যে মত প্রকাশিত হবে, সেটা খুবই মামুলী ব্যাপার। এখনকার যুবকরা পূর্ব্বসূরীদের বিশেষতঃ যাঁরা ঠিক তাদের এক পুরুষের আগে এসেছেন তাঁদের সম্বন্ধে খুব রূঢ়ভাবে, প্রায় নাজীদের মত, সমালোচনা করতে অভ্যস্ত। আমি পড়ে খুব বিস্মিত হয়েছি যে নেপোলিয়ন অতি অহঙ্কারী অপদার্থ লোক ছিলেন আর বড় যা কিছু কাজ করেছেন তার জন্য প্রাপ্য সম্মান অন্য লোকেদের, সেকসপিয়ার এমন কিছু একটা বড় ছিলেন না, আর সব পূর্ব্বকালের মহাজনেরা এমন বড় ছিলেন না, যা পূর্ব্বযুগের অজ্ঞ লোকেরা মনে করত। তাহ'লে আর রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায়? কিন্তু সমকালীন এসব অবিচার ধোপে টেকে না—শেষ পর্যন্ত একটি বিজ্ঞ সুবিবেচিত মত গঠিত হয়, যা চিরস্থায়ী হয়।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সেই যুগের মানুষ, যাঁদের বিশ্বাস ছিল সমকালীন ভাব-ধারণায় তাঁরা যাতে বিশ্বাস করতেন না তাও ছিল সৃষ্টিধর্মী। তাঁর শেষের দিকের লেখা সম্বন্ধে তোমার বিরুদ্ধ সমালোচনা ঠিক বা ভুল হতে পারে, কিন্তু সে লেখাও তাঁর সময়োপযোগী ছিল, আর তা থেকে বোঝাও যায় যে তার মধ্যে আছে নতুন কোনও সত্যের আবির্ভাবের সূচনা—আর তাই সেটাও সৃষ্টিধর্মী। সেই সমস্ত আদর্শবাদ আজ গেছে ভেঙ্গেচুরে, আর সবাই দেখাতে ব্যস্ত যে সে আদর্শবাদের কত ত্রুটি ছিল। কিন্তু তার বদলে কাকে স্থান দেব, এ সম্বন্ধে কারোও ধারণা নেই। আজ ঢেউ এসেছে অবিশ্বাসের, আর 'হিটলারের জয় হোক্', "ফাসিস্টদের সেলুট" "পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা", "সবাইকে ভেঙ্গেচুরে একই ছাঁচে ঢেলে সাজা", "সমস্ত আদর্শকে চূর্ণ-বিচূর্ণ-করা", "নিজের ও অপরের চোখ বন্ধ করে রাখা" প্রভৃতি মতবাদ। কিন্তু এসবেও কিছু অগ্রগতি হবে না। আর

আছেই বা কী? নূতন আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ না এলে, চিরস্থায়ী কোনও কিছু সৃষ্টি করা যায় না।

২৪-৩-১৯৩৪

অনুস্মৃতি ও সমীক্ষণ

মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে শেষ কথা

মিথ্যে কথা? কেম্ব্রিজে থাকার সময় একটি পাঞ্জাবী ছাত্র কথায় কথায় বলে উঠল, "মিথ্যাবাদী, আরে আমরা সবাই তো মিথ্যাবাদী"। তার এই স্বীকারোক্তিতে আমরা সবাই চমৎকৃত হয়ে উঠলাম। পরে বোঝা গেল যে সে "lawyers" কথাটাই ব্যবহার করেছে, কিন্তু তার জিভের টানে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল "liars"। যাই হোক তার উক্তি যেভাবে আমরা বুঝেছিলাম, তা ছিল গভীর তত্ত্বপূর্ণ এবং মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে শেষ কথা। তবে মিথ্যা কথা লোকে যা বলে, তা কখনও ইচ্ছাকৃত, কখনও আধ-ইচ্ছায় আধ-অনিচ্ছায়, কখনও বা সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়, সাময়িক ও অজান্তে। কাজেই বুঝে দেখো।

অবশ্য তুমি মিথ্যা কথা সম্বন্ধে যা বলেছ, তা ঠিক। অনেক রকমের মিথ্যা কথা আছে আর সব লোকই দুরাচার বিশিষ্ট--তবে কেউ কেউ পুণ্যবান দুরাচারবিশিষ্ট, কেউ বা পাপী দুরাচারবিশিষ্ট--আর কারোও মধ্যে দুয়ের মিশ্রণ। এখানে যে হরিশ্চন্দ্র বা শুকদেব আছে সে কথা আমি অস্বীকার করি না, তবে তাদের খুঁজে বার করতে হলে অনুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন।

আই. সি. এস পরীক্ষার উত্তর পত্র

প্র: আপনার কী মনে হয় যে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আপনি আই. সি. এস্ পরীক্ষায় যে উত্তরপত্র লিখেছিলেন, তা কর্ত্তারা রেখে দিয়েছেন? ভাবছিলাম যে যদি সম্ভবপর হয়, সেগুলি জোগাড় করে, গুছিয়ে রাখব স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে। বোধহয় তাঁরা ঐসব বাইরের লোকেদের দেন

না, বা হাতছাড়া করেছেন।

উঃ মনে হয় না যে ভবিষ্যতের জন্য তাঁরা ওসব বাঁচিয়ে রাখেন।

১-৫-১৯৩৬

কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য

কাশ্মীর সম্বন্ধে তোমার ধারণার সঙ্গে আমি একমত। কাশ্মীরের পাহাড়, নদী, আর হাউসবোটে করে প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে বয়ে যাওয়া বা ঝিলাম যেখানে প্রবল বেগে সমতলের দিকে ছুটে চলেছে—,তার তীরে বসে কবিতা লেখা—সে তো স্বর্গ বাস। দুর্ভাগ্যের কথা যে সদাই ব্যস্ত গাইকোয়াড়, সে স্বর্গবাসের পাঠ অচিরেই ঘুচিয়ে দিলেন। স্বর্গ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা যে নথীপত্রের মধ্যে ডুবে থাকা, আর আমাকে ও অপর লোকদের দিয়ে বক্তৃতা লেখানো, যার কৃতিত্ব তিনি একাই পেতেন। যাই হোক, সকলেই নিজের নিজের প্রকৃতি অনুসারে স্বর্গ সম্বন্ধে ধারণা করে।

৭-১১-১৯৩৮

আমি যখন গাইকোয়াড়কে চিনতাম, তখন তিনি ছিলেন স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাসী, কোনও ধর্মে তাঁর আস্থা ছিল না। জানি না, এখন তাঁর মত বদলেছে কিনা। বাহ্যিকভাবে অবশ্য তিনি হিন্দুই ছিলেন।

৭-৭-১৯৩৬

ব্রহ্মানন্দের বয়স

তার কোনো প্রমাণ নেই। ৪০০ বছর বললে বাড়াবাড়ি হয়। এটা ঠিক কথা যে তিনি ৮০ বছর যাবৎ নর্মদা তীরে বাস করছিলেন, আর

যখন সেখানে আসেন তখন তাঁর পরিপক্ক বার্ধক্যের বয়স। মৃত্যুর আগে আমি যখন তাঁকে দেখি তখন পাকা চুল দাড়ি ব্যতীত আর কোনো বার্ধক্যের লক্ষণ পাইনি। বেশ লম্বা চওড়া দেহ, সুপুষ্ট চেহারা, অনায়াসে কয়েক মাইল হাঁটতে পারেন দ্রুতগতিতে, শিষ্যেরা তাঁর সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না। নিজের বয়সের কথা কখনো বলেননি। কেবল একবার বলেছিলেন মজুমদারকে। তাঁর দাঁতের ব্যথার কথা শুনে মজুমদার ফোরিলিন কিনে নিয়ে গিয়েছিল। ব্রহ্মানন্দ বললেন আমি নর্মদার জল ভিন্ন কখনো কোনো ওষুধ খাইনি। এ দাঁতের ব্যথা আমার ভাও গির্দির সময় থেকে আছে। সদাশিব রাও ভাও ছিলেন পানিপতের যুদ্ধের সর্দার, ঐ যুদ্ধেই তিনি অদৃশ্য হন। অনেকে বলেছে উনি নিজেই ভাও গির্দি, কিন্তু সেটা কল্পনা মাত্র। তাঁর কথা অবিশ্বাসের কোনো কারণ ছিল না কারণ তিনি ছিলেন সরল সত্যবাদী মানুষ, কখনো নিজের খ্যাতি চাননি। যখন তিনি মারা যান তখনও শরীরে যথেষ্ট শক্তি ছিল, দেহক্ষয়ে মৃত্যু নয়, পায়ে পেরেক ফুটে রক্ত বিষাক্ত হয়ে মারা গেছেন। আমি তাঁর কথা মাকে বলেছিলাম, তাই মা তাঁর 'কথাবার্তায়' ওঁর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি যে ২০০ বছর বেঁচেছিলেন এ কথা তাঁর উক্তির উপর নির্ভর করেই বলা হয়েছে, তার কোনো ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ নেই। তবে একথা বলতে পারি যে তাঁর তিনজন শিষ্য যৌবনের শক্তি ও তেজ অটুট রেখে বহুকাল পর্যন্ত বৃদ্ধ বয়সেও তেমনি ছিলেন--তবে যারা একসঙ্গে রাজযোগ এবং হঠযোগ করে তাদের পক্ষে এটা কিছু অসাধারণ কথা নয়।

১-২-১৯৩৬

"ভারতের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ব্যক্তি"

ভগবানকে পাওয়া খুবই কঠিন হতে পারে, কিন্তু তাঁর দিকে লেগে থাকলে সে বাধাকেও ঘোচাতে পারা যায়। এমনকি আমার হাসিবর্জিত গোমড়া হয়ে থাকাও ঘুচে গেল, যার সম্বন্ধে কুড়ি বছরেরও আগে নেভিনসন প্রচার ক'রে বলেছিল--"ভারতে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ব্যক্তি এই অরবিন্দ ঘোষ, যে কখনো হাসে না"। ঐ সঙ্গে আরো বলা উচিত ছিল: "কিন্তু পরিহাস করে"। কিন্তু একথা সে জানতো না, কিংবা হয়তো তখন এটা ভালো-

রকম ভাবে আসেনি। যাই হোক, তুমি যখন আমার হাসিবর্জিত ভাবকেও কাটিয়ে উঠতে পেরেছ, তখন অন্যান্য বাধাগুলিও কাটিয়ে উঠতে বাধ্য।

১১-২-১৯৩৭

ওকি কথা! আমি নাকি বেজায় গুরুগম্ভীর ও কঠোর! এ-কথা শুনলে যে হতাশ হয়ে পড়ি। তোমাদের সহজ বুদ্ধি কোথায় গেল! অধি-মানস পেতে হলে জীবনের সাধারণ জিনিসগুলি ছেড়ে দিতে হবে? সহজ বুদ্ধি অবশ্য কোনো লজিক নয়, তা হলো সোজাভাবে সহজ চোখে দেখা। কোনো কল্পনার আমদানি করবার দরকার হয় না। হতাশ হয়ে বলার দরকার হয় না,—"জানি না বাপু কেন" এমন কথাও নয়।

২৩-২-১৯৩৫

মহারাষ্ট্রীয় রন্ধনের আস্বাদ

আশা করি তোমার দেওয়াসে নিমন্ত্রণ খাওয়ার পরিণাম আমার মতো হয়নি, যখন আমি প্রথম মহারাষ্ট্রীয় রান্নার আস্বাদ পাই—সে সময়ে কোনো কারণে আমার নিজের খাবার তৈরি না থাকাতে একজন পাশের মহারাষ্ট্রীয় প্রফেসারের বাড়ি থেকে আমার জন্য খাবার নিয়ে এলো। তার এক গাল মাত্র মুখে দিয়েছিলাম। ও হরি! হঠাৎ মুখের মধ্যে আগুন ভরে দিলেও এত আশ্চর্য হতাম না। সে এমন আগুন যে সমগ্র লণ্ডন শহরটাও তাতে পোড়ানো যেতে পারত!

দৈহিক ব্যথা ও আনন্দ

দিব্যানন্দের কথা যদি বলো, তা মাথায় বা পায়ে বা অন্য কোথাও কঠিন আঘাত পেলে তাতেও সেই ব্যথার আনন্দ বা ব্যথার সঙ্গে আনন্দ বা শুধুই দৈহিক আনন্দ মিলতে পারে—কারণ নিজে আমি বহুবার অনৈচ্ছিক ভাবে এ পরীক্ষায় পড়েছি এবং সম্মানের সঙ্গে তাতে উত্তীর্ণ হয়েছি। এটা

প্রথম শুরু হয় যখন আমি আলিপুর জেলে ছিলাম, তখন একদিন লাল বর্ণ বড়ো বড়ো দুর্ধর্ষ যোদ্ধা পিঁপড়ের দল আমাকে কামড়ে ধরলে, কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে দেখি যে ব্যথা পাওয়া আর আনন্দ পাওয়া কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির তৈরি ক'রে নেওয়া রীতিমাত্র। অবশ্য এমন অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া অন্য কারো বেলাতে হবে এমন আমি প্রত্যাশা করি না। তাছাড়া তারও একটা সীমা আছে।

১৩-২-১৯৩২

প্রার্থনা যন্ত্র নয়

প্রার্থনা সম্বন্ধে বাঁধা-ধরা কোনও নিয়ম নেই। কখনও কখনও প্রার্থনায় কাজ হয়, কখনও বা হয় না। 'সঞ্জীবনী'র সম্পাদক, কে, কে, মিত্র আমার মেসোমহাশয় হতেন। তিনি মোটেই রোমান্টিক, কল্পনাপ্রবণ বা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন না। তাঁর বড় মেয়ের একবার ভীষণ অসুখ হয় এবং ডাক্তাররা জীবনের আশা ছেড়ে দেন, আর সব ওষুধও বন্ধ করে দেওয়া হয়। মেসোমশায় বল্লেন "এখন শুধু ভগবানই ভরসা, এসো আমরা প্রার্থনা করি"। তিনি প্রার্থনা আরম্ভ করলেন, আর সেই মুহূর্ত থেকেই মেয়েটি ভাল হতে সুরু করল, টাইফয়েড জ্বর আর তার সব লক্ষণ সরে পড়ল, এমন কি যম পর্যন্তও। আমি এরকম অনেক ঘটনার কথা জানি। তোমরা হয়তো জিজ্ঞাসা করবে "তাহলে সব প্রার্থনায় কাজ হয় না কেন"? কিন্তু কেনই বা সব সময় কাজ হবে? এ তো আর একটা যন্ত্র নয় যে গর্ত্তের ভিতর প্রার্থনা ঢুকিয়ে দেবে আর তার সুফল বেরিয়ে আসবে। তাছাড়া মনে করো যে যখন সারা পৃথিবীতে লোকেরা কত রকম বিপরীত প্রার্থনা করছে একই সময়ে, তখন ভগবান বেচারা কি মুস্কিলেই না পড়েন যদি সব প্রার্থনাই মঞ্জুর করতে হয়। তা হয় না।

৭-১০-১৯৩৬

সিস্‌টার নিবেদিতা ও সিস্‌টার ক্রিস্টিন

সিস্‌টার নিবেদিতাকে আমি বিলক্ষণ চিনতাম (রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেককাল ছিলেন আমার বন্ধু ও সহকর্মী) আর সিস্‌টার ক্রিস্টিনকেও দেখেছি—দুজনেই ছিলেন বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠতম ইউরোপীয়ান শিষ্যা। পাশ্চাত্ত্য ভাব তাঁদের মধ্যে পুরোপুরিই ছিল, হিন্দুদের মতো চালচলন আদৌ নয়; যদিও নিবেদিতা ছিলেন আইরিশ মহিলা, এখানকার তাঁর পারিপার্শ্বিক মানুষদের আচার ব্যবহারকে সহানুভূতির চোখে দেখে তার মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করেছেন, কিন্তু নিজে তিনি শেষ পর্যন্ত অপ্রাচ্য ভাবেই থাকতেন। তথাপি বেদান্ত মতের সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করতে তাঁর কিছুমাত্র বিঘ্ন হয়নি।

গুরুগিরি

ভগবৎ কৃপা সম্বন্ধে ক-এর আপত্তি ধর্মানুসরণকারীদের বেলা খাটতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক পথের বেলাতে তা নয়। তাদের কাজ হলো ধর্মের শুষ্ক আচারনিষ্ঠাগুলি মেনে চলা, কেবল কৃপার দিক নয়। এমন কি "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, জাগ্রত" এও হয় সেই বাঁধা ফর্মুলারই অন্তর্গত, প্রত্যেক জন ভগবান সম্পর্কে কেবল তাই ক'রে থাকে। এইসব কারণেই আমার গুরুগিরি নিতে ভীষণ আপত্তি ছিল, কিন্তু এমনি নিয়তির ব্যঙ্গ বা অন্তরালস্থ সত্যের নিষ্ঠুরতা যে এখন গুরু হতে বাধ্য হয়ে গুরুবাদ প্রচার করি। একেই বলে ভাগ্য।

১৬-১-১৯৩৬

শিবের মতো স্বভাব

শিবের আদর্শের প্রতি আমি বিশেষ আকৃষ্ট নই, তথাপি শিবের মতো স্বভাব কিছুটা আমার মধ্যে এসে গেছে। অর্থের দিকে আমার কখনো কোনো বিরাগও ছিল না বা আকর্ষণও ছিল না। এই সব থেকে উপরে

উঠে যাওয়া চাই; এর উপরে উঠে গেলে তবেই তুমি সহজে তাকে যথেচ্ছা নিয়োগ করতে পারো।

১৫-১-১৯৩৬

প্রকৃত সন্ন্যাস

সন্ন্যাস কাকে বলো তারই উপর ওটা নির্ভর করে। আমার নিজের কোনো কামনা বাসনা নেই, তবু আমি বাইরে সন্ন্যাসীর মতো থাকি না, কেবল নির্জনবাস ছাড়া। গীতায় বলে যে কামনা ত্যাগ, আসক্তি ত্যাগ, তাই হলো প্রকৃত সন্ন্যাস।

৯-৭-১৯৩৭

সামাজিক সৌজন্য ও আধ্যাত্মিক জীবন

কিন্তু কোথায় কবে আচরণের নম্রতা ও সৌজন্যকে আধ্যাত্মিক বা যোগের প্রকৃত সিদ্ধির লক্ষণ বলে দেখা গেছে? যেমন নাচতে পারা বা ভালো সাজগোজ করতে পারাও তার লক্ষণ হতে পারে না, এর বেলাও তাই। যেমন ভালো চরিত্রের দয়ালু ব্যক্তিও বাহ্য আচরণে রুক্ষ ও রূঢ় হতে পারে, তেমনি গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও বাহ্য জীবনের উপর দখল না থাকায় তাদের রীতি নীতিতে অসংযত হয় (অনেক উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তিরাও তাই হয়)। আমারও বোধ করি অহংকারী ও অশিষ্ট বলে একটা অপবাদ আছে যেহেতু আমি লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি না, চিঠির জবাব দিই না, এবং আরো নানা অভদ্র আচরণ করি। আমি শুনেছি একজন খ্যাতনামা সাধুর কথা যিনি কাছে লোক আসতে দেখলেই ঢিল ছুঁড়ে মারতেন, তিনি শিষ্য করতে চাইতেন না, তাই এইভাবে ছাড়া প্রার্থীদের তাড়ানোর আর কোনো উপায় খুঁজে পাননি। তাই বলে ঐসকল সাধুদের আধ্যাত্মিক গুণ ছিল না এমন কথা আমি অন্তত বলতে পারব না। তবে এটা নিশ্চয় চাইব যে সাধকরা যেন পরস্পরের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করে, কিন্তু এ হলো সম্মিলিত জীবনের সঙ্গতির কথা, যোগ-

সিদ্ধির বা আভ্যন্তরীণ অনুভূতির অপরিহার্য লক্ষণ নয়।

ডিসেম্বর ১৯৩৫

দারিদ্র্য

দারিদ্র্যে আমি কখনও ভয় পাইনি বা অনুপ্রেরণাও পাইনি। তুমি বোধহয় ভুলে গেছ যে, কোনও দরকার না থাকলেও আমি আমার বরোদার কাজ, যা খুব নিরাপদ ও অর্থকরী ছিল, ছেড়ে দিয়েছিলাম, যেমন ছেড়ে দিয়েছিলাম ১৫০ টাকা মাহিনার ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষের পদও। আমার তখন এমন কিছু ছিল না যা দিয়ে ভরণ পোষণ চালাতে পারি। যদি অর্থের প্রতি আমার লোভ থাকত, তা আমি করতে পারতাম না।

যখন দেশ মোটেই প্রস্তুত ছিল না, সেই সময় দশ বছরের উপর ধরে স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবাত্মক কাজ চালিয়ে যাওয়া যদি বিপদের ঝুঁকি নেওয়া না হয়, তাহলে তোমার মাথায় পেরেক মেরেও সেই সামান্য কথা ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে না। তাছাড়া যোগের পথ সম্বন্ধেও তুমি নিজেই অনেকবার বলেছ যে এ পথেও মারাত্মক ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। তবে?

যোগলব্ধ শান্তি ও সাত্ত্বিক গুণ

> প্র ঃ সাধারণ জীবনে যারা সাত্ত্বিক ব্যক্তি তারা অনেকটা সেই রকমই আচরণ করে যেমন যোগের দ্বারা আধ্যাত্মিক শান্তিলব্ধ ব্যক্তিরা ক'রে থাকে। তার মানে কি এই যে সাত্ত্বিকদের মধ্যেও শান্তি নেমে আসে গোপনভাবে, কিংবা পূর্বজীবনেও তারা সাত্ত্বিক ছিল বলে?

উঃ অবশ্য পূর্বেকার বিবর্তন থেকে তাদের মনের মধ্যে সেই গুণ এসেছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক শান্তি হলো সম্পূর্ণ আলাদা কথা, মনের শান্তির চেয়ে যা অনেকগুণ বেশি, কেবল খানিকটা নির্মল চিন্তা বা সংযম বা অবিচলতা বা সাত্ত্বিক অবস্থাপ্রাপ্তি নয়। কিন্তু তেমন আধ্যাত্মিক শান্তির

পূর্ণ বিকাশ তখনই হয় যখন তা সত্তার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী হয় কিংবা যখন তুমি এরূপ বোধ করতে থাকো যেন মাথার উপরিভাগে উঠে তুমি চতুর্দিকে ঐ শান্তির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছ এবং তা অনন্তের দিকেও প্রসারিত আবার দেহস্থ কোষগুলির মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেছে। তখন তোমার মধ্যে যে গভীর ও বিশাল ও নিরেট রকমের প্রশান্তি আসে তাকে কোনো কিছুতেই টলাতে পারে না—বাইরে যতই ঝড়ঝাপটা ও সংগ্রাম চলুক। আমি এক-সময় ঐরকম সাত্ত্বিক প্রকৃতির ছিলাম আমার যৌবনে, কিন্তু এই উপরের শান্তি যখন আমার মধ্যে নেমে এলো তখন তা হলো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। সত্ত্বগুণ হারিয়ে গেল নির্গুণের মধ্যে, আর সেই নেতিমূলক নির্গুণ পরিণত হলো ইতিমূলক ত্রৈগুণ্যাতীতে।

২২-৭-১৯৩৫

দৈহিক কর্মের জন্য শিক্ষা

এখানে ইচ্ছার কথা নয় কিন্তু পারগতার কথা, যদিও সাধারণত অনেক সময় ক্ষমতা থাকলে ইচ্ছাও থাকে। কিন্তু পারগতাও অর্জন করা যায়, ইচ্ছাও আনা যায়, কিংবা যে রসবোধের কথা বলেছ তাও হয়। পূর্ণ যোগের অবস্থা তাকে বলা যায় না—এই যোগের পক্ষে—যদি তুমি ভগ-বানকে নিবেদন স্বরূপ যে কাজ তোমাকে দেওয়া হলো তা করতে ইচ্ছুক না হও। এক সময়ে আমি কেবল মানসিক কাজ করা ব্যতীত দৈহিক কাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলাম, কিন্তু এই ত্রুটির সংশোধন ক'রে দেহযন্ত্রকে চেতনভাবে দক্ষ ক'রে নেবার জন্য যত্ন সহকারে ও নিখুঁতভাবে নিজেকে দৈহিক কাজ করতে শিখিয়ে নিলাম। এখানেও কারো কারো বেলাতে তাই হয়েছে বাইরের কাজ গ্রহণ করবার শিক্ষা না থাকলে প্রকৃতি মনের দিক দিয়ে মাথাভারী হয়ে যায়—আর দেহের দিকে থাকে অসাড় অকর্মণ্য। কেবল যদি খুব দুর্বল বা অক্ষম হও তাহলে অবশ্য দৈহিক শ্রমের কাজ ছেড়ে দিতে হবে। আমি এটা বলছি আদর্শের দিক থেকে—তাছাড়া প্রকৃতি অনুসারে।

আর যে দেবতার কথা জানতে চাও, যিনি কর্মীদের কাজের উপর, গুদামের কাজের উপর, আবার কাব্য ও চিত্রাদি রচনার উপরও প্রভাব

রেখেছেন, তিনি ঐ একজনই—ঐ শক্তি, যিনি মা

১২-১১-১৯৩৪

তন্দ্রা আসার গুণ

প্রচণ্ড পরিশ্রম করার পর একটু তন্দ্রার আবেশ আনতে পারার যে শুভ ইচ্ছাটির কথা তুমি জানিয়েছ, তা কেমন ক'রে হয় বলে কোনো কথা নেই; ঐ গুণটি যার আছে সে একটু ঠেস দিয়ে বসলেই তন্দ্রা আপনি এসে যায়। আমার ঐ গুণটি আছে, যদিও কাজের চাপে সে গুণ কাজে লাগাবার সুযোগ পাই না। কিন্তু এ জিনিস কাউকে শেখানোও যায় না কিংবা তার কোনো উপায় উদ্ভাবন করাও যায় না; ওটা নিছক প্রকৃতির দান।

আভ্যন্তর দৃষ্টিতে অচেনা লোককে দেখা

হাঁ, ব-এর কথা মনে আছে—যদিও মানুষটিকে নয়, কারণ তাকে সশরীরে কখনো দেখিনি। সে অতিমানস বলতে যা বোঝাচ্ছে তা হয়তো উচ্চ মানস—আমি যাকে বলি দীপ্ত মানস—বোধি—অধিমানস। গোড়ায় আমিও ঐরূপ গণ্ডগোল করেছি।

সে যা বলেছে তার থেকে বোঝা যায় না যে মাকে প্রকৃতই সে দেখেছিল কিংবা ওর মনের মধ্যে প্রতিফলিত তাঁর ছবি দেখেছে। কিন্তু এর মধ্যে অসাধারণ কিছু নেই, যাকে কখনো দেখনি তাকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা অসম্ভবও কিছু নয়—তুমি কিন্তু ভাবছ যেন বাহ্য মন ও ইন্দ্রিয়াদি ও বাহ্য দৃষ্টির দ্বারাই আভ্যন্তরীণ মন ও বোধ ও আভ্যন্তর দৃষ্টি সীমায়িত বা তারই প্রতিফলন মাত্র। তাই যদি হতো এবং তা ছাড়া কিছুই না হতে পারত তাহলে আভ্যন্তর মন ও দৃষ্টি বলতে কোনো কিছুই থাকত না। আভ্যন্তরীণ বোধ ও দৃষ্টির এ একটা স্বতন্ত্র ক্ষমতা যা কেবল যোগীদেরই নয় কিন্তু সাধারণ অলোকদ্রষ্টা বা স্ফটিকদ্রষ্টাদেরও থাকে। যার সঙ্গে কোনো দেখাশোনা নেই তেমন লোককেও এরা দেখতে পায় কোথায় বসে কি করছে তা খুঁটিয়ে বলে দেয়, তারপর তাদের কথা যাচাই হয়ে সত্য বলে

প্রমাণিত হয়---এরকম আশ্চর্য ও নিঃসন্দেহ ঘটনা অনেক ঘটেছে। এখানকার মা এমন অনেক লোককেই আগের থেকে দেখেন যারা নিজেরা বা যাদের ফোটো এখানে পরে এসে উপস্থিত হয়। আমি নিজেও এমন দেখেছি কিন্তু তা মনে রাখি না কিংবা পরখ করি না। কিন্তু দুটি অদ্ভুত ব্যাপারের কথা মনে আছে যা প্রথমেই হয়েছিল। একবার আমি এখানকার সদ্য নির্বাচিত ডেপুটিকে দেখতে চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলাম এমন একজনকে, যিনি পরে এখানকার গভর্ণর হয়ে এলেন। তাঁকে চোখে দেখার কোনো কথা ছিল না, কিন্তু একটা ভুলের দরুন তাঁর কাছে আমার যেতে হলো, আর তখন তাঁকে দেখেই চিনলাম। আর একবার দেখলাম ভি. আর.-কে, তার আমার কাছে আসার আগে, কিন্তু যেমন চেহারাতে দেখলাম সে তখনকার চেহারা নয়, তেমন চেহারা তার হলো আমার বাড়িতে একবছর থাকার পরে। তার তখন হলো ঠিক সেই অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা মূর্তি, দাড়ি-গোঁফ কামানো, চুল ছোটো ক'রে ছাঁটা, রুক্ষ, কর্মদক্ষ চেহারা, যেমন অমায়িক বৈষ্ণব মূর্তিতে সে আমার কাছে প্রথম এসেছিল তেমন নয়। তাহলে আমি দেখেছিলাম এমন কাউকে যাকে আগে কখনো দেখিনি এবং ভবিষ্যতে তার যেমন চেহারা দাঁড়াবে সেই চেহারাতে। একটা ভবিষ্যৎদৃষ্টি।

২৪-১০-১৯৩৪

দুলতে থাকার বোধ

> প্রঃ আমি দেয়ালে লাগানো ভারার উপর দাঁড়িয়েছিলাম, সেটা তখন দুলছিল। তারপর দেখি দেয়ালগুলিও পেণ্ডুলামের মতো দুলছে। কারণটা বুঝলাম, কিন্তু এত স্পষ্টভাবে দুলতে থাকল যে দেয়ালে হাত দিয়ে দেখতে গেলাম সত্যই দুলছে কিনা। স্পর্শ সে কথা বললে না, কিন্তু চোখের মন তা মানতে চাইলে না।

উঃ তার কারণ কি হতে পারে? ভারার দোলা মস্তিষ্ককেন্দ্রে গিয়ে দেয়ালের দোলার অনুভব ঘটিয়ে দিলে? দুই একবার নৌকাযাত্রা করার পরে নৌকা থেকে নেমে আসারও ঐরকম দোলন বোধ হয়েছিল, যেন

পায়ের নিচের মাটি ঠিক নৌকার মতো দুলছে, অবশ্য এ হলো দেহের একটা সূক্ষ্ম বোধ মাত্র—কিন্তু বেশ স্পষ্ট রকমের।

৪-৪-১৯৩৫

দেহের বাহির থেকে চিন্তা

প্র : বেশি পড়াশোনা করলেই মাথা টন্‌টন্‌ করে ও শুষ্ক বোধ হতে থাকে, আর ঘুমানো যায় না। পড়তে পড়তে কিন্তু তা মনে রাখতে চেষ্টা করলে মনে হয় যেন বুকের মধ্যে কাজ হচ্ছে, মাথার মধ্যে নয়, তবু মাথাটাতেই কষ্ট হয় কেন?

উ : বুকের কাজ হওয়া অদ্ভুত কথা, কারণ ওখানে থাকে প্রাণগত মন, রোমানরা বরাবরই বলতো যে মন আছে বুকের মধ্যে। কিন্তু পড়া ও স্মরণ রাখা দৈহিক মনের কাজ। তবে মস্তিষ্কই এসব কাজের পরি-চালনা করে, সুতরাং কিছু কষ্ট হলে সেখানেই তা হবে। মস্তিষ্কের পক্ষে সব চেয়ে আরামের কাজ হবে, চিন্তা এলে যদি দেহকে ছেড়ে মাথার উপর থেকে তা করা যায় (আকাশ থেকে বা দেহের বাইরে অন্য স্তর থেকে)। অন্ততপক্ষে আমি তাই করতাম, তাতে বেশ আরাম পেতাম। তারপর থেকে যদিও দেহের ক্লান্তি বোধ করেছি কিন্তু মস্তিষ্কের ক্লান্তি কখনো হয়নি। অন্যেদের কাছেও এইরূপ শুনেছি।

১৯-১২-১৯৩৪

একটি হদিস

প্র : পড়তে বসে এত নিবিষ্ট হয়ে যাই যে সাধন-চিন্তার অবকাশ থাকে না, আর পড়ার নিবিষ্টতা ছেড়ে দিলেই যা তা জিনিস মনের মধ্যে ঢোকে। সাধনার পক্ষে তা কি খারাপ নয়?

উঃ আমার বোধ হয় যে পড়ার সময়ের প্রচেষ্টাকে আর সাধন-চিন্তার প্রচেষ্টাকে আলাদা আলাদা ভাগ ক'রে নাও, এবং এইভাবে সাধ-নাতে আরো বেশি মনোযোগ দাও, তাহলে তোমার পক্ষে তাতে ভালো ফল হতে পারে। অর্থাৎ এতটাই মনোযোগ দিতে অভ্যাস করলে যাতে পড়া ছেড়ে দেওয়া মাত্রই মনের মধ্যে ঐ সাধনার আবহাওয়াটি এসে পড়বে, কিংবা যা তা চিন্তা এসে আক্রমণ করার হাত থেকে রেহাই দেবে। এমন অভ্যাস না করলে অবচেতন শক্তিরা জোরদার হয়ে পেয়ে বসে। তাছাড়া একটা অবচেতন অবস্থা এসে নিশ্চেষ্টতায় যেদিকে খুশি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অন্তত আমার অবচেতনাকে নিয়ে সম্প্রতি অমন হয়েছিল, তাই তোমাকে জানিয়ে দিলাম।

২৭-৫-১৯৩৫

অবচেতন স্বপ্ন

> প্রঃ আমার স্বপ্নের প্রকৃতি এখনও বদলাচ্ছে না—বাড়ির জীবন নিয়ে, খাওয়া নিয়ে, অদ্ভুত মানুষদের দেখা প্রভৃতি নিয়ে এখনও স্বপ্ন দেখি। তিন বছর এখানে সাধনা করবার পরেও এর কিছু বদলাচ্ছে না কেন?

উঃ জাগ্রত চেতনা থেকে এসব দিকে কোনো টান ছেড়ে গেলেও স্বপ্নের মধ্যে এগুলো বছরের পর বছর টিকে থাকে। অবচেতনা সমস্ত আগেকার কথাকে আঁকড়ে থাকে, কিছুতে ছাড়তে চায় না। আমি এখনও পর্যন্ত বিপ্লবের কাজ নিয়ে আর একবার বরোদার মহারাজাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি, আর এমন সব জিনিসের কথা ও মানুষদের কথা স্বপ্নে দেখেছি যার সম্বন্ধে গত কুড়ি বছরের মধ্যে একবারও ভাবিনি। তার কারণ বোধ-করি এই যে মানুষের মনস্তত্ত্বের মধ্যে অবচেতনের কাজই হলো অতীতকে নিজের মধ্যে ধরে রাখা, মনের মধ্যে তা না জাগলেও সেগুলি ঐখানে আপন আপন স্থানে রক্ষিত হয়ে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত উপরের আলো এসে ওখান-কার অন্ধিসন্ধিগুলোকে পর্যন্ত সম্পূর্ণ আলোকদীপ্ত ক'রে না দেয়।

১৭-১২-১৯৩৪

প্রঃ গত কয়েকদিন ধরে আমি কেবল খাবার স্বপ্ন দেখছি। তার মানে কি আমার খাবার লোভ আছে, কিংবা দেহের তা প্রয়োজন, কিংবা কোনো ব্যারাম হবে যেমন গ্রামাঞ্চলে বলে?

উঃ তা কিছু মনে হয় না——হয়তো অবচেতনের পুরানো কোনো জিনিসের প্রভাব (প্রাণের নয়, সুতরাং কোনো কামনা নয় কেবল স্মৃতি) যা স্বপ্নে উঠে এসেছে। আমার মনে আছে এক সময়ে কেবলই স্বপ্ন দেখতাম থালাভরা খাবারের, যদিও তখন খাওয়ার দিকে আদৌ মনই ছিল না।

২-৪-১৯৩৪

বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব

প্রঃ এখনও আমি নিজের সাধনাতে সমুচিত অবস্থায় আসতে পারিনি, অথচ অন্যেদের অক্ষমতায় তাদের যথোচিত উপদেশ দিয়ে থাকি। এটা কি ভণ্ডামি বা ছলনা নয়?

উঃ তা তুমি নিজে ভালো কাজ না করলেও অন্যকে ভালো করার উপদেশ দিতে পারো——সেই যে প্রাচীন নীতিবাক্যই রয়েছে "আমি যা বলি তাই করবে, যা নিজে করি তা নয়"। তবে রহস্য ছেড়ে ভিতরকার কথা হলো এই যে প্রত্যেকের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব থাকে, তোমার মধ্যে যে ব্যক্তি সাহায্য করতে ভালো উপদেশ দিচ্ছে সে হয়তো সম্পূর্ণ খাঁটী। মনে আছে অনেক কাল আগে যখন নিজেই সংগ্রাম ও ধাঁধার মধ্যে অন্ধকারে রয়েছি, আর সেই সময়ে লোকে বাইরের থেকে এসে আমার কাছে নানা উপদেশ প্রভৃতি চাইছে, আমি যদিও নিজে তখন নিরুৎসাহ হয়ে হতাশা ও ব্যর্থতার ভাব থেকে বেরিয়ে আসার উপায় খুঁজে পাচ্ছি না, তবু সে ভাব কিছুমাত্র বেরিয়ে আসতে না দিয়ে আমি তাদের নিশ্চয়তার সঙ্গে দৃঢ় আশ্বাস দিয়েছি। তাতে কি ছলনা করা হয়েছে? এখন আমার মনে হয় না——আমার ভিতরকার যে ব্যক্তি সেগুলো বলেছে সে তার নিশ্চয়তা নিয়েই বলেছে। নিজের সমস্তটাকে ভগবানের দিকে নিতে পারা সোজা কাজ নয়, তাতে অনেক বেশি

সময় লাগলেও এবং অন্যরকম অনুচিত ক্রিয়াগুলো চেষ্টার মধ্যে ঢুকে পড়লেও তার জন্য নিরুদ্যম হয়ে পড়া উচিত নয়। সেগুলোকে লক্ষ্য করবে, শুধরে নেবে, আর এগিয়ে যাবে, অনির্বিঘ্নেন চেতসা।

[illegible]-২-১৯৩৫

মানুষের দায়িত্ব

আমার অভিজ্ঞতাতে জেনেছি যে মানুষেরা তাদের কাজের জন্য ততখানি দায়ী এবং অভিপ্রায়সম্পন্ন নয় যতখানি ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও নীতিবাদীরা তাদের উপর আরোপ ক'রে থাকে; আমি দেখি বরং যে ঠিক কোনরকম শক্তি মানুষকে দিয়ে সেই কাজ করিয়েছে যা আপাতদৃষ্টিতে দেখাচ্ছে যে সে নিজে ইচ্ছা ক'রেই করেছে—তাতে বোঝা যায় যে আমাদের ধারণাগুলো প্রায়ই ভুল হয়, আর যদিও তা ঠিক হয় তবে কেবল তা বাইরের দিক থেকেই।

২২-৬-১৯৩৪

কোষ্ঠী ও জ্যোতিষশাস্ত্র

কোষ্ঠীর কথা কিছু বলতে পারি না, কারণ জ্যোতিষ যেটুকু শিখেছিলাম তাও ভুলে গেছি।

১৪-৯-১৯৩৬

জ্যোতিষেরা অনেক কথা বলে যা সত্য হয় না। একজন বলেছিল আমি গত বছরে মারা যাবো, আর একজন বলেছিল গত বছরের মার্চ কিংবা মে মাসে পণ্ডিচেরি থেকে বেরিয়ে শিষ্যদের নিয়ে সারা ভারত ঘুরব, শেষে পারানি নৌকা থেকে নদীতে নেমে ডুবে মরব। যদি কোষ্ঠী অনুযায়ী গণনা ঠিকই হয়ে থাকে, তবু তা সফল হতে পারে না, কারণ আধ্যাত্মিক

জীবনে প্রবেশ করলে তখন সে ব্যক্তি এক নতুন শক্তির আওতায় চলে যায় যা তার নিয়তিকে বদ্‌লে দিতে পারে।

২২-৮-১৯৩৭

> প্রঃ স বলছিল যে আজকের তারিখটি (৪ঠা এপ্রিল) হলো পণ্ডিচেরির জন্মদিন, কারণ এই তারিখে আপনি এখানে পদার্পণ করেছেন। এর একশো বছর পরে (২০৩৬ সালে) যে থাকবে সে তখন দেখবে যে পৃথিবীর আধ্যাত্মিক জীবনের সূত্রপাতের শতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। হয়তো পৃথিবীর কোষ্ঠীপত্রে এটা স্পষ্ট জানা যায়; পৃথিবীর কি কোনো কোষ্ঠী আছে, কোনো কোনো গ্রামের মতো?

উঃ পণ্ডিচেরি জন্মেছিল বহুকাল আগে--তবে যদি স বলে তার পুনর্জন্মের কথা, সেটা হতে পারে কারণ আমি যখন এখানে আসি তখন এটা ছিল মৃত স্থান। পৃথিবীর কোনো কোষ্ঠী হয়েছে কিনা জানি না। এই পৃথিবী যখন জন্মেছিল তখনকার বছর, দিন, ঘন্টা, মিনিট প্রভৃতি টুকে রাখার মতো কেউ ছিল না। কিন্তু আমি যখন জাহাজ থেকে এখানকার মাটিতে নেমেছি তখনকার রাশিচক্র ও নক্ষত্রের অবস্থান প্রভৃতি ধরে নিয়ে হয়তো কোনো জ্যোতিষী পৃথিবীর ভবিষ্যতের একটা ছক কেটে দিতে পারবে! তবে তার হয়তো সমস্তটাই ভুল হবে, যেমন একজন জ্যোতিষী বললে যে ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে এখান থেকে বেরিয়ে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত আমি সারা ভারত ঘুরব আর শিষ্যদের সঙ্গে নদীতে নাইতে নেমে ডুবে যাবো। সে বোধ করি এসব বলেছিল সেই প্রাচীন ভৃগু সংহিতা থেকে, ঠিক বলতে পারি না। বহুকাল আগে একবার ঐ ভৃগু থেকেই মুসোলিনি-নেপোলিয়নের মতো আমার চমকপ্রদ ভবিষ্যৎ নির্দেশ করা হয়েছিল।

৪-৫-১৯৩৬

প্রঃ অনেকেই যারা ফরাসী পড়া শিখতে চায় তারা ভাল ক'রে ভাষাটাকে রপ্ত করে না। তাড়াতাড়ি কতকগুলো গল্প উপন্যাস পড়ে যায়, তার ফলে ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি আয়ত্ত করতে পারে না। আমার মনে হয় একটা বই তিন চার বার পড়া উচিত।

উঃ তারা বোধহয় বই পড়তে চায়, ভাষা শিখতে চায় না। খুব কম জনই ফরাসী ভাষা ভালো ভাবে জানে। কোনো বই তিন চার বার পড়তে অনেকেই রাজী হবে না। তেমন শিক্ষার মনোভাব কম জনেরই আছে। তবে দুই তিনটা বই পড়লে কাজ হয়। আমি সংস্কৃত শিখেছিলাম মহাভারতের নল দময়ন্তীর উপাখ্যানটা বারকয়েক খুঁটিয়ে পড়ে।

২৫-৩-১৯৩৭

আধ্যাত্মিক জীবন ও বাহ্য প্রয়োজনীয়তা

প্রঃ এত লোকের ফরাসী শেখার কি দরকার? তারা কি লেকচার দেবে কিংবা কোথাও ফরাসী কেন্দ্র খুলবে?

উঃ বাহ্য প্রয়োজনীয়তা বুঝেই কি জীবনকে ও মনকে পরিচালিত করতে হবে? আধ্যাত্মিক জীবন তাহলে তো মানসিক জীবনের চেয়েও ছোটো হয়ে যায়, কারণ মানসিক জীবনে লোকে বাহ্য প্রয়োজন ছাড়াও অনেক কিছু শেখে।

২৪-৩-১৯৩৭

বার বার আবৃত্তির ব্যর্থতা

প্রঃ কোনো মন্ত্র, যেমন "ওঁ শান্তি" কিংবা ফরাসী "paix" অনেকবার বলতে থাকলে কি তাতে মন্ত্রের গুরুত্ব কমে যায়?

উঃ হাঁ। অভ্যাস করে ফেললে তা হতে পারে। আমি যখন প্রথম এই মন্ত্রটি পড়ি "ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি" উপনিষদ থেকে তখন আমার মধ্যে তা খুব জোরালো ক্রিয়া করেছিল। ফরাসীতেও ঐ কথা কেমনভাবে কোন ক্ষেত্রে বলা হবে তার উপর নির্ভর করে।

১৪-২-১৯৩৬

পুরাণো ও নতুন বাড়ী

> প্রঃ পুরুষানুক্রমে যেভাবে বাড়ী তেরী করা হয়, আমিও সেই ভাবে করছি জেনে এখানকার অনেকেই খুব খুসী। এই ক্ষেত্রে পুরাণো প্রণালী ভাল হতে পারে, কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন যে পুরাণো হলেই সেটা খুব ভাল হবে। বোধহয়, যদি ইউরোপীয় হোমিওপ্যাথি বা প্রাকৃতিক চিকিৎসা-প্রণালী ছেড়ে দিয়ে আমরা পুরাযুগের আয়ুর্ব্বে-দের চিকিৎসা চালাই তাঁরা খুবই সুখী হবেন। কিন্তু আমি ভাবি যে তাঁরা দেখতে পান না ঢালাই ছাদ বা রাস্তা আগেকার তুলনায় কতো ভাল, আর ভূমিকম্প হলে আগেকার প্রণালীতে তৈরী বাড়ী কি টিকবে?

উঃ যদি সত্যিই পুরাণো প্রণালীতে বাড়ী তৈরী হয়ে থাকে, তাহলে সে বাড়ী অনেক ভূমিকম্পের ধাক্কা সামলাতে পারবে। আমার মনে আছে যে বাংলা দেশে ভূমিকম্পের সময়, যেখানে প্রাদেশিক সম্মেলন বসেছিল, সেখানকার সব নতুন বাড়ী ভেঙ্গে পড়ে গিয়েছিল, একমাত্র সেখানকার রাজার পুরাণো বাড়ীটাই খাড়া ছিল। আমাদের এখানকার গেস্ট হাউসের ছাদ যখন সারানো হচ্ছিল, সবচেয়ে পারদর্শী যে রাজমিস্ত্রী কাজ করছিল, সে বলেছিল যে সেই পুরাণো বাড়ীর ছাদটা এমন শক্ত ভাবে তৈরী ছিল, যে সেরকমভাবে কোনও বাড়ীই আর এখন তৈরী হচ্ছে না। কাজেই মনে হয়, যে পুরাণো প্রণালীর দোষ নয়, দোষ হচ্ছে অধস্তন পুরুষদের, যার ফলে এমন সব বাজে বাড়ী দেখতে পাচ্ছি। মাদ্রাজের একজন ইংরেজ স্থপতিবিদ্ খুব বিস্মিত হয়েছিলেন এই দেখে যে পুরাণো নড়বড়ে বাড়ীগুলি

ঠিক দাঁড়িয়ে আছে নানারকম ধাক্কা সত্ত্বেও, কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী বাড়ী সব বসে গেছে। ভারতবর্ষে বা ইউরোপে সত্যিকারের পুরাণো জিনিসগুলি খুব মজবুতভাবে তৈরী—খেলো জিনিস হয়েছে, তার পরে এবং কংক্রিট আবিষ্কারের আগে, ঠিক মাঝামাঝি অবস্থায়। আমাদের পুরণো প্রণালী ছাড়তে হবে, কিন্তু তার জায়গায় নিতে হবে সেই রকম বা তার চেয়েও বেশী মজবুত পদ্ধতি।

২০-৩-১৯৩৭

পুস্তক রচনার রেকর্ড সংখ্যা

> প্রঃ অ আমাকে বললে যে ক একটা ইংরেজী নভেলের তর্জমা ক'রে তা অর্ধেকটা আপনাকে দিয়ে সংশোধন করিয়ে নিয়েছে। তার মানে সে আপনাকে দিয়ে ঐরকম বাজে কাজ করিয়ে নিলে, যদিও তার বদলে যদি "আর্য" পত্রিকার তর্জমা করত তার একটা মানে হতো। কত হাঙ্গামাই আপনাকে সইতে হয়! লণ্ডনের একটা পত্রিকাতে বলেছে যে আপনি ৫০০ পুস্তক লিখেছেন, তা নিতান্ত ভুল কথা নয়; আপনি সাধকদের যেসব চিঠিগুলি লিখেছেন তা প্রত্যেকের কাছেই তিন চারখানা বই হয়ে উঠতে পারে, তার সঙ্গে যদি কবিতা, অনুবাদ ও লেখাসকল যোগ করা হয় তাহলে তা পাঁচ শতের কম হবে না।

উঃ সমস্ত "আর্য" পত্রিকাগুলোর অনুবাদ করা? শুনেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে! বরং ৫০০ খানা বই লেখা আমার পক্ষে সহজ। তা হয়তো করেওছি—যদি কলমে যা-কিছু আঁচড় কেটেছি সবগুলোকেই আমার বিরুদ্ধে জড়ো করা হয়। তবে তার অধিকাংশই হয়তো সাধারণের দিবা-লোক দেখবে না, বই লেখার সংখ্যার রেকর্ড করাকে এড়িয়ে যাবো।

৩-৩-১৯৩৫

"আর্য" পত্রিকা

প্রঃ শোনা যায় যে "আর্য" পত্রিকা প্রথম বেরিয়েছিল যেদিন বিশ্বযুদ্ধ বাধে সেদিন কিংবা ঠিক তার আগে। এর কি তাৎপর্য কিছু নেই? দুই ক্রিয়া পাশাপাশি?

উঃ "আর্য" পত্রিকা বের করবার সংকল্প হয় ১লা জুন (১৯১৪) আর স্থির হয় যে তা প্রথম শুরু হবে ১৫ই অগস্ট তারিখ থেকে। এর মধ্যে লড়াই শুরু হয় ৪ তারিখে। ইচ্ছা করলে একে তারিখের "পাশা-পাশি" ব্যাপার বলতে পারো, কিন্তু খুব কাছাকাছি হলোনা, আর ঐ সময়ে তাতে কিছুই ইতরবিশেষ ঘটেনি।

৯-৯-১৯৩৫

×

"আর্য" পত্রিকার আর্থিক সাফল্য হয়েছিল। খরচ বাদে অনেক উদ্বৃত্ত থাকতো।

×

ঐ "global" কথাটি (বৃত্ত-জগৎব্যাপী) এখন এমন অপরিহার্যভাবে কাজে লাগছে যে ওকে আর বাদ দেওয়া যায় না, এমন কোনো শব্দ নেই যা ওর বদলে ঐরূপ অর্থে প্রয়োগ করা যায়। প্রথম ঐ শব্দটি শুনি আর্য-ভের কাছে, সে বলেছিল যে "আর্য" পত্রিকাতে যা লেখা হচ্ছে তা global চিন্তার ধারা, কথাটি শোনামাত্র আমি ধরে নিয়ে বিশেষ কয়েকটি কাজে লাগালাম, যেমন অধিমানসের যে সব চিন্তা সর্বলোকব্যাপী হয়।

৩-৪-১৯৪৭

“মা” গ্রন্থ সম্বন্ধে

“মা” বইখানি সেইভাবে লেখা হয়নি যেমন উল্লেখিত অন্যগুলির বেলা হয়েছে (“যোগের পথে আলো”, “যোগের ভিত্তি” ইত্যাদি)। চার রকম শক্তি প্রভৃতির কথা যা ওতে আছে তা কোনো চিঠির মধ্যে নয় কিন্তু এমনিই লেখা হয়েছিল, এবং ওর প্রথম অংশটাও তাই।

প্রঃ কয়েকদিন আগে আপনাকে “মা” বইটির একটি সমালোচনা পাঠিয়েছিলাম। পড়েছেন কী?

উঃ হ্যাঁ, তবে পাঠকের মনে ধারণা হবে যে এই বইটিতে যোগের দার্শনিক বা প্রণালী প্রদর্শক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়।

১-৩-১৯৩৭

“যোগসমন্বয়” (“ The Synthesis of Yoga ”) সম্বন্ধে

এই “যোগ সমন্বয়ের” সাধনা প্রণালী সকলের জন্য নয়। যোগের বিভিন্ন দিক ও তার যা কিছু সম্ভাব্যতা ও নির্ধারণ স্বতন্ত্রভাবে লিখে তার মধ্যে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কেমনভাবে জ্ঞানের মধ্যে কর্ম ও ভক্তির উপলব্ধি আসতে আবার পরস্পর থেকে পরস্পরের উপলব্ধি মিলতে পারে। “আত্মপরিণতি” (Self-Perfection) লেখার পরে ইচ্ছা ছিল যে সবগুলিকে একত্রে মিলিয়ে দেওয়া হবে কিন্তু তা আর হয়নি। “মা” এবং “যোগের পথে আলো” এ-দুটি বই সাধনা সম্বন্ধে সুসম্বদ্ধ রচনা নয়, কেবল কয়েক বিষয় মাত্র ওতে স্পর্শিত হয়েছে।

১৮-৫-১৯৩৬

"আর্য" পত্রিকাতে যখন "Synthesis of Yoga"এর শেষ অধ্যায়টি লেখা হয় তখন "অধিমানস" শব্দটি পাওয়া যায়নি, কাজেই তার উল্লেখ নেই। আছে কেবল অতিমানসের অবতরণের কথা যখন তা ঐ অধি-মানসের স্তরে নেমে তার কাজের মধ্যে রূপান্তর আনবে। সর্বোচ্চ যে অতিমানস বা বিজ্ঞান তা এখনও রয়েছে সব কিছুর উপরে নাগালের বাইরে। ইচ্ছা ছিল পরের অধ্যায়গুলিতে ওর কথা লেখার, যে মানুষের মনের স্তর ও অতিমানসের মধ্যে আরো কতগুলি স্তরের ব্যবধান রয়েছে, এবং অতি-মানস এখানে এসে নামলেও এখানকার নিম্ন ক্রিয়ার সঙ্গে মিশে তার খাঁটী সত্যের মূল্য কমে যেতে পারে। তা আর লেখা হয়নি।

১৩-৪-১৯৩২

প্র ঃ "Synthesis"সম্পূর্ণ গ্রন্থরূপে প্রকাশের কি হবে? সবাই জানতে চায়। সবাই তার জন্য খুব আগ্রহান্বিত, কারণ এই মনোবিজ্ঞান ও অজ্ঞানতার যুগের ভিতর দিয়ে বিশ্বরহস্যকে জানতে গিয়ে সকলে বিরক্ত হয়ে উঠেছি।

উ ঃ তার মানে বোধ হয় তুমি গোটা বিরাট জিনিসটার কথা বলছ— তা "The Synthesis of Yoga" নামক একক গ্রন্থে প্রকাশ হতে পারে এর পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধের (?) আগে, কিংবা সত্য যুগ আসার আগে। আর যদি বলো তার "কর্ম যোগ" (Yoga of Works) অংশের কথা, ওতে আরো চার পাঁচ অধ্যায় যোগ করতে চাই। আশা করি তা ঠিক সময়ে হয়ে যেতে পারবে; কিন্তু আমার দৈনিক সময় খুব অল্প আর অধ্যায়গুলি হবে লম্বা। ভবিষ্যৎবাণী করবার ক্ষমতা যখন নেই তখন কেবল এই পর্যন্তই বলতে পারি।

২-৩-১৯৪৪

"আর্য" পত্রিকাতে

প্রঃ "আর্য" পত্রিকাতে অধিমানস সম্বন্ধে উল্লেখ নেই। তাতে বলা হয়েছে অতিমানসের স্তরের কথা যা অধিমানস থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। দুই জিনিসের মধ্যে যে পার্থক্য তা স্পষ্টভাবে দেখানো হয়নি কেন?

উঃ ওতে পার্থক্য দেখানো হয়নি কারণ এখন যাকে অধিমানস বলছি তাকে অতিমানসের নিম্নস্তর বলেই জানা ছিল। তার কারণ আমি তখন দেখেছি মনের দিক থেকে। কিন্তু দৈহিক চেতনার দিক থেকে দেখলে তবেই অধিমানসের যা সীমাবদ্ধতা তা বোঝা যায়। অধিমানসেও অজ্ঞানতা আছে, কিন্তু সত্যের নানাদিকের অভিব্যক্তি থাকায় মন তাকে অতিমানসের অন্তর্গত বলে ভাবে। মনের উপর অধিমানসের আলো পড়লে মনে হয় যে দিব্যসত্যের সাক্ষাৎ পেলাম। কিন্তু প্রাণ ও দেহের স্তরে এলেই তখন হয় মুশকিল। তখন দেখা যায় যে অধিমানসের আলো যতই থাক তা অজ্ঞানতাকে দূর করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, কারণ সেখানেও ভেদ জিনিসটা রয়েছে যার থেকে অজ্ঞানতার উৎপত্তি। ওকে অতিক্রম করে অতিমানসগত স্থানে যেতে হবে, যেখানে মন সমেত অন্যান্য সকল অংশেরই পরিবর্তন আসবে।

২০-১১-১৯৩৩

বাদ দিয়ে দার্শনিক রচনা

প্রঃ আপনি 'র'কে বলেছেন যে লোকে যদিও আপনাকে দার্শনিক বলে কিন্তু আপনি কখনো দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেননি। কিন্তু আপনি "আর্য" পত্রিকাতে এমন দার্শনিক তত্ত্ব লিখেছেন যা সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকও লিখতে পারত না। তার মধ্যে যা প্রকাশভঙ্গী ও যুক্তিবিচার আছে তা বুদ্ধিকে ও বিচারকে অভিভূত করে।

উঃ আমার দর্শনের মধ্যে কোনো যুক্তিতর্ক নেই—যেমন থাকে দার্শনিকদের শুষ্ক যুক্তিবিচার দ্বারা প্রতিপাদ্য দাঁড় করানোর উপর। আমার লেখার মধ্যে আছে বিভিন্ন দিকে জ্ঞান যা পেয়েছি সেগুলিকে নিয়ে একত্রিত ক'রে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনা। যুক্তিতর্কের জোরে তা করা হয়নি, যেমন দেখেছি ও জেনেছি সেগুলিকে জ্ঞানের পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে দিয়েছি।

৪-১১-১৯৩৬

"Essays on the Gita" (গীতা নিয়ে রচনা) সম্বন্ধে

> প্রঃ এই গ্রন্থটি আগে তিনবার পড়েছি, কিন্তু সম্প্রতি আবার পড়তে গিয়ে দেখি যে আরো অনেক কিছু নতুন চিন্তা ওতে রয়েছে যা আগে নজরে পড়েনি। বোধ করি আরো যদি কয়েকবার পড়ি তবে প্রত্যেক বারেই আবারও নতুন কিছু মিলে যাবে।

উঃ এটা সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা—জ্ঞানগভীর অনেক বইএর বেলাতেই তা হয়ে থাকে। গীতাতে সকল রকম আধ্যাত্মিক সমস্যার কথাই সংক্ষেপে কিন্তু গভীরভাবে বলা হয়েছে, সেইগুলিকে নিয়ে আমার প্রবন্ধের বইখানিতে বিশদভাবে আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি।

১-১১-১৯৩৬

"The Future Poetry" (ভবিষ্যতের কাব্য) সম্বন্ধে

এই বইখানিতে কাজিন্‌সের বইএর লম্বা সমালোচনা করতে চাওয়া হয়নি, কেবল তাকেই সূত্র ধরে লেখা; বাকী সবটাই শ্রীঅরবিন্দের নিজের আর্ট ও জীবন সম্বন্ধে পর্ব ধারণা।

"Yogic Sadhan" বইখানি সম্বন্ধে

তোমার বন্ধু বলছেন এই বইটিতে বৈরাগ্য সম্বন্ধে আমার আপত্তির কথা। কিন্তু এই "Yogic Sadhan" বইখানি আমার নিজের রচিত নয় কিংবা আমার যোগের যা মূলসূত্র তাও ওর মধ্যে নেই, প্রকাশক যাই কেন মিথ্যা প্রচার করুক অনেক আপত্তি করা সত্ত্বেও।

৪-৫-১৯৩৪

×

উত্তর যোগী আমারই নাম, কারণ একজন প্রখ্যাত তামিল যোগী অনেককাল আগে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে ত্রিশ বছর পরে (অর্থাৎ যখন আমি এখানে আসি সেই সময়ের সঙ্গে মিল রেখে) একজন যোগী উত্তর থেকে দক্ষিণে পালিয়ে এসে পূর্ণযোগ করবেন এবং তা হবে আসন্ন ভারতমুক্তির সূচনা। এই যোগীকে চেনবার তিনটি লক্ষণও তিনি বলেছিলেন সেই তিনটি জিনিসের কথাই আমার স্ত্রীকে লেখা চিঠির সঙ্গে মিলে গেছে।

"Yogic Sadhan" প্রকৃতপক্ষে আমার লেখা নয়, যদিও এ ঠিক কথা যে আমি মায়াবাদী নই।

"শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে"

এ বই আমার লেখাও নয় আর বরোদা সম্পর্কেও নয়—চন্দননগরের একজন যুবক এখানে কয়েকদিন এসেছিল, তার সঙ্গে যা কথাবার্তা হয় তাই নিয়ে লেখা, তা কতদূর পর্যন্ত সঠিক সে কথা বলতে পারি না। ওর কোনো দাম আছে বলেও মনে হয় না। ওসব অনেক আগেকার কথা, তারপর অনেক কিছুই এখন বদ্‌লে গেছে।

২৫-১-১৯৩৫

A. G. (এ. জি.)

ঐরকম A. G. লিখে আমি সই করি না, অনেককাল ছেড়ে দিয়েছি।

১৪-৯-১৯৩৩

এরিস্টটলের শুষ্ক দর্শন

প্রঃ এরিস্টটল পড়তে চেষ্টা ক'রে দেখি তা নিতান্ত শুষ্ক ও বিবিক্ত।

উঃ তাই আমিও বরাবরই দেখেছি নিতান্ত শুষ্ক। কেবলই তা মানসিক দর্শনের পর্যায়ে; প্লেটোর মতো নয়।

সংবাদপত্রাদির বিশিষ্ট সংখ্যা

এই সব বিশিষ্ট সংখ্যার উদ্দেশ্য আমাকে নিয়ে সাধারণ প্রদর্শনীর মতো আমার আদি অন্ত উদ্ঘাটিত ক'রে দেখানো নয়, যেন সাধারণের রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করিয়ে আমার সব রকমের অভিনয়গুলো দেখাতে চাওয়া। তা নয়, ওর উদ্দেশ্য হলো এই যোগ সম্বন্ধে সাধারণ পাঠককে ভালোরকম ভাবে অবজ্ঞাত করা এবং এই আশ্রমে কি করা হচ্ছে তা মোটামুটি জানানো। আশ্রমের ভিতরের ঘরোয়া কথা সাধারণের জানবার নয়---কেবল যতটুকু দ্রষ্টব্য ততটুকু। অতএব আমার সম্বন্ধে যা কিছু ব্যক্তিগত ও প্রচ্ছন্ন তাও নিষিদ্ধ। আমার সম্বন্ধে সাধারণের জানা দরকার কেবল আমার চিন্তাগুলি সম্পর্কে এবং আমি কী নিয়ে কাজ করছি সেই সম্পর্কে। লক্ষ্য ক'রে দেখবে যে আমার জীবনটাই এমনভাবে রচিত যাতে কেবল কতকগুলি ধূসর রকমের ছাঁকা ঘটনাবলীই রয়েছে, আর কিছু নয়। সংবাদপত্রের জমকালো "ফীচার" ক'রে দেখাবার মতো কোনো প্রচেষ্টা, যেমন মুষ্টিযোদ্ধা জোন্‌সের সঙ্গে লড়াই, কিংবা ডাগ্‌লাস ফেয়ারব্যাংক্‌স্‌, এইচ. জি. ওয়েলস, রাজা জর্জ ও রাণী মেরী, হেইল সেলেসি, হবস, হিটলার, জ্যাক

ও মুসোলিনি ইত্যাদিকে নিয়ে,--তা মন থেকে একেবারেই দূর করতে হবে, চিরদিনের জন্য এবং পরের দিনেরও জন্য।

২৪-৯-১৯৩৫

আধ্যাত্মিক ব্যাপারে গোপনীয়তা

> প্রঃ সত্য কথা বলা কি কোনো কোনো স্থলে বিপদজনক নয়, যেমন রাজনীতিতে, বিপ্লবে, যুদ্ধ ব্যাপারে? নৈতিক-ভাবে সত্যবাদী যারা তারা তো এক পক্ষের সত্য অন্য পক্ষকে জানিয়ে বিপর্যয় আনতে পারে।

উঃ রাজনীতি, বিপ্লব, যুদ্ধ, এগুলি হলো কৌশলের ও লুকোনোর ব্যাপার--ওতে সত্য বলা চলে না। দ আমাকে বললে যে ডাহা মিথ্যা কথা না বললে রাজনীতিতে কাউকে নেওয়ানো যায় না, তাই সে তার কাজে বিরক্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে চলতেই হবে।

নিজের প্ল্যান বা মতলবের কথা এমন কাউকে বলার দরকার হয় না যার তা জানবার কোনো প্রয়োজন নেই, যার বোঝবার ক্ষমতা নেই, কিংবা জানলে যে শত্রুতা করবে বা সব নষ্ট ক'রে দেবে। আর আধ্যাত্মিক ব্যাপারে গোপনীয়তা নিশ্চয়ই চাই, কেবল শিষ্য ও গুরুর মধ্যে ব্যতীত। আমাদের আশ্রমে কি হচ্ছে তা বাইরের লোককে আমরা জানতে দিই না, কিন্তু মিথ্যা কথাও বলি না। অধিকাংশ যোগীরা তাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা কাউকে বলে না, কিংবা অনেক কাল বাদে ছাড়া বলে না, আর প্রাচীন গুহ্যসাধকদের মধ্যে গোপনীয়তা ছিল অবশ্য রক্ষিত। নৈতিক বা আধ্যাত্মিক এমন কোনো আইন নেই যাতে জগতের লোকের কাছে আমাদের মন ও হৃদয়ের আবরণ খুলে দেখাতে হবে। গান্ধী নাকি বলেছেন যে গোপনীয়তা একটা পাপ, কিন্তু এটা হলো তাঁর অনেক বাড়াবাড়ি কথার মধ্যে অন্যতম।

যারা অবিশ্বাসী বা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন তাদের সঙ্গে আমাকে নিয়ে বা এই আশ্রমকে নিয়ে কিংবা আধ্যাত্মিক কথা নিয়ে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত নয়। ওতে সাধকেরই মধ্যে বিপরীত দিকের আবহাওয়ার ধাক্কা এসে লাগে, তাতে তার অগ্রগতির পক্ষে কোনোরূপ সাহায্য হয় না। সেখানে চুপচাপ থাকাই সব চেয়ে ভালো ব্যবস্থা; অপর পক্ষের অশুভ মনোভাবকে বা তাদের অজ্ঞানতাকে দূর করতে যাবার কোনোই প্রয়োজন তোমার নেই।

১৩-৯-১৯৩২

আশ্রমের মর্যাদা

"আশ্রমের মর্যাদা রক্ষা" সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা অদ্ভুত। যে প্রতিষ্ঠান আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রস্বরূপ তার মর্যাদা সেখানেই, কোনো সংবাদপত্র বা বড়লোকের কথাতে নয়।

৩০-৬-১৯৩৮

বিভ্রান্তি

প্র : একজন চিন্তাব্রতী লিখেছে যে আপনার লেখার ভাষা বোঝা যায় না, বিভ্রান্তি জন্মায়। সে বলেছে যে আপনার দর্শন বা আপনার শিষ্যরা তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি, কিন্তু সে যদি আপনার সঙ্গে ১৫ মিনিট কথা বলতে পায় তাহলে তার মত পরিবর্তন করতে পারে। সে "আর্য" পত্রিকা পড়েছে, আমি যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে অতিমানস বলতে সে কি বুঝেছে, তখন সে বললে এক-রকম অলোকদৃষ্টি। ঐ চিন্তাব্রতীর অমন কথা শুনে আমি হেসে বাঁচি না।

উ : আমার দর্শন সম্বন্ধে তার বিভ্রান্তির কথা বোঝাই গেল, যদিও তার কারণ সম্ভবত তার নিজেরই চিন্তাপ্রণালীর উচ্চতা। ঐরূপ যোগীর

সঙ্গে ১৫ মিনিটের সাক্ষাৎলাভ আমার ভাগ্যে ঘটে উঠবে না এ জন্মে, তাহলে অনেক পুণ্য সঞ্চয় ক'রে আবার আমাকে জন্মাতে হবে।

১৩-৪-১৯৩৫

ভাব চুরি

> প্রঃ "হিন্দু" পত্রিকাতে ক-এর যে বক্তৃতা ছাপা হয়েছে তার আগাগোড়াই আপনার থেকে চুরি, এমনকি ভাষা পর্যন্ত। চুরি বিদ্যায় উনি খুব ধুরন্ধর। এমনি ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়, আমি ভাবছি তাকে চিঠি লিখে তার বিদ্যা ফাঁস ক'রে দেবো।

উঃ তাতে কিছু লাভ নেই। চুরি তো বটেই, কিন্তু সে বোধহয় নিজের জন্য ময়ূরপুচ্ছ নিতে চায়।

২৩-৭-১৯৩৬

×

> প্রঃ আমি বিবেকানন্দের লেখা পড়তে চাই। তিনি যা বলেছেন তা কি সত্য প্রেরণা থেকে?

উঃ বলতে পারি না সবই সত্য কিনা—তাঁর আপন মতামত ছিল। তবে তিনি যা বলেছেন তার অধিকাংশই সত্য এবং যথেষ্ট মূল্যবান।

২৫-৯-১৯৩৫

×

> প্রঃ আমি কিছু বই পড়তে চাই। কতকগুলি বইএর নাম বলবেন?

উঃ কেমন বই তোমার পছন্দ হবে জানি না। তা ছাড়া বইএর সঙ্গে এখন আমার সম্পর্ক নেই, সব নাম ভুলে গেছি। বিবেকানন্দ পড়তে পারো তাতে বেদান্তের ও সাংখ্যের কথা জানবে। মহেন্দ্র সরকারের " Eastern Lights" পড়তে পারো, তাতে ভারতীয় দর্শনের বিষয়ে জানবে।

২৫-৯-১৯৩৫

শ্রীঅরবিন্দের লেখাগুলিকে ভুলবোঝা

আমি যা লিখি তা লোকে বুঝতে পারে না কারণ মনই তার পিছনকার অর্থটা ধরতে পারে না। একটা কিছুকে ধরে নিয়ে মন তার নিজের ভাবটি-কেই গড়ে তোলে, যা লেখা হয়েছে তার সেই অর্থটাই ক'রে নেয়। সত্যের স্থানে প্রত্যেক মনই তার আপন মনোভাবটি রাখে।

৬-৬-১৯৩৬

×

আমি যা লিখি কিংবা মা যে কথা বলেন তাই নিয়ে লোকে প্রায়ই তার সঠিক অর্থের বদলে সম্পূর্ণ অন্যরূপ অর্থ ক'রে নিয়ে হঠাৎ এমন একটা নিজেদের "যুক্তি মাফিক" মীমাংসা ক'রে বসে, যা আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা হয়তো স্বাভাবিক আর বিরোধী শক্তিদের একটা খেলা; বহুমুখী সত্যকে সমগ্রভাবে দেখার চেয়ে ঐরকম প্রচণ্ড ধরনের যুক্তির দ্বারা মীমাংসা ক'রে নেওয়া অনেক বেশি সহজ।

মে ১৯৩৩

×

মানুষের বিচারকে কোনো বিশ্বাস নেই কারণ বরাবরই দেখেছি তা ভ্রান্ত হয়—আর হয়তো নিজে আমি মানুষের বিচারে এতই মসীময় হয়ে দাঁড়িয়েছি যে অপরের সম্বন্ধেও মানুষের বিচারকে আমি কোনো আমল দিই না। এটা অবশ্য আমার নিজের মতের কথাই ব্যাখ্যা ক'রে বলছি;

অন্যের পক্ষে এ নিয়ম ক'রে নিতে বলছি না। আমি যেমন ভাবি অন্যেও তেমন ভাবুক, এ আমি কখনই চাইনি—আর আমার যোগই সকলে নির্বিবাদে গ্রহণ করুক তাও চাই না।

ডিসেম্বর ১৯৩৪

যোগের দিক থেকে এসব বিষয়ে কিছু লিখতে যদি যাই, তা যুক্তিযুক্ত হলেও সাধারণ মতের বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে; যেমন, অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিচারের সংকীর্ণতা সম্বন্ধে, ইত্যাদি। এসব বিষয়ে কিছু লেখা আমি পারতপক্ষে এড়িয়ে যাই, কারণ তা ইন্দ্রিয়গত যুক্তি ছাড়া অন্যরকম যুক্তি দিয়ে বুঝতে হবে, নতুবা বোঝা যাবে না। তাতে এমন সব শক্তি ও নিয়মের কথা আমাকে বলতে হবে যা যুক্তিগ্রাহ্য বা জড়বিজ্ঞানগ্রাহ্য নয়। আমার লেখাতে ও সাধকদের চিঠিতেও এই সব নিয়ে কিছু লিখিনি কারণ তা সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধির বাইরে। কেউ কেউ সে সব জিনিস জানে কিন্তু তারাও তাই নিয়ে কিছু বলে না, আর যাও বা জানা গেছে তা নিয়ে লোকে হয় বিশ্বাস নতুবা অবিশ্বাস রাখে, কিন্তু জ্ঞান বা অনুভূতির সঙ্গে নয়।

ডিসেম্বর ১৯৩৫

বস্তুবিজ্ঞান ও অতীন্দ্রিয়বাদ

এসব কথা নিয়ে জল্পনা করতে আমার আর কোনো উৎসাহ নেই; আমি এমন গভীর জিনিসের মধ্যে লেগে রয়েছি যে অমীমাংসার মতো যুক্তিতর্ক নিয়ে মিছে সময় নষ্ট করা চলে না। তুমি যত খুশি তা করতে পারো অর্ধশতাব্দী আগেকার বস্তুবিজ্ঞানকে সিংহাসনে বসিয়ে, যাতে বলবে যে তার সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরের যা কিছু চিন্তা সবই হলো বাক্যসর্বস্ব দর্শন ও অতীন্দ্রিয় কথা ও কল্পনার চন্দ্রালোক। অবশ্য বস্তু জগতে যদি কেবল বস্তুশক্তিই থাকতো তাহলে পৃথিবীতে দিব্যজীবনের কোনো সম্ভাবনাই থাকতে পারত না। বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান যাকে অস্বীকার করে তাকে কেবল কোনো দার্শনিক বাক্যের ইন্দ্রজাল সত্য বলে দাঁড় করাতে পারত না। কিন্তু আমি ভাবতাম যে অপর মহাদেশের অনেক বিজ্ঞানী মনও একথা স্বীকার

করেছে যে বিজ্ঞান মূল আদি বস্তুটির সম্বন্ধে এখন আর নির্ধারিত ক'রে বলবার দাবী রাখে না যে তা কোনরূপ বাস্তব পদার্থ, এবং তা নির্ধারণ ক'রে বলার কোনো উপায় বিজ্ঞানের হাতে নেই, বিজ্ঞান কেবল আবিষ্কার করতে এবং সঠিক প্রণালী বর্ণনা করে বলতে পারে যে বস্তুশক্তি বাস্তবের রাজ্যে কোন কাজটা কেমন ভাবে করছে। তাতে অন্যদিকের ক্ষেত্র খুলে গেল যাতে উচ্চতর চিন্তা ও বিভাবনা, আধ্যাত্মিক অনুভূতি, ও এমন কি অতীন্দ্রিয়বাদ, গুহ্যতত্ত্ব প্রভৃতি অনুশীলিত হবার সুযোগ পেলে, যেগুলিকে সকলেই আগে গাঁজাখুরি বলে অবিশ্বাস করতো। আমি যখন ইংলণ্ড ছেড়ে আসি তখন সেখানে এই অবস্থা। কিন্তু আবার যদি সেই আগেকার ভাবটাই ফিরে আসে কিংবা যদি রাশিয়ার তর্কবাদী বস্তুতান্ত্রিকতাই জগতের নিয়ন্ত্রক হয়, তো ভাগ্যকে মেনেই নিতে হবে আর দিব্য-জীবনকে আরো হাজার বছরের মতো অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে। কিন্তু তাই বলে আমাদের কোনো পত্রিকাতে তাই নিয়ে কোনো বাক্‌যুদ্ধ শুরু করতে আমি নারাজ। এই বলতে চাই। এটা আমি লিখছি তোমার এ বিষয়ে পূর্ব প্রবন্ধের উপরে, পরবর্তীগুলি ভালো ক'রে দেখিনি ; হয়তো বা তাতে এমন অকাট্য যুক্তির কথা আছে যে তা পড়ে আমি নিজের ভুল বুঝতে পারব, আর এটাও জানবো যে কেবল একজন একগুঁয়ে অগমবাদীই ভাবতে পারে যে আত্মা দিয়ে বস্তুকে জয় করা সম্ভব। তবে আমি কিন্তু সেই রকমই একগুঁয়ে অগমবাদী। সুতরাং যদি তোমার ঐসব লেখা আমাদের কোনো পত্রিকাতে প্রকাশ হতে দিই, তাহলে আমাকেও নিরুৎসাহ ছেড়ে নিজের দাবী বজায় রাখতে এই বলে লড়তে হবে যে বস্তু-বিজ্ঞানের হাতে যখন এ বিষয়ে নির্ধারণ করবার কোনো সুনিশ্চিত উপায় নেই তখন তার পক্ষ থেকে এতে কোনো কথা বলাই উচিত নয়। তাতে "জড়বাদীর নেতি"র জবাবে আমাকে হয়তো "The Life Divine" (দিব্য জীবন) আবার নতুন ক'রে লিখতে হতে পারে। যাই হোক আমার এ বিষয়ে উত্তর দিতে এতদিন নীরব থাকা সম্বন্ধে সময়ের অভাব ছাড়া এই কৈফিয়তটাই দিতে পারি।

মে ১৯৪৯

দার্শনিক রচনা—খ্যাতি ও প্রচার

শোনো বলি! এরা কি চায় যে আবার আমি প্রবন্ধ রচনার যন্ত্রস্বরূপ হয়ে যাই? "বন্দে মাতরম্" আর "আর্য" পত্রিকার সে সব দিন তো চলে গেছে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! এখন কেবল আশ্রমের চিঠিপত্র লেখা, তাও এত স্তূপাকার যে দার্শনিক পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতি আর না লিখলেও চলবে।

আর দর্শনের কথা! তোমাকে যথার্থ বলছি যে জীবনে কখনো, কখনো, কখনোই আমি দার্শনিক ছিলাম না—যদিও লিখেছি বটে সেইরকম, কিন্তু সে হলো অন্য কথা। যোগ করার ও পণ্ডিচেরিতে আসার আগে দর্শনের বিষয় থোড়াই জানতাম—ছিলাম শুধু কবি ও রাজনীতিক, দার্শনিক নয়। তবে কেন ও কেমন ক'রে ও সব লিখলাম? প্রথমে ক আমাকে বললেন এক দার্শনিক রিভিউ পত্রিকাতে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে,—আর যেহেতু আমার থিওরি ছিল এই যে যোগী যে হবে সে সকল কাজেই হাত লাগাতে পারবে, তাই পারা চাই, সুতরাং আমি না বলতে পারলাম না; তারপর তিনি তো গেলেন যুদ্ধে, প্রত্যেক মাসে চৌষট্টি পৃষ্ঠার দর্শনতত্ত্ব আমাকে একাই ভরাট করতে হলো। দ্বিতীয়ত প্রত্যহ যোগ সাধনা করতে গিয়ে আমি যা কিছু জেনেছি ও অনুভব করেছি সেগুলিকে বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাষাতে লিখতে গিয়ে দেখি তাই আপনা হতে দার্শনিক হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু তাতেই তো কেউ দার্শনিক হয় না!

র-কে কি বলব জানি না—এসব কথা তাঁকে বলা যায় না। একটা উপায় ক'রে দাও না? হয়তো "মহা ব্যস্ত, এক মুহূর্ত সময় নেই, কিছু করতে গেলেই প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হতে হবে", এমনি কিছু,—কি বলো?

৪-৯-১৯৩৪

র সম্বন্ধে বক্তব্য, আমার লেখা পাবার জন্য তাঁর এমন ব্যগ্র হওয়াটা সমুচিত কিনা বলতে পারি না। কিন্তু ফরমাস অনুযায়ী ফিলজফি লিখতে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। যদি কিছু আপনা হতে এসে যায় তাহলে তা লিখতে পারি, যদি সময় পাই। কিন্তু সময় আমার নেই। ইচ্ছা ছিল অ-কে লিখে জানিয়ে দেবো যে চেতনা ও বোধি সম্বন্ধে আমার মতের যে

সমালোচনা সে করেছে তা ভুল এবং এ বিষয়ে আমার প্রকৃত মতামত সংক্ষেপে বিবৃত করব। কিন্তু তাও করতে পারলাম না। বরং হনুমানের মতো চাঁদকে বগলদাবা ক'রে বেড়িয়ে আসা সহজ হতো---যদিও তিনি চাঁদের বদলে সূর্যকে বগলদাবা করেছিলেন। কিন্তু চাঁদও নেই আর বেড়ানোও সম্ভব নয়। র-কে কিছু লেখা দেবো অঙ্গীকার করলেও তাই হতো, কাজের কাজ কিছু হতো না---সেটা লিখতে অস্বীকার করার চেয়ে আরো খারাপ।

দ্বিতীয় কথা এই যে আমার নামটা কোথাও জাহির হোক তা আমি আদৌ চাই না। এমন কি রাজনীতির যুগেও খ্যাতি এড়িয়ে পর্দার আড়ালে থেকেছি, অন্যেদের সামনে ঠেলে দিয়ে কাজ হাসিল করেছি। ধুরন্ধর ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টই আমাকে আসামী ক'রে সাধারণভাবে আমাকে "নেতা" পরিচয় করিয়ে সব নষ্ট করলে। কিন্তু কোনোরূপ বিজ্ঞাপনে আমার আস্থা নেই কেবল বইএর বিজ্ঞাপন ছাড়া, আর প্রচারেও আস্থা নেই কেবল রাজ-নীতি ও পেটেন্ট ওষুধের ছাড়া। গুরুত্বপূর্ণ কাজের বেলাতে তা বিষবৎ। এ স্থলে তার মানে হবে সোচ্চার নীতি কিংবা ঝাণ্ডা নিয়ে চমকপ্রদ প্রচার, যাতে আখেরে তা ভেঙে প্রাণহীন হয়ে কোথায় পড়ে থাকবে তার ঠিক নেই---আর তাতে আরো কাজ বাড়বে। অর্থাৎ আমার এই ধরনের প্রচেষ্টা নিয়ে তখন গড়ে উঠবে একটা সংঘ বা ধর্ম সম্প্রদায় বা ঐরকম কিছু। তার ফলে এই দাঁড়াবে যে শত-সহস্র অকেজো মানুষ তাতে যোগ দিয়ে এই কাজকে নষ্ট ক'রে দেবে কিংবা একে জমকালো প্রহসনে পরিণত করবে, আর যে সত্য নেমে আসছিল তা ফিরে গিয়ে গোপন নীরবতার মধ্যে লুকিয়ে পড়বে। "ধর্ম" নামে জগতে যেগুলি জন্মেছিল তাদের অসাফল্যের এই হলো কারণ। নিজের কথা নিয়ে আমি একটু আধটু যা কিছু লিখি, তা কেবল সাধারণ মনের ধোঁয়াটে ভাবটা কাটাবার জন্য, অজ্ঞানময় জগতে কোনো নতুন প্রাণবন্ত সত্য দেখা দিতে চাইলেই চারদিক থেকে যে বিরুদ্ধ-তা জাগে তাকে নরম করার জন্য। কিন্তু ঐ পর্যন্তই তার প্রয়োজন, ওর চেয়ে বেশি করতে গেলে তা বিজ্ঞাপন হয়ে উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করবে। বস্তুত আমার সব কাজেই আমি খাঁটি "বাস্তববাদী", কেবল ব্যক্তিগত খ্যাতি প্রভৃতি অপছন্দের দরুনই এই ধরনের কিছু করি না। সত্যের কাজে যতটা পর্যন্ত সহায়ক হবে ততটা পর্যন্ত করতে আমি সব সময়েই রাজী; কিন্তু প্রচারের জন্য প্রচার করা বাঞ্ছনীয় নয়।

"সমসাময়িক দর্শন" ব্রিটিশ বা ভারতীয়, আমার মনে হয় তা যেন বই-বানানো (যেমন ফরাসীতে বলে "সকলেরই জন্য" এ বই হয়েছে), তা যদি করতে হয় অন্যেরা করুক, আমি আমার আসল কাজ নিয়ে থাকতে চাই। তুমি বলবে যে আসল কাজই হোক এই নিয়ে লেখা, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তা ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো পড়ে থাকবে। তা ছাড়া বর্তমানে আমার যা আসল কাজ তা দর্শন নয়, তা বাক্যগত নয়, তার চেয়ে গভীর। সে কাজ সুসম্পন্ন হলে তখন তা আপনা থেকেই ছড়াবে---আর তা সফল না হলে সকল প্রচারই ব্যর্থ হবে।

এই সব হলো আমার তরফের কারণ। যাই হোক অপেক্ষা করে দেখা যাক যে কার কেমন বই বেরোচ্ছে, তার মধ্যে কেমন বস্তু আছে।

২-১০-১৯৩৪

জীবনী লেখকের প্রতি

দেখছি তুমি জীবনী নিয়ে লিখবেই---তা কি বাস্তবিকই দরকার বা তাতে কি কোনো কাজ হবে? মিথ্যে চেষ্টা, ওতে বিফল হবেই, কারণ আমার জীবন সম্বন্ধে তুমি কিংবা কেউই কিছু জানে না; কারো দেখবার মতো ভাবে বাইরে তার প্রকাশ নেই।

তুমি আমার রাজনৈতিক ক্রিয়ার যেমন বর্ণনা দিয়েছ, তাতে আমার মনে হয় ও বোধ করি সাধারণ সকলেরই মনে হবে যে একজন অগ্নিতুল্য আদর্শবাদী প্রচণ্ড তেজে এক অসম্ভব লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলেছে (পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকে, যেন সজ্ঞানে নয়), যার বাস্তব সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই আর যুক্তিযুক্ত কোনো রাজনীতিক প্রণালী বা ক্রিয়াধারা নেই। এ ছবি দেখলে পাশ্চাত্ত্যের লোকেরা বিশেষ খুশি হবে না, তারা তখন সন্দেহ করতে থাকবে যে আমার যোগও বুঝি ঐরকমই জিনিস!

আমার জীবনী লিখে আদৌ কি লাভ আছে? তার কি যথার্থই দরকার আছে? আমার মতে, কোনো মানুষের দাম নির্ভর করে না সে কি শিখেছে,

বা কি করেছে, বা কতটা তার খ্যাতি প্রতিপত্তি হয়েছে তারই উপর, তা নির্ভর করে সে নিজে কি হয়েছে এবং ভিতরের দিকে সে কী হতে পেরেছে তারই উপর।

লেনিন

> প্র ঃ একজন কেউ বলেছে যে শ্রীঅরবিন্দ লেনিনের মধ্যে বিপ্লবের শক্তি অনুপ্রাণিত করেছিলেন। র বলে যে আপনি যদি যোগশক্তিতে দেহের দুরারোগ্য ব্যাধি সারাতে পারেন তাহলে অন্যের মনের মধ্যে যথেষ্ট যোগশক্তি প্রয়োগ ক'রে তার প্রাণশক্তিকে রুশ বিপ্লবের কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন না কেন?

উ ঃ এটা ঠিক বলা হয়নি। কথাটা নিতান্ত স্থূল ভাবের। আধ্যাত্মিক শক্তি জগৎ-ব্যাপারের কর্মীদের উপর প্রভাব করতে পারে, কিন্তু অমন কিছু হলে তা যন্ত্রবৎ হয়ে যায়।

২৫-১-১৯৩৭

হিটলার-গোয়েরিং-গোয়েব্‌লস

হিটলার ও তার সহকারীরা নিশ্চয় প্রাণস্তরের সত্তা বা প্রাণসত্তাদের দ্বারা আবিষ্ট, সুতরাং সেখানে সহজ বুদ্ধি আশা করতে পারো না। আগে-কার কাইজার সয়তান হলেও অনেকটা মানুষের মতো ছিল, এরা মানুষই নয়। আগেকার শতাব্দী ছিল মানবীয় যুগ, এখন হয়েছে প্রাণসত্তাদের স্তরের রাজ্য।

১৮-৯-১৯৩৬

ভারত মাতা

প্র : আপনি যে লিখেছিলেন ভারত একটা ভূমি মাত্র নয়, ইনি হলেন জননী ভগবতী, তা কি সত্য জেনে বলেছিলেন অথবা দেশভক্ত হয়ে কাব্য ক'রে বলেছিলেন?

উ : ওহে বাপু, আমি বস্তুবাদী নই। ভারতকে যদি ভৌগোলিক ভূমি মাত্র বলে জানতাম তাহলে নিজেকে দারুণ অবস্থায় ফেলে এত কাণ্ড করতে যেতাম না।

তোমরা ভাবো দেহ, চর্ম, অস্থি এইগুলোই বাস্তব। যাকে মন বলো তাতো দেখা যায় না কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক হলেও তা খাদ্যাদির দ্বারা পুষ্ট এবং গ্ল্যাণ্ডের দ্বারা ক্রিয়াশীল। মন বা বলে তা বাস্তব। দেশপ্রেম ও কাব্য মন থেকে জন্মালেও তা অবাস্তব।

স্বাধীনতার পরে ভারত

প্র : বাংলা দেশে মুসলমানরা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করছে। স্বাধীনতা এলে হয়তো এগুলো থেমে যাবে। আমি জানতে চাই, স্বাধীন ভারত কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন? আপনি বলেছেন যে ভারত স্বাধীন না হলে জগতে আধ্যাত্মিকতা আসবে না। আপনি কি তারই চেষ্টাতে আছেন? কেবল আপনিই তা পারেন অধ্যাত্ম শক্তিতে।

উ : ওসব নির্ধার্য হয়ে গেছে, এখন কেবল কাজে সফল হতে বাকি। এখন প্রশ্ন, ভারত স্বাধীন হলে কি করবে? ঐরকম চলবে? বলশেভিজম্? গুণ্ডারাজ? অন্ধকার?

১৬-৯-১৯৩৫

চিত্তরঞ্জন দাস সম্বন্ধে

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে সমূহ ক্ষতি হলো। রাজনৈতিক বুদ্ধিতে তিনি ছিলেন ধুরন্ধর, কল্পনাশক্তি ছিল গঠনমূলক, সুদৃঢ় মনের সঙ্গে সাবলীল দৃষ্টিভঙ্গী মিলিয়ে সময়োচিত ভাবে তাঁর বৈদ্যুতিক শক্তিকে প্রয়োগ করতে পারতেন, তিলকের পরে তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি দেশকে স্ব-রাজের পথে অগ্রসর করতে পারতেন।

একটি পূর্বদৃষ্ট ভবিষ্যৎবাণী

১৯০৭ সালের পর থেকে আমরা নতুন যুগে বাস করছি, ভারতের সম্বন্ধে পরিপূর্ণ আশা নিয়ে। শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগতেই অকস্মাৎ দারুণ বিপর্যয় ও বৈপ্লবিক উত্থানপতন পরিলক্ষিত হবে। যারা উচ্চে অবস্থিত তারা নিচে নামবে যারা দুঃস্থ পদানত তারা উপরে উঠবে। সমগ্র জাতি ও মানবগণের মধ্যে একটা নব চেতনা জাগ্রত হবে, নতুন ফললাভের জন্য নতুন চিন্তাধারা ও নতুন তৎপরতা দেখা দেবে। এই সকল উত্থান-পতনের মধ্যে ভারত স্বাধীন হয়ে থাকবে।

জানুয়ারি ১৯১০

পুরাণো রাজনৈতিক মতবাদ ও সমকালীন সমস্যা

> প্র ঃ The Ideal of the Karmayogin বইটির, আমার লেখা সমালোচনা দেখেছেন কী?

উ ঃ হ্যাঁ, দেখেছি, তবে মনে হয় না, যেভাবে সমালোচনাটি লিখেছ, সেই ভাবে সেটিকে এখন প্রকাশিত করা উচিত। সে যুগের রাজনীতি ক্ষেত্রে যাত্রী অরবিন্দকে আজকের যুগের শ্রীঅরবিন্দের ভিতর এনে দাঁড় করানো হয়েছে। তুমি এমন কথাও লিখেছ যে ঐ বইটি আমি সম্পূর্ণ-ভাবে পরিমার্জ্জিত করেছি এবং প্রবন্ধগুলিতে সমকালীন সমস্যাগুলির

সম্বন্ধে আমার অধুনাকালীন মতবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এবং গত ২৭ বছরে আমার মতের কোনও পরিবর্তন হয়নি (এটা সত্য হলে আমার মন যে অনগ্রসর তার চেয়ে বড় প্রমাণ আর নেই)। কোথা থেকে তুমি এসব পেলে? আমার আধ্যাত্মিক চেতনা বা জ্ঞান আজকের তুলনায় তখন নগণ্য ছিল--তার বিকাশ কী রাজনীতি বা জীবন সম্বন্ধে আমার মতবাদকে এতটুকুও স্পর্শ করেনি? সেরকম কিছু পরিমার্জ্জনা করা হয়নি, যেমন ছিল সেইভাবেই বইটিকে রেখে দিয়েছি, কেননা অতো আগে যা লেখা হয়েছে তাকে এখন সংশোধনা করা অর্থহীন--ঠিক সেইভাবে "The Yoga and its Objects" বইটিও রয়ে গেছে। মোট কথা, এই সমালোচনাটি পড়লে মনে হবে যে আমি যেন আমার এখনকার রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশ করছি--কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে গত ক-বছর ধরে মনে নেই, আমি রাজনৈতিক বিষয়ে কোনও মতবাদ দিইনি।

২১-৪-১৯৩৭

"The Yoga and its Objects" বই সম্বন্ধে

বইটি লেখা হয় শ্রীঅরবিন্দের সাধনার গোড়ার পর্ব্বে এবং ২০ বছর পরে 'যোগ' আজ যে রূপ নিয়েছে, তার অতি সামান্য পরিচয়ই এতে পাওয়া যাবে।

২৮-১০-১৯৩৪

নীতি-শাস্ত্র ও সাধনা

প্র ঃ পাশ্চাত্য প্রণালীতে আপনার অবদানগুলি লিখবার মনস্থ করেছি, তিনটি প্রধান ভাগে, যথা, দর্শন, মন - স্তত্ত্ববাদ ও নীতিশাস্ত্র, কিন্তু শিক্ষকদের মত করে লিখতে গেলে অতীত ও বর্ত্তমানের পাশ্চাত্য-দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ব-বিদদের লেখা পড়তে হবে। তার সময় কোথায়?

উঃ আমার মনে হয় এটি একটি বৃহৎ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু নীতিশাস্ত্র কেন? আমার মনে হয় না নীতিশাস্ত্রের প্রয়োজন আছে, কেননা এটি নির্ভর করে কতগুলি নির্দ্দিষ্ট নীতি ও আচার ব্যবহারের রীতির উপর; কিন্তু এখানে এই সব নীতি রীতির প্রয়োজন থাকবে সাধনার উদ্দেশ্যে কেবল মাত্র উন্নততর বা আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশের জন্য, এবং তারপর সব কিছুই চলবে সেই চেতনার নির্দ্দেশ ও গতি অনুসারে।

২৬-৭-১৯৩৬

আশ্রমে চাপ ও বাইরের ঘটনাবলী

> প্রঃ যদি এখানকার চাপ বাইরের পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তাহলে এখানে যা সব ঘটছে, তার সঙ্গে বাইরের ঘটনাবলীর কী কোনও সম্পর্ক আছে? যেমন ধরুন, আমি লক্ষ্য করেছি যে 'ক' ও 'খ' যেদিন এখান থেকে চলে গেল, সেই দিনই ইটালীর আবিসিনিয়া জয় সম্পূর্ণ হ'ল। ষোড়শ শতাব্দীতে আমেদাবাদের এক occultist -এর গল্প আছে, যে তিনি মাদুর তৈরী করতেন আর ভাঙ্গতেন, আর সেই অনুসারে সহরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর যা দিনের বেলায় গাঁথা হোত, তা রাত্রে ভেঙ্গে যেত---আর রাত্রেই তিনি মাদুরের উপকরণগুলি সরিয়ে ফেলতেন।

উঃ ঐ গল্পে কিছু সত্য আছে, এবং এটা যদি মনে করা হয় যে এখানকার চাপের সঙ্গে বাইরের ঘটনাবলীর কোনও সংযোগ নেই তাহলে ভুল করা হবে। কিন্তু কোনও বিশিষ্ট ঘটনার সঙ্গে সংযোগ আছে কিনা জানি না। আবিসিনিয়ার ঘটনাবলীর সঙ্গে 'ক' ও 'খ'র এখান থেকে চলে যাওয়ার কোনও সম্পর্ক আছে সহজে বলা যায় না।

১০-১০-১৯৩৬

ডব্লিউ জেম্স্

জেম্সের বই (Psychology) বেশ মুখরোচক। অনেকদিন আগে আমি ঐ বই পড়ি, এবং আমার এইটুকু মনে আছে যে এটি খুব মুখরোচক এবং সাধারণ বই নয়, ও এতে অনেক মূল্যবান তত্ত্ব আছে।

১-৭-১৯৩৩

রাসেল, এডিংটন ও জিন্স্

আমি বুঝতে পারি না কেন 'ক' আশা করে যে রাসেলের সমালোচনা আমাকে মাথা পেতে নিতে হবে।

১। জিন্স্, এডিংটনের মত, রাসেলের মতবাদও যেমনভাবে মানুষ হয়েছেন ও স্বভাবের দ্বারা প্রভাবিত। তিনি জন্মেছেন বস্তুতন্ত্রবাদ যখন খুবই প্রবল ছিল। তাঁর প্রকৃতিতে যেসব ধারণা গেঁথে গেছে, তা তিনি বদলাতে মোটেই রাজী নন। বিজ্ঞানের অধুনা যে সমস্ত উন্নতি হয়েছে সেসব সম্বন্ধে তাঁর মত এই মনোভাবের দ্বারা গঠিত। তাঁর যুক্তিগুলি নির্ভুল ও পরিষ্কার নয়। মনের গতি যেদিকে সেই দিকেই যুক্তিগুলি নিয়ে যাওয়া যায়। এডিংটনের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী, কল্পনা-প্রবণতা ও আদর্শবাদিতার দ্বারা প্রভাবিত মতবাদের বিরুদ্ধে রাসেলের মতবাদ নৈর্ব্যক্তিক বা ন্যায়সঙ্গত নয়। মানুষের যুক্তিবাদিতা যে একেবারে নৈর্ব্যক্তিক, এটা যুক্তিবাদীদের একটি কুসংস্কার যা ভেঙ্গে গেছে অনেকদিন। মনস্তত্ত্ববাদের অধুনাতম গবেষণায় দেখা গেছে ঐরকম নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ঘটনাবলী থেকে অপক্ষপাত প্রমাণ, সাদা কাগজে মন যেন আপনা আপনি লিখে যাচ্ছে, তা কল্পনা মাত্র। এই সব গবেষণায় দেখা গেছে যে ব্যক্তিত্বের প্রভাব থাকবেই থাকবে---আমরা নিজেরা যা, সেই রকমই আমরা ভাবি।

২। আমার বিশ্বাস যে রাসেল একজন বড় বৈজ্ঞানিক নন বা কোনও বিশেষ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রধান নন। আমি শুনেছি যে এডিংটন এস্ট্রোফিসিক্সে একজন বিশেষ জ্ঞানী ব্যক্তি। জিন্স্ ও এডিংটন যদি বড় কিছু আবিষ্কার নাও করে থাকেন তাহলেও প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক। রাসেল নিশ্চয়ই অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত; কিন্তু সে ক্ষেত্রেও এডিংটন তাঁকে একটি

বিষয়ে টেক্কা মেরেছেন। কেউ কেউ বলেন যে তিনিই একমাত্র, বা কারোও কারোও মতে পাঁচ জনের একজন, যিনি আইনস্টাইনের আবিষ্কার ঠিক-ভাবে বুঝতে পেরেছেন। রাসেল ঐ পাঁচজনের ভিতর নন এবং তিনি বোধ হয় আপেক্ষতাবাদতত্ত্বের পূর্ণ ফলাফল বুঝতে পারেননি। রাসেল কিন্তু এক-জন নামকরা দার্শনিক, যদিও প্রথম শ্রেণীর নন। আমার নিজের মতে তিনি দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে একজন সূক্ষ্ম চিন্তাশীল ব্যক্তি। এখানে তাঁর একটি বিশেষ সুবিধা আছে—জিন্‌স্‌ ও এডিংটন কেবলমাত্র সখের দার্শনিক কয়েকটি সাধারণ ধারণা মাত্র তাঁদের সম্বল।

৩। মননশীলতার দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে বলা যায় যে রাসে-লের চিন্তাধারা বস্তুতন্ত্র ঘেঁষা, কিন্তু খুব পরিষ্কার ও শক্তিশালী, নিজের জ্ঞানের সীমানার মাঝে তা যথেচ্ছ সঞ্চারমান। জিন্‌স্‌ ও এডিংটন নিজস্ব নিজস্ব ক্ষেত্রে খুবই শক্তিশালী, এবং তাঁরা বিজ্ঞানক্ষেত্রে বিশেষভাবে শিক্ষিত এবং বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁদের মতামতও পরিষ্কার—কিন্তু তার বাইরে তাঁরা নগণ্য। এডিংটনের চিন্তাধারায় বোধির ও স্বতস্ফূর্তির পরিচয় মেলে, কিন্তু লক্ষ্যের বাইরে তা প্রায়ই উড়ে যায়। রাসেল নিজের বিশিষ্ট ক্ষেত্রের বাইরে এসে ভুল করেন ও হোঁচট খান। কাজেই জিন্‌স্‌ ও এডিংটনকে বাতিল করে দিয়ে রাসেলের জয়পতাকা তোলার কী কারণ থাকতে পারে? ওঁদের তিনজনেরই মতবাদের সঙ্গে আমার মিল নেই,—মন, প্রাণ, বা বস্তুতন্ত্রবাদকে আমি প্রাধান্য দিই না। কাজেই আমার বিরুদ্ধে রাসেলকে খাড়া করছ কেন? তাঁর বস্তুতান্ত্রিকতার সম্মানার্থে আমি আমার মতবাদ বদলাতে রাজী নই। আর তাঁর মতবাদ বা যুক্তি কোথায় দাঁড়ায়? বিজ্ঞা-নের ক্ষেত্রে যে বিপ্লব এসেছে এটা 'ক'র বিরুদ্ধে তিনি স্বীকার করেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে পূর্বযুগের বস্তুতন্ত্রবাদের পা ভেঙ্গে গেছে; 'বস্তু' সম্বন্ধে মতবাদ আজ কোথায় চলে গেছে ভগবানই একমাত্র জানেন। কিন্তু তবুও রাসেল বলেন যে বস্তু আছে আর পৃথিবীর সব কিছুই বস্তু-তান্ত্রিক বিজ্ঞানের আইনকানুন মেনে চলে। খুবই গোলমেলে ব্যাপারে এটি তাঁর নিজস্ব মত। ভবিষ্যতের যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে, তিনি এখন থেকেই তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে লড়বার চেষ্টা করছেন। তিনি যা সব বলছেন তা নিজের মতবাদকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে করছেন, আক্রমণাত্মক তা নয়। তাঁর আগেকার আত্মবিশ্বাসের পরিচয় এতে মেলে না।

রাসেলের যুক্তিগুলি সম্বন্ধে বলা যায় যে নিরবচ্ছিন্ন যুক্তি দিয়ে সত্যকে

ধরা যায় না। বরঞ্চ উৎসাহী মন দিয়ে আরও শীঘ্র ধরা যায়। যুক্তিশাস্ত্রের কাজ হচ্ছে চিন্তার ছন্দ এনে দেওয়া, শক্ত গ্রন্থি দিয়ে তা বেঁধে দেওয়া, অপরের ধারণার সঙ্গে সুস্পষ্ট ব্যবধান গেঁথে দেওয়া। কিন্তু এসব হওয়ার পরও আমরা সত্যের দিকে এক পাও এগুতে পারি না। যুক্তিশাস্ত্রে সত্যকে দেখতে পাওয়া যায় না, দৃষ্টিতেই তা লভ্য। বাহ্যিক দৃষ্টি ঘটনাগুলি দেখে কিন্তু তাদের গুহ্য অর্থ বুঝতে পারে না, অন্তঃদৃষ্টি ভিতরের ঘটনাবলী দেখে ও গূঢ় অর্থ বোঝে, সামগ্রিক দৃষ্টিই (যার সঙ্গে মনের সম্পর্ক নেই) একমাত্র সমগ্রকে বুঝতে পারে। রাসেলের আছে শক্তিশালী ও পরিষ্কার মননশীলতা আর কিছু নেই—বিজ্ঞান বা আর কোন বিষয়েই তিনি নির্ভুল জ্ঞানী নন। জিন্‌স্ ও এডিংটনের নিজস্ব যুক্তিধারা আছে; তাও আমি গ্রহণ করতে রাজী নই যেমন নই রাসেলের বেলায়।

কাজেই আমাদের এসব জ্ঞানীদের মতামত ছেড়ে দিতে হয়—একই জ্ঞানীলোকের সম্পূর্ণ বিপরীত অভিমতও দেখা যায়—রাসেলের বিরুদ্ধে রাসেলকে বা ডারুইনের বিরুদ্ধে ডারুইনকে দাঁড় করিয়ে কোনও লাভ নেই—তার চেয়ে আসল বিষয়ে ফিরে আসা যাক্।

লেনার্ড উলফ্‌কে উত্তর

উল্‌ফের প্রবন্ধ যখন লণ্ডনের সাপ্তাহিক NewStatesman and Nation এ বেরোয়, সেই সময়, বহুদিন আগে, তার জবাব লিখেছি। 'ক'ই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই প্রবন্ধের প্রতি এবং জবাব চায়। 'স' এইবার Onward এর ১৫ই আগস্ট সংখ্যার জন্য আমার লেখা চায় এবং এইটি পছন্দ করে।

২৪-৮-১৯৩৪

রাজনীতিবিদদের যুক্তিবাদিতা

বেচারা 'ক'। কিন্তু সে রাজনীতিবিদ আর তাঁদের যুক্তিবাদিতাকে সীমিত ক্ষেত্রের মধ্যে চলাফেরা করতে হয়। তাঁদের চিন্তাধারা যদি খুব

পরিষ্কার হয়, তাহলে তাঁদের চাকুরী যাবে। সবাই তো আর বার্কেন-হেডের মত সিনিক বা সি. আর. দাসের মত দার্শনিক মনোভাবাপন্ন নয়, যে রাজনৈতিক যুক্তিবাদ বা হুজুগ নিয়ে চলবে সব কিছু জেনে শুনেও।

অষ্টম বিভাগ

বাণী

বাণী

যুদ্ধ সম্বন্ধে

কোনও কোনও শক্তি কাজ করছে ভগবানের পক্ষে, আবার কোনও কোনও শক্তির উদ্দেশ্য ও মতলব ভগবানের বিরুদ্ধে।

যে সমস্ত জাতি বা সরকার অজ্ঞাতভাবে ভগবৎ-শক্তির অস্ত্ররূপে কাজ করছে, তারা যদি সম্পূর্ণ পবিত্র ও দৈবভাবে কাজ করে বা অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে, যা তারা না জেনে করছে বা পাচ্ছে, তাহলে তাদের জয় সু-নিশ্চিত, কেন না ভগবৎ-শক্তি অপরাজেয়। তার বাইরের প্রকাশে যদি ভেজাল থাকে, তা হলেই অসুরদের জয়লাভ করার অধিকার জন্মায়।

আসুরিক শক্তির বাহক হওয়া খুবই সহজ; কেননা তা তোমার নিম্ন-প্রকৃতির লীলাগুলি গ্রহণ ও ব্যবহার করে, কাজেই তোমার আর আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার দরকার লাগে না। কিন্তু তুমি যদি দৈবশক্তির প্রকৃত বাহক হতে চাও, তাহলে তোমাকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র হতে হবে---একমাত্র সাময়িক-ভাবে দৈবভাবাপন্ন অস্ত্রের মাধ্যমেও দৈবশক্তির পূর্ণ ক্রিয়া সম্ভব।

৪-৭-১৯৪০

×

আমরা মনে করি যে এ যুদ্ধ কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য, বা যে সমস্ত জাতি জারমানির ও নাৎসীশক্তির চাপে পড়ছে তাদের বাঁচাবার জন্য নয়। এ যুদ্ধ মানবসভ্যতাকে রক্ষা করার এবং সেই সভ্যতার সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে, বা মানবজাতিকে, বাঁচিয়ে রাখার জন্য। যাই ঘটুক না কেন, আমরা এই উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণভাবে দৃঢ়ভাবে সাহায্য করব। আমরা ব্রিটেনের জয়লাভের দিকে তাকিয়ে আছি, আর তাকিয়ে আছি, তার ফল হিসাবে আসবে যে শান্তির বা জাতিগণের ঐক্যের যুগ এবং

বিশ্বশান্তির যুগ তার দিকে।

১৯-৯-১৯৪০

×

তুমি লিখেছ যে এ যুদ্ধ মায়ের যুদ্ধ কিনা সে বিষয়ে তোমার সন্দেহ জাগছে, এবং চাও যে আমি যেন তোমাকে আবার বুঝিয়ে দিতে পারি যে এটা মায়ের যুদ্ধ। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি আবার বলছি যে এ যুদ্ধ মায়ের যুদ্ধ। তুমি মনে কোরো না যে এ যুদ্ধ কয়েকটি জাতির নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা ভারতের জন্য। মানুষের জীবনে এক আদর্শবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, এক চিরন্তন সত্যকে রূপায়িত করার জন্য, এ যুদ্ধ, আর যে অন্ধকার ও মিথ্যা পৃথিবীকে, মানবজাতিকে, অদূরে গ্রাস করবার চেষ্টা করছে তার বিরুদ্ধে। যুদ্ধের পিছনে যেসব শক্তির ক্রিয়া চলছে তাদের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, উপরের ভাসা ভাসা ঘটনাবলীর দিকে নয়। কোনও জাতির ভুল বা ত্রুটির দিকে চেয়ে থাকলে কোনও লাভ নেই—সব জাতিরই দোষ-ত্রুটি আছে। কিন্তু এই যুদ্ধে কোন জাতি কার পক্ষ নিয়েছে, সেইটাই মনে রাখতে হবে, এ যুদ্ধ মানবজাতির স্বাধিকার বিকাশের জন্য, সেইরকম অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য যাতে মানুষের স্বাধীনতা ও সুবিধা থাকে স্ব স্বভাবে প্রস্ফুটিত হবার সত্য ও চেতনার বিকাশের পথে অগ্রসর হবার। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না যে যদি এক পক্ষ জয়লাভ করে তাহলে মানুষের স্বাধীনতার অবলুপ্তি ঘটবে, আলোর ও সত্যের সব আশাই নির্ম্মূল হয়ে যাবে, আর কাজ করতে হবে এমন অবস্থায় যা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়, আর আসবে অন্ধকারের ও মিথ্যাদরের রাজত্ব, নিদারুণ অত্যাচার ও হীনতা, যা এ দেশের লোকেরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না বা এখনও বুঝতে পারে না। যে পক্ষ দাঁড়িয়েছে মানবজাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, তা যদি জেতে, এই ভীষণ বিপদ থেকে সবাই রক্ষা পাবে, আর যাতে আদর্শবাদের বিকাশ হতে পারে, দৈবকাজ চলতে পারে, যে আধ্যাত্মিক সত্যকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তার প্রকাশের জন্য, সবরকমের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হবে। যারা এই উদ্দেশ্যের জন্য যুদ্ধ করছেন, তাঁরা

সবাই ভগবানের পক্ষে এবং অসুরের পরাজয়ের জন্য লড়ছেন।

২৯-৭-১৯৪২

এ কথা আমরা বলি না যে মিত্রপক্ষরা কোনও অন্যায় কাজ করেনি, কিন্তু তারা বিবর্ত্তনের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। আমি এটা কথার কথা হিসাবে বলিনি। কিন্তু ঘটনাবলী দেখে এটাই আমার সুচিন্তিত অভিমত। তুমি যা লিখেছ সেটা খারাপ দিক সম্বন্ধে। সব জাতি এবং সরকার পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারে যথেষ্ট অন্যায় কাজ করে—অন্ততঃ সেই সব জাতি যাদের শক্তি ও সুবিধা আছে। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ না যে এমন কোনও জাতি বা সরকার আছে বা ছিল, যারা সম্পূর্ণ সৎ, বা দোষ-ত্রুটিহীন। কিন্তু অপর দিকটাও দেখো। আন্তঃর্জাতিক ব্যবহারের অধুনা-তম নীতি অনুসারে তুমি মিত্রপক্ষকে বিচার করছ ও দোষারোপ করছ। ঐদিক দিয়ে বিচার করলে সকলেরই দোষ আছে। কিন্তু স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সাম্য-নীতি, আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার প্রভৃতি আদর্শবাদের সৃষ্টি, বা সৃষ্টি করতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য কারা করেছে? তা কী আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আজকের যারা মিত্রশক্তি, তারা নয়? তারা সবাই রাজ্য বিস্তার করেছে একথা ঠিক, এবং তার জন্য ভুগছেও। কিন্তু তারা ঐ সমস্ত আদর্শের বীজ স্বেচ্ছায় সর্ব্বত্র বপন করেছে, এবং যাতে তা ফলপ্রসূ হয় তার জন্য সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এইসব জিনিসের আপেক্ষিক মূল্য যাহাই হউক না কেন, কিন্তু বিবর্ত্তনের সোপান এগুলি। আর অন্য দিকে তাকিয়ে দেখো—হিটলার তো বলেইছে যে কালো জাতি-দের লেখাপড়া শেখানো পাপ—তাদের মজুর বা কৃতদাস হিসাবে দাবিয়ে রাখতে হবে। নিজেদের কোনও লাভের দিকে লক্ষ্য না রেখেও ইংলণ্ড কিছু কিছু জাতিকে স্বাধীনতা দিয়েছে। 'ইজিপ্ট' ও 'আয়ার'কে যুদ্ধের পর স্বাধীনতা দিয়েছে বটে, কিন্তু 'ইরাক'কে বিনা যুদ্ধে তা দিয়েছে। ইংলণ্ড ধীরে ধীরে কিন্তু দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে রাজ্যবিস্তারের পথ ছেড়ে দিয়ে, পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার পথে। ইংলণ্ডের ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ও ডোমিনিয়ন অপূর্ব্ব ও অভূতপূর্ব্ব সহগঠন, এবং সহযোগিতার পথে দৃঢ় পদক্ষেপ। পৃথিবীর রাজ্যগুলির মধ্যে কোনও একরকম ঐক্য স্থাপনের

আদর্শ তাকে অনুপ্রাণিত করছে, যাতে পরস্পরকে আক্রমণ না চলে। এই যুগের বাসিন্দাদের আর পুরাতন সেই রাজ্যবিস্তারের প্রতি আস্থা নেই। ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন স্বাধীনতা বা যদি আমাদের দেশ পূর্ণ স্বাধীনতা চায়, তাও, যুদ্ধের পরে দিতে রাজী হয়েছে, এমনকি আমরা নিজেরা যেমন শাসনব্যবস্থা সম্মিলিতভাবে চাইব, তাও দিতে রাজী। আমার মনে হয় ঠিক দিকে অগ্রসর হবার নিদর্শন এসব, যতোই ধীরে বা অসম্পূর্ণ বা নড়বড়ে হোক না কেন। আর আমেরিকা, সে তো মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা ছেড়ে দিয়েছে—কিউবা ও ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দিয়েছে। মিত্র-শক্তির বিরোধী পক্ষের সম্বন্ধে কী একথা বলা যায়? কোনও জিনিস বিচার করতে গেলে সব দিক দিয়ে, সমগ্রভাবে দেখতে হবে। আবার বল্‌ছি যেসব শক্তি এই যুদ্ধের পিছনে কাজ করছে, আমাকে সেইটাই দেখতে হবে। উপরের বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীতে আমি ভুলে যেতে রাজী নই। ভবিষ্যৎকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে—তা না হলে আজকের গোলযোগ বা পরস্পর-বিরোধী ঘটনাবলীর কোনও সুরাহা হবে না।

আমাদের সম্বন্ধে এ প্রশ্ন উঠেই না। আমরা একটি চিঠিতে পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছি—সে চিঠি জনসাধারণের সামনে প্রকাশিতও হয়েছে—এ যুদ্ধ আমাদের দৃষ্টিতে বিভিন্ন জাতি বা সরকারের মধ্যে নয়, সৎ ও অসৎ লোকের মধ্যে তো নয়ই, এ যুদ্ধ দুই শক্তির মধ্যে এক দৈব ও অপরটি আসুরিক। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে লোক বা জাতি কোন পক্ষ অবলম্বন করছে—তারা যদি ঠিক পক্ষ নেয়, তাহলে তাদের যতো কিছু দোষ, ত্রুটি, ভুল, ভ্রান্তি যা সাধারণ লোকের মধ্যে আছেই, থাকুক না কেন, তারা দৈব শক্তির বাহক হয়ে দাঁড়াবে। মিত্র পক্ষের জয় হলে মানবসভ্যতার বিবর্ত্তনের পথে অগ্রসর হবার পথ উন্মুক্ত থাকবে। অপরপক্ষের জয় হলে মানবসভ্যতার অধোগতি হবে, এমন কি তার বিনাশও ঘটতে পারে, যেমন পুরাকালের বিবর্ত্তনের কোনও কোনও জাতির বেলায় ঘটেছিল। এটাই হচ্ছে মূল প্রশ্ন,আর সব অবান্তর বা নগন্য। মিত্র পক্ষ দাঁড়িয়েছে মানবিক নীতিবোধকে রক্ষা করতে—যদিও তারা প্রায়ই তাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়। হিটলার দাঁড়িয়েছে আসুরিক নীতির পক্ষে বা মানবিক নীতিবোধের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে। অবশ্য আমার এসব কথা থেকে এটা মনে কোরো না যে ইংরেজ বা আমেরিকান জাতি নির্দ্দোষ দেবশিশুর মত বা জার্মান জাতি অতি অসৎ ও পাপী, কিন্তু এসবের ভিতর থেকে বোঝা যায় কারা কোন দিকে যাচ্ছে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সঙ্গে এ যুদ্ধের পুরোপুরি মিল না থাকতে পারে, কিন্তু সে যুদ্ধও দুই বিরোধী শক্তির মধ্যে ঘটেছিল, আর যে পক্ষ দৈব-শক্তির সাহায্য পেয়েছিল, সেই পক্ষই জিতেছিল। কেননা সেই পক্ষের অধিনায়করা দৈবশক্তির বাহক হয়েছিল। পুণ্য বা পাপের মধ্যে, সৎ বা অসৎ লোকের মধ্যে সে যুদ্ধ ঘটেছিল ভাবলে ভুল করা হবে। পাণ্ডবরাও কী দোষত্রুটিহীন, নিঃস্বার্থপর, রাগ-দ্বেষ বিবর্জ্জিত পুণ্যবান লোক ছিলেন?

পাণ্ডবরাও কী তাদের নিজেদের দাবী বা স্বার্থ, তা যতোই ন্যায়সঙ্গত হোক্ না কেন, তা পূরণ করবার জন্য যুদ্ধ করেননি? সে যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত ন্যায় বা দাবীর জন্য আর যদি সাম্রাজ্য-বাদ, বা সৈন্য-সামন্তর সাহায্যে রাজ্যবিস্তার সর্ব্বক্ষেত্রেই অন্যায় হয়, তাহলে পাণ্ডবরাও সেই দোষে দোষী—তাঁরা যুদ্ধে জয়লাভের পর তাঁদের সাম্রাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, এবং তাঁদের পরে পরীক্ষিত বা জন্মেজয় সেই সাম্রাজ্যকে আরোও বাড়িয়ে তোলেন। আজকের মানবিকতা বা শান্তিবাদের দৃষ্টিতে দেখলে এ দোষ কী তাঁদের দেওয়া যায় না যে ঐসব পুণ্যবান লোকেরা এমনকি শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত, সারা ভারতবর্ষের স্বাধীন জাতিগুলিকে পরাজিত করে নিজেদের সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই অতো লোকক্ষয় করেছিলেন? যদি পুরাতন ঘটনাবলীকে আজকের তুলাদণ্ডে ওজন করা হয়, তাহলে ঐ ধারণাই দাঁড়াবে। বস্তুতঃ সেই যুগে ঐরকম একটি সাম্রাজ্য স্থাপন একটি সঠিক পদক্ষেপ ছিল, যেমন আজকের দিনে সারা বিশ্বের স্বাধীন জাতির ঐক্য সম্মেলন একটি সঠিক পদক্ষেপ—এবং উভয় ক্ষেত্রেই তা ঘটেছে বা ঘটবে অজস্র লোকক্ষয়ে।

একথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, পুরাকালে, মধ্যযুগে বা সেদিন পর্যন্ত কোনও জাতিকে পরাধীন করা বা তাদের উপর রাজত্ব করা অন্যায় বলে গণ্য তো হতই না, বরঞ্চ মনে করা হত যে সেটা খুব বড় এবং মহৎ কাজ। বিজয়ী লোকেদের বা জাতিদের কোনও বিশিষ্ট ধরনের অসৎ বলে মনে করা হ'ত না। পরাধীন জাতিকে ন্যায়সঙ্গতভাবে শাসন করার আদর্শ ছিল বটে, কিন্তু শোষণনীতিও বাদ ছিল না। এই বিষয়ে অধুনা-কালীন যে চিন্তা-ধারা প্রাধান্য লাভ করছে, যেমন সকলের, জাতির বা মানুষের স্বাধীনতার অধিকার, অপরকে পরাজিত করা বা সাম্রাজ্যবাদ অন্যায়, বা পরাধীন জাতিদের স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত করার শিক্ষা দেওয়া যা বৃটিশদের আদর্শ, এ-সবই—বিবর্ত্তনের নূতন মূল্যবোধ। এ একটি নূতন নীতিবোধ

যা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে এবং কার্যক্ষেত্রে প্রসার লাভ করছে। হিটলার যদি জয়ী হয় এবং তাঁর নূতন নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হ'ন, তাহলে এই নূতন মূল্যবোধ চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যাবে। পরাধীন জাতিরা এই নূতন নীতিকে সাদরে অভ্যর্থনা জানায়, কিন্তু এ আশা করা অন্যায় হবে না যে তারা যখন শক্তিশালী বা ধনশালী হয়ে উঠবে তখন তারাও ঐ নীতি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে। কিন্তু সবচেয়ে ভাল হয়, যদি কোনও নূতন বিশ্বশান্তির পরিকল্পনা উদ্ভূত হয়, যতো অসম্পূর্ণ বা ধীরে ধীরেই হোক্ না কেন, যাতে করে সাম্রাজ্যবাদ বা শোষণনীতি আর কখনও মাথা চাড়া দিয়ে না উঠতে পারে। শক্ত কাজ এটা বটে, কিন্তু অসম্ভব নয়।

যেমনভাবে মানুষ গড়ে উঠেছে, তেমনভাবেই তাদের নিয়ে ভগবান কাজ করতে চান---তারা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, পুণ্যবান দেবশিশু না হলেও চলবে। যদি তাদের সদিচ্ছা থাকে, তাহলে বাইবেলের ভাষায় বলা চলবে যে তারা ভগবানের পক্ষে এবং তা হলেই চলবে। একথা যদি মানি যে মিত্রপক্ষরা জয়লাভ করার পর সেটাকে তারা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করবে, বা শান্তির চেষ্টা ব্যর্থ হবে, বা তাদের জয়লাভের ফলে মানবজাতির অগ্রসর হবার যেসব দুয়ার খুলে যাবে, তা তারা খানিকটা বন্ধ করে দেবে, তবুও আমি আমার শক্তি দিয়ে তাদেরই সাহায্য করব, যাই হোক্ না কেন, হিটলার জিতলে যা ক্ষতি হবে, মিত্রপক্ষ জিতলে তার শতাংশের এক অংশও হবে না। মিত্রপক্ষ জিতলে ভগবানের দুয়ার খোলা থাকবেই---খোলা রাখাটাই হবে আমাদের কর্ত্তব্য। কালা মানুষদের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আজীবন আবদ্ধ করে রাখার বা ভারতবর্ষ ও সারা পৃথিবীতে নূতন দানবতার লীলার, আশঙ্কা দূরীভূত করাই হচ্ছে মূল ও মুখ্য লক্ষ্য, সেইটাই আমাদের আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে---এবং আর সব গৌণ প্রশ্ন বা মনগড়া সমস্যাকে ভবিষ্য-তে মোকাবিলা করবার জন্য রেখে দিতে হবে---তা না হলে তারা মূল প্রশ্নটিকে চাপা দিয়ে দিতে পারে।

৩-৯-১৯৪৩

আমাদের সাধনা

আমাদের সাধনা কেবল ভক্তি নিয়ে বা ভগবৎ মিলনের আকাঙ্ক্ষা

নিয়ে বা সর্বভূতে ভগবানের উপলব্ধি করা নিয়ে নয়, কিন্তু কর্মীরূপে ও যন্ত্ররূপে জগতে আমাদের সমুচিতকর্মও করতে হবে কিংবা জগতের কঠিন অবস্থা হলে সেখানে শক্তিকেও নামিয়ে আনতে হবে; তখন সেই দিকেই লক্ষ্য রেখে যেখানে যেমন আদিষ্ট কর্ম তা করে যেতে হবে, যেখানে যেমন সমর্থন দরকার তা দিতে হবে, তার জন্য যদি যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতে হয় তাও হতে হবে, সে যুদ্ধ ধনুর্বান ও রথাদি নিয়েই হোক কিংবা ট্যাংক প্রভৃতি ও আমেরিকান বোমা ও এরোপ্লেনাদি নিয়েই হোক, অর্থাৎ যাকে বলা যায় ঘোরম্ কর্ম—; সময় সুযোগ ও ব্যক্তিবৈচিত্র্য অনুযায়ী সে প্রক্রিয়ার অদলবদল হবে। কিন্তু ক যে বলেছে যে এখনকার সমস্যা কুরুক্ষেত্রের সঙ্গে সমান তা কিছু ভুল বলেনি। আর হানাহানি সম্বন্ধে যে কথা, সে সম্বন্ধে গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বহুযুগ আগে যা বলেছেন তা আবার নতুন ক'রে প্রযোজ্য, ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রম্ ভব সব্যসাচী,—হে সব্যসাচী, আমিই আগের থেকে তাদের হত্যা ক'রে রেখেছি, তুমি কেবল তার নিমিত্তমাত্র হও।

তারা কারা যারা হিটলারের প্রতি এমন সহানুভূতি প্রকাশ করছে এবং দুর্যোধনের সঙ্গে তার তুলনাতে আপত্তি করছে? তারা নাকি আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের মধ্যে, আশা করি তারা নয় যারা হিটলারকে অবতার মনে করে এবং তার যা ধর্মপ্রচার (ধর্ম??) সেই ধর্মকেই সমগ্র জগতে প্রচলিত করা সম্বন্ধে সকলকে সাহায্য করতে বলে!! কিংবা তারা নয় যারা হিটলারকে একজন মহৎ ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে জ্ঞান ক'রে বলে যে হিটলার একজন সাধু-সজ্জন ব্যক্তি ও ভগবানের মতো উচ্চ সত্তা?

৩-৯-১৯৪৩

শ্রীঅরবিন্দের পত্র: স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স্‌কে লিখিত

আমি আপনার রেডিও ব্রড্‌কাস্ট শুনলাম। একজন জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে ও ভারতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকারী হিসাবে, যদিও এখন আমি রাজনীতির ক্ষেত্র ছেড়ে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে রয়েছি, তথাপি আপনি আমাদের জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন তার জন্য সমর্থন জানাই। এতে ভারতকে তার আত্মনির্ধারণের সযোগ দেওয়া হবে, স্বাধীনভাবে ভারত

মিলনের পথে অগ্রসর হবে, এবং জগতের স্বাধীন জাতিদের মধ্যে আপন সুনির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করতে পারবে। আমি আশা করি যে আপনার এ-প্রস্তাব গৃহীত হবে, এবং সকল মতবিরোধ ও বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে এই সুযোগের সঠিক সদ্ব্যবহার করা হবে। আরো আশা করি যে ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে অতীত বিরোধ মিটে গিয়ে সখ্য স্থাপিত হবে, এবং বৃহত্তর জগৎ মিলনের ক্ষেত্রে এক স্বাধীন জাতি রূপে এই ভারত তার আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা জগতের মানুষের উৎকৃষ্টতর সুখসমৃদ্ধির জীবন আনতে সহায়তা করবে। এই দৃষ্টি নিয়ে আমি প্রকাশ্যে আপনার কাছে সমর্থন দিলাম।

১১-৩-১৯৪২

ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাব সম্বন্ধে মতামত

এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ কোনো ব্যক্তিগত মতামত ঘোষণা করা অনাবশ্যক মনে করেন। কর্তৃপক্ষ যদি জানতে চায় তাহলে তিনি প্রকাশ্য ভাবে বলতে পারেন। তাঁর অভিমত বরাবর জানাই আছে। তিনি বরাবরই বলে এসেছেন যে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, তিনিই প্রথম একথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতির পক্ষে এর চেয়ে কম কিছু গ্রহণযোগ্য নয়। ১৯১০ সালে তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেন যে চার বছর পর থেকে জগতে বহু যুদ্ধবিগ্রহ চলবে এবং তারপর অবশেষে ভারত স্বাধীন হবে। কিছুদিন আগেও তিনি বলেছেন যে এবার ভারত শীঘ্রই স্বাধীন হচ্ছে, কেউ আর তা ঠেকাতে পারবে না। তিনি বরাবরই জানতেন যে ব্রিটেন শেষ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে আপোষ নিষ্পত্তি ক'রে তাকে স্বাধীন ক'রে দেবে। সেই বাক্যই এখন সফল হতে চলেছে, ব্রিটিশ ক্যাবিনেট যে দূত পাঠিয়েছে এটা তারই লক্ষণ। এখন দেশের নেতারা যদি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাহলে খুবই ভালো। কিন্তু এর ফলাফল যাই হোক না কেন, যে শক্তি এই সব ঘটনাসংস্থান ক'রে চলেছে তার ক্রিয়া কখনো ব্যর্থ হবে না, শেষ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী।

২৪-৩-১৯৪৬

১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ .. .. (১)

১৫ই আগস্ট স্বাধীন ভারতের জন্মদিন। এদিনে ভারতে একটা যুগের শেষ হল, আরম্ভ হল নূতন যুগ। কিন্তু কেবল আমাদের জন্যেই নয়, এসিয়ার জন্যে, সমগ্র জগতের জন্যে এ দিনের অর্থ রয়েছে। সে অর্থ হল নেশনগোষ্ঠীর মধ্যে একটা নূতন নেশন-শক্তির আবির্ভাব, অফুরন্ত যার ভবিষ্য সম্ভাবনা, মানবজাতির রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ভবিতব্য গঠনে যার থাকবে বৃহৎ অবদান। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এ জিনিষটি নিশ্চয়ই প্রীতিকর যে, যে-দিনটি আমার স্মরণীয় ছিল আমার নিজের জন্মদিন হিসাবে, আমার জীবন-সাধনা যারা গ্রহণ করেছে তারাই যে-দিনটির উৎসব করে এসেছে, ঠিক সেই দিনটি আজ অর্জ্জন করেছে এক বিপুল অর্থ। অধ্যাত্মপন্থী হিসাবে এই যোগাযোগটি আমি কেবল একটা হঠাৎ-যোগ বা আকস্মিক-ঘটনারূপে গ্রহণ করি না, তা হল যে-কাজ নিয়ে আমার জীবন আমি সুরু করি তাতে ভগবৎশক্তির সম্মতি ও তাঁর অনুমোদনসূচক আশীর্ব্বাদ। এই ভগবৎশক্তির নির্দ্দেশই আমার প্রতিপদ চালিয়ে নিয়েছে। ফলতঃ যে সব জাগতিক আন্দোলনের পূর্ণ সাফল্য আমি দেখে যেতে পারব আশা করেছি, একসময়ে যাদের মনে হত অসম্ভব স্বপ্ন বলে, আজ দেখছি তারা তাদের গন্তব্যের নিকটে গিয়ে পৌছেছে, অন্ততঃ তাদের কাজ সুরু হয়ে গিয়েছে, সাফল্যের পথে উঠেছে গিয়ে।

আজকার এই মহৎ উদ্যোগে আমার কাছে বাণী চাওয়া হয়েছে, কিন্তু বাণী দেওয়ার মত সম্ভাবনা এখন আমার নেই। তবে আমি সকলকে জানাতে পারি শুধু আমার ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষার কথা, শৈশবে যৌবনে যারা অঙ্কুরিত হয়েছে, এখন যাদের ফলোদ্গম হতে চলেছে---কারণ ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ, এইজন্যে যে সে-সব হল আমার মতে ভারতের যা ভবিষ্য কর্ম্ম, যাতে ভারত নেতৃস্থান না গ্রহণ করেই পারে না, তার অঙ্গীভূত। আমি চিরকাল বিশ্বাস করেছি, বলে এসেছি যে ভারতের অভ্যুত্থান, তার নিজের স্থূল স্বার্থ-সেবার জন্যে নয় কেবল, নিজের প্রসার মহত্ত্ব শক্তি সমৃদ্ধি লাভের জন্যে নয়---যদিও এ সকলকে অবহেলা করা তার উচিত হবে না---তার জীবনধারণ হবে ভগবানের জন্যে, জগতের জন্যে, সকল মানবজাতির সহায় ও নেতারূপে। এই সব আশা আকাঙ্ক্ষা তাদের স্বাভাবিক ক্রমানুসারে এই হবেঃ (১)

এক বিপ্লব, যার ফলে ভারতের আসবে মুক্তি ও ঐক্য, (২) এসিয়ার পুনরুত্থান ও মুক্তি—মানবসভ্যতার ক্রমোন্নতি কল্পে একসময়ে তার ছিল যে সুমহৎ অবদান পুনরায় সেই ব্রত গ্রহণ করা, (৩) মানুষের জন্যে একটি নূতন, মহত্তর, উজ্জ্বলতর, উন্নততর জীবনধারা—তার পূর্ণরূপ বাহ্যতঃ প্রতিষ্ঠিত থাকবে আন্তর্জাতিক ঐক্যের উপর—প্রত্যেক নেশন অক্ষুণ্ণ রাখবে তার পৃথক স্বকীয় জাতীয় জীবন, সেই সঙ্গেই সকলে সম্মিলিত থাকবে সকলের উপরে সকলের অন্তিমে রয়েছে যে অনিবার্য্য একতা তার মধ্যে, (৪) ভারত জগৎকে দেবে তার অধ্যাত্মজ্ঞান, আর জীবনকে আধ্যাত্মিক করে তুলবার সাধনা, (৫) সর্ব্বশেষে এক উর্দ্ধতর চেতনায় মানুষের উত্তরণ, ফলে প্রকৃতির বিবর্ত্তনে একটা নূতন পর্য্যায়—তখনই আরম্ভ হবে জাগতিক যাবতীয় সে-সব সমস্যার সমাধান, মানুষকে যা বরাবর বিমূঢ় আর ক্ষুব্ধ করেছে, যেদিন থেকে মানুষ ব্যক্তিগত পরমোৎকর্ষের, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমাজের চিন্তা করেছে, স্বপ্ন দেখছে।

ভারত স্বাধীন, কিন্তু একত্ব সে লাভ করে নি, এ তার দীর্ণ খণ্ডিত স্বাধীনতা। এমনকি এক সময়ে প্রায় বোধ হয়েছিল হয়ত বা সে ফিরে চলেছে ব্রিটিশ অধিকারের অব্যবহিত পূর্ব্বেকার বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্ররাজির বিশৃঙ্খলার মধ্যে। সুখের কথা, বর্ত্তমানে বিশেষ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে এই সাংঘাতিক পুনরাবর্ত্তন তার আর ঘটবে না। সংগঠনী-সমিতি (Constituent Assembly) তাঁদের কর্ম্মব্যবস্থায় যে দৃঢ়তা ও সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তাতে মনে হয় অনুন্নত শ্রেণীর সমস্যার সুসমাধানই হবে, ভাঙ্গন খণ্ডন কিছু ঘটবে না। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের সেই সুপ্রাচীন ধর্ম্মগত দ্বন্দ্ব এত গাঢ় হয়ে উঠেছে যে মনে হয় তা দেশকে যেন স্থায়ীভাবে খণ্ডিত করেছে রাজনীতিক হিসাবেও। তবে আশা করা যায় জাতীয় মহাসভা আর দেশের লোক এই আপাতবাস্তব সত্যকে স্থায়ী বাস্তব বলে গ্রহণ করবে না, সাময়িক ব্যবস্থার বেশী মূল্য একে দেবে না। কারণ, তা যদি স্থায়ী হয় তবে ভারত সাংঘাতিকভাবে দুর্ব্বল হয়ে পড়বে, এমনকি বিকল হয়েও পড়তে পারে। অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা সর্ব্বদাই রয়ে যাবে, এবং নূতন এক বিদেশী আক্রমণ ও অধিকারের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত দেখা দিতে পারে। দেশের বিভাগ দূর হওয়া চাই—যে উপায়েই হোক। আশা করা যায় বিরোধের উগ্রতা সময়ে স্তিমিত হয়ে আসবে, কিংবা শান্তির, সৌভ্রাত্রের প্রয়োজন উভয়পক্ষ ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম করবে, অথবা একই কর্ম্মে একসঙ্গে সহযোগ

যে নিরন্তর প্রয়োজন, এমনকি এ উদ্দেশ্যে একটা ঐক্যসাধনের যন্ত্রও যে দরকার এ উপলব্ধি হবে। ঐক্য এইভাবে আসতে পারে যে আকারেই হোকনা—বিশেষ আকারটির প্রয়োজন কাজের সুবিধার দিক দিয়ে, তার নিজস্ব নিত্য মূল্য কিছু নাই। কিন্তু যে উপায়েই হোক, খণ্ডতাকে যেতে হবে, যাবেই। তা না হলে ভারতের ভবিতব্য সাংঘাতিকভাবে ক্ষুণ্ণ হবে, এমনকি ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা ঘটতে দেওয়া হবে না।

এসিয়া উঠে দাঁড়িয়েছে, তার অনেকানেক অংশ স্বাধীন হয়েছে কিংবা স্বাধীন হতে চলেছে—অন্যান্য অংশ যারা এখনও পরাধীন তারা, যত দ্বন্দ্বসংঘর্ষই হোক না, তার ভিতর দিয়েই মুক্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। সামান্যই একটু করবার বাকী আছে, আজ হোক কাল হোক, সেটুকু করা হবেই। এখানেও ভারতের করণীয় কাজ আছে, এবং সে-কাজ সে আরম্ভ করেছে সামর্থ্য ও নৈপুণ্য সহকারে—তাতে ইতিমধ্যেই নির্দ্দেশ করে কতখানি তার ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা আর কোন স্থান সে অধিকার করতে পারে জাতিসঙ্ঘের আসরে।

মানবজাতির ঐক্যসাধনাও সুরু হয়েছে, সূত্রপাত যদিও তার ত্রুটিবহুল, বাহ্য-ব্যবস্থা একটা পেয়েছে বটে কিন্তু বিপুল বিঘ্নের বিরুদ্ধে তাকে চলতে হয়েছে। তবে ভিতরের বেগ সে অর্জ্জন করেছে, আর ইতিহাসের শিক্ষা দিয়ে যদি দিকনির্ণয় করা যায় তা হলে বলা যেতে পারে সে-বেগ ক্রমে বৃদ্ধি পাবে এবং শেষে জয়লাভ হবেই। এক্ষেত্রেও ভারত এক প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে—যদি অনুশীলন করে চলে সেই উদারতর রাষ্ট্রনীতি বর্ত্তমানের ঘটনা আর আশু সম্ভাবনার মধ্যেই যা সীমাবদ্ধ নয়—যার দৃষ্টি ভবিষ্যতের মধ্যে, এবং ভবিষ্যৎকে যা নিকটে নিয়ে আসে—তবে ভারতের উপস্থিত সান্নিধ্যের অর্থ হবে মন্থর আর শঙ্কিত গতির পরিবর্ত্তে ক্ষিপ্র নির্ভীক গতি।

দুর্য্যোগ একটা অতর্কিতে অবশ্য এসে পড়তে পারে, যে-কাজ করা হয়ে চলেছে তাকে ব্যাহত করতে পারে, তাকে ধ্বংসও করতে পারে—তাহলেও শেষ ফল সুনিশ্চিত। যাই ঘটুক না, ঐক্যসাধন প্রকৃতির ধারায় একটা অবশ্য প্রয়োজন, অপরিহার্য্য ক্রিয়া, এবং তার সংসিদ্ধির সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে ভবিষ্যৎ-বাণী করা যায়। নেশন-সকলের জন্যে তার প্রয়োজন স্পষ্ট, কারণ তৎব্যতিরেকে ক্ষুদ্রতর জাতিরা অতঃপর কখনও নিরাপদে থাকতে পারে না। আর ভারতবর্ষ খণ্ডিতই যদি থাকে তবে তারও নিরাপত্তা

সন্দেহাকুল। সকলের স্বার্থের দিক দিয়েই , ভারতের ঐক্য বাঞ্ছনীয়। কেবল মানুষের ঘোর পঙ্গুতা আর মূঢ় আত্মপরতাই তাকে ব্যর্থ করতে পারে ---মানুষের এ গুণের বিরুদ্ধে, শোনা যায়, দেবতাদের পর্য্যন্ত আয়াস বৃথা; কিন্তু প্রকৃতির প্রয়োজন আর ভগবৎ-ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ জিনিষ কখনও দাঁড়াতে পারে না। এ-রকমেই জাতীয়তা পূর্ণ সার্থকতা লাভ করবে; তার-পর প্রয়োজন হবে যাতে একটা আন্তর্জাতিক ভাব ও দৃষ্টি গড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান। এমনকি যে পরিবর্ত্তন ঘটছে সেই ধারায় চলনে এক দেশের অধিবাসী দুই বা ততোধিক দেশের নাগরিক-অধিকার লাভ করতে পারে, বিভিন্ন নেশনের সংস্কৃতি স্বেচ্ছায় পরস্পরে সম্মিলিত হয়ে একীভূত হয়ে উঠতে পারে। নেশনবাদ তার যোদ্ধৃভাব পরিত্যাগ করে, নিজের নিজত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখেও এ-সকল জিনিষকে বরণ করে নিতে পারে, সমস্ত মানবজাতি নূতন একটা ঐক্যভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে তখন।

জগৎকে ভারত তার আধ্যাত্মিক বিদ্যা দান করতে ইতিমধ্যেই আরম্ভ করেছে। ভারতের আধ্যাত্মিক বিদ্যা ইউরোপ ও আমেরিকায় ক্রমে অধি-কতর পরিমাণে প্রবেশ লাভ করছে। এই গতি ক্রমেই বৃদ্ধিলাভ করবে। এযুগের দুর্য্যোগের মধ্যে মানুষের দৃষ্টি আশায় ভরসায় ভারতের দিকেই বেশী করে ফিরছে, কেবল তার শাস্ত্রই নয়, তার সাধনা, আন্তর ও আধ্যা-ত্মিক অনুশীলন-পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে উন্মুখ হয়েছে।

অবশিষ্ট যা রইল তা আমার ব্যক্তিগত আশার ও আদর্শের কথা। ভারতবর্ষে এবং পাশ্চাত্যে যাদের দৃষ্টি ভবিষ্যতের মধ্যে কিছু গিয়ে পড়েছে--- তারা ধীরে ধীরে একে গ্রহণ করছে, অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্র অপেক্ষা এখানে বাধাবিঘ্ন অত্যন্ত বিপুল---কিন্তু বাধাবিঘ্ন হয়েছে জয় করবার জন্যে---ভগ-বৎ অনুজ্ঞা যদি থাকে, তবে এসব জয় করা হবেই। এখানেও এই বিব-র্ত্তন-ক্রমের আবির্ভাব-সম্ভাবনা যদি থাকে, তবে তা ঘটবে, অধ্যাত্মসত্তার ও আন্তর চেতনার পরিণতির ফলে; এবং এইজন্যেই সে-প্রেরণা আসতে পারে ভারতবর্ষ হতে---বাহিরের ক্ষেত্র থাকবে পৃথিবী জুড়ে, কিন্তু উৎস হবে ভারত।

ভারতের আজকার মুক্তিদিবসের মধ্যে আমি এই অর্থ দেখেছি---এ যোগাযোগ কত দরপ্রসারী বা কতশীঘ্র তা বাস্তবে পরিণত হবে তা নির্ভর করছে নতন ও মক্ত ভারতবর্ষের উপর।

১৫ই অগস্ট ১৯৪৭ .. .. (২)

১৫ই অগস্ট ১৯৪৭ তারিখটি স্বাধীন ভারতের জন্মদিন। ভারতে পুরাণো যুগ শেষ হয়ে গিয়ে শুরু হলো এক নতুন যুগ। কিন্তু স্বাধীন জাতি হয়ে এখন আমরা আমাদের জীবন ও কর্মের দ্বারা এই তারিখটিকে সমগ্র জগতের ভবিষ্যৎ মানব জীবনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তিরও নতুন যুগের সূচনাতে পরিণত করতে পারি।

১৫ই অগস্ট তারিখটি আমার নিজেরও জন্মদিন, সুতরাং এই তারিখই যে এমন একটা মহত্তম তাৎপর্য লাভ করল এ আমার কাছে খুবই আনন্দের। এমন একটি যোগাযোগকে আমি আকস্মিক মিল হওয়া বলে মনে করি না, কিন্তু যে কাজ নিয়ে আমার জীবন শুরু হয়েছিল এবং যাতে ভগবৎ শক্তি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে; সেই কাজই এইদিন থেকে সম্পূর্ণ সার্থকতার মুখে, একে আমি সেই শক্তিরই দেওয়া বিশেষ দান ও মঞ্জুরী বলে বিশ্বাস করি। আজকের দিনে আমি জগতের গতিবিধির দিকে চেয়ে দেখতে পাচ্ছি যে আমার যে সব ইচ্ছা আমার জীবদ্দশাতেই সফল হবে বলে আশা পোষণ করতাম, যা তখন বললে শোনাতো অবাস্তব স্বপ্নের মতো, এখন তার অধিকাংশই সফল হতে চলেছে। আমি মনে করি যে এর পর ঐরূপ সকল জাগতিক ব্যাপারেই ভারত অগ্রণী হয়ে তাতে প্রধান স্থান গ্রহণ করবে।

আমার সেই স্বপ্নগুলির মধ্যে প্রথম স্বপ্ন ছিল বিপ্লব আনা, যাতে ভারত হবে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ। ভারত স্বাধীন হলো বটে কিন্তু ঐক্যবদ্ধ নয়। একসময় আশংকা ছিল যে স্বাধীন হতে গিয়ে ভারত আবার ব্রিটিশ রাজত্বের আগেকার মতো নানা রাজ্যভেদে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। সৌভাগ্যক্রমে এখন দেখা যাচ্ছে যে সে বিপদ কেটে গিয়ে সম্পূর্ণ ঐক্য না হলেও একটা বৃহত্তর ও শক্তিশালী রকমের ঐক্য স্থাপিত হচ্ছে। তাছাড়া সংবিধান সভার নীতিগঠন থেকে বোঝা যাচ্ছে যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমস্যাটিও বিনা হাঙ্গামাতে হয়তো মিটে যাবে। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের পুরানো সাম্প্রদায়িক প্রভেদ এখনও আরো জোরদার হয়ে রইল, দেশ স্বতন্ত্র দুইটি রাজনৈতিক ভাগে বিভক্ত হওয়াতে। আশা করা যেতে পারে যে এই প্রভেদ চিরস্থায়ী না হয়ে কেবল এখনকার সাময়িক ব্যাপার রূপেই এর সমাপ্তি ঘটবে। কারণ এটা স্থায়ী হলে ভারত দুর্বল ও পঙ্গু হয়ে পড়তে পারে;

ঘটা সর্বদাই সম্ভব থাকবে, আর বিদেশীদের আক্রমণও সম্ভব হতে পারে। ভারতের আভ্যন্তরীণ উন্নতি ও সমৃদ্ধি তাতে বিঘ্নিত হবে, আন্তর্জাতিক মর্যাদা হ্রাস পাবে, ভবিষ্যৎ নিয়তির আশা ব্যর্থ হবে। এমন হতে দেওয়া চলে না; এই দেশবিভাগ ঘুচিয়ে দেওয়া চাই। আশা করব যে তা স্বাভাবিক নিয়মেই হয়ে যাবে, যখন দেখা যাবে যে শান্তি ও সঙ্গতির জন্য ও মিলিত কর্মধারার জন্য তারই প্রয়োজন, এবং তখন মিলে যাবার উপায়ও উদ্ভাবিত হবে। যেমন ভাবেই হোক শেষ পর্যন্ত ঐক্য স্থাপিত হবে——কেমন ক'রে হবে তা নিয়ে প্রায়োগিক প্রশ্নে মতভেদ থাকলেও সে প্রশ্ন অবান্তর। তবে যে প্রকারেই আসুক মিলন আসাই চাই, ঐক্য অবশ্যই স্থাপিত হওয়া চাই এবং নিশ্চয়ই তা হবে। কারণ ভারতের মহান ভবিষ্যতের জন্য তাই প্রয়োজন।

আরো এক স্বপ্ন ছিল সমগ্র এশিয়ার জনগণের পুনরভ্যুত্থান ও মুক্তি, যাতে এই মহাদেশ আবার ফিরে যেতে পারে মানব সভ্যতার উন্নতিকল্পে তার নিজস্ব অংশগ্রহণে। এশিয়া এখন জেগেছে; এর বড়ো বড়ো অংশগুলি এখন মুক্ত কিংবা মুক্ত হতে চলেছে; এখনও যারা পরাধীন বা আংশিক পরাধীন রয়েছে তারা মুক্তির জন্য নানারূপ সংগ্রাম করছে। এখন সামান্যই কিছু করা বাকী যা আজ কিংবা কাল হয়ে যাবে। তাতেও ভারতের কিছু অংশ রয়েছে এবং সে কাজ যে দক্ষতার সঙ্গে সে শুরু করেছে তাতেই প্রমাণ হয় যে সর্বজাতি সংঘে সে কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করবে।

আমার তৃতীয় স্বপ্ন ছিল একটা বিশ্ব-মিলন, যাতে সমগ্র মানবকুলের একটা সুন্দরতর ও উজ্জ্বলতর ও মহত্তর জীবনের ঐক্যযুক্ত বাহ্য ভিত্তি গড়ে উঠবে। মানব জগতের এইরূপ ঐক্যের পথ ক্রমশ প্রস্তুত হচ্ছে; যদিও তার জন্য একটা অপূর্ণ রকমের মিলনক্ষেত্র খাড়া করা হয়েছে, তথাপি তাকে এখনও বিস্তর বাধাবিপত্তির সম্মুখীণ হতে হচ্ছে। কিন্তু যখন ঐরূপ প্রচেষ্টার মধ্যে একটা বেগ এসে গেছে তখন তা আরো বেড়ে গিয়ে একদিন তার জয় হবে। এ ব্যাপারেও ভারত একরূপ প্রধান অংশ নিতে শুরু করেছে, এখন যদি তার রাজনীতির জ্ঞান কেবল সাম্প্রতিক সম্ভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে তাকে আরো কাছে আনতে সচেষ্ট হয়, তাহলে এবিষয়ের উন্নতি এমন বিলম্বিত না হয়ে আরো ত্বরান্বিত হতে পারে। হয়তো হঠাৎ কোনো দুর্যোগ এসে এ

কাজে বাধা দিতে বা যেটুকু কাজ হয়েছে তাকে নষ্টও ক'রে দিতে পারে, কিন্তু তবুও শেষ পরিণাম ভালোই হবে এবং তা ধ্রুব। কারণ মূলতঃ ঐক্যই প্রকৃতির প্রয়োজন, সেই দিকেই তার অবশ্যম্ভাবী গতি। সকল জাতিরও যে তাই কাম্য একথা সুস্পষ্ট, কারণ তা ছাড়া ছোটো ছোটো দেশেরা হঠাৎ বিপন্ন হতে পারে, আর শক্তিশালী বৃহৎ রাজ্যগুলির জীবনও নিরাপদ হয় না। সকলেরই ভালোর জন্য এমন বিশ্ব ঐক্য আসা দরকার, কেবল মানুষের সংকীর্ণ পঙ্গুতা ও মূঢ় স্বার্থপরতাই তার প্রতিবন্ধক হতে পারে; কিন্তু প্রকৃতির প্রয়োজনের বিরুদ্ধে ও ভগবৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেরূপ বিরোধিতা চিরদিন চলতে পারে না। কিন্তু এই ঐক্যের জন্য একটা বাহ্য ভিত্তিস্থাপন মাত্রই যথেষ্ট নয়; সকলকে নিয়ে একটা আন্তর্জাতিক কাঠামো ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হওয়া দরকার, এমন হওয়া চাই যাতে সকল মানুষের একটা আন্তর্জাতিক দৃষ্টি খুলে যাবে, একই ব্যক্তি দুই বা ততোধিক দেশকে আপন ক'রে অনায়াসে তার নাগরিক অধিকার অর্জন করতে পারবে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বেচ্ছায় ও সদ্ভাবে সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং মিশ্রণও চলবে। জাতীয়তাবাদের চরম পরিণতি হবে তার জঙ্গী প্রতিরক্ষার প্রয়োজনের দিকটা ঘুচে গিয়ে, বিভিন্ন জাতির নিজস্বতা বজায় রাখতে সামরিক আয়োজন রাখার প্রয়োজন হবে না। মানবজাতির অন্তরে এক নতুন একত্বের ভাব এসে পড়বে।

অন্য এক স্বপ্ন, ভারত জগৎকে দেবে তার বহুমূল্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অবদান, সে কাজও ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। ইউরোপ এবং আমেরিকাতে এখন ভারতের আধ্যাত্মিকতা বেশি মাত্রায় অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে। ক্রমশ তা আরো বাড়বে; বর্তমান সকল বিপর্যয়কে সহ্য ক'রে শেষ পর্যন্ত অনেকেরই দৃষ্টি আশাভরসা নিয়ে ভারতের দিকে ফিরেছে, কেবল এখানকার শিক্ষা-সংস্কৃতির দিকেই আকৃষ্ট হয়ে নয়, এখানকার আধ্যাত্মিক সাধনারও তারা অনুশীলন করছে।

শেষের স্বপ্নটি ছিল বিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের আরো এক ধাপ উপরে ওঠা, যাতে সে উচ্চতর ও বৃহত্তর চেতনা পেয়ে গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত যে সকল সমস্যার উত্তর সে খুঁজে পায়নি তার মীমাংসায় আসবে এবং ব্যক্তিগত পরিণতি ও সামাজিক সংহতির যে স্বপ্ন দেখেছিল তাও সফল হবে। এ যদিও এখনও ব্যক্তিগত প্রত্যাশা, কিন্তু ভারতে এবং পাশ্চাত্যেও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে এ ভাব জেগেছে। বাধা অবশ্য প্রচুর এবং সর্বা-

পেক্ষা বেশি, কিন্তু জয় করবার জন্যই বাধা আসে, পরাৎপরের ইচ্ছা হলেই সব ঘুচে যাবে। আর বিবর্তনের এই অগ্রগতির প্রথম প্রেরণা আসবে ভারতেরই দিক থেকে, কারণ আভ্যন্তরীণ চেতনার ও আত্মার ক্রমবিকাশের দ্বারাই তা আসতে পারে, এবং ভারতেই তার প্রথম সূচনা। সে ক্রিয়া যদিও বিশ্বকে নিয়ে, কিন্তু তার ক্রিয়ার কেন্দ্র এই ভারতেই।

ভারত মুক্তির এই দিনটিতে আমার এই কথাগুলি আমি রাখলাম; আমার সকল আশা সম্পূর্ণ সফল হবে কিনা বা কতদিনে তা হবে, তা নির্ভর করছে এই সদ্য বন্ধনমুক্ত ভারতেরই উপর।

বর্তমান রাজনীতি সমাজনীতি ও অর্থনীতি

রাজনৈতিক সামাজিক বা অর্থনীতির ক্ষেত্রে বর্তমান জগতের যে ভাবধারণা তার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ একমত নন। তিনি তার সমর্থনও করেন না বা বিরোধিতাও করেন না। পুঁজিবাদ কিংবা প্রাচীন সমাজবাদে যে ভবিষ্যৎ জগতের সমস্যা মিটবে তা তিনি মনে করেন না। অথচ স্বাধীন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলি যে সমাজকে পুঁজিবাদী করে তুলবে তাও নয়; সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে তা খাপ খাইয়ে চলতে পারে, তাতে সমাজব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ হবে না। ভারতের কংগ্রেস অর্থনীতি যে বাস্তবিক সমাজতান্ত্রিক কিনা অথবা তা একটা আবরণ মাত্র এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ ভিন্ন মত পোষণ করেন, কিন্তু বর্তমান অবস্থাতে তিনি নিজের মতামত প্রকাশ করতে চাননা।

১৫-৪-১৯৪৯

আমেরিকার প্রতি

১৫ই অগস্টের জন্মদিন উপলক্ষে আমাকে পাশ্চাত্যের উদ্দেশে কিছু বাণী দিতে বলা হয়েছে, কিন্তু আমার যা বলবার আছে তা প্রাচ্য দেশের পক্ষেও প্রযোজ্য। মানব পরিবারের এই দুই বিভাগের মধ্যে একটা বিভেদ করা হয়েছে এবং পরস্পরকে বিপরীত বলেও দেখানো হয়েছে; কিন্তু

আমার তরফ থেকে আমি এই বিভেদের পরিবর্তে দুই দিককে এক করেই দেখতে চাই। পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যের ভিতরকার মানব চরিত্র একই প্রকার, তাদের একই নিয়তি, বৃহত্তর পরিণতি লাভের জন্য একই রূপ আস্পৃহা, বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ ভাবে আরো উচ্চতায় উত্তরণের জন্য একই প্রচেষ্টা। কোনো কোনো চিন্তক মন বলে থাকে যে প্রাচ্য হলো আধ্যাত্মিক ও অলৌকিকবাদী, আর পাশ্চাত্ত্য হলো বস্তুবাদী। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যেও আধ্যাত্মিক সন্ধানীর সংখ্যা কম ছিল না যদিও প্রাচ্যের মতো এত বেশি নয়, আর প্রাচ্যেও বস্তুবাদ এবং বাস্তব সম্পদের উৎকর্ষ কম ছিল না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বরাবরই অল্পবিস্তর মিলিত হয়েছে এবং পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, আর বর্তমান কালে প্রকৃতি ও ভাগ্যচক্রের ফলে আরো বেশিরকম মেলামেশা করতে বাধ্য হচ্ছে।

দুই তরফের একটাই আশা থাকে, একটাই নিয়তি, তা হলো উভয়ত আধ্যাত্মিক ও বস্তুতান্ত্রিক, যার জন্য পরস্পরের সহযোগিতা নিতান্ত দরকার। এখন বিভেদের দিকে নয়, কিন্তু মিলনের দিকে ও একত্বের দিকেই আমাদের মনকে পরিচালিত করা দরকার, তবেই আমরা এক আদর্শে, এক লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব, এবং প্রথমে অন্ধ প্রকৃতির যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা জ্ঞানের আলোকে সার্থক হতে পারবে।

সেই আদর্শ ও লক্ষ্য আমাদের কি হবে? তা নির্ভর করছে আমাদের জীবনের প্রকৃত সত্য ও চরম বাস্তবতার উপর।

এইখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দুই রাস্তা ধরে দুই বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হয়েছে। প্রাচ্য ঝোঁক দিয়েছে আত্মার দিকে; আত্মার সত্যই পরমতম সত্য, আত্মাই জগতের সব কিছুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এবং জগৎকে উত্তীর্ণ হয়েও বিরাজিত, আত্মাই প্রকৃতিকে তার চরম লক্ষ্যের দিকে নিয়ে চলেছে চেতনার উত্তরোত্তর উন্মীলনের দ্বারা, এবং জগতের অস্তিত্বের তাই হলো একমাত্র অর্থ। প্রাচ্য বরাবরই আধ্যাত্মিক এই চরম সত্যের দিকে ঝোঁক দিয়েছে এবং এমন কথাও বলেছে যে জগৎ হলো মায়া, আত্মাই সত্য। আর পাশ্চাত্ত্য উত্তরোত্তর পার্থিব বিষয়ের দিকেই বেশি ঝোঁক দিয়েছে, মনের ও জীবনের উন্নতি ও জীবনের প্রশ্নগুলির উপর দখল স্থাপনাকেই জীবনের পরিপূর্ণতা বলে জ্ঞান করেছে। এমনকি এ কথাও বলেছে যে আত্মা বলে কিছু নেই, পার্থিব জড়ের উপর প্রভুত্ব করাই মানুষের চরম বিজয়। একদিকে আধ্যাত্মিক পরিণতিই হলো চরম লক্ষ্য, অন্যদিকে মানব মনের ও

পার্থিব জীবনের চরম উন্নতিই হলো ভবিষ্যতের একমাত্র স্বপ্ন। অবশ্য দুই কথাই সত্য, জগৎ প্রকৃতির মধ্যে আত্মার দুইই কাম্য; দুই সত্য পরস্পর-বিরোধী নয়; এখন এই বিভেদকে দূর করতে হবে, দুইই একত্রে হবে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্য।

পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান বিবর্তনতত্ত্বের আবিষ্কার ক'রে বলেছে যে জগতে ক্রমিক বিবর্তনই হলো জীবনের গুপ্তরহস্য; কিন্তু তাতে জাতিগত ও আকৃতিগত বিবর্তনের কথাই বলা হয়েছে, চেতনার বিবর্তনের কথা নয়। চেতনার অস্তিত্বকে বলা হয়েছে একটা দৈব ঘটনা। প্রাচ্যেও কোনো কোনো দর্শনে এবং শাস্ত্রাদিতে বিবর্তনের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তা জন্মজন্মান্তরের ভিতর দিয়ে আত্মার ক্রমিক পূর্ণতায় উত্তরণ। কিন্তু দেহাধারের মধ্যে যদি কোনো চেতন সত্তা থাকে, সে চেতনসত্তা কোনো অস্থায়ী জিনিস নয়; সেই ভিতরকার আত্মা নিজেকে পূর্ণতায় আনতে চায় এবং তা হতে পারে কেবল পৃথিবীতে পুনঃপুনঃ বিভিন্ন দেহে জন্মগ্রহণ ক'রে।

বিবর্তন প্রক্রিয়ার রীতি হলো প্রথমে অচেতন জড় থেকে ক্রমে অব-চেতন ও পরে চেতন জীবনে উন্নতি, প্রথমে পশুজীবন থেকে অবশেষে চিন্তাশীল চেতন মানবে পরিণতি, আজ পর্যন্ত প্রকৃতির বিবর্তনে তাই হয়েছে। এখন মনোবুদ্ধিযুক্ত মানবই প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, এবং এইখানে এসেই থেমেছে। কিন্তু বিবর্তনের গতিতে আরো অগ্রসর হতে পারা সম্ভব। মানুষের মন এখনও অপূর্ণ, তার চেতনা এখনও অজ্ঞান, তাকে উত্তীর্ণ হয়ে মানুষ তার নিজস্ব পরম সত্যে পৌঁছতে পারে। প্রকৃতি সে কথা জানে, সে মানুষকে তার মনের অজ্ঞানতা থেকে সত্য জ্ঞানে উত্তীর্ণ করে দিতে চায়। বেদে তেমন সত্য চেতনার কথা উক্ত আছে, যাকে আমি অতিমানস বলি, যা জ্ঞানসমৃদ্ধ তাকে জ্ঞান অর্জন করতে হয় না এবং তার জ্ঞানের কখনো অভাব হয় না। উপনিষদ বলেন যে মনোময় সত্তার পরেই আসবে সেইরূপ জ্ঞানময় সত্তা, আমাদের আত্মাকে সেইখানে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং তখন সে তার আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের পরমানন্দ লাভ করবে। প্রকৃতির বিবর্তনচক্র যদি অতঃপর সেই ধাপে উপস্থিত হয় তাহলে তার মূল উদ্দেশ্য সফল হবে এবং আমরা এই জীবনের মধ্যেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে এই দেহেতেই পূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করব এবং হয়তো দেহও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে। আমরা তখন এই পৃথিবীতে দিব্যজীবনের কথা বলব; আমাদের জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির স্বপ্ন সফল হবে, এবং বহু ধর্মে ও বহু সাধসন্তেরা পৃথিবীতে যে স্বর্গরাজ্যের

কথা বলেছেন তাও সার্থকরূপে সম্ভব হবে।

মানব আত্মার পরম-আত্মাতে উঠে যেতে পারাই তার সর্বোচ্চ লক্ষ্য ও সর্বোচ্চ প্রয়োজন, কারণ তাই হলো চরম বাস্তব; কিন্তু সেই পরমাত্মা জগতের মধ্যে নেমে এসে তার শক্তিতে বস্তুজগতের অস্তিত্বকে সার্থক ক'রে দিতেও পারে এবং তার একটা অর্থ হয়, তাতে জগৎসৃষ্টির রহস্যভেদ হয়। এই সর্বোচ্চ ও বৃহৎ আদর্শের দিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয়ে একত্রে প্রয়াস করতে পারে। আত্মা জড়ের মধ্যে নিবর্তিত, এবং জড় চায় তার প্রকৃত পরিচয় লাভ করতে, কারণ সেই পরম আত্মার বাস্তব রয়েছে সকল বস্তুতে লুক্কাইত। ১১-৮-১৯৪৯

মহাত্মার মৃত্যুতে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে বাণী

বর্তমানে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে আমার নীরব থাকাই উচিত ছিল। কারণ এ-অবস্থায় বাক্যের মূল্য খুবই কম। তথাপি এইটুকু বলতে পারি, যে-আলো আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে, যদিও ঐক্য আসেনি, তথাপি সে আলো শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই জাতির ও দেশের ভবিষ্যৎ নিয়তি মহা ঐক্যের মধ্যে। যে শক্তি এত কষ্ট দুঃখের ভিতর দিয়ে স্বাধীনতা এনেছে, সেই শক্তি আমাদের মহৎ নেতার শোচনীয় অকালমৃত্যু সত্ত্বেও তাঁর লক্ষ্যকে সফল করে দেবে। যেমন স্বাধীনতা সে এনে দিয়েছে তেমনি ঐক্যও এনে দেবে। মুক্ত ভারত এক হয়ে যাবে এবং ভারত মাতা তাঁর সন্তানদের একত্রিত ক'রে এই জাতিকে শক্তিতে ও গৌরবে সমৃদ্ধ ক'রে দেবেন। ৫-২-১৯৪৮

শ্রীঅরবিন্দের বাণী

[অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত "শ্রীকাট্টামাঞ্চি রামলিঙ্গ রেড্ডি জাতীয়-পুরস্কার" গ্রহণ উপলক্ষে]

আপনারা আমার কাছে একটি বাণী চেয়েছেন। আমি যাই লিখি না কেন—তাকে যদি বাণীই নাম দেওয়া যায়—তা যখন আপনাদের বিশ্ব-

বিদ্যালয়কে উদ্দেশ্য করে, তখন তার বিষয়বস্তু হওয়া উচিত আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে, তার লক্ষ্য, তার প্রকৃতি, তার করণীয় কর্ম্ম---এই নিয়ে। কিন্তু বর্ত্তমানের সঙ্কটলগ্নে যখন এমন সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে চলেছে, যা আমাদের দেশের শাসন-যন্ত্রেরই কেবল যে নূতন আকার এনে দেবে তা নয়, তাতে স্থির করে দেবে দেশের ভাগ্য, জাতীয় চরিত্রের উপকরণ ও গড়ন, অন্যান্য দেশের মধ্যে তার বিশেষ স্থান, নিজে কি হয়ে উঠতে চায় সে-দীক্ষা---তখন এসব দিকে দৃষ্টি না দিয়ে থাকা সম্ভব নয়। একটি সমস্যা দেশের সম্মুখে আজ উঠেছে যার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ একান্ত ঘনিষ্ঠ---সেবিষয়ে আমি এখন বলতে চাই, যত অসম্পূর্ণ ভাবেই হোক না---বিষয়টি হল ইংরাজের কৃত কৃত্রিম প্রদেশ-ভাগ পরিবর্ত্তে নূতন রকম একটা স্বাভাবিক দেশ-বিভাগের দাবী---নূতন অথচ ভারতের প্রাচীন সে পদ্ধতি, ঐক্যের মধ্যে নানাত্ব---তার উপর প্রতিষ্ঠিত। একদিকে হিমালয় আর একদিকে মহাসাগর, এই দুই সীমানার মাঝে আবদ্ধ ভারত এক বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ লোকের দেশ; তাদের গুণাবলি অন্যান্য লোকের গুণাবলি হতে স্পষ্টই পৃথক, পৃথক তার সংস্কৃতি, তার জীবন-ধারা, অন্তরাত্মার ধারা, ভিন্ন তার শিক্ষাদীক্ষা---তার শিল্পকলা তার সমাজ-সংগঠন। যাকিছু তার মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে তাকেই সে স্বাঙ্গীভূত করে নিয়েছে, সকলের উপর দিয়েছে ভারতীয় ছাপ, অতিবিভিন্নমুখী উপাদান সব ঢেলে মিলিয়ে ধরেছে তার মূল একত্বের মধ্যে। তবুও ভারত চিরকালই ছিল একটা বহুত্বের সমাহার---তাতে স্থান পেয়েছে বহুতর জন-সঙ্ঘ, বিভিন্ন ভূখণ্ড, কত রাজভুক্তি---প্রাচীনতর কালে, প্রজাভুক্তি পর্য্যন্ত---বহুতর গোষ্ঠী, উপজাতি,---প্রত্যেকের আপন আপন বৈশিষ্ট্য, প্রত্যেকেই প্রকাশ করে চলেছে পৃথক পৃথক শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা,---শিল্পকলা ও স্থাপত্যের বহুতর ধারা, কিন্তু সকলে মিলে কেমন গড়ে তুলেছে একটা সাধারণ ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতি।

ভারতের ইতিহাসে চিরকাল ফুটে উঠেছে একটা ধারা, একটা অবিরল চেষ্টা, এই সকল উপকরণ-বৈচিত্র্যকে একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় একত্বের মধ্যে গেঁথে তুলতে---যাতে ভারতবর্ষ সংস্কৃতি হিসাবে যেমন রাষ্ট্র হিসাবেও তেমনি এক হয়ে ওঠে। তবে মোসলেম জাতিদের উপপ্লাবন এখানে একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিল তাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ে এসে---সেখানেও তবু বরাবর চলেছিল সেই রাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রচেষ্টা, দুটি বিভিন্ন সংস্কৃতি ক্রমে মিলনের দিকে, পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে

চলেছিল। এমন কি দু-একটি দুঃসাধ্য-প্রয়াসও হয়েছিল যাতে আপাত-বিরোধী ধর্ম্মমত দুটি মিলিয়ে একটি অখণ্ড ধর্ম্মমত আবিষ্কার করা যায় বা গড়ে তোলা যায়। এ ক্ষেত্রেও একটি অপরটিকে প্রভাবান্বিত করেছিল। তথাপি ভারতের ইতিহাসে কখনও রাষ্ট্রীয় ঐক্য পূর্ণ সাধিত হয় নি—একাধিক হেতু ছিল তার। প্রথম আয়তনের বিশালতা, স্থান-স্থানান্তরে যোগা-যোগের অপ্রতুলতা—ফলে এই সব বিভিন্ন লোকসঙ্ঘের সম্মেলনে বাধা সৃষ্টি। দ্বিতীয়তঃ যে উপায় অবলম্বন করা হত—উপায় হল সামরিক শক্তির জোরে সমগ্র দেশের উপর একটি জাতির বা রাজবংশের আধিপত্য—তার ফলে হয়েছে সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, কোন সাম্রাজ্যই স্থায়ী হতে পারেনি। শেষতঃ, একটা দৃঢ় সংকল্পের অভাব যার লক্ষ্য এই সকল বিভিন্ন দেশখণ্ডকে দলে-পিষে এক অখণ্ড বস্তু ও রূপে ঢালাই করা। এর পরে এসে গেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য—সমস্ত দেশ নূতন করে ভেঙ্গে গড়ল, দেশের আভ্যন্তরীণ স্বাভাবিক সীমানা বৈচিত্র্যকে অমান্য করে, অথচ তাকে সম্পূর্ণ বিলোপ না করে, নিজের সুবিধার জন্য সৃষ্টি করলে কৃত্রিম প্রদেশ সব। ভারতবর্ষে বহু পূর্ব্ব হতেই তার বিবিধ মূল উপাদানকে ধরে গড়ে উঠেছিল একটা উপদেশরাজির স্বাভাবিক গোষ্ঠী সব—ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন সাহিত্য, ভিন্ন রীতিনীতি নিয়ে—যথাঃ দ্রাবিড়জাতি চতুষ্টয়, বঙ্গ, মহা-রাষ্ট্র, গুজরাত, পাঞ্জাব, আসাম, সিন্ধু, উড়িষ্যা, নেপাল, উত্তরাখণ্ডের হিন্দী-ভাষী, রাজপুতানা এবং বিহার। ব্রিটিশ রাজত্ব প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থায় এই সকল গোষ্ঠীকে একীভূত করে নি, তবে তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল সর্ব্বত্র এক অভিন্ন শাসন-ধারা, ইংরেজী ভাষার সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর আদান-প্রদানে অভ্যস্ত করে তুলেছিল আর তার শিক্ষাব্যবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিল ব্যাপকভাবে একটা যুযুৎসু দেশপ্রেম, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আর সে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ঐক্য। স্বাধীনতা লাভের পক্ষে যথেষ্ট একটা যুযুধান একত্ব গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হল বটে, কিন্তু স্বাধীনতা এসে গেলে দেখা গেল পূর্ণ একত্ব তাতে এনে দেয়নি—শুধু তা নয়, ভারতবর্ষকে যুক্তি করে খণ্ডিত করা হল, এই হেতু দিয়ে যে ভারত হল দুটি নেশন, হিন্দুস্থান আর পাকিস্থান—আর এ তত্ত্বের যে কি বিষময় ফল তা আমরা জানি।

ব্রিটিশের হাত থেকে শাসনভার গ্রহণ করতে গিয়ে, অনিবার্য্যভাবে আমাদের অনুসরণ করতে হল ন্যূনতম বিঘ্নের পথ। ব্রিটিশসৃষ্ট কৃত্রিম

প্রদেশ-বিভাগ স্বীকার করে চলতে হল---অন্ততঃ সাময়িকভাবে। কিন্তু এই সাময়িক ব্যবস্থা মোটের উপর যে স্থায়ী হয়ে উঠবার মুখে চলেছে, আশঙ্কা হতে পারে। তবে অনেকে এই স্থায়ী হওয়াটাকে লাভেরই বলে দেখেন। তাঁদের বিবেচনায়, এতে দেশের ঐক্য-সাধন সহজ হবে, অতীতে নিশ্ছিদ্র ঐক্যের একাকারের অন্তরায় ছিল যে বিভিন্ন উপদেশ সব তাদের বাঁচিয়ে রাখা আর প্রয়োজন হয় না। নির্দ্বন্দ্ব ঐক্যই তাঁদের মতে একমাত্র সত্যকার ঐক্য---অর্থাৎ এক অখণ্ড দেশ সর্ব্বত্র সমান অভিন্ন শাসন, ভাষণ, সাহিত্য সংস্কৃতি, শিল্পকলা, শিক্ষাদীক্ষা---সমস্ত পরিচালিত এক অদ্বিতীয় জাতীয় ভাষার সহায়ে। ভবিষ্যতে এ-ধরণের পরিকল্পনা কতদূর কার্য্যে পরিণত করা যেতে পারে, আগে হতে বলা যায় না; কিন্তু বর্ত্তমানে তা যে সম্ভব নয় তা স্পষ্ট দেখা যায়, আর ভারতের পক্ষে তা যে বাঞ্ছনীয় এও সন্দেহের বিষয়।

দেশের অন্তর্গত প্রাচীন এই নানাত্ব এক হিসাবে সুবিধার যেমন ছিল, অসুবিধারও তেমন ছিল। এ-সব পার্থক্য ছিল বলেই সেখানে জন্মেছিল বহুতর জীবনধারার, শিল্পের, সংস্কৃতির সজীব ও সক্রিয় কেন্দ্র সব, ঐক্যের মধ্যে একটা ঋদ্ধ-উজ্জ্বল-বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্য। কয়েকটি মাত্র প্রাদেশিক রাজধানীর মধ্যে অথবা সমগ্রের যে পাটরাজধানী তার মধ্যে সব কিছু আহরিত হয় নি---অন্যান্য নগর-নগরী বা দেশখণ্ড একান্ত অধীন হয়ে, বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত হয়ে, এমন কি শিক্ষাদীক্ষা হিসাবে সম্পূর্ণ নিদ্রাগ্রস্ত হয়ে পড়ে থাকে নি। বহুতর অঙ্গের ভিতর দিয়ে সমগ্র দেশ এক পরিপ্লুত জীবন যাপন করত---এতে সমগ্রের সৃষ্টিশক্তি অসামান্য বৃদ্ধি লাভ করেছিল। এই নানাত্ব যে ভারতের একত্বকে ব্যাহত বা ক্ষুণ্ণ করবে সে সম্ভাবনা আর নেই। যে বিস্তৃতির ব্যবধান লোক-সঙ্ঘের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও পূর্ণ আদান-প্রদানের অন্তরায় ছিল তা দূর হয়ে গিয়েছে,---বিজ্ঞানের কল্যাণে এবং চলাচলের ক্ষিপ্রতা হেতু তাতে আর পৃথক করে ধরে রাখতে পারে না। রাষ্ট্র-সমবায়ের আদর্শ এবং তাকে নির্দ্দোষভাবে কার্য্যকরী করবার জন্য একটা সর্ব্বাঙ্গীণ-ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তার পূর্ণ প্রয়োগও চলেছে। তাছাড়া দেশপ্রেমজনিত ঐক্যবোধ ভারতবাসীর মধ্যে এতখানি সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছে যে তাকে সহজে বিলোপ করা বা হ্রাস করা সম্ভব নয়। বরং যদি বিভিন্ন উপ-দেশগত জীবনধারার স্বাভাবিক ক্রিয়াকে অস্বীকার করা হয়, তবে তাতেই ঐক্যবোধের বিপদ হতে পারে, তাদের ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষাকে

তৃপ্ত করাতেই বিপদ কম। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে কংগ্রেস স্বয়ং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ভাষা অনুযায়ী প্রদেশ গঠন করবার--সে প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত করা, অবিলম্বে যদি সম্ভব না হয়, অন্ততঃ যথাসম্ভব শীঘ্র করাই সর্বাপেক্ষা সুবুদ্ধির কাজ। ভারতের জাতীয় জীবনের ভিত্তি তখন হবে তার স্বাভাবিক সামর্থ্যরাজি; "নানাত্বের মধ্যে ঐক্য" এই তত্ত্বের সঙ্গে তার নিত্যনৈমিত্তিক পরিচয় এবং এর প্রয়োগ হল তার সত্তার প্রকৃতির মূলধারা; "একের মধ্যে বহু"--এই সত্যই তাকে প্রতিষ্ঠিত করবে তার অটল ভিত্তির উপর, তার স্বভাব ও স্বধর্ম্মের উপর।

এই পরিণতিই যে ভবিষ্যতে ভারতের অনিবার্য্য ভাগ্য-ধারা, একথা বেশ বলা যেতে পারে। দ্রাবিড়-মণ্ডলের অধিবাসী সব তাদের স্বায়ত্তশাসনের স্বতন্ত্র অধিকার দাবি করছে। মহারাষ্ট্রীয়েরাও অনুরূপ অধিকারের প্রত্যাশা করে--তার অর্থ গুজরাতেরও তদনুরূপ পরিণতি। ফলে ব্রিটিশকৃত মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির লোপ। পুরাতন বাংলা-প্রেসিডেন্সি ইতিমধ্যেই খণ্ডিত হয়ে গিয়েছে এবং উড়িষ্যা, বিহার আর আসাম প্রদেশ হিসাবে এখন স্বায়ত্তশাসন লাভ করেছে। তারপর মধ্যপ্রদেশের আর যুক্তপ্রদেশের হিন্দীভাষীরা সম্মিলিত হলে এই পরিণতি সম্পূর্ণ হবে। খণ্ডিতভারত যুক্ত হলেও এই সাধারণ গতি-ধারায় কিছু ইতর-বিশেষ যদিও ঘটে তবু আসল পরিবর্ত্তন কিছু আসবে না। রাজন্যরাষ্ট্র সকলের এবং প্রদেশগত জাতি-সকলের সম্মেলনই হবে ভারতীয় একত্বের রূপ।

এই নূতন ব্যবস্থায় আপনাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়েরও থাকবে নিজস্ব কর্ম্ম ও সার্থকতা। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি যেভাবে হয়েছে আপনাদের সে-ভাবে হয়নি। বিদেশী শাসকের উদ্যোগে, তাদের আপন শিক্ষাদীক্ষা ভারতে প্রচলন করবার উপায় হিসাবে তাদের গড়া হয়েছিল; তাদের স্থাপন করা হয়েছিল প্রাদেশিক রাজধানীতে, তাদের প্রধান কাজ ছিল পঠন-পাঠন এবং পরীক্ষা গ্রহণ, গ্রন্থগত বিদ্যার মধ্যেই তাদের লক্ষ্য ছিল একান্ত আবদ্ধ। কাশী এবং আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য অন্যভাবে স্থাপিত হয়েছিল--তবে উভয়ে হল সর্ব্বভারতীয় আয়তন, দেশের প্রধান দুটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সেবায় নিযুক্ত তারা। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু সৃষ্ট হয়েছে স্বজাতিভক্ত অন্ধ্রবাসীদের উদ্যোগে এবং তা প্রতিষ্ঠিত কোন রাজধানীতে নয় কিন্তু অন্ধ্রমণ্ডলের একটি সহরে; তার উদ্দেশ্যই হল এই দেশখণ্ডের অধিবাসীদের সেবা। এক সবল সমর্থ কর্ম্মিষ্ঠ জাতির জন্মভূমি অন্ধ্রদেশ। অতীতে

ভারতের রাষ্ট্র-জীবনে সে জাতির মহৎ অবদান, মহৎ তার কীর্ত্তি শিল্প-কলায়, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, সঙ্গীতে। অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করে জাগে তার কত সাম্রাজ্য-স্মৃতি, ভারতের বৃহত্তর খণ্ড অধিকার করে উঠেছিল যে সব সাম্রাজ্য-পরম্পরা সেখানে তার কি বিশিষ্ট স্থান, জাগে অপেক্ষাকৃত আধুনিক—শেষ হিন্দুসাম্রাজ্য বিজয়নগরের মহিমার স্মৃতি। এ ইতিহাস যে-কোন জাতির পক্ষে মহাগৌরবের। আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যা ও জ্ঞানের, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে তার সমুচ্চ আসন গ্রহণ করতে পারবে অন্ধ্র-তরুণদের এমনভাবে শিক্ষা দিয়ে তৈরী করতে পারে যাতে তারা তাদের পূর্ব্বপুরুষদের যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়ে উঠবে। মহান্ অতীত নিয়ে যায় যেন মহান্ ভবিষ্যতের, এমন কি, মহত্তর ভবিষ্যতের দিকে। জড়-বিজ্ঞান শুধু নয়, চারুশিল্পও, পুস্তক-গত বিদ্যা ও তথ্য আহরণ নয়, পরন্তু চরিত্র ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ-সাধন, এই হল সত্যকার শিক্ষার অঙ্গ। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাহায্য করা যাতে সে তার গুণ সব অনুশীলন করতে পারে, এমন সাহায্যদান যাতে ভবিষ্যতের জন্য তৈরী হয় চিন্তাশীল সৃষ্টি-ক্ষম, দৃষ্টিবান, কর্ম্মকুশল মানুষ সব—এও তার কাজের অন্তর্ভুক্ত। তা-ছাড়া, দেখতে হবে আবার আপন মণ্ডল-গত জীবনধারা যেন একান্ত নিজে-রই মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে না থাকে; নিজের প্রদেশের তরুণদের অনুরূপ অন্য প্রদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে; পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান হবে একদিকে যেমন শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অন্যদিকে তেমনি আবার মনের ও অধ্যাত্মের ক্ষেত্রেও। অধিকন্তু আবার শিক্ষা করতে হবে কেবল অন্ধ্র-খণ্ডের নয়, অখণ্ড ভারতের নাগরিক হয়ে উঠতে—সমগ্র দেশের জীবনই তাদের জীবন। একটি গুণী-মণ্ডলী গঠন করতে হবে, যাদের থাকবে সমগ্র দেশগত ব্যাপারের সমস্যা-রাজির যথাযথ জ্ঞান, যারা সমগ্রের নানা শাসন পরিষদে, যাবতীয় ক্রিয়া-কর্ম্মে, যেখানে প্রয়োজন জনসাধারণের সহায় ও সহযোগ সে-সব ক্ষেত্রে, অন্ধ্রের প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়াতে পারে। এছাড়াও আরো একটা বৃহত্তর ক্ষেত্র যেখানে ভারতের প্রয়োজন হবে তার সকল প্রান্ত থেকে এমন সব ব্যক্তির সেবা যারা যোগ্যতায় ও চরিত্রগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—আমি বলছি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের কথা। ভারত ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে বিশেষ এক আন্তর্জাতিক পদবী, তার মর্য্যাদা ক্রমে বৃদ্ধি পাবে যত দিন যাবে; এমন কি সময়ে তার আসন হবে প্রধানতম, রাষ্ট্রকুলের মধ্যে যাদের বাক্য হবে বলবত্তম, যাদের

দেশ ও কর্ম্মধারা জগতের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করবে। এসব জিনিষেরই জন্যে ভারতের প্রয়োজন এমন মানুষ যাদের স্বাভাবিক গুণ, প্রতিভা চরিত্র-বল যেমন তেমনি শিক্ষাসাধনাও হবে শ্রেষ্ঠ পর্য্যায়ের। এসব ক্ষেত্রেই আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা হতে পারে পরমোৎকৃষ্ট এবং তার কর্ম্ম হতে পারে অপরিসীম প্রয়োজনের।

এই মুহূর্ত্তে, স্বাধীনতার দ্বিতীয় বৎসরে দেশকে সজাগ হতে হবে আরো অনেক আরো গুরুতর সব সমস্যা সম্বন্ধে—তার সম্মুখে যত বৃহৎ সম্ভাবনা সব উন্মুক্ত হয়ে চলেছে তাদের সম্বন্ধে, আর সেই সব বাধা-বিপদ সম্বন্ধেও যা বাস্তবিকই অতিভীষণ আকার গ্রহণ করতে পারে যদি বুদ্ধিমানের মত তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা না যায়। মহাযুদ্ধ রেখে গিয়েছে একটা জগৎ-ব্যাপী বিশৃঙ্খলা—বিপদে, দুঃখকষ্টে, অভাবে পরিপূর্ণ তা, ক্রমেই তা চলেছে যেন নূতন এক প্রলয়ের দিকে। উদ্ধারের একমাত্র পথ সকল জাতির সমবেত চেষ্টা, সানফ্রান্সিস্কোতে যে বিশ্বমণ্ডলীর পরিকল্পনা হয়েছিল সেই ধরণের চেষ্টাই হল সত্যকার পথ—কার্য্যতঃ তা এ যাবৎ তেমন সাফল্য-লাভ করেনি বটে, তবুও সে চেষ্টা করে চলতেই হবে। নূতন রকমের কৌশল আবিষ্কার করতেই হবে যাতে অতীতের ও বর্ত্তমানের বিপদসঙ্কুল ভেদদ্বন্দ্ব থেকে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ জগৎ-ব্যবস্থায় উত্তরণের যে কঠিন পথ তা সহজ হয়ে আসে—তা না হলে নিত্য দুর্য্যোগ ও শেষ বিনষ্টি হতে নিস্তার নেই। ভারতের নিজের জন্যও রয়েছে গভীরতম সমস্যা সব—কারণ প্রলোভনের বশে এমন সব দিকে সে চলতে পারে যাতে ভারত অন্যান্য নেশনের মতই একটা নেশন হয়ে উঠতে পারে বটে, সমৃদ্ধ শিল্প-বাণিজ্য, শক্তিশালী সুসংহত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, বিপুল সামরিক বল গড়ে তুলতে পারে, ছল-বলের রাজনীতি-খেলায় বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারে, আপনার লাভ ও স্বার্থসমূহ সোৎসাহে রক্ষা ক'রে, প্রসারিত ক'রে চলতে পারে, এমনকি পৃথিবীর এক বৃহৎ খণ্ডই আপনার আধিপত্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারে—কিন্তু এই আপাত-প্রতীয়মান মহা উন্নতির মধ্যেই তার স্বধর্ম্ম হতে সে বঞ্চিত হতে পারে, হারিয়ে বসতে পারে তার আত্মাকে। তা হলে এই প্রাচীন ভারত, তার অধ্যাত্মসত্তা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে, তখন অপরাপর নেশনের মত আর একটি নেশন দেখা দেবে শুধু, আর তাতে লাভ আমাদেরও কিছু নেই জগতেরও কিছু নেই। অবশ্য প্রশ্ন হতে পারে অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ পথে চলেও হয়ত তার

পক্ষে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠা সম্ভব--তবে এ পথেও তার স্তূপীকৃত সুরক্ষিত অধ্যাত্ম-উপলব্ধি ও জ্ঞানরাশি সম্পূর্ণরূপেই যে হারাতে পারে না তা নয়। কি করুণ পরিহাসের লীলা হবে, ভারত যদি তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে বিসর্জ্জন দিয়ে বসে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে যখন পৃথিবীর অন্যান্য অংশ তারই দিকে ক্রমে ফিরছে আধ্যাত্মিক সাহায্যের জন্য, মুক্তিপ্রদ আলোর জন্য। এ রকম আমরা হতে দেব না, হবেও না--কিন্তু বিপদ যে নেই তা বলা চলে না। ফলত দেশের সম্মুখে আরো কঠোর সমস্যা সব রয়েছে--বা অনতিলম্বে সম্মুখে এসে উপস্থিত হবে। অন্তিমে আমাদের জয় হবেই, সন্দেহ নেই--কিন্তু তাই বলে এই সত্যটিকে আড়াল করে রাখলে চলবেনা যে সুদীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতার ফলে আমাদের এসেছে একটা সঙ্কীর্ণতা ও বৈকল্য, সুতরাং আমাদের প্রয়োজন বিশেষ একটা আন্তর ও বাহ্য মুক্তি ও পরিবর্ত্তন, একটা বৃহৎ আন্তর ও বাহ্য উন্নতি--যদি আমরা সার্থক করে তুলতে চাই ভারতের সত্যকার নিয়তি।

১১-১২-১৯৪৮

নবম বিভাগ

শ্রীঅরবিন্দের আগেকার চিঠি

শ্রীঅরবিন্দের আগেকার চিঠি

পণ্ডিচেরীতে থাকা-কালীন প্রথম যুগের সাধনা

আমার এমন একটি নিভৃত স্থান চাই যেখানে নির্বিঘ্নে আমার যোগ সম্পূর্ণ করতে পারি এবং আমার কাছে অবস্থিত অন্যান্য আত্মাদের তৈরি ক'রে নিতে পারি। আমি বোধ করি যে আমাদের উপরে যাঁরা আছেন তাঁরা এই পণ্ডিচেরি আমার জন্য নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন, কিন্তু তুমি জানো যে উদ্দিষ্ট জিনিসকে বাস্তবের স্তরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে আনতে কতখানি প্রয়াসের দরকার...

অধ্যাত্ম বস্তুকে বাস্তবের স্তরে নামিয়ে আনতে যে শক্তির প্রয়োজন তা আমি আয়ত্তে আনতে পারছি, আর এখন আমি অন্যেদের মধ্যে নিজেকে প্রয়োগ ক'রে তাদের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদের অন্ধকার ঘুচিয়ে আলো দিয়ে নতুন হৃদয় ও নতুন মন এনে দিতে পারি। যারা আমার কাছে আছে তাদের বেলাতে ঐ জিনিস তাড়াতাড়ি এবং সম্পূর্ণভাবেই করতে পারি কিন্তু যারা শত শত মাইল দূরে আছে তাদের বেলাতেও পেরেছি। আর সেই-রকম শক্তিও আমাকে দেওয়া হয়েছে যার দ্বারা লোকের হৃদয় ও স্বভাবের কথা ও এমন কি চিন্তার কথাও আমি জানতে পারি, কিন্তু সে শক্তি এখনও পুরোপুরি আসেনি আর আমি সকল ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করতে পারি না। কেবলই ইচ্ছার জোরে কর্মনিয়ন্ত্রণ করবার শক্তিও আমার আসছে, কিন্তু এখনও ততটা নয়। আর অন্য জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এখনও কিছু কঠিন, কিন্তু বৃহৎ শক্তিদের সঙ্গে নিশ্চয় একটা যোগ স্থাপিত হয়েছে। তবে এসব বিষয়ে পরে আরো জানাবো যখন এ পথের বাধাগুলো আরো সাফ হয়ে যাবে।

যে কথা স্পষ্টই জানছি তা এই যে আমার যোগের মূল উদ্দেশ্য হলো সকল রকমের ভ্রান্তি ও অসাফল্যকে তার গোড়া থেকে ঘুচিয়ে দেওয়া, যাতে ভ্রান্তি ঘুচে গিয়ে আমি যে সত্যকে আনছি তাকে লোকে পূর্ণভাবে নিতে পারবে, আর অসাফল্য ঘুচে গিয়ে জগতের পরিবর্তন আনবার যে

কাজে আমি সহায়তা করবো তা সম্পূর্ণরূপ জয়যুক্ত ও অনিবার্য হবে। এরই কারণে আমাকে এত দীর্ঘ তপস্যার ভিতর দিয়ে যেতে হচ্ছে, এবং আমার যোগের আরো উৎকৃষ্ট ও উজ্জ্বলতর সাফল্য আসতে বিলম্ব হচ্ছে। তবে আমি ওর ভিত্তিস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি, যদিও তা ছিল খুবই কঠোর ও কষ্টদায়ক। এখন তার পাকা ভিত্তির উপরে সবে দেয়াল গাঁথা শুরু হয়েছে।

১২-৭-১৯১১

×

আমার যোগ বেশ দ্রুতগতিতেই অগ্রসর হচ্ছে কিন্তু তার ফলের কথা এখন তোমাকে জানাতে চাই না—যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এখনকার পরীক্ষা-গুলিতে এমন নির্বিবাদ সাফল্য না আসে যাতে আমার প্রবর্তিত এই যোগের তত্ত্বকে সুনিশ্চিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারি, এবং যা শুধু আমার বেলাতেই নয় কিন্তু আমার কাছে অবস্থিত তরুণ সাধকদের মধ্যেও দেখছি আশ্চর্য সাফল্য আনছে...যদি সব কিছু নির্বিঘ্নে চলে তাহলে এক মাসের মধ্যেই নিশ্চিত ফল মিলবে।

২০-৯-১৯১১

×

সাধনায় অগ্রগতির পথে যে সব অন্তরায় তোমার সামনে আসছে, তা সকলেরই সামনে আসে। এই যোগে, অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, সব সময়ই, ঘটে সাধারণ মনোবৃত্তিতে প্রত্যাগমন, যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত সত্তার এমন আমূল পরিবর্তন আসে, যে তা নিজস্ব চেতনার কোনও নিম্নমুখী গতিতে, বা বাইরের পৃথিবীর ঝড় ঝাপটায়, বা যোগের পথে যাদের সঙ্গে নিগূঢ় সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাদের মানসিক অবস্থার দ্বারা, ব্যাহত না হয়। সাধারণ কোনো একটি মাত্রই উদ্দেশ্য থাকে, সেইজন্য সেখানে এরকম পশ্চাদপসরণ অতো ঘটে না। আমাদের যোগ এতো বহুমুখী ও জটিল, ও এর উদ্দেশ্য এত সুদূর-প্রসারী, যে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা পথের শেষ সীমানার কাছে পৌছুই, ততক্ষণ পর্যন্ত সহজভাবে অগ্রসর হওয়া যায় না—বিশেষতঃ যখন

আধ্যাত্মিক জগতের সব কটি বিরুদ্ধ শক্তি সব সময়ই আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করছে। আমাদের মধ্যে যদি একজনও সম্পূর্ণভাবে জয়ী হয়, তাদের সর্বসাধারণের পতন ঘটবে। বস্তুতঃ আমাদের একার শক্তিতে বিজয়ী হবার কোনও আশা আমাদের নেই। আমরা যেমন যেমন সর্বোত্তমের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারব, ঠিক তেমন তেমন ভাবে এইসব অন্তরায়কে দূর করতে পারব। আমার নিজের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে এতোবার আমার নিশ্চিত স্তর থেকে ফিরে আসতে হয়েছে যে, কেবলমাত্র আপেক্ষিক ভাবে বলতে পারি আমার যোগের কোনও অংশ সম্বন্ধে যে "আমি পেয়েছি"। এসত্ত্বেও আমি দেখেছি যে যখনই আমি এরকম নিম্নমুখী অবস্থা থেকে উদ্ধার পেয়েছি, তখনই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে একটা নতুন কিছু পেয়েছি, যা আমি পেতাম না যদি আমার আগেকার অবস্থায় নিশ্চিতভাবে বসে থাকতাম। বিশেষতঃ আমার অগ্রসর হবার মানচিত্র আমি এমনভাবে এঁকে রেখেছি, যে প্রতি ধাপে আমি কতোটা অগ্রসর হলাম তা আমি ঠিক বুঝতে পারি, আর যা কিছু লোকসান হয়েছে তা পুষিয়ে যায় সাধারণ অগ্রগতি সম্বন্ধে স্থির ধারণার দ্বারা। শেষ লক্ষ্য এখনও দূরে, কিন্তু এতো বিরোধিতা সত্ত্বেও যতোটা অগ্রসর হয়েছি তা থেকে নিশ্চিতভাবে অনুমান করতে পারি যে শেষ পর্যন্ত পৌছবই। কিন্তু কতোটা সময় লাগবে সেটা বলা আমাদের হাতে নেই। সেইজন্য অধৈর্য্য বা বিরক্তিকে দূরে সরিয়ে রেখেছি।

মনের ও অন্তরের পরিপূর্ণ সমতা, সত্তার সমস্ত অংশে পবিত্রতা ও অবিচল শক্তি—এরই উপর জোর দিয়েছে যে শক্তি আমার ভিতর করছে, তা। যখনই এ দুটি অপরিহার্য জিনিস ব্যাহত হয়েছে, তখনই সেই শক্তি বারবার তা মেরামত করতে লেগেছে, যেমন ভাবে শিল্পী করে তার সৃষ্টির ত্রুটি সংশোধন। আমার মনে হয় এ দুটিই যা কিছু গড়া যাবে তার ভিত্তিস্বরূপ। এই দুটি যতোই সম্পূর্ণ ও দৃঢ় হবে, ততোই—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই দৃষ্টি খুলে যাবে। তারই উপর স্থাপিত হবে ভগবানের সঙ্গে একত্ব বোধ, ও সেই বোধের ফলস্বরূপ আনন্দ। আমাদের প্রকৃতি এটা কিছুতেই মানতে চায় না। বিভেদ, দ্বৈতবোধ, দুঃখ, মনোবৃত্তিতে ও কাজে অসন্তোষ প্রভৃতি, আমাদের প্রকৃতি বিশেষতঃ প্রাণসত্ত্বা বা স্থূল সত্ত্বা, আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, এবং সেইজন্য দিব্যচেতনার অসীমত্ব, আনন্দ, সমতা গ্রহণ করতে পারে না। এরাই মনকে আনন্দময়, শান্ত, ঐক্যের অবস্থা থেকে নামিয়ে আনে। আমার মনে হয় সেইজন্যই ধর্ম বা দর্শন-শাস্ত্র জীবনকে

বা স্থূল জগৎকে প্রত্যাহার করতে চায়, জয় করতে চায় না। কিন্তু জয়লাভ আমাদের করতেই হবে—যে সব বৃত্তি বিরোধিতা করছে তাদের রূপান্তর ঘটাতে হবে, ছেঁটে বাদ দেওয়া চলবে না।

যখন এই একত্ব-বোধ অবিচলভাবে স্থাপিত হবে, তখন আমাদের কাজের স্থিতিশীল অংশ সম্পূর্ণ হবে, কিন্তু কার্যকরী অংশ তখনও বলবৎ থাকে। তখনই সেই একের মধ্যে দেখতে হবে আমাদের প্রভুকে ও তাঁর শক্তিকে—কৃষ্ণ ও কালীকে। যে শক্তি আমাকে সমগ্রভাবে গ্রাস ও পরিচালিত করছে তাই হলো কালী—আমার প্রভু সেই শক্তিকে তাঁর নিজের উদ্দেশ্যে, আমার জন্য নয়, চালিত করছেন, উপভোগ করছেন—আমার সত্তা তাতে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে যাচ্ছে, কৃষ্ণ ও কালী ছাড়া আর কিছুই থাকছে না। শত বাধা, বিপত্তি সত্ত্বেও আমি এই অবস্থায় পৌঁছেছি যদিও অসম্পূর্ণভাবে। যখন এটা সম্পূর্ণভাবে স্থিতি পাবে, তখন আমরা আশা করতে পারব আমাদের মধ্যে তাঁর জ্ঞানের লীলা। বাদবাকী হবে তাঁর লীলার স্ফুরণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে, এবং জড় পদার্থ, শরীর ও স্থূল জগৎকে স্বীকার করে নিতে হবে সেই সতের প্রভুত্ব। অধীর হয়ে, অন্ধভাবে আগে আমি এই সব উপলব্ধির দিকে ছুটেছিলাম মনের বা অন্তরের সমতা ও সমস্ত অংশের পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে—যদিও তারও দরকার ছিল। এখন আমি চোখ মেলে রয়েছি সুদূরে স্থিত আমার সেই লক্ষ্যের দিকে।

অতিমানসের আলো ও শক্তিকে অধিকার করাই এখন উদ্দেশ্য। কিন্তু মন বা চিন্তা-শক্তির পরানো অভ্যাসগুলি এখনও লড়ছে—তার ফলে অগ্রসর হওয়ার পথে বাধা আসছে, এবং যেটুকু অগ্রসর হচ্ছি তা থেকে পেছুতেই হচ্ছে। আমার ভিতরে তাদের অবস্থান নেই—কিন্তু অন্ধ, নির্বোধ যান্ত্রিক, দেখেও বোঝে না, সেই সব অভ্যাস, যখনই আমার মন অতিমানসের আলো বা নির্দ্দেশের পথে চলতে চাইছে, তখনই তার চারধারে ভিড় করে আসে, যাতে অতিমানসের জ্ঞান বা শক্তি বিকৃতভাবে প্রবেশ করতে পারে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা—এদের আক্রমণের তেজ কমবেই এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাহত হবেই।

২৬-৬-১৯১৬

মাকে লেখা চিঠি

অবশ্য সবই হয় ভালোর জন্য। কিন্তু বাহ্য বিষয়ে কখনো কখনো হয় মন্দের ভালো...

সারা পৃথিবী এখন এক আইনের বশে চলেছে এবং একই রকমের স্পন্দনে সাড়া দিচ্ছে, আর আমি এমন কোনো স্থান খুঁজে পাবার বিষয়ে সন্দিগ্ধ হচ্ছি যেখানে ঐ সংঘর্ষ হতে আমরা নিষ্কৃতি পেতে পারব। তবে জগৎ সম্পর্ক পরিহার ক'রে তফাতে থাকাই আমার নিয়তি বলে মনে হয় না। জগতের সঙ্গে সংস্পর্শ আমাকে রাখতেই হবে, যতদিন পর্যন্ত আমি বিরুদ্ধ অবস্থাকে জয় করতে বা পরাজিত হতে না পারছি কিংবা অধ্যাত্মের সঙ্গে বাস্তবের সংগ্রামে সার্থক না হচ্ছি, যা করতেই আমি আছি। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই আমি বরাবর দেখে থাকি। আর ব্যর্থতা ও বিঘ্ন ও অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে এই কথা যে ওতে আমি এত বেশি অভ্যস্ত যে তা নিত্য ঘটলেও আমাকে আর বিচলিত করে না, কেবল সাময়িক মুহূর্তটি ছাড়া...

যখন বিশ্বময় বিলম্বিত চলেছে তখন তাতে নিরুৎসাহ না হয়ে অবিচল থাকতে হলে চাই শান্ত হৃদয়, সুস্থির ইচ্ছাশক্তি ও আত্মত্যাগ। আমার নিজের কথা এই যে আমি উপরকার নির্দেশবাণী শুনেই চলি, ডাইনেও চাই না বাঁয়েও চেয়ে দেখি না। যা কিছু ফল তাও আমার নয় আর এখন-কার এই প্রয়াসও আমার নয়।

৬-৫-১৯১৫

স্বর্গকে আমরা অধিকার করেছি কিন্তু পৃথিবীকে নয়; কিন্তু যোগের সম্পূর্ণতা ঘটলে তাই হবে যেমন বেদের কথনে আছে "স্বর্গ ও মর্ত সমান ও অভিন্ন"।

২০-৫-১৯১৫

ভিতরকার সব কিছুই পেকেছে বা পাক ধরে আসছে। কিন্তু একটা

অবিচ্ছেদ সংগ্রাম চলেছে যাতে কোনো দিকই তেমন অগ্রগতি করতে পারছে না (ইউরোপের ট্রেঞ্চ যুদ্ধের মতো), আধ্যাত্মিক শক্তি জোর করছে বাস্তব জগতের প্রতিরোধের বিরুদ্ধে, আর সেই প্রতিরোধ এক ইঞ্চিও না হটে বিপরীত আক্রমণ করছে...এর মধ্যে যদি আনন্দ জিনিসটি না থাকতো তাহলে ব্যাপারটা খুবই বিরক্তিজনক ও কষ্টকর হতো ; কিন্তু জ্ঞানের চক্ষু দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন, সে দেখে যে এ কেবল দীর্ঘমেয়াদী কাজ।

২৮-৭-১৯১৫

×

অনড় অবস্থা কিছুতেই যেন কাটছে না, আমাদের বাইরে যা ঘটছে তা কেবল একটা অন্ধকার ঘোর বিশৃঙ্খলা, যার ভিতর থেকে আলোকিত কোনো কিছুই বেরিয়ে আসতে পারে না। জগতের এ এক বিশেষ বিপর্যয়ের অবস্থা, তার উপর উপর ভাবে রয়েছে পুরানো জগতের সব কিছু জিনিস অটুট ও অনড় হয়ে। কিন্তু এ বিপর্যয় কি শেষে ধ্বংস আনবে অথবা শীঘ্রই কোনো নতুনের জন্ম দেবে? দিনের পর দিন তারই জন্য সংগ্রাম চলছে, এখনও কোনো মীমাংসা আসেনি।

১৬-৯-১৯১৫

×

তুমি যে অনুভূতির বর্ণনা দিয়েছ তা হলো খাঁটী বৈদিক জিনিস, এখনকার কোনো যোগ পদ্ধতি যাকে সহজে বুঝবে না, যদিও তারা যৌগিক অনুভূতির কথা বলে। বেদে ও পুরাণে যে "পৃথ্বী"র সঙ্গে ভগবৎ বস্তুর মিলনের কথা বলেছে, সে পৃথ্বী আমাদের এই জড় পৃথিবীর উপরকার জিনিস, অর্থাৎ সেই হলো আসল সত্তা ও চেতনা যার প্রতিরূপ মাত্র হলো এই জগৎ ও তার দেহ। কিন্তু বর্তমান যোগগুলি ভগবানের সঙ্গে সেই পৃথিবীর এমন বাস্তব মিলনকে মানতেই চাইবে না।

৩১-১২-১৯৩৫

রাজনীতিতে ফেরা

পণ্ডিচেরী
৫ জানুয়ারি ১৯২০

প্রিয় ব্যাপ্‌টিস্টা,

তুমি যে প্রস্তাব করেছ তা লোভনীয় হলেও দুঃখের বিষয় আমি ওতে সায় দিতে পারি না। তার কারণ তোমাকে বলা দরকার। প্রথমত আমি এখন ব্রিটিশ ভারতে ফিরে যেতে প্রস্তুত নই। বাংলা গভর্ণমেন্ট সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমার ফিরে যাওয়ার বিরুদ্ধ ছিল, এখন যদি আমি যাই তাহলে কোনো একটা জুতসই রকমের আইনের বলে আমাকে আটক ক'রে রাখবে এবং বলবে যে তাতে নতুন যুগের উপকার হবে। অন্য কোনো প্রদেশও হয়তো আমার যাওয়াতে খুশি হবে না। সম্প্রতি রাজার যে ঘোষণা তা অনুকূল হলেও সবই নির্ভর করে ভাইসরয়ের মর্জির উপর। আপাতত আমার হাতে অনেক কাজ নিয়েছি, এখন আমি সরকারী অতিথি হয়ে আবদ্ধ থেকে সময় নষ্ট করতে রাজী নই। যদিও সরকার আমাকে মুক্ত করে রাখে তথাপি এখন যাওয়া চলে না। পণ্ডিচেরীতে এসেছিলাম একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে স্বাধীনভাবে নিরিবিলিতে থাকবার জন্য, তার সঙ্গে বর্তমান রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে আসার পর থেকে রাজ-নীতিতে কোনো প্রত্যক্ষ অংশ নিইনি। দেশের জন্য আমার যা করবার ছিল তা আমি করেছি, সে কাজ সফল না হওয়া পর্যন্ত আর ওতে অংশ নেওয়া সম্ভব নয়। ব্রিটিশ রাজ্যে ফিরে গেলেই আবার আমাকে বিবিধ রকম তৎপরতায় জড়িয়ে পড়তে হবে। পণ্ডিচেরী এখন আমার নিরাপদ আশ্রয়, আমার তপস্যার গুহা, আমার নিজের আবিষ্কারমত, সন্ন্যাসীদের মতো নয়। এখানকার কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমি ফিরতে পারি না।

অতঃপর কাজ সম্বন্ধে। রাজনীতিকে আমি হেয় মনে করি না কিংবা আমি তার উপরে চলে গেছি তাও মনে করি না। আগে তা জোরের সঙ্গেই করেছি কিন্তু এখন আধ্যাত্মিক জীবনের উপরেই জোর দিচ্ছি, যদিও আমার আধ্যাত্মিকতা সন্ন্যাসীদের মতো সংসারত্যাগী বা সংসারবিমুখ নয়। আমার কাছে মনুষ্যজীবনের সব কিছুই পূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবনের অন্তর্ভুক্ত, রাজ-

নীতিও তার মধ্যে। কিন্তু বর্তমান রাজনীতির সঙ্গে আমার ক্রিয়াদর্শের অনেক পার্থক্য। একটিমাত্র লক্ষ্য নিয়ে আমি ১৯০৩ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত কাজ করেছি, তা হলো দেশের লোকের মনে পূর্ণ মুক্তিলাভের ইচ্ছা জাগানো এবং কংগ্রেসের দুর্বল প্রণালীর বদলে উপযুক্ত সংগ্রামের দ্বারা সেই লক্ষ্যে পৌছনো। সেই ইচ্ছাটাই জাগা দরকার ছিল, এখন সে ইচ্ছা জেগেছে এবং দেশে সে সংগ্রাম পরিচালন করতে উপযুক্ত নেতা যথেষ্টই আছেন। সংস্কার-নীতি অপূর্ণ হলেও যদি মাথা ঠিক রেখে দেশ আত্মপ্রয়াসের পথে অগ্রসর হয়, তাহলে শীঘ্রই তা সফল হতে পারবে। এখন আমার ভাবনার বিষয় এই যে দেশ স্বাধীন হলে তখন সে কি করবে, কেমনভাবে তার ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলবে?

তুমি হয়তো বলবে, আপনি নিজে এসে পরিচালন করুন না কেন? কিন্তু আমার মন অনেক আগে পর্যন্ত ভেবে দেখে। তোমাদের দল সামাজিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, আমিও তা পছন্দ করি, কিন্তু ঐ ইউরোপীয় ধরনের সমাজতন্ত্র নয়। আমি বলি যে ভারত আত্মা ও ভারত সভ্যতা তার নিজস্ব রকমের, সেই অনুযায়ী সে তার রাজনীতি ও শাসন পদ্ধতি গড়ে তুলবে, ইউরোপীয় ধরনে নয়। কিন্তু বর্তমানে তার নিজস্ব কোনো রাস্তা করা নেই, কারো নির্দিষ্ট কোনো ধারণা নেই। সে ক্ষেত্রে যদি আমি আমার আদর্শ-মত কিছু করতে চাই তা আধ্যাত্মিক ধরনের হওয়াতে কেউ তা গ্রহণ করতে রাজী হবে না, অনেকে তাতে নারাজ হবে। আর আমার নিজেরও ধারণা সম্পূর্ণ হয়নি, কোনো নির্দিষ্ট রাস্তা হয়নি। আমি আমার মনের মধ্যে কাজ করে চলেছি, তা এখনও প্রকাশ করবার বা কাজে লাগাবার মতো নয়। এখন আমাকে মুক্ত অবস্থায় থেকে নীরবে এবং একাকী আমার জমি লাঙ্গল দিতে হবে কিছুকালের জন্য। তোমাদের কাগজের সম্পাদনা করতে গেলে আমাকে নিজের কথা চেপে রেখে পাঁচজনের মতা-মত প্রকাশ করতে হবে, এবং যদিও অগ্রগামী দলের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে আমার সহানুভূতি থাকা উচিত, তথাপি আমি এখন ঐভাবে নিজেকে সীমা-বদ্ধ করতে পারি না।

চিঠিখানা দীর্ঘ হয়ে গেল। আমি ভেবে দেখলাম যে তোমাকে সব কথা বুঝিয়ে বলা দরকার যাতে তুমি এমন কথা মনে না করো যে আধ্যাত্মিক নিরাসক্তির কারণে আমি দেশের ডাকে সাড়া দিলাম না, কিংবা দেশের ও তোমাদের কাজের সঙ্গে আমার কোনো সহানুভূতি নেই, কিংবা

তোমরা যে চমৎকার কাজ করছ তার প্রতি আমার কোনো আনুকূল্য নেই। তথাপি দুঃখের বিষয় এই যে আমি তোমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে তোমাকে নিরাশ করতে বাধ্য হলাম।

তোমাদের

অরবিন্দ ঘোষ

×

পণ্ডিচেরী

৩০শে অগস্ট ১৯২০

প্রিয় ডাঃ মুনজে,

আগেই তার বার্তায় আপনাকে জানিয়েছি যে নাগপুর কংগ্রেসের সভাপতি পদ গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। রাজনীতির ক্ষেত্রেই এমন কয়েকটি কারণ আছে, কেবলমাত্র যার জন্যই আমার এ পদ নেওয়া চলে না। প্রথমতঃ কংগ্রেসের নীতিতে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস নেই, কারণ আমার নীতি বিভিন্ন। তাছাড়া, বৃটিশ-শাসিত ভারত থেকে চলে আসার পর, আমার দৃষ্টি-ভঙ্গীর ও মতের এমন পরিবর্তন হয়েছে, যার সঙ্গে আমার তদানীন্তন দৃষ্টি-ভঙ্গীর বা মতের পার্থক্য অনেক বেড়ে গেছে, এবং আজকের বাস্তবতার ক্ষেত্র, বা রাজনৈতিক কর্মধারা থেকে তা এতো দূরে সরে গেছে, যে আমি কংগ্রেসকে কিছু বলতে গিয়ে লজ্জায় পড়তে পারি। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার আদর্শের প্রতি আমার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু কোনও দল বিশেষের সঙ্গে আমি যুক্ত হতে চাই না। কংগ্রেসের সভাপতি প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসেরই মুখপাত্র—এবং সভাপতির গদী থেকে এমন কিছু বলা, যা কংগ্রেসের চিন্তাধারা বা কর্মধারা থেকে অনেক দূরে, হবে সম্পূর্ণ হাস্যকর। শুধু তাই নয়, এখন সভাপতির সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির এবং কংগ্রেসের বাৎসরিক বা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত, নীতি-ধারার সম্বন্ধে একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। আমার নীতিগত পার্থক্যের জন্য হয়তো বা যে কোনও রকমের পদাধিকার বলে কর্তব্য করার বা কোনও রকমের লাগাম পরার ব্যক্তিগত অক্ষমতার জন্য, আমি ও পদের অনুপযুক্ত, এবং আমার নির্দিষ্ট কর্মধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে বৃটিশ-শাসিত

ভারতে গিয়ে বসবাস করা এখন আমার পক্ষে অসম্ভব। এই সব কারণে আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করতে আমি অক্ষম।

মূল কারণ হচ্ছে যে আমি আর এখন পুরোপুরি রাজনীতিক নই—আমি আর এক ধরণের কাজে হাত দিয়েছি যার ভিত্তি হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন এর লক্ষ্য, এবং আমার সব সময়টুকু এই বিষয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হচ্ছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এখন যেরকম কাজ চলছে সেই রকম কাজের সঙ্গে, আমার নির্দিষ্ট কাজের সমন্বয় ঘটানো অসম্ভব, অন্ততঃ প্রথম দিকে। এই কাজ আমার জীবনের লক্ষ্য, এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে নামলে এই কাজ আমায় ছেড়ে দিতে হবে—যা আমি কখনই পারব না। আপনার আহ্বানে সাড়া দিতে না পারার এই হচ্ছে সত্যিকার কারণ।

আমি আরও বলতে পারি যে তিলকের জায়গায় আমাকে মুখ্য আসনে বসানোর নিমন্ত্রণ করা ভুল। ভারতবর্ষের কোনও লোকই, বিশেষ করে আমি, সেই আসনে বসবার উপযুক্ত নয়। আদর্শবাদ আমার মজ্জাগত—এবং যখন বৈপ্লবিক (তার মানে হিংসাত্মক নয়) কোনও কাজ বা আদর্শগত কোনও আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত বা সংগঠিত করতে হবে, তখন আমাকে কিছুটা প্রয়োজন হতে পারে। "সাড়া পেলে সহযোগিতা করব", "অবিচ্ছিন্ন আন্দোলন" এবং "যখন যেখানে দরকার বাধা দান" প্রভৃতি তিলকের যে কর্মধারা, তা নিশ্চয়ই "অসহযোগিতা"র বা "নিষ্ক্রিয় বাধাদানে"র একমাত্র বিকল্প। কিন্তু এই কর্মধারাকে সফল করতে হলে এর পুরোভাগে থাকা দরকার তাঁর মতন স্থিরপ্রতিজ্ঞ কর্মকুশল, কুশলবুদ্ধি লোকের। যে ধরণের কর্মপটুতা বা বুদ্ধি দরকার তা আমার নেই—বড়জোর স্থিরপ্রতিজ্ঞা থাকতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত কয়েকটি কারণে আমি কিছুতেই Council এ ঢুকতে রাজী নই। অপর দিকে পাঞ্জাবের কয়েকটি সরকারী কর্মচারীকে শাস্তি দেওয়ার বা মৃত তুর্কী সাম্রাজ্যকে পুনর্জ্জীবিত করার জন্য কোনও বৃহৎ অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলা আমার কাছে সাধারণ বুদ্ধির পরিপন্থী। এটা যদি সরকারকে অসুবিধায় ফেলার জন্য বা সাময়িক অভিযোগগুলিকে ফেনিয়ে তুলে Ireland বা Egypt র মত (অবশ্য হিংসাত্মক কাজ দিয়ে নয়) স্বায়ত্তশাসনের দাবীর জন্য করা হয়, তার মানে বুঝতে পারি। যদি কংগ্রেসের কর্মধারার বা গঠনের আমূল পরিবর্তন ক'রে একে জাতির পুনরুত্থানের কেন্দ্র করা হয়, কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য নয়,

তাহলে হয়তো রাজনীতির ক্ষেত্রে পুনঃপ্রবেশ করতে পারি, কিন্তু সেখানেও বাধাস্বরূপে দাঁড়ানো আগে যে কারণ বলেছি তা। দুর্ভাগ্যবশতঃ কংগ্রেসের আগেকার কার্যপ্রণালীর দ্বারা যে মনোবৃত্তি বা অভ্যাস গড়ে উঠেছে, তার জন্য এটা এখন অসম্ভব। আশা করি, আমার এই সব ধারণা নিয়ে কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণ করা বা তাতে অংশগ্রহণ করা অসম্ভব, এটা আপনি বুঝতে পারবেন।

আমি আরও বলতে পারি যে, যে লোক বহুদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে আছে তাকে দিয়ে, বা যে কোনও একজন লোকের উপস্থিতির দ্বারা কংগ্রেস সাফল্য অর্জন করতে পারে না। যে সব বন্ধুরা আমাকে আহ্বান জানিয়েছে, আমি ছাড়া নাগপুর কংগ্রেস একেবারে অর্থহীন হয়ে যাবে, তাদের এরকম ধারণা ভুল। এই সর্বভারতীয় আন্দোলন, এর নিজের আদর্শ দিয়েই অনুপ্রাণিত হবার শক্তি রাখে, বিশেষতঃ এই সংকটের সময়। আমি দুঃখিত যে আপনাকে হতাশ হতে হ'ল, কিন্তু যে সব কারণ আগে বলেছি, তার জন্যই আমি এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি।

আপনারই একান্ত

অরবিন্দ ঘোষ।

বাইরের কাজ নেওয়া বিষয়ে আগেকার প্ল্যান

আর্য্য অফিস
পণ্ডিচেরী
১৮ই নভেম্বর ১৯২২

স্নেহের বারীন,

তোমার চিঠি থেকে মনে হচ্ছে যে তুমি চাও যে, যে কাজের ভার তোমায় দিয়েছি তার জন্য লিখিত হুকুমনামা, এবং যেসব লোকের সঙ্গে তোমায় যোগাযোগ করতে হবে ঐ কাজের জন্য, তাদের পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য একটি বাণী। যাকে খুশী তাকে এই চিঠি তুমি দেখাতে পারো হুকুমনামা হিসাবে এবং আশা করি এ চিঠি তোমার কাজ সহজ করে দেবে।

আমি এখন, এবং কিছুকাল পর্যন্তও, যোগসাধনায় ব্যস্ত থাকব। মানুষের জীবনের রূপান্তর সাধনই হবে এর ভিত্তি, পলায়নী মনোবৃত্তি নয়। অন্তর্জগতের অনেক স্থান যেখানে এখনও মানুষের পদার্পণ ঘটেনি, সেই সব স্থান এবং সাধনার নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করতে হবে, এবং তার জন্য দরকার আমার লোকচক্ষুর অন্তরালে যাওয়া এবং সাফল্যলাভের জন্য বহু সময়। কিন্তু সেই সময় এগিয়ে আসছে—যদিও এখনও এসে পৌঁছয়নি—যখন আমাকে, এই যোগের আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে, বাইরের কোনও বৃহৎ কাজ করতে হবে।

এই কারণে কয়েকটি ছোট ছোট কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন এই সাধনায় শিক্ষালাভের জন্য—একটি আমার নিজের তত্ত্বাবধানে, অপরগুলির সঙ্গে আমার সরাসরি যোগ থাকবে। এই কেন্দ্রগুলি বড় হয়ে উঠবে এবং এদের সংখ্যাও বাড়বে সময়ে। যে কাজ আমায় করতে হবে, তাতে সহায়তা করবে, যারা এই সব কেন্দ্রে শিক্ষালাভ করবে—কিন্তু এখন এই সব কেন্দ্র শুধু তপস্যা এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষালাভ ছাড়া বাইরের কোনও কাজ করবে না।

প্রথম কেন্দ্রটি ইতিমধ্যেই পণ্ডিচেরীতে রয়েছে, এবং আমি যখন বৃটিশ-শাসিত ভারতে ফিরে যাব, তখন সেখানে স্থানান্তরিত হবে। কিন্তু এই কেন্দ্রটিকে চালাতে এবং বড় করতে অর্থের প্রয়োজন। দ্বিতীয় কেন্দ্রটি তোমার মাধ্যমে বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠিত করছি। এর পরের বছর গুজরাটে

একটি কেন্দ্র স্থাপন করবার আশা রাখি।

আমার এখানে যতো লোক নিতে পারি, তার চেয়ে বেশী লোক এই সাধনার উপযুক্ত এবং এখানে আসতে চায়। বাইরের কাজে যাবার প্রস্তুতি স্বরূপে এই কেন্দ্র পরিচালনা বাবৎ আমার বহু অর্থের প্রয়োজন।

অর্থ সংগ্রহের ও আনুষঙ্গিক কাজের জন্য, তোমাকে ভার ও ক্ষমতা দিয়েছি। তোমার উপর আমার পুরোপুরি বিশ্বাস আছে, এবং যাঁরা আমার শুভানুধ্যায়ী, তাঁদের সকলকেই অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন তোমার উপরে সে বিশ্বাস রাখেন।

আমি আরও বলতে পারি যে, যে কাজের কথা বলেছি, তা ব্যক্তিগত ও ব্যাপক, দুইভাবেই, একান্তই আমার নিজস্ব, এবং আর কারও পক্ষে করা সম্ভবপর নয়। আর যাঁরা আমার নাম বা অনুমোদন নিয়ে কাজ করছেন, সেই কাজ থেকে আমার কাজ পৃথক ও বিভিন্ন। তোমার মতন যাঁরা আমার হাতে এই সাধনায় শিক্ষালাভ করছে বা করবে তাদের সাহায্যেই আমি এই কাজে সিদ্ধিলাভ করব।

অরবিন্দ ঘোষ

×

চিত্তরঞ্জন দাসকে লিখিত চিঠি

আর্য অফিস, পণ্ডিচেরী
১৮ নভেম্বর ১৯২২

প্রিয় চিত্ত,

প্রায় দুটি বৎসর যাবৎ আমি কাউকে একটিও পত্র লিখিনি। আমি অন্তরালে থেকে এতই গভীর সাধনাতে মগ্ন ছিলাম যে বাহিরের জগতের সঙ্গে প্রায় কোনো সম্পর্কই ছিল না। এখন বাইরের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখছি যে কারণবশত আমার প্রথমে তোমাকে পত্র লেখাই বিশেষ দরকার---সেই কারণেই আমি এতকাল কলম ব্যবহার ছেড়ে দিয়ে আবার কলম ধরেছি।

এতকাল নির্জন অন্তরালে থাকার পরে এবার একটা বাইরের কাজেরই

দরকার হয়ে পড়েছে। বারীন বাংলাদেশে গেছে, এ সম্পর্কে সে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, কিন্তু আমার নিজেরও তোমাকে লেখা দরকার, সেই-জন্য এই চিঠি আমি বারীনের হাতে তোমাকে পাঠাচ্ছি। আমি তাকে ভার অর্পণেরও এক পত্র দিচ্ছি তাতেই বুঝবে যে অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন হয়েছে। কথাটা বুঝিয়ে বলি।

আমার বর্তমান মনোভাব তুমি জানো জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে, যার জন্য আমি এখানে চলে এসেছি। পূর্বে আমার বরাবরই এমন বোধ ছিল, কিন্তু এখন দৃঢ়নিশ্চয় ভাবে জেনেছি যে জীবন ও কর্মের প্রকৃত ভিত্তি হওয়া চাই আধ্যাত্মিক---অর্থাৎ একটা নবচেতনা জাগাতে হবে, যা যোগের দ্বারাই সম্ভব। আমি উত্তরোত্তর প্রত্যক্ষভাবেই দেখছি যে মানবজাতি যে ব্যর্থ চক্রের মধ্যে ঘুরে মরছে তার থেকে কোনো নতুন ভিত্তি নিয়ে তার উঠে যাওয়া দরকার। আর এটাও আমার বিশ্বাস যে ভারতই সেই কাজ করবে, তারই কাজ হবে জগৎকে এই বৃহত্তর বিজয়লাভে পৌছে দেওয়া। কিন্তু সেই বৃহত্তর চেতনার শক্তি ও প্রকৃতি কেমন হবে? তার সত্য কি? সে সত্য কেমনভাবে সফল হবে? সে সত্যকে জীবনের ক্ষেত্রে কেমন ভাবে নামিয়ে এনে সার্থকভাবে ক্রিয়াশীল করা যাবে? আমাদের যে বর্তমান যন্ত্রগুলি, বুদ্ধি, মন, জীবন ও দেহ, এগুলিকে সেরূপ রূপান্তরের পক্ষে কেমনভাবে কাজে লাগানো যেতে পারবে? এই সমস্যার মীমাংসা নিয়েই আমি সাধনার কাজ করছিলাম, এবং অভিজ্ঞতার ও অনুভূতির ফলে আমি এক সুনিশ্চিত লক্ষ্যে পৌছেচি, উদারভাবে জ্ঞানলাভ ক'রে আমি এই রহস্যের সমাধানে এসেছি। এখনও স্থায়ীভাবে তা সম্পূর্ণ হয়নি---সুতরাং এখনও আমাকে এমনি অন্তরালেই থাকতে হবে। কারণ পুরোপুরিভাবে এই নতুন ক্রিয়াশক্তিকে আয়ত্ত না করা পর্যন্ত আমি বাইরের জগতে কাজ করব না, যতক্ষণ নিরেট নিখুঁত ভিত্তি না স্থাপিত হচ্ছে।

কিন্তু এখন আমি আরো বেশি অগ্রসর হয়ে কাজের পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছি---অর্থাৎ অন্যেদের নিয়ে সাধনা শিক্ষা দিয়ে আমার কাজের জন্য তাদেরও প্রস্তুত ক'রে তুলছি, নতুবা ভবিষ্যতে জগতে আমার কাজ শুরু করা যাবে না। এখন অনেকেই এখানে আসতে চায় এবং অনেকে বাইরে দূরে থেকেও শিক্ষা নিতে চায়। কিন্তু এর জন্য অর্থের প্রয়োজন নতুবা এখানে এবং এখানকার বাইরেও দুই একটি কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারবে না। তার জন্য যথেষ্ট সাহায্যের দরকার। আমার মনে হয় যে তোমার অনু-

রোধ ও প্রভাবের দ্বারা তুমি আমার কাজের জন্য বারীনকে ঐ-বিষয়ে সাহায্য করবে। এটা নিশ্চয় আমি তোমার কাছে আশা করতে পারি?

ভুলবোঝা নিবারণের জন্য একটা কথা বলা দরকার। অনেককাল আগে চন্দননগরের মতিলাল রায়কে আমি নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ও শিক্ষাবিধি অনুষ্ঠান করা সম্বন্ধে আমার আদর্শ ও মনোভাব জানিয়ে-ছিলাম, এবং তার থেকে সে আমার আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্য নিয়ে তার আপন রাস্তায় সংঘ স্থাপন ক'রে তার কাজ ক'রছে। কিন্তু আমি এখন তোমাকে যা লিখলাম তার থেকে সে জিনিস হলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—আমার যা কাজ তা আমার নিজেকেই করতে হবে। আমার হয়ে অন্য কেউ সে কাজ করতে পারবে না।

তোমার রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম ও তৎপরতার আমি অনুসরণ করছি। বিশেষত বর্তমানে অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে যে নতুন ধারা নিয়ে আসবার চেষ্টা করছ তাও আমি লক্ষ্য করছি। বিরুদ্ধ শক্তিদের প্রতিবন্ধকের ফলে তুমি কতটা কি করতে পারবে তা জানি না, কিন্তু আমি তোমার প্রচেষ্টার সার্থকতা কামনা করি। স্বরাজ সম্বন্ধে তুমি যে নির্দেশ দিয়েছ তাতে আমি বিশেষ অবহিত; প্রকৃত ভারতীয় স্বরাজ কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আমার নিজেরও বিশেষ মত ছিল, আমি দেখছি যে তার সঙ্গে তোমার মতেরও মিল হতে পারে।

তোমাদের অরবিন্দ

×

পণ্ডিচেরী
১লা ডিসেম্বর ১৯২২

স্নেহের বারীন,

চিত্তরঞ্জন কোন কোন অংশ, এবং ঠিক কি কারণে, প্রকাশ করতে চায়, তা জানবার জন্য তোমার চিঠির অপেক্ষায় ছিলাম। ঠিক যা ভেবে-ছিলাম তাই, কিন্তু আমি নিশ্চিত হয়ে চেয়েছিলাম। প্রকাশ করতে কেন আমার দ্বিধা ছিল, তার কারণ পরিষ্কারভাবে এখন জানাচ্ছি।

জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তি, বা স্বরাজ সম্বন্ধে শেষের অনুচ্ছেদে যা

লিখেছি, তা প্রকাশিত করার সম্বন্ধে আমার কোনও দ্বিধা ছিল না। কিন্তু অসহযোগ সম্বন্ধে যা লিখেছি, সেটা প্রকাশিত হলে লোকে আমাকে সম্পূর্ণ-ভাবে ভুল বুঝত। কেউ কেউ হয়তো মনে করত যে আমি গান্ধীর প্রস্তাব কমিটি কর্তৃক সংশোধিত আকারে গ্রহণ করেছি। তুমি জানো যে, মহাত্মা-জীর কর্মধারা যে ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বাধীনতা, বিরাটত্ব, স্বরাজ, বা সাম্রাজ্য আনতে পারে, সেটা আমি বিশ্বাস করি না। অপর দিকে, কেউ কেউ মনে করতে পারে যে আমি তিলক প্রবর্তিত জাতীয়তাবাদের পক্ষে। সেটাও সত্যি হবে না---কেননা সেটা আজকের যুগে অচল। যদি আমি রাজনীতি ক্ষেত্রে থাকতাম, তাহলে আমার কর্মধারা মূলতঃ বিভিন্ন হ'ত ওই দুটি কর্মধারা থেকে, যদিও কিছু কিছু বিষয়ে মিল থাকত। কিন্তু আমাদের দেশ তা গ্রহণ করতে এখনও প্রস্তুত হয়নি।

এটা ভাল করে জানি বলেই আমি আধ্যাত্মিক ও চৈত্যের ক্ষেত্রের কাজ করেই সন্তুষ্ট। ঠিক সময়ে, ঠিক আবহাওয়ায় আমার কাজ প্রাণের বা জড়ের জগতে প্রসারিত হতে পারে। ভবিষ্যতে আমার কাজ পাছে ব্যাহত হয় সেই ভয়ে আমি সর্বসাধারণের কাছে এ বিষয়ে কিছু বলতে নারাজ। আমার প্রস্তাব কি হবে সেটা নির্ভর করবে ঘটনাবলীর পরিস্থিতির উপর। আজকের রাজনীতি যে ধারায় বইছে, নিরর্থক বিশৃঙ্খলায়, বা বাইরের ঘটনাবলীর প্রভাবে, কোনও এক ধরনের স্বরাজে তার পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। যে কোন একটাই ঘটুক, সত্যিকারের কাজ তখনও বাকী থাকবে। তাই আমি এ থেকে দূরে থাকতে চাই।

আমার সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব থাকা বাদেও কয়েকটি কারণে তার কাজে এবং কথায় আমার আগ্রহ আছে। প্রথমতঃ, যদিও আমি বিশ্বাস করি না যে, যে ধাক্কা সে দিচ্ছে, তা সফল হবে, তা সত্ত্বেও এতে কিছু কাজ হতে পারে। বারদৌলির সঙ্কীর্ণ ও অনমনীয় গঠনমূলক কর্ম-সূচী যা কিছুই গড়তে পারে না, বা অসহযোগ আন্দোলন, যেটাকে উপায় হিসাবে অবলম্বন করা যেতে পারে, উদ্দেশ্য হিসাবে নয়, এ দুটির প্রতি লোকের যে অহেতুকী শ্রদ্ধা আছে, তা ভাঙ্গাতে পারে, এবং প্রকৃত স্বরাজ আনবার জন্য যে জটিল ও বিশাল কর্মসূচীর প্রয়োজন, তার অনুকূল আব-হাওয়া সৃষ্টি করতে পারে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, যে ভবিষ্যতের কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে আমি যেসব ভাবছি, সেগুলিকে ক্ষিপ্রগতিতে সে ভাষা দিচ্ছে। আমি চিঠিতে যা লিখেছি তা তার সঙ্গোপনে ব্যবহারে আমার আপত্তি নেই।

কিন্তু আমি আশা করি যে সে বুঝবে কেন আমি তা জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করতে অনিচ্ছুক।

অরবিন্দ

9/23

দ্বিতীয় খণ্ড

নিজের কথা ও মায়ের কথা

প্রথম বিভাগ

বিবর্তনের দুই অগ্রনেতা

বিবর্তনের দুই অগ্রনেতা

বিবর্তনের অগ্রদূত

প্রঃ আমরা জানি যে আপনি ও মা দুজনেই অবতার। কেবল এই জন্মেই কি আপনাদের দিব্যত্ব বিকাশ করলেন? সৃষ্টির পর থেকেই তো আপনারা পৃথিবীতে ছিলেন। পূর্ব পূর্ব জন্মে কি করেছিলেন আপনারা?

উঃ বিবর্তনের কাজ করেছিলাম।

×

প্রঃ অতীত কালের লোকেরা হয়তো আপনাদের চিনতে পারেনি, কারণ আপনারা সাধারণ মানুষের মতোই ছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বা বুদ্ধ বা খ্রীষ্ট কি আপনাদের উপস্থিতির কথা জানতে পারেননি?

উঃ উপস্থিতি কোনখানে এবং কার মধ্যে? দেখা সাক্ষাৎ না হলে তো চেনা যায় না, আর যদিও তা হয়ে থাকে তথাপি আমাদের আবরণ উন্মোচিত হবে কেন। তখন তো তার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

×

প্রঃ আপনি বলেছেন "উপস্থিতি কোথায় এবং কার মধ্যে"? এ প্রশ্ন কেন?

উঃ "উপস্থিতি" হবে নিশ্চয় কারো বাহ্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে। আর

"উপস্থিতি" হবে জগতের কোন অংশে? বুদ্ধের সময়ে মা যদি থাকতেন রোমে, তাহলে বুদ্ধ কেমন ক'রে তা জানতেন, বুদ্ধ তো রোমের নামও শোনেননি।

×

প্র : আপনি বলেছেন তাঁদের জীবনে আভ্যন্তর সত্তা গোপন থাকবে না কেন? অবতার ও বিভূতিদের মধ্যে তা কেন গোপন থাকবে?

উ : অবতার এবং বিভূতিরা কেবল সেই জ্ঞানই রাখে যা তাঁদের কাজের পক্ষে দরকার। রোমে কি হচ্ছে তা বুদ্ধের জানবার দরকার ছিল না। আর অবতার তাঁর সমস্ত শক্তিমত্তার বিকাশ করেন না, তা তাঁর পক্ষে অপ্রয়োজন। সব কিছুই তাঁর চেতনার সামনে থাকে না। আর বিভূতিদের যে দিব্যশক্তি আছে তা নিজেরাই তারা জানে না। যেমন জুলিয়াস সীজার, তিনি ছিলেন একজন নাস্তিক। বুদ্ধ ব্যক্তিগত ভগবানে বিশ্বাস করতেন না, কেবল বলতেন নির্ব্যক্তিক অস্তিত্বের কথা।

×

প্র : আপনারা যখন পৃথিবীতে ছিলেন তখন অবতার আসার কি দরকার ছিল?

উ : আমরা পৃথিবীতে অবতার হয়ে আসিনি।

×

প্র : আপনি বলছেন যে অবতার হয়ে আসেননি, অথচ বিবর্তনের কাজ করেছেন। তাই যখন করেছেন তখন ভগবানের অংশ অবতাররূপে আসা কিসের জন্য?

উঃ অবতারের প্রয়োজন বিবর্তনের মোড়ের মুখে কোনো বিশেষ কর্ম সাধনের জন্য। বাকি সময়ে ভগবানের কাজ হতে থাকে সাধারণ মানবীয় রীতিতে বিভূতির দ্বারা কিন্তু বিশেষ কাজের সময় তাঁকে অবতার হয়ে আসতে হয়।

২৫-৯-১৯৩৫ থেকে ২৫-৭-১৯৩৬

x

প্রঃ যখন আমাদের উপলব্ধি এসেছে যে সর্বাপেক্ষা উত্তম রহস্য হলো এই যে আপনি হলেন ভগবৎ অবতার আর মা হলেন পরাশক্তি, তখন অন্য উপলব্ধির, এমন কি নিরাকার নীরব ব্রহ্মের উপলব্ধি আসার কি দরকার? জগতে যা কিছু করার তা তো আপনারাই করবেন, সে কাজের জন্য অন্য কারো কোনো যন্ত্ররূপেও প্রয়োজন নেই।

উঃ হাঁ, কিন্তু ঐরূপ উপলব্ধি পরিপূর্ণভাবে নিত্য থাকা দরকার এবং তার জন্য নিত্য চেষ্টা লেগে থাকা দরকার, তবেই অন্যান্য উপলব্ধিও ওরই আনুষঙ্গিক রূপে এসে যাবে।

৩০-১০-১৯৩৬

বিবর্তনের সহায়ক রূপে

প্রঃ শুনতে পাই যে আপনি আর মা পৃথিবীতে সৃষ্টির গোড়া থেকেই এসেছেন। লক্ষ লক্ষ বছর অজানিত ভাবে থেকে আপনারা দুজনে কি করছিলেন জানতে ইচ্ছা হয়। 'অজানিতে' বলছি কারণ কেবল এই জন্মেই নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন।

উঃ বিবর্তনের কাজ করছিলাম।

২৫-৫-১৯৩৫

প্রঃ আরো একটু পরিষ্কার ক'রে বলুন।

উঃ তাহ'লে তো মানব ইতিহাসের আগাগোড়া লিখতে হয়। এই পর্যন্ত বলতে পারি যে বিবর্তনকে আরো এগিয়ে দেবার জন্য যেমন বিশেষ বিশেষ অবতরণ ঘটে, তেমনি ভগবানের থেকে কোনো কিছু জিনিসও আসে বিবর্তনের প্রত্যেক ধাপকে সাহায্য দিয়ে এক দিকে বা অন্য দিকে এগিয়ে দিতে।

২৬-৫-১৯৩৫

আবির্ভাব রহস্য

> প্রঃ মা লিখেছেন : "আমাদের দৈনিক কাজকর্মে আমরা ভগবানের আবির্ভাব রহস্যকে প্রকাশিত করতে চেষ্টা করি।" তার অর্থ কি হবে?

উঃ তার মানে আমরা এই নিশ্চয়তা বোধ নিয়ে কাজ করি যে ভগবান মানুষের দেহে অভিব্যক্ত হতে পারেন এবং তা হয়েছেন।

ব্যক্তিগত ভগবানের অভিব্যক্তি

আশ্চর্য কথা, তুমি এই সহজ ও সাধারণ কথাটা বুঝতে পারলে না, যে—এই যোগের মূল কারণই সেইখানে যে কেবল নির্ব্যক্তিকের সাধনাতে আসবে মাত্র আভ্যান্তর অনুভূতি কিংবা বড় জোর মুক্তি। সমগ্র ভগবানের ক্রিয়া ব্যতীত সমগ্র প্রকৃতির রূপান্তর আসবে না। এমন কথা না হলে,

অর্থাৎ নির্ব্যক্তিকের উপলব্ধিই যথেষ্ট হলে, তাহলে এই মা-ও এখানে আসতেন না আর আমিও এখানে থাকতাম না।

১৫-৯-১৯৩৬

মানুষের জন্য ভগবানের আত্মপ্রচ্ছন্নতা

> প্রঃ আমার মনে হয় মায়ের দেহচেতনাতে যে অতিমানস নেই তা তিনি প্রস্তুত নন বলে নয়, তার কারণ তিনি তার আগে চান সাধকদের দেহকে ও পৃথিবীকে তার জন্য খানিকটা প্রস্তুত ক'রে নিতে। কিন্তু কেউ কেউ ভুল বুঝে মনে করে যে মা এখনও পূর্ণতা লাভ করেননি বলেই অতিমানস তাঁর মধ্যে আসেনি। আমার ধারণা কি ঠিক?

উঃ নিশ্চয় তাই। আমরা যদি গোড়া থেকেই অতিমানসের দেহ নিয়ে থাকতাম তাহলে কেউই আমাদের কাছে ঘেঁষতে পারত না, আর কোনো সাধনার কাজও সম্ভব হতো না। আমাদের সঙ্গে পৃথিবীর ও এখানকার মানুষদের সংস্পর্শ ঘটার কোনো আশাই থাকত না। এমনিতেই দেখছ যে মাকে সর্বদাই নিজের চেতনাতে থাকা পরিত্যাগ ক'রে সাধকদের নিম্ন চেতনার মধ্যে নেমে আসতে হচ্ছে, নতুবা তখনই তারা বলতে শুরু করে: "মা তুমি কতই দূরে আছো, কতই কঠিন তুমি, আমাকে একটুও ভালোবাসো না, কোনোই সাহায্য তোমার কাছে পাই না, ইত্যাদি, ইত্যাদি"। মানুষের কাছাকাছি আসতে ভগবানকে এমনি আত্মপ্রচ্ছন্ন হয়ে আসতে হয়।

অভিব্যক্তির জন্য প্রস্তুতি

হাঁ তাই, যা কিছু এখানে করা হচ্ছে তা অতিমানসের পার্থিব চেতনাতে ও জড়জগতে পর্যন্ত অভিব্যক্ত হবার জন্য প্রস্তুতির কাজ, সুতরাং তা কেবল আমার ও মায়ের জন্য নয়। যদি আমাদের দেহে অতিমানস অব-

তরণ করে তার মানে হবে জড়দেহে তার অবতরণ ঘটেছে, সুতরাং তখন তা সাধকদের মধ্যেও অভিব্যক্ত না হবার কোনো কারণ থাকবে না।

১৫-৯-১৯৩৫

যুগে যুগে কর্ম

> প্র : মা তাঁর "কথাবার্তা" বইটিতে বলেছেন : "আমরা সকলেই পূর্ব পূর্ব জীবনে মিলিত হয়েছি...যুগে যুগে কাজ করেছি ভগবানের জয় আনতে"। যারা এখানে এসে রয়েছে তাদের সকলের পক্ষেই কি একথা খাটে? যারা আসে আর চলে যায় তাদের কি হয়?

উ : যারা এসেছে আর চলে গেছে তারাও রয়েছে এখনও এই গণ্ডীর অন্তর্গত। আত্মার টান থাকলে সাময়িক সরে যাওয়াতেও কিছু যায় আসে না।

১৮-৬-১৯৩৩

> প্র : "ভগবানের জয় আনতে যুগে যুগে" আমরা কি ভাবে কাজ করেছি? আজ পর্যন্ত তাতে কতটা ফল হয়েছে?

উ : জয় আসা মানে পৃথিবীতে দেহাশ্রিত চেতনার বর্তমান অজ্ঞানতার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণতায় বিকাশলাভ করা। যুগের পর যুগ আধ্যাত্মিক বিবর্তনের দ্বারা তারই জন্য প্রস্তুতি আনার দরকার ছিল। আজ পর্যন্ত সেই প্রস্তুতির কাজের ফলেই অতীতের যত কিছু সুদীর্ঘ আধ্যাত্মিক প্রয়াস ও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে। এখন সেই অবস্থাতে এসেছে যাতে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করা সম্ভব হচ্ছে।

১৮-৬-১৯৩৩

নীল পতাকার তাৎপর্য

নীল পতাকার মধ্যে সাদা পদ্ম, সেটির কথাই বোধ হয় বলতে চাইছ। সেটি হলো মায়ের চিহ্ন, কারণ শ্বেত পদ্ম হলো মায়ের প্রতীক, আমার হলো লাল পদ্ম। পতাকার নীল রংটি কৃষ্ণের রং, যা আধ্যাত্মিক বা দিব্য চেতনার প্রতীক, আর মায়ের কাজ হলো এখানে সেই চেতনারই প্রতিষ্ঠা করা, যাতে সেই চেতনাই পৃথিবীকে পরিচালনা করে। সেইজন্য ঐরূপ পতাকা আশ্রমের পতাকা রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার মানে হবে এই যে আমাদের কাজ সেই দিব্য চেতনাকে এখানে নামিয়ে আনা যাতে তা অতঃপর পার্থিব জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

১৪-৩-১৯৪৯

> প্রঃ যদি সর্বকালেই আপনি এই পৃথিবীতে থেকে থাকেন, তাহলে ঐসব মহাপুরুষেরা যখন পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন, তখনও আপনি এখানে ছিলেন। বাহিরের চেহারা আপনার যাই থাকুক না কেন, আপনার ভিতরের চেহারা—সত্যিকার দেবতার—কি করে লুকোলেন তাদের কাছ থেকে? তাদের সঙ্গে একই দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কি না, সে বিষয় অবান্তর, কিন্তু তাঁদের তো জানা উচিত ছিল যে যে ভাগবতী সত্তার অংশ তাঁরা, সেই সত্তা পার্থিব দেহ ধারণ করে এখানে আছেন?

উঃ কিন্তু ভিতরের স্বরূপ কেনই বা লুকিয়ে রাখা যাবে না? তোমার যুক্তির কিছু মানে থাকতে পারে যদি অবতার হিসাবে অবতরণ ঘটে বিভূতি হিসাবে নয়।

> প্রঃ আমি একথা বলিনি যে মা বা আপনার আবরণ খুলে ফেলার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আবরণ সত্বেও ঐসব মহা-

পুরুষদের আপনাদের চিনে ফেলা উচিত ছিল।

উঃ এই সব জিনিস না জানা সত্ত্বেও মহাপুরুষ হওয়া যায়। মহাপুরুষদের বা মহান্ বিভূতিদের সবজান্তা হবার বা অপ্রয়োজনীয় জিনিস জানবার কোনও কারণ নেই।

> প্রঃ তবুও আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না। আপনি আবরণ খুলে না ফেললেও, বুদ্ধ, যীশুখৃষ্টের মত মহাপুরুষরা কেন তাদের আবরণ (মিথ্যার) ফেলে দিলেন না আপনার চিনবার জন্য?

উঃ কেন তাঁরা তা করবেন? তাঁদের কাজের জন্যই তাঁদের আবরণের প্রয়োজন ছিল। সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেবার কি কারণ থাকতে পারে? সুতরাং শ্রীমার যদি যীশুখৃষ্টের সময় তাঁর সঙ্গে সংযোগ ঘটেই থাকে, তিনি সেখানে ভাগবতী চেতনার বিকাশ রূপে ছিলেন না, সম্পূর্ণ মানুষী রূপেই ছিলেন। তাঁকে যদি ভগবান রূপে তখন চেনা যেত তাহলে আসত দারুণ বিপর্যয় আর খৃষ্ট যা করতে এসেছিলেন তা ব্যর্থ হত সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য?

> প্রঃ আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন যে খৃষ্ট জন্মগ্রহণ করবার অব্যবহিত পূর্বেই ভারতবর্ষের কোনও কোনও ঋষি জানতে পেরেছিলেন যে ভগবান মানবদেহে অবতরণ করছেন, এবং কেবলমাত্র অনুভূতির বলেই, জেরুসালেমের পথে যাত্রা করেন, যদিও তাঁরা জানতেন না যে জেরুসালেম কি বা কোথায়?

উঃ আমি শুনিনি ভারতবর্ষ থেকে কোনও ঋষি সেখানে গিয়েছিলেন।

তবে প্রচলিত আছে যে কোনও কোনও ম্যাগি অনুভূতি-বলে ভগবানের অবতরণের কথা জানতে পারেন এবং তারকার নির্দেশে আস্তাবলে পৌঁছেন যেখানে খৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এটি একটি গল্প, ইতিহাস নয়।

দ্বিতীয় বিভাগ

দুজনের চেতনার ঐক্য

দুজনের চেতনার ঐক্য

চেতনার ঐক্য ও পথ

মায়ের চেতনা ও আমার চেতনা যে বিপরীত এটা হলো গোড়ার দিকে যারা ছিল তাদের আবিষ্কার, যখন মাকে তারা সম্পূর্ণ চিনতে বা গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু চেনবার পরেও তারা এমনি নিরর্থক বিরুদ্ধতা ক'রে নিজেদের এবং অন্যেদের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। মায়ের ও আমার চেতনা একই জিনিস, একই দিব্যচেতনা দুই অংশে বিভক্ত, বর্তমান লীলার প্রয়োজনে। মায়ের জানা ও তাঁর শক্তি ছাড়া কোনো কিছুই করা যাবে না। যে কেউ মায়ের চেতনাকে অনুভব করবে সে জানবে যে আমি আছি তার পিছনে, আর আমার চেতনাকে যে অনুভব করবে সে জানবে যে মা আছেন তার পিছনে। কিন্তু যদি ঐভাবে ভাগ ক'রে দেখা হয় (যাদের মন ঐ ভাব নিয়েছিল তাদের কথা বাদ দিয়ে) তাহলে সত্যের প্রতিষ্ঠা কেমন ক'রে হবে---কারণ সত্যের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই।

১৩-১১-১৯৩৪

×

মায়ের চেতনা হলো দিব্যচেতনা, তার থেকে যে আলো আসে তা দিব্যসত্যের আলো। যে তাকে গ্রহণ করবে সে মায়ের আলোর মধ্যে অবস্থান করবে, মন প্রাণ ও দেহের সকল স্তরেই সে সত্যকে দেখবে। যা কিছু অদিব্য তাকে সে প্রত্যাখ্যান করবে---অদিব্য হলো যা মিথ্যা, যা অজ্ঞানতা, তামসিক শক্তিদের ভ্রান্তি; যা কিছু অন্ধকার অস্পষ্ট এবং দিব্যসত্যকে ও তার আলো এবং শক্তিকে মানতে নারাজ তা সবই অদিব্য। সুতরাং মায়ের আলোকে ও শক্তিকে যা মানে না তাও অদিব্য। সেইজন্যই তোমাকে সর্বদা বলি মায়ের সঙ্গে এবং তাঁর আলো ও শক্তির সঙ্গে সংস্পর্শ রাখতে, তাহলে তুমি এই সব ধাঁধা ও অনিশ্চয়তার হাত থেকে বেরিয়ে উপরের

সত্যকে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

মায়ের আলো বা আমার আলোর কথা যখন বিশেষ অর্থে বলা হয়, তার মানে তা বিশেষ একরূপ গুহ্য ক্রিয়া—যে আলো অতিমানস থেকে আসে তার ক্রিয়া। তার মধ্যে শ্বেতশুভ্র আলোটি মায়ের, যা করে বিশুদ্ধী-কৃত, উদ্দীপিত, সত্যের শক্তিকে নামিয়ে এনে যা রূপান্তর আসা সম্ভব করে। কিন্তু বস্তুত উচ্চ দিব্যসত্যের সব আলোই মায়ের আলো।

মায়ের পথ ও আমার পথে কোনো প্রভেদ নেই; চিরদিন আমরা একই পথে চলেছি, যে পথ অতিমানস রূপান্তর ও ভগবৎ উপলব্ধির অভি-মুখে; কেবল শেষকালেই নয়, কিন্তু প্রথম শুরু থেকেই আমাদের ঐ একই পথ।

মাকে একদিকে আর আমাকে অন্যদিকে বিপরীত ও পৃথক ক'রে নিয়ে এই যে দুই বিরুদ্ধ ভাগে ভাগ ক'রে নেবার প্রচেষ্টা, এ হলো মিথ্যা জগতের শক্তিদের চক্রান্ত, তারা চায় যে কোনো সাধক যেন সত্যে পৌঁছতে না পারে। এই সকল মিথ্যাকে তোমার মন থেকে একেবারে দূর ক'রে দাও।

এই কথা নিশ্চিত জেনে রাখো যে মায়ের আলো এবং শক্তি হলো সত্যেরই আলো এবং শক্তি; মায়ের সেই আলো এবং শক্তির সঙ্গে নিত্য সংযোগ রক্ষা করো, তবেই তুমি দিব্যসত্যের মধ্যে উন্নীত হতে পারবে।

১০-৯-১৯৩১

যা কিছু পাবে মায়ের কাছ থেকে, জানবে যে তা আমার কাছ থেকেও আসছে—কোনো তফাৎ নেই। তেমনি আমি যদি কিছু দিই, তাও জানবে যে মায়ের শক্তিতে সাধকের কাছে গিয়ে পৌঁছচ্চে।

২০-৮-১৯৩৬

তুমি মনে করো যে মায়ের দ্বারা তোমার কোনো সাহায্য হবে না... কিন্তু তাঁর সাহায্যে তোমার যদি কিছু লাভ না হয় তাহলে আমার সাহায্যে

তার চেয়েও কম হবে। সে যাই হোক, আমি সকল সাধকদের জন্য যে ব্যবস্থা করেছি তার কোনো রদবদল হতে পারে না, বিনা ব্যতিক্রমে সকল-কেই আমার পরিবর্তে মায়েরই কাছ থেকে আলো এবং শক্তি নিয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে মায়েরই দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। এ ব্যবস্থা কেবল সাময়িক উদ্দেশ্যে নয়, সাধক যদি নিজেকে খুলে ধরে গ্রহিষ্ণু হয় তাহলে এই হলো একমাত্র সত্য এবং সার্থক উপায় (কারণ সেই রকমই মায়ের উপস্থিতি ও তাঁর শক্তি)।

×

মা এবং আমি একই শক্তির দুই রূপ—যা স্বপ্নে দেখেছ তা খুবই যুক্তিসঙ্গত। ঈশ্বর-শক্তি, পুরুষ-প্রকৃতি, এ হলো একই ব্রহ্মের দুই দিকের বিকাশ।

১৯৩৩

×

দুটি মূর্তি মিলে এক হয়ে গেল, এই যে অনুভূতি, অর্থাৎ আমি ও মা এক এবং অভিন্ন, এটি খুবই সাধারণ সত্য অনুভূতি।

৪-১১-১৯৩৫

×

প্রঃ আমি ভিতরকার দৃষ্টিতে প্রায়ই যে সব আলোর খেলা দেখি তাতে একটা গভীর রকমের ধারণা আসে যে শ্রীঅরবিন্দকে ও মাকে দুই বিভিন্ন দেহে দেখা গেলেও তাঁরা একই। ঠিক কথা কি?

উঃ হাঁ।

২৫-৪-১৯৩৩

×

তোমার ঐ স্বপ্নই ইঙ্গিত করছে যে মা আর আমি কারা এবং কিসের প্রতিনিধি—ওর চেয়ে বেশি কিছু বলার দরকার নেই। ওতেই বোঝা যাচ্ছে যে আমরা আছি ভগবৎ প্রেম ও আনন্দকে সম্পূর্ণ করতে।

১৯৩৩

মা এবং আমি একই কিন্তু দুই বিভিন্ন দেহে। দুই দেহ একই রকম কাজ করবে না। কাজেই একজন কেবল নির্দেশের চিহ্ন দেবে, অন্য জন প্রণাম গ্রহণ করতে ও ধ্যানে যোগ দিতে পারে।

> প্র : আপনাকে কিংবা মাকে লিখে জানানো কি একই কথা? দুজনেই যখন এক তখন যাকেই লিখি তাতে মায়ের কাছে খোলা হয়। সত্য কি?

উ : আমরা একই বটে, কিন্তু সম্পর্ক হিসাবে মায়ের কাছেই খোলা চাই।

> প্র : এমন কি হতে পারে যে আমি শ্রীঅরবিন্দের কাছে খুললাম কিন্তু মায়ের কাছে খোলা হলো না? অথবা মায়ের কাছে খুললে শ্রীঅরবিন্দেরও কাছে হলো?

উ : মায়ের কাছে খোলাই ঠিক। শ্রীঅরবিন্দের কাছে খুলে মায়ের কাছে না খোলার মানে বাস্তবিক সেটা শ্রীঅরবিন্দের কাছেও খোলা হলো না।

প্রঃ প্রায়ই আপনি বলেন যে মায়ের শক্তিকে পরিচালনা করতে চাও। তার মানে কি এই যে দুই রকম শক্তিতে কোনো পার্থক্য আছে?

উঃ শক্তি হলো একই, তা মায়ের শক্তি—কিংবা বলতে পারো যে মা-ই হলেন শ্রীঅরবিন্দের শক্তি।

মায়ের দেবত্ব জানা

প্রঃ বোধ করি ২৪শে নভেম্বর ১৯২৬ সালে শ্রীঅরবিন্দ যখন সিদ্ধিলাভ করেন তখন তিনি জানলেন যে মা-ই হলেন ভগবৎ চেতনা ও শক্তি। একমাত্র তিনিই পারেন পার্থিব চেতনাকে উঁচে ওঠাতে, সেই কাজই তিনি এখন করছেন। এই কি ঠিক কথা?

উঃ না, তা আমি অনেক কাল থেকে জানতাম।

সাধনায় পারস্পরিক সহযোগ

আধ্যাত্মিক জীবনে বা যোগের ব্যাপারে তৎপূর্বে কার কি ইতিহাস ছিল তাই নিয়ে কিছু যায় আসে না; আধ্যাত্মিক উন্নতি কার কি হলো তাই আমরা দেখি।

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের অনেক আগের থেকেই মা যোগ করছিলেন, এবং তাঁর সাধনা শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে একই লাইনে চলছিল। পরস্পরে যখন সাক্ষাৎ হয় তখন পরস্পরের সাহায্যে সাধনা সম্পূর্ণ হয়। যাকে শ্রীঅরবিন্দের যোগ বলা হয় তা শ্রীঅরবিন্দের ও মায়ের যৌথ প্রচেষ্টার সৃষ্টি, দুইই এখন এক হয়ে গেছে। আশ্রমে যে সাধনা করা হয় তা সরাসরি মায়ের পরিচালনাতেই হয়ে থাকে, পিছন থেকে শ্রীঅরবিন্দ তার সমর্থন করেন। যারা এখানে সাধনা করতে আসে তাদের মায়ের কাছে

সমর্পিত হতে হয়, মা তাদের সর্বদা সাহায্য দিয়ে আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে দেন।

×

> প্র : একজন আমাকে বললে, মাকে গুরু বলে চিনিয়ে দেবার আগে শ্রীঅরবিন্দ কাউকে কখনো যোগশিক্ষা দিতেন না। তিনি কেবল বলতেন যে নিজেদের জ্ঞান অনুসারে চলো। আপনি কি সত্যই তাই বলতেন?

উ : তা আমি জানি না। কিন্তু এখনও তো মা কাউকে তেমনভাবে শিক্ষা দেন না, তিনি কেবল বলেন নিজেকে খুলে রাখতে এবং গ্রহণ করতে। তিনিও এমন কথা বলেন না এবং আমিও কখনো বলিনি যে তোমাদের "জ্ঞান অনুসারে" চলো।

২৬-৪-১৯৩৩

মায়ের আগমনের পূর্ববর্তী সাধনা

আমার পথে বসে থাকা সম্বন্ধে তোমার গুরু কি বলেছেন বুঝলাম না; তা সত্য হতে পারে ১৯১৫ থেকে ১৯২০র মধ্যে যখন "আর্য" পত্রিকা লিখছি আর সাধনার কাজ অপেক্ষা করছে মায়ের ফিরে আসা পর্যন্ত। ১৯২৩ বা ১৯২৪এ সাধনা সম্বন্ধে সে কথা নয়, তবে কাজের বাহ্য স্বরূপ তখনও তৈরি হয়ে ওঠেনি বলে উপমারূপে বলা যায়। অন্য এক যোগীও বলেছেন যে আমি এত উপরে গেছি যে জগতের কাজে নেমে আসতে পারছি না; ওটাও তখনকার অবস্থার সম্বন্ধেই বলা যেতো, তার বেশি কিছু নয়।

১৬-৯-১৯৩৫

×

•

প্রঃ ক বলেছেন খকে যে ১৯২৬ থেকে মা ভার নেবার আগে সাধকরা বিশ্বচেতনা অনুভব করেছে এবং তখনকার সাধনা এখনকার চেয়ে আরো ভালো ও গুরুত্বপূর্ণ হতো। এ কথা কতখানি সত্য?

উঃ মায়ের আসার আগে সকলেই ছিল মনের অনুভূতি ও উপলব্ধি নিয়ে। প্রাণসত্তা প্রভৃতি অবিশুদ্ধ আর চৈত্য ছিল অন্তরালে। কেউ বিশ্বচেতনা পেয়েছিল কিনা জানি না। আমি তখনও রূপান্তর ও অতিমানসে যাবার পথ খোঁজাতে লেগে আছি (সাধারণ বেদান্তের যোগকে ছাড়িয়ে), যারা অল্পজন সাধক ছিল তাদের লাগাম ঢিল দিয়েছি। ক হলেন তাদেরই একজন—ওরা তখন যে প্রাণ স্বাধীনতা ও নিয়মমুক্তির মধ্যে ছিল তারই অভাব বোধ করছে।

২৭-৭-১৯৩৪

×

প্রঃ শ্রীমার ও আপনার শক্তির কার্যকারিতার বিষয়ে কোনও পার্থক্য আছে কি?

উঃ না, শক্তি একই।

২৩-৫-১৯৩৩

তৃতীয় বিভাগ

পথ সন্ধানীদের বিয়াবিপত্তি

পথ সন্ধানীদের বিঘ্নবিপত্তি

কঠিন পথ

এই যোগের পথকে কেউই গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড মনে করেনি, কও না খও না আর আমিও না কিংবা মা-ও না। এমন ধারণাগুলি আসে কল্পনার মোহে।

অগস্ট ১৯৩৫

মানবতার ভারবোঝা

আমরা যে সব কষ্ট ও সংগ্রামের ভিতর দিয়ে গেছি তার তুলনায় তোমারগুলি তো নেহাৎ ছেলেখেলা; সেগুলি তোমার সঙ্গে সমান বলিনি। আমি এই কথা বলেছি যে তিনিই হন অবতার যিনি মানুষের উচ্চ চেতনাতে এগিয়ে যাবার জন্য রাস্তা খুলে দিতে আসেন--সে রাস্তায় যদি কেউই না যায়, তাহলে আমাদের যা প্রত্যয়, যা ছিল খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণ ও বুদ্ধেরও কথা, তা সবই ভুল এবং অবতারের সমস্ত জীবন ও কর্মও অনর্থক। ক বলতে চান যে অবতারের পথকে অনুসরণ করার কোনো সাধ্য ও সম্ভাবনাই নেই, আর অবতারের যত কিছু কষ্টভোগ ও সংগ্রাম তা সমস্তই মিথ্যা ও ভুয়ো--যিনি স্বয়ং ভগবানের প্রতিভূ তাঁর আবার সংগ্রাম কিসের; তাহলে তো অবতার কথাটাই মিথ্যা হয়ে যায়, সে সবের কোনো যুক্তি নেই, কোনো প্রয়োজন নেই, কোনো অর্থ নেই। যিনি সর্বশক্তিমান তিনি পৃথিবীতে নেমে না এসে উপর থেকেই মানুষকে উঠিয়ে নিতে পারেন। কেবল যদি জগৎ ব্যবস্থার মধ্যে তার অংশ রূপে এই কথা থাকে যে তিনি নেমে এসে মানবতার ভারবোঝা নিয়ে তাদের জন্য রাস্তা খুলে দেবেন, তখনই অবতারত্বের একটা অর্থ হয়।

৭-৩-১৯৩৫

×

তুমি বলছ যে তোমার পক্ষে বা তোমার মতো লোকদের পক্ষে এ রাস্তা অসম্ভব রকমে কঠিন, কেবল আমি কিংবা মায়ের মতো "অবতার" জনেরাই এমন রাস্তায় চলতে পারে। এ তো এক অদ্ভুত ভুলবোঝা; ওর বদলে আমি বলব যে এই হলো সব চেয়ে সহজ সরল ও সোজা রাস্তা, যে-কেউ এ রাস্তায় চলতে পারে যদি সে তার মন ও প্রাণকে অচঞ্চল ক'রে রাখে...তোমার যতটা সামর্থ্য তার দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র যার আছে সেও পারবে। বরং অন্য যে সব কষ্টপ্রয়াসের ও দুর্দান্ত তপস্যার পথ, তা এর চেয়ে অনেক কঠিন। ,মা আর আমি দুজনেই আমরা সব রকম রাস্তা পরীক্ষা ক'রে দেখেছি, সকল পদ্ধতি পরখ করেছি, বিঘ্ন বিপত্তির দুর্গম পর্বত অতিক্রম করেছি, তোমাদের চেয়ে ও আশ্রমের ভিতরে বাহিরে সকলের চেয়ে অনেক বেশি গুরুভার বহন করেছি, অনেক লড়াই লড়েছি, অনেকরকম ঘা খেয়েছি, অনেক দুর্ভেদ্য জলা ও মরু ও অরণ্য ভেদ ক'রে চলবার রাস্তা করেছি, অনেক বিরোধকে জয় করেছি—যে কাজ আমি নিশ্চিত বলতে পারি আমাদের আগে কেউ কখনো করেনি। কারণ যাকে এমন কাজের পথে চলার জন্য নেতা হতে হবে তার কেবল ভগবানের প্রতিনিধি হয়ে তাঁকে নামিয়ে আনলেই চলবে না, তাকে মানুষের তরফেরও প্রতিনিধি হয়ে তাদের বোঝাগুলো পুরোপুরি বহন করতে হবে এবং ভোগ করতে হবে, কেবল লীলা হিসেবে নয় কিন্তু পুরো গুরুত্ব নিয়ে তাদের সকল দুঃখকষ্ট, সকল বাধাবিঘ্ন, সকল ব্যর্থতা ও প্রতিরোধ, এ পথে চলার পক্ষে যতটা যা সম্ভব সবই তাকে মেনে নিতে হবে। কিন্তু তাই বলে অন্য সকলকেই এসব জিনিসের পুনরাবৃত্তি করতে হবে না, আমাদের যা করতে হয়েছে তা আর কারো করার দরকার নেই। আমরা সে সমস্ত অভিজ্ঞতা শেষ ক'রে এসেছি বলেই এখন অন্য সকলকে সোজা ও সরল রাস্তাটা দেখিয়ে দিতে পারি—যদি কেবল তারা এ রাস্তা নিতে সম্মত হয়। অতখানি দাম দিয়ে কেনা এই নিশ্চিত অভিজ্ঞতার জোরেই তোমাকে ও অন্য সকলকে বলছি, "চৈত্য মনোভাবটি গ্রহণ করো; এই সোজা রৌদ্রালোকের পথে চলো—প্রকাশ্যে এবং গোপনে ভগবান তোমার সহায় হবেন—যদি গোপনেও থাকেন তবু ঠিক সময়ে তিনি দেখা দেবেন—কঠিন রুক্ষ ও দুস্তর ঘোরাপথ নিতে যেও না।"

৫-৫-১৯৩২

রৌদ্রদীপ্ত পথের প্রস্তুতি

প্রাচীন যোগী ও সাধকেরা প্রথমেই চেয়েছে শান্তি, অর্থাৎ অচঞ্চল নীরব মন--তাতেই আনে শান্তি--তারা বলেছে যে ভগবানকে উপলব্ধি করতে আগে তারই প্রয়োজন। হৃদয় আলোকিত হয়ে প্রফুল্ল থাকলে তা আনন্দের উপযুক্ত আধার হতে পারে, তাহলে আনন্দ বা যাতে আনন্দ মেলে তা কেমন ক'রে ভগবৎ মিলনের অন্তরায় হবে? তবে হতাশা জিনিসটা অবশ্য এ পথের একটা মারাত্মক বোঝা। "The Pilgrim's Progress"এর ক্রিশ্চান যেমন হতাশার খানাখন্দ অতিক্রম করেছিল তেমনি ভাবে ওকে পার হতে হবে, কিন্তু পুনঃপুনঃ হতে থাকলে তা রীতিমত বাধা বৈকি... আমি ভালোরকমই জানি যে কষ্ট ও নানা যন্ত্রণা ও সংঘর্ষ ও আশাভঙ্গ আসা এতে স্বাভাবিক, যদিও অপরিহার্য নয়, তা যে আসে সাহায্য করতে এমন কথাও নয়, কিন্তু আমাদের মানব প্রকৃতির তমসাই ওগুলিকে আমাদের উপর চাপায়, যার সঙ্গে লড়াই ক'রে আমাদের আলোতে পৌঁছতে হবে।...রামকৃষ্ণ এই মুক্ত রোদে চলা পথের সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিলেন না। তিনি এও বলেছেন যে এটি শীঘ্রের ও সহজের পথ।

আমি যে কষ্ট দুঃখ ও বিপদের দিকটা এড়াবার জন্য নিজে এই পথ ধরেছি তা নয়। এসব জিনিস আমি তো পুরোপুরিই ভোগ করেছি আর মা তার চেয়ে দশগুণ আরো বেশি ভোগ করেছেন। কিন্তু তার কারণ এই যে এমন পথ যারা আবিষ্কার করতে যায় তাদের পক্ষে এই সকলের সম্মুখীন হয়ে সব কিছুকে জয় করতে হয়। সাধকের ভাগ্যে এমন কোনো বিপত্তি আসে না যার সম্মুখীন আমাদের হতে হয়নি; কোনো কোনোটার বিরুদ্ধে আমাদের একশো বার লড়তে হয়েছে (তবুও কম বললাম) তবে তাকে জয় করা গেছে; এখনও অনেকগুলি থাকতে চায় এবং তা থাকবে পূর্ণ রকমের পূর্ণতা না আসা পর্যন্ত। কিন্তু অন্যেদেরও তাই ভোগ করতে হবে এমন আমরা কখনো বলি না। বস্তুত অন্যেদের রাস্তা এখন থেকে সহজ ও সাধ্য ক'রে দেবার জন্যই আমরা অত বোঝা বয়েছি। এই কারণেই মা ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যে এ পথের যত কিছু বিপদ, বাধা ও দুঃখভোগ আছে সমস্ত আমাকেই দেওয়া হোক, অন্যেদের যেন তা ভোগ করতে না হয়। বছরের পর বছর প্রত্যহ দিন ঐরূপ মারাত্মক কষ্ট ও সংগ্রামকে অতিক্রম ক'রে তার ফলে তিনি এই ক্ষমতা

পেয়েছেন যে এখন যারা ঐকান্তিক বিশ্বাসে তাঁর উপর নির্ভর করে, তারা এই রৌদ্রালোকের পথে নির্বিঘ্নে চলে, আর যারা তা না পারলেও আস্থা নিয়ে থাকে তারা হঠাৎ দেখে যে তাদের পথ সহজ হয়ে গেছে, এবং আবার যদি তা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তখন দেখা যায় যে অবিশ্বাস, বিদ্রোহ, অভিমান, প্রভৃতি অন্ধকার এসে পড়াতেই তা হয়েছে। এই আলোর পথ মিছে গল্পকথা নয়।

কিন্তু তুমি বলবে, যারা তা পারলে না? তাদেরই জন্য আমি চেষ্টা করছি সমুচিত সময়ের মধ্যে অতিমানসকে নামিয়ে আনতে। জানি যে সেই শক্তি একদিন নামবে, কিন্তু আমি চাই তা শীঘ্র এগিয়ে আসুক, আর পার্থিব প্রকৃতির শত বাধা সত্ত্বেও এবং আসুরিক শক্তিদের প্রচণ্ড প্রতিরোধ সত্ত্বেও তা পৃথিবীর মাটির দিকে নামছে। কিন্তু অতিমানস সম্বন্ধে তুমি যা ভেবেছ তা নয়, কঠিন হিমশীতল পাথরের মতো জিনিস কিছু নয়। ওর মধ্যে রয়েছে ভগবৎ প্রেম ও ভগবৎ সত্য, এবং তার রাজত্ব যখন আসবে তখন যে তাকে গ্রহণ করবে তার পক্ষে রাস্তা হবে নিষ্কণ্টক, সরল ও প্রাচীরের বাধা বর্জিত, প্রাচীন ঋষিরা যার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন।

অন্ধকারের পথও রয়েছে, ক্রিশ্চান সাধুদের মতো অনেকেই আধ্যাত্মিক পীড়ন ভোগকে কাম্য বলে মনে করে যে জয়লাভের জন্য ওটাই তার যথোচিত মূল্য। হতে পারে তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে, অনেকের জীবনের প্রথম দিকে তাই হয়েছে, আর কেউ কেউ তাই নির্বাচন ক'রেও নেয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে সকল কষ্টকে ধৈর্য ও অটুট সহনশীলতার সঙ্গে মাথা পেতে নিতে হবে। স্বীকার করি যে তা সয়ে যেতে পারলে ঐসব শক্তির দ্বারা আক্রমণের ও পরীক্ষার একটা অর্থ হয়। ওতে প্রত্যেক জয়লাভের পরে খানিকটা ক'রে অগ্রগতি হয়; ওগুলি যেন কষ্টের তীব্রতা দেখিয়ে দিয়ে বলে, "এটা তোমাকে জয় করতে হবে"। তথাপি বলব যে ওরূপ পথ যথেষ্ট অন্ধকার ও দুরূহ, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে ও পথে না যাওয়াই ভালো।

কতজনই আপন তপস্যা প্রভৃতির উপর নির্ভর ক'রে যোগ সাধনা করেছে, উপরের ভগবৎ কৃপার উপর আস্থা না রেখে। তাতে কিছু নয়, কিন্তু আসল কথা হলো একটা উচ্চতর সত্য ও উচ্চতর জীবনের জন্য আপন আত্মার আকিঞ্চন, সেটাই অপরিহার্য। সেটি যদি থাকে সেখানে কৃপার উপর বিশ্বাস থাক বা নাই থাক তথাপি তা কাজ করবে। যদি বিশ্বাস রাখো, কাজটা তাড়াতাড়ি হবে; যদি তা না করতে পারো, তথাপি

আত্মার আস্পৃহা সার্থক হবেই, যত কেন বিপত্তি ও সংগ্রাম আসুক।

প্রাণশক্তি্র সংবেদনশীলতা

প্র ঃ সকলকেই কি প্রাণশক্তি্র সংবেদনশীলতার ভিতর দিয়ে যেতে হয়?

উ ঃ মাকে ও আমাকেও এর ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। ব্যক্তি-চেতনা যখন বিশ্বচেতনার দিকে বিকশিত হয় তখন এর আসা অবশ্যম্ভাবী।

১৭-৪-১৯৩৬

ত্যাগের আনন্দ

আচ্ছা, তুমি কি ভাবো যে মা কিংবা আমি কিংবা আর যারা আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণ করেছে তারা পার্থিব জীবন উপভোগ করতে পায়নি বলেই তাই করেছে, আর মা-ও তাই ত্যাগের আনন্দের কথা বলেন? কিংবা মনে করো যে প্রথম অবস্থাতে আমরা দেহানন্দের জন্যই লালায়িত থেকে পরের অবস্থাতেই আধ্যাত্মিক ত্যাগের আনন্দ খুঁজে পেয়েছি? অবশ্যই তা নয়; আমরা এবং আরো অনেকে খুশির সঙ্গেই ত্যাগ করেছি যখনই যোগ দরকার মনে করেছি এবং তার জন্য পরে লালায়িত হইনি। তোমার পক্ষে যে কঠোর নিয়ম তা সকলের জন্য নয়।

১৭-১০-১৯৩৫

রিক্ত জীবনের যুগ

(সাধক সাধিকাদের কারো কারো শৌখিন পরিচ্ছদ সম্পর্কে)

উপলব্ধির পরে উচ্চশক্তি্র ইচ্ছা যেমন চায় তাই করাই ভালো—কিন্তু গোড়ার নিয়ম হলো অনাসক্তি। প্রথমে কঠোর নিয়মে না চলে

মুক্তিলাভ খুব কম জনেরই ভাগ্যে হতে পারে। আমাকে ও মাকে বহু বছর যাবৎ স্বেচ্ছাকৃত রিক্তজীবন যাপন করতে হয়েছে।

১৫-১১-১৯৩৩

মানব প্রকৃতির জ্ঞান

বোধ করি মানব প্রকৃতির দুর্বলতা, অজ্ঞানতা ও দ্বৈত-ভাবের কথা আমার যথেষ্টই জানা আছে, তোমার চেয়ে অনেক বেশি জানি। মা কিংবা আমি আধ্যাত্মিক দিকে বড়ো হলেও ব্যবহারিক দিকে অজ্ঞ, এই ধারণাটাই যেন এই আশ্রমে খুব সাধারণ। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উচ্চস্তরে উঠলেই যে জগতের সম্বন্ধে বা মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ বা অমনোযোগী হয়ে পড়তে হয় এমন ধারণা করা ভুল। আমি যদি মানব প্রকৃতির কথা না জানি বা না বুঝি তাহলে আমি কারো রূপান্তর আনার সহায়ক হতে পারি না, কারণ যে প্রকৃতিকে আমি চিনি না বা চিনলেও যার ক্রিয়ারীতির দিকে নজর দিই না, তার পরিবর্তনও আনতে পারি না। যদি আমি পৃথিবীর মানুষদের স্তরকে অনন্ত আলো শক্তি আনন্দ ও অটুট ইচ্ছাশক্তির স্তরের মতো বলে ধরে নিতাম, তাহলে আমি একটা পাগল বা আকাট মূর্খ বা মূঢ়ের মতো মিউজিয়মে রাখার যোগ্য হতাম।

৩০-৪-১৯৩৭

×

যুক্তিতর্কের কোনো দরকার নেই, একটু সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়। কেউ যদি এমন কথা ভাবে যে এই অজ্ঞানতা সীমাবদ্ধতা ও দুঃখভোগের জগৎ এমন হলেও তা অনন্ত আনন্দ ও শক্তি ও আলোর রাজ্য বা স্তর, তাহলে সে যেই কেন হোক তাকে আত্মপ্রতারক নির্বোধ বা উন্মাদ ছাড়া আর কি বলা চলবে? আর তাহলে উপরের স্তর থেকে এখানে আলো শক্তি প্রভৃতিকে নামিয়ে আনারই বা কি দরকার, যদি এখানকার পশু-মানব সত্তাদের দল আপনা থেকেই আনন্দে বিহার ক'রে বেড়াতে থাকে? কিন্তু তোমারও হয়তো অমকের মতো সেই মত যে—ভগবান যদি এখানেই

থাকেন, তবে আবার তিনি নেমে আসবেন কোথা থেকে? তিনি এখানে থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি তাঁর আলোকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দিয়ে আর আনন্দকে দুঃখ দিয়ে ঢেকে রেখেছেন; তাতেই এ স্তর এমন হয়েছে। এখন যদি কেউ কেবল সেই আলোর ও আনন্দের দিকে ডিঙিয়ে উঠে যায়, তাতে তাঁর চেতনা বদ্‌লে গেলেও এ স্তরের ক্রিয়াগুলো খুব কমই বদলাবে।

৩-৫-১৯৩৭

জ্ঞানের ভিত্তিতে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস

তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিই যে এককালে আমিও বুদ্ধিবাদী ছিলাম আর সংশয়ী কম ছিলাম না—মা আর আমি দুজনেই আমরা মনের দিক থেকে চেয়েছি প্রত্যক্ষ ইতিবাচক নিরেট ফলের দিকে, তাতে কোনো রাসেল অপেক্ষা আমরা কম যাইনি। রোলাঁ প্রভৃতি যারা ভাব ও বাক্যের ছটাকে সত্য ধরে নিয়ে খুশি হয় আমরা তেমন কোনোকালেই ছিলাম না। একটা ভাবগত অনুভূতিতে এবং ক্রিয়াগত বহিঃপ্রকাশী শক্তিতে যে কতখানি তফাৎ তা আমরা বিলক্ষণ জানি। সুতরাং যদিও আমরা বিশ্বাস রাখি (আর নিজের কাজের উপর জোর বিশ্বাস ছাড়া কে কবে জগতে কোনো বড়ো কাজ করতে পেরেছে?) তথাপি আমরা কেবল বিশ্বাসকেই ভিত্তি ক'রে নেই, বস্তুত জ্ঞানের উপর আমাদের ভিত্তি, যে জ্ঞানকে আমরা সারা জীবন পরীক্ষা ক'রে ও অনুশীলন ক'রে এসেছি। বরং বলতে পারি যে কোনো বিজ্ঞানী যেমন তার জড়ের স্তরে নিখুঁতভাবে বার বার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, আমি তার চেয়েও বেশি নিখুঁত ভাবে বছরের পর বছর দিবারাত্র তাই চালিয়ে গেছি। আর সেই কারণেই আমি এখন জগতের বর্তমান অবস্থা দেখে ও বিরোধী শক্তিদের উত্তরোত্তর বিক্রম প্রকাশ দেখে ভয় পাই না, যদিও উপরের আলো যতই পৃথিবীর কাছাকাছি নেমে আসছে ততই বিরোধী সব শক্তি তাদের প্রতাপকে জোরদার ক'রে সফল করতে চেষ্টা করছে।

আমি যদি কেবল আসবার সম্ভাবনার কথাই নয়, কিন্তু অতিমানস নিশ্চয় নেমে আসবে এটা প্রকৃতই অনুভব করি (কোনো তারিখ দিয়ে বলছি না), তার কারণ আমার এই বিশ্বাসের যথেষ্ট বাস্তব হেতু আছে,

যা ফাঁকা বিশ্বাস নয়। আমি জেনেছি যে অতিমানসের অবতরণ অপরিহার্য---এ কথাও আমার অভিজ্ঞতা হতে বিশ্বাস করি যে এই সময়েই এবং এখনই ঘটবে ও ঘটা উচিত, কোনো দূর ভবিষ্যতে নয়...কিন্তু ভবিষ্যতে ঘটবে বলেও যদি জানতাম তথাপি আমার এই পথ থেকে আমি একটুও টলতাম না কিংবা নিরুদ্যম হয়ে আমার প্রচেষ্টাকে শিথিল হতে দিতাম না। আগে হলে বরং তা হতে পারত কিন্তু এখন আর সে কথা নয়---এতখানি রাস্তা চলে আসার পরে। সত্য সম্বন্ধে যে সুনিশ্চিত হয়েছে, যে বিশ্বাস করে যে তার পথই একমাত্র মীমাংসার পথ, সে তৎক্ষণাৎ সাফল্যের প্রত্যাশা রাখে না, সে আলোর দিকে সমানে এগোতে থাকে, তার দুস্তর যাত্রার পথে যত কিছু বিপত্তির সম্ভাবনার সমুচিত মূল্য দিতে প্রস্তুত থেকে। যাই হোক, আমি তোমার মতো এই জীবনেই তা পেতে চাইছি, পরবর্তী জীবনে বা সুদূর ভবিষ্যতে নয়।

৩০-৮-১৯৩২

ধাপে ধাপে অগ্রগতি

বর্তমান অবস্থা নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না, বিশেষত আমার ও মায়ের কাজের ভবিষ্যৎ সুফল সম্পর্কে। কেবল এইটুকু মানছি যে সাম্প্রতিক সময়টা খুব ভারী হয়ে উঠেছিল, দৈহিকের ও বাস্তবের স্তরে জোর বিরোধী আক্রমণ চলেছিল---কিন্তু তেমন আক্রমণে গত ত্রিশ বছর যাবৎ আমরা অভ্যস্তই হয়েছিলাম, তাতে আমাদের প্রয়োজনমত এগিয়ে চলতে কোনো বাধাই হয়নি। এপথ যে অনায়াস ও সহজ হবে এমন মিথ্যা আশা আমি কখনই করিনি; বরাবরই জানি যে সকল রকমের বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে পারলে তবেই আমার এ কাজ করা যাবে; সুতরাং ওতে আমাকে নিরুৎসাহ বা ক্লান্ত করতে পারে না, যতই কেন সে বাধা আমাদের মধ্যে বা সাধকদের মধ্যে বা প্রকৃতির মধ্যে প্রবল হোক।

না, আমি ক্লান্তও নই, আর ছেড়ে দিতেও ইচ্ছুক নই। গত দুই তিন মাসের মধ্যে আমি ভিতরে ভিতরে এমন কয়েক ধাপ এগিয়েছি যা কয়েক বছরের প্রতিরোধের দরুন খুবই অসম্ভব ছিল, সুতরাং তাতে এখন আর হতাশা বা ছেড়ে দেবার কথা ওঠে না। এক দিকে প্রতিরোধ হলেও অন্য

দিকে যথেষ্ট লাভ মিলেছে—সবই যে বন্ধ্যা অন্ধকার তা নয়। তোমাকে কেবল যত বাজে সংশয়ের রাক্ষসরা ধাক্কা দিয়ে তোমার খোলা দরজাকে দুম্ ক'রে ভেজিয়ে দিচ্ছে; ঐসব রাক্ষসদের বধ করো, তখন সব দরজা খুলে যাবে, যেমন আরো অনেকের হয়েছে যারা ইতিপূর্বে নিজেদের মন ও প্রাণপ্রকৃতির প্রভাবে আটক হয়ে ছিল।

১২-১-১৯৩৪

অবতরণের গতি বৃদ্ধি

উচ্চশক্তি যে আরো বেশি জোরে অবতরণ করছে এ-কথা ভুল নয়। অনেকেই এখন মাকে ঘিরে নানারকম আলো ও বর্ণালি দেখতে পাচ্ছে এবং তাঁর সূক্ষ্ম জ্যোতির্ময় দেহও দেখা যাচ্ছে—তার মানে তাদের অতি-ভৌতিক দৃষ্টি খুলছে, কোনো মিথ্যা মায়া নয়। আর যে সব আলো বা রং তোমরা দেখ ওগুলি হলো বিভিন্ন স্তরের শক্তি, প্রত্যেকটি বর্ণের আলাদা আলাদা শক্তিবিকাশ।

অতিমানস শক্তি নামছে, কিন্তু এখনও দেহ বা জড়বস্তুকে অধিকার করেনি—তার পক্ষে এখনও অনেক বাধা রয়েছে। এখন কেবল অতি-মানসগত অধিমানস এসে স্পর্শ করেছে, এর পরে যে কোনো মুহূর্তে ওর বদলে অতিমানস স্বয়ং তার আপন শক্তিতে এসে দখল নিতে পারে।

১৪-৯-১৯৩৪

অবতরণের সুদীর্ঘ প্রণালী

কে এমন কথা ক্-কে বলেছে তা জানি না, কিন্তু মা কখনো কাউকে এমন কথা নিশ্চয় বলেননি যে ২৪শে নভেম্বর তারিখে অতিমানস অবতরণ করবে। তার অবতরণ হতে অনেক সময় লাগে, অন্ততপক্ষে তার প্রস্তুতি হতেও দীর্ঘকাল লাগে; এখন কেবল এই কথাই বলা যায় যে কাজটা কখনো বা সম্পূর্ণ হবার জন্য জোর চাপ দিচ্ছে, কখনো বা নিচেকার চাপে বাধা পেয়ে তার সঙ্গে মোকাবিলা ক'রে তবে এগোতে হচ্ছে। এ হলো

আধ্যাত্মিক বিবর্তনের দীর্ঘ প্রণালীকে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে গুটিয়ে আনা—তা অন্যরকম ভাবেও হতে পারত (যাকে বলে হঠাৎ অঘটন ঘটিয়ে) যদি মানব মন যথেষ্ট নমনীয় হতো আর আপন অজ্ঞানতাকে কম আঁকড়াতো। আমরা যতদূর দেখতে পাচ্ছি, ওটা প্রথমে অল্প কয়েক-জনের মধ্যে প্রকাশ পাবে তার পরে ক্রমশঃ ছড়াতে থাকবে, সমগ্র পৃথিবীকে এককালে অভিভূত করবে না। সে কি করবে আর না করবে তাই নিয়ে বেশি আলোচনা করা ঠিক নয়, কারণ সে বিষয়ে অতিমানস তার আপন দিব্য সত্য থেকে আপনিই স্থির ক'রে নেবে—কোন খাতে সে চলবে তা মনের তরফ থেকে স্থির ক'রে দেবার কথা নয়। তবে অতিমানস রূপান্তর ঘটলে তাতে শেষ পর্যন্ত স্বভাবতই অবচেতন অজ্ঞানতা থেকে মুক্তি, ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি, ইচ্ছামত পরমায়ু, দৈহিক ক্রিয়ারীতির পরিবর্তন এগুলি এসে পড়বে; কিন্তু কতটা কি হবে তা অতিমানস শক্তি তার আপন প্রকৃতি অনুযায়ী নির্ধারণ করবে।

১৮-১০-১৯৩৪

অবতরণে বাধা

আমার চিঠিগুলিতে আমি অতিমানস ও তার দুর্নিবার বাধা সম্বন্ধে যা লিখেছি সে কথা নিশ্চয় আগেও বলেছি। এমন কথা বলিনি যে বাধা-গুলি অপ্রত্যাশিত বা তাতে কিছু কাজের পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু এই অবতরণ স্বেচ্ছামত ব্যাপার বা হঠাৎ অঘটনের মতো জিনিস নয়। এ হলো বিবর্তন প্রক্রিয়াকে কয়েকটা বছরের মধ্যে ত্বরান্বিত ক'রে বর্তমান প্রকৃতির নিম্নতর স্তরগুলিতে তার আপন আলোকপাতের দ্বারা সত্যের অনুপ্রবেশ ঘটানো। এ জিনিস এককালে সমগ্র জগতের মধ্যে হতে পারে না, প্রথমে তা হবে কয়েকটি নির্বাচিত আধারের মধ্যে ও পরে তার বিস্তৃতি হবে। সে কাজ প্রথমে আমাদের নিজেদের মধ্যে এবং এখানকার পার্থিব চেতনাযুক্ত সাধক মণ্ডলীর মধ্যে করিয়ে নিতে হবে। যদি অল্প কয়েক-জনের মধ্যেও তা খুলে যায়, ওর কাজের পক্ষে তাই যথেষ্ট হবে। কিন্তু যদি অনেকেই ভুল বোঝে এবং বাধা জন্মায় (সকলে নয়) তখন কাজটি বিলম্বিত ও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, তথাপি তা অসম্ভব হবে না। অসম্ভব

হয়ে পড়ছে এমন কথা আমি বলিনি, কিন্তু আমরা যদি এই বিশেষ গুরুত্বের কাজের দিকে যথেষ্ট অবহিত না হয়ে অন্য সব অবান্তর কাজের দিকে অধিক ব্যাপৃত থেকে প্রতিকূল অবস্থা এনে ফেলি, তাহলে ওর অবতরণে বিলম্ব হবেই। অবশ্য অতিমানস পৃথিবীর বুকে নেমে যখন পার্থিব চেতনার মধ্যে সজোরে অনুপ্রবিষ্ট হতে পারবে তখন আর আসুরিক কোনো মায়ার কাজ করার বা টিকে থাকার কোনো সম্ভাবনাই হবে না।

আর বাকী যা বলেছি তা ওর পূর্বেকার এই মধ্যবর্তী কালের মধ্যে মানুষ ও দিব্যশক্তি কি করবে তাই নিয়ে। বলতে চেয়েছি যে মা যদি আগেকার মতো দেবতাদের ব্যক্তিত্বকে ও শক্তিকে আপন দেহসত্তার মধ্যে নামিয়ে আনতেন, যেমন তিনি এর আগে কয়েক মাস যাবৎ করেছিলেন, যে সময়টা ছিল এই আশ্রমের সর্বোজ্জ্বল যুগ, তাহলে কাজটা খুব সহজ হয়ে যেতো আর এই সব মারাত্মক আক্রমণও বস্তুতপক্ষে হতে পারত না। তখনকার দিনে মা সাধকদের সঙ্গে নিয়ে ধ্যান করতেন, কিংবা সারা দিন রাত না ঘুমিয়ে ও খাওয়াদাওয়া নিয়মিত না ক'রে সর্বক্ষণ কাজ ও একাগ্রতা নিয়েই থাকতেন, তাতে তিনি একটুও অসুস্থ বা ক্লান্ত হননি, সব কিছু চলে যাচ্ছিল বিদ্যুৎবেগে। যে শক্তির দ্বারা কাজ হচ্ছিল তা অতিমানসের নয়, অধিমানসের, কিন্তু তা ঐ কাজের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু পরে সাধকদের নিম্ন প্রাণ ও দেহ প্রকৃতি সে কাজের অনুসরণ করতে পারলে না, বাধ্য হয়ে মাকে ঐ সব ব্যক্তিসত্তা ও শক্তিদের সরিয়ে দিতে হলো যাদের সাহায্যে তাঁর কাজগুলি হচ্ছিল, তাদের অন্তরালে রেখে তিনি নেমে এলেন স্থূল মানব স্তরে তারই অবস্থানুযায়ী কাজ করতে, তার মানেই তখন এসে পড়ল যত কিছু বিপত্তি, সংগ্রাম, অসুস্থতা, অজ্ঞানতা, জড়তা। সবই হয়ে দাঁড়াল মন্থর, কণ্টকর, প্রায় নিষ্ফল, কেবল এখন আবার এগিয়ে চলা সম্ভব হতে পেরেছে। কিন্তু এই অগ্রগতি সাধারণভাবে সার্থক ও দ্রুত হবার জন্য সাধকদের সকলের, কেবল অল্প কয়েকজনের নয়, একটা পরিবর্তন আসা দরকার। তাদের পক্ষে বাহ্য দৈহিক চেতনার ব্যাপারগুলির দিকে বেশি মন না দিয়ে যোগী ও সাধকের উপযোগী প্রকৃত সত্য চেতনার দিকে নিজেদের উন্মীলিত করতে হবে। তা করতে পারলে তাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাবে, আর তখন যদি মা আগেকার মতো আবার সেই সব দিব্য শক্তিদের বাইরে এনে অভিব্যক্ত করেন, তাতে তারা আর ভয় পাবে না কিংবা বিহ্বল হবে না। তারা মাকে আর তাদের নিজেদের

স্তরে নামিয়ে রাখতে না চেয়ে সানন্দে নিজেদেরকে উপরে তুলে নিতে দেবে। তাতে এই সকল বিপত্তি দশগুণ কমে যাবে, কাজটা অনেক সহজ হয়ে আসবে।

এই কথাই বলতে চেয়েছিলাম; হয়তো অনেকের এ-কথা বুঝতে বিলম্ব হতে দেখে একটু অধৈর্য হয়েছিলাম যে—আমাদের যোগের মূল সূত্রই হলো রূপান্তর আনা, যাতে মানব প্রকৃতির মধ্যে যত কিছু অসঙ্গতি আছে তা আলো পেয়ে দূর হয়ে যায়, যা কিছু সঙ্গতি আছে তা দিব্যের সঙ্গতিতে পরিবর্তিত হয়ে আরো সুন্দর, বিশুদ্ধ, বৃহত্তর, মহত্তর হয়ে ওঠে, আরো কিছু তাতে যুক্ত হয় যা মানব বিবর্তনের মধ্যে ছিল না। তাই বলতে চেয়েছিলাম যে সাধকেরা যদি তাদের অজ্ঞানতার মনোভাবকে কিছু কমিয়ে দিয়ে এই দিকে আরো দ্রুত এগিয়ে আসে তাহলে কাজটা আরো ভালো ভাবে হয়,—আর তা যদি না পারে তাহলে আমাদের যেমন ক'রে হোক চালাতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত অতিমানস এই বস্তুজগতের স্তরে নেমে না আসে।

আর তোমার এই অর্থহীন হতাশ ভাবটিকে ত্যাগ করতে হবে। আমি যার কথা বললাম সেই দিকগুলিকে প্রশ্রয় দেবার ফলেই ওটা এসেছে; ঐগুলি ছাড়লে ঐ ভাবটিও কেটে যাবে। উন্নতি আসতে দেরী লাগবে, কিন্তু তা আসবেই; আর অতিমানস শক্তি এসে গেলে তখন সবই সুনিশ্চিত ও ত্বরান্বিত হবে।

১৮-১০-১৯৩৪

তুমি হয়তো বলবে, "মা নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন, এর জন্য দায়ী অতিমানস, কারণ অতিমানসকে জড়জগতে নামাবার জন্যই মা সরে দাঁড়িয়েছেন।" কিন্তু অতিমানসের দোষ নেই; অতিমানস সহজেই নেমে আসতে পারত আগেকার অবস্থা থাকলে, যখন দেহপ্রাণের সংযোগ ঘটাবার জন্য মা যে ব্যবস্থা করেছিলেন তা সাধকদের বিরুদ্ধ মনোভাব ও আশ্রমের আবহাওয়ার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার দ্বারা দূষিত হয়ে না উঠত। তখন সরা-সরি অতিমানসের শক্তির কাজ হয়নি, সেখানকার কম আলো পাওয়া অন্য এক মধ্যবর্তী শক্তির দ্বারা কাজ হচ্ছিল, কিন্তু উচ্চ ক্রিয়ার রাস্তা

খুলে দেবার পক্ষে তাতেই যথেষ্ট হতো, যদি নিচেকার প্রাণের অসংস্কৃত স্তর থেকে এই সব বিরোধী শক্তিরা বেরিয়ে না পড়ত। তার দ্বারা এমন তীব্র বাধার সম্ভাবনা হচ্ছিল যাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। এমন না হলে মা এইভাবে সরে দাঁড়াতেন না; তথাপি তা ক্ষেত্র পরিত্যাগ করা নয়, যাকে বলে সাময়িক ভাবে কৌশলপূর্ণ পশ্চাদপসরণ। সুতরাং অতিমানস এর জন্য দায়ী নয়; বরং অতিমানস এবার এসে পড়বে এবং তখন সব বিপত্তির শেষ হবে।

১৪-১-১৯৩২

সাধনার দেহস্তরে অবতরণ

> প্র ঃ দেহের স্তরে সাধনা হলে তখন কি সকল সাধককেই দেহচেতনাতে নামতে হয়, অথবা যাদের মধ্যে অধিক জড়তা ও অশুদ্ধি আছে তাদের বেলাতেই হয়, যেমন আমি?

উ ঃ সকলকেই সম্পূর্ণ নামতে হবে কিনা তা বলা কিছু কঠিন। মাকে আর আমাকে ঐ স্তরে নেমে আসতে হয়েছে নতুবা কোনো কাজ হয় না। আমরা চেষ্টা করেছি উপর থেকে মন ও উচ্চ প্রাণের মাধ্যমে কাজ করতে, কিন্তু তা হলো না কারণ সাধকরা তার জন্য প্রস্তুত ছিল না—তাদের নিম্ন প্রাণ ও দেহসত্তা তা নিতে পারলে না কিংবা বিপরীত উচ্ছল প্রতিক্রিয়া এনে তার অপব্যবহার করলে। তখন থেকে সাধনা আমাদের সাথে সাথে দেহচেতনাতে নেমে এসেছে। অনেকে তার অনুসরণ করেছে—কেউ তৎক্ষণাৎ কোনো মন প্রাণের প্রস্তুতি না করেই, কেউ বা মন প্রাণকে ধরে থেকে তিনটির মধ্যেই, কেউ বা তৈরি মন প্রাণ নিয়ে সম্পূর্ণরূপেই। এই দেহচেতনাতে পুরোপুরি নেমে কাজ করা খুব মুশকিলের ব্যাপার—তার মানে অনবরত নানা দীর্ঘস্থায়ী বিপত্তির চাপ, কারণ দেহ জিনিসটাই তামসিক, জড়তাপূর্ণ, আলোর দ্বারা অভেদ্য। কেবল অভ্যাসের দাস, অবচেতনের ও তার যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ক্রীতদাস। আক্রমণে প্রাণের চেয়ে এতে কম সাড়া জাগে, কেবল ব্যাধি প্রভৃতি কয়েক রকমের বিশেষ দৈহিক

আক্রমণ ছাড়া, কিন্তু বদ্ধ এবং অলস থেকে আপন রীতি ত্যাগ করতে সে চায় না যতক্ষণ পর্যন্ত উপরের আলো শান্তি শক্তি ও আনন্দ এসে ওর উপর চেপে না বসে। আমাদের তরফ থেকে আমরাই চেয়েছিলাম যে ঐসব কঠিন জিনিসগুলো নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে কাজটা সহজ হয়ে এলে তখন সকলকে ডেকে নেবো, কিন্তু তা সম্ভব হলো না।

এর মধ্যে অশুদ্ধির কোনো প্রশ্ন নেই, কেবল তুমি একটু বেশি তাড়াতাড়ি নেমে গিয়েছ। ঐ সময়টিতে আত্মার শান্তি ও নীরবতা আসছিল এবং মাথার উপরকার উচ্চতর চেতনাতে আত্মার উপলব্ধি স্থায়ী হবার সম্ভাবনা ছিল। তা যদি আগে হয়ে যেতো তাহলে তখন এতটা কষ্টকর হতো না। এখন জড়তার বিরুদ্ধে অনেক সংগ্রাম করে তবে কাজ এগোবে—কিন্তু অধ্যবসায় থাকলেই তা হয়ে যাবে। তখন সব সহজ হয়ে আসবে।

৩১-১২-১৯৩৪

নতুন শক্তি

অমুকের মাকে আরোগ্য করতে পারলে তা নিশ্চয়ই একটা উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথা, আর যদিও রোগটা খুবই দুর্বার ও অনমনীয় ও মারাত্মক তথাপি তাকে দূর করা একেবারে অসম্ভব নয়। তুমি ঠিকই বলেছ, শক্তি আগে বেশ কাজ করছিল, কিন্তু যেখানে পুরো বিশ্বাস ও গ্রহিষ্ণুতা নিয়ে থাকে (বিশেষত সাধকদের মধ্যে) এবং আরো কিছু ভালো অবস্থা থাকে তবেই সেখানে তা খুবই শীঘ্র এবং সম্পূর্ণভাবে সফল হতে পেরেছে।

সেই সকল ফল দেখে মনে হয় যে এই শক্তি একটা নতুন ক্ষমতা ও নতুন ক্রিয়ারীতি গ্রহণ করেছে। এ শক্তি যে বাইরে বিস্তৃত হয়েও কাজ করতে পারে বলে তুমি ধারণা করেছ তার সপক্ষে যুক্তি আছে; কারণ পৃথিবীর আবহাওয়াতে যখন এমন কিছু এসে পড়ে যা আগে কখনো ছিল না তখন তা অনেক দিক দিয়ে অভাবনীয় রূপে কাজ করতে শুরু করে। তাই দেখা গেছে যে এই যোগের ক্রিয়া যখন শুরু হলো তখন তা দূরস্থিত এমন কয়েকজনের উপর গিয়ে কাজ করল যাদের আমাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই এবং যারা বুঝতেই পারলে না যে তাদের মধ্যে কি হচ্ছে। এমন হতেই পারে কারণ প্রকৃতি এখনও বিবর্তনশীল, সুতরাং নতুন রকম

আলো এবং শক্তি তার মধ্যে এসে পড়লে তা চেতন পার্থিব অস্তিত্বের অংশ-স্বরূপ হয়ে যেতে পারে।

২৯-১-১৯৩৬

দৈহিক স্তরের সংগ্রাম

রোগব্যাধি সম্পর্কে এই বলা যায় যে দৈহিকের স্তরেও পূর্ণতালাভ করা এই যোগের একটি বিশেষ আদর্শ, কিন্তু তা হলো সব শেষের কথা; যতক্ষণ পর্যন্ত বাস্তব চেতনাতে,—দেহও যার অন্তর্গত, সেইখানে কিছু মূলগত পরিবর্তন না ঘটছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য স্তরে পূর্ণতা কিছু ঘটলেও দেহের বেলাতে রোগজয়ের পূর্ণতা আসবে না। আমরা স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের জন্য পূর্ণতা আনতে চাইনি, সাধারণ ভাবে চেয়েছি, যাতে অন্যেদের মধ্যে পূর্ণতা আসা সম্ভব হয়। তার জন্য দরকার ছিল আমাদের দিক থেকেই উপলব্ধি ও রূপান্তরের সকল বাধার সম্মুখীন হয়ে তাকে জয় করা, নতুবা সে কাজ হতে পারত না। সে কাজ অন্যান্য স্তরে যথেষ্টই করা গেছে—কিন্তু দৈহিকের নিতান্ত বাস্তব স্তরে তা হয়নি। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে, আর যোগের ক্রিয়ার কতকটা প্রতিরোধ শক্তি থাকলেও পুরোপুরি রোগজয় হবে না। মায়ের তরফে যা কিছু বিপত্তি সেগুলি তাঁর নিজের নয়, অন্যেদের সকল বিপত্তি তিনি নিজে বহন করছেন, তা ছাড়া সাধারণ ভাবে রূপান্তরের কাজে যে সকল বিপত্তি রয়েছে তাও তাঁকে বহন করতে হচ্ছে। তা যদি না হতো তাহলে সে অন্য কথা ছিল।

অগস্ট ১৯৩৬

চতুর্থ বিভাগ

পথের দিশারী

পথের দিশারী

আশ্রম স্থাপনের হেতু

গোড়াতে আশ্রম বলে কিছু ছিল না, কয়েকজন মাত্র এসেছিল শ্রীঅরবিন্দের কাছে যোগ সাধনা করতে। কিছুকাল পরে মা যখন জাপান থেকে এলেন তখনই আশ্রম গড়ে উঠল, অনেকটা সাধকদের ইচ্ছাতেই, মায়ের বা শ্রীঅরবিন্দের নিজেদের মতলব অনুসারে নয়,—যখন সাধকরা চাইলে মায়ের উপর তাদের আভ্যন্তর ও বাহ্যজীবনের সকল ভার সমর্পণ করতে।

×

প্রকৃত ঘটনা এই: মা দীর্ঘকাল ফ্রান্সে ও জাপানে কাটিয়ে পণ্ডিচেরীতে ফিরে এলেন ২৪শে এপ্রিল ১৯২০ সালে। তখন দেখা গেল যে শিষ্যদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছে। যখন আশ্রম গঠন নিতে শুরু হলো তখন মায়ের উপর ভার পড়ল তাকে সুপরিণত ক'রে তোলার। শ্রীঅরবিন্দ শীঘ্রই নির্জনবাসে গেলেন, সুতরাং আশ্রমের যা কিছু বাস্তব ও আধ্যাত্মিক দায়িত্ব মায়েরই উপর গিয়ে পড়ল।

×

প্রঃ ১৯২৬ সালের কোন তারিখে মা আশ্রমের ভার হাতে নিলেন?

উঃ সঠিক তারিখটি মায়ের স্মরণ নেই। ১৫ই অগস্টের কিছু পরেই হবে। আমি যখন সব ছেড়ে দিলাম তখনই মা কাজের ভার সম্পূর্ণ-ভাবে নিলেন।

১৬-৫-১৯৩৬

আশ্রমের পরিধি

পরিধি কাকে বলছ? যে বাড়িগুলিতে আশ্রমের সাধকরা থাকে তার সবগুলিই আশ্রম পরিধির অন্তর্গত। লোকে এমন ভাবে বলে যেন এই বাড়ির এলাকাটুকুই আশ্রম—সে কথার কোনো মানে হয় না। কিংবা তারা বুঝি ভাবে যে মায়ের বা আমার যা কিছু প্রভাব তা এই এলাকাটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ?

জানুয়ারি ১৯৩৫

সাধকদের প্রতি আচরণ

মা এবং আমি সকলের সঙ্গে আচরণ করি একটা ভগবৎ বিধান অনুসারে। ধনী দরিদ্রকে, উচ্চ নীচকে সমান দৃষ্টিতে দেখি, সমানভাবে ভালোবাসি ও আশ্রয়দান করি। সাধনায় তাদের উন্নতি ঘটানোই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে—কারণ সেইজন্যই তারা এসেছে, সুস্বাদু খাদ্য খেয়ে উদরপূরণ করতে নয়, প্রাণের সাধারণ চাহিদা মেটাতেও নয়, আর আরাম বিরাম নিয়ে ঝগড়া করতেও নয়। তাদের উন্নতি নির্ভর করে মায়ের প্রেম ও সাহায্যদানে তারা কেমন সাড়া দিচ্ছে তারই উপর—মা যে শক্তি সকলের উপর বর্ষণ করছেন তাকে তারা ঠিক ভাবে গ্রহণ করছে কিনা, তারা যা পাচ্ছে তার কোনো অপব্যবহার করছে কিনা। আর মা যে বাহ্য দিক দিয়ে সকলের সঙ্গে একই ব্যবহার করবেন এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই—সে রকম কোনো দাবী করা হবে মূর্খের মতো কাজ—আর তা করলে সেটা হবে ভগবৎ বিধানের সত্যের বহির্ভূত। যে সাধক যেমন হবে, যার যেমন প্রকৃতি, যার যেমন সামর্থ্য ও যার যেমন প্রয়োজন (ইচ্ছা বা দাবীর কথা নয়), আর আধ্যাত্মিক মঙ্গলের পক্ষে যার পক্ষে যেমন সব চেয়ে ভালো হবে তিনি তার সঙ্গে সেই রকমই আচরণ করবেন। সাধকরা তাদের অজ্ঞানতা হেতু যেমন ব্যবহার তাদের ন্যায়ের ওজনে বা প্রাণের ধারণা অনুযায়ী সমুচিত বলে ভাবে কিংবা তারা বাইরের থেকে যেমন ধারণা নিয়ে এসেছে, তাদের সেই চাহিদা মেনে চলতে আমরা রাজী নই। আমরা যা করব তা আমাদের ভিতরকার আলো এবং সত্যের দিক থেকে,

যে সত্যকে পার্থিব প্রকৃতিতে প্রকট করতে চাই।

১১-১২-১৯৩৩

প্রথমে কি চাই

আমরা যাদের গ্রহণ করি তাদের সম্বন্ধে তুমি ঠিকই বলেছ---তাদের কোনো অংশ আন্তরিক ভাবেই ভগবানকে চায় দেখলে আমরা তাদের সেই সুযোগটা দিই। যদি ওর চেয়ে বেশি কিছু গোড়া থেকেই চাওয়া হয় তাহলে খুব কম লোকই পারবে ভগবানের অভিমুখে যাবার পথে যাত্রা শুরু করতে।

২৪-৪-১৯৩৫

সাধকদের প্রতি একমাত্র কর্তব্য

দোষ করা বা শাস্তি দেবার কথা এখানে নয়---আমরা যদি লোকের দোষ ধরে শাস্তি দিতে যাই আর সাধকদের অন্যায়ের ন্যায্য বিচার করতে বসি, তাহলে কোনো সাধনাই সম্ভব হয় না। তোমার তিরস্কার বাক্য এখানে সমুচিত বলে মনে হয় না। সাধকদের প্রতি আমাদের একমাত্র কর্তব্য হলো তাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দিকে নিয়ে যাওয়া---সংসারে গৃহবিবাদ মেটাতে যেমন একদিকের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে অন্যদিকের পক্ষ নিয়ে কাজ করা হয়, তেমন তো আমরা করতে পারি না। যতবারই ক হোঁচট খেয়ে পড়ুক, তার হাত ধরে আমাদের ওঠাতে হবে, আবার তাকে খাড়া ক'রে দিয়ে ভগবানের দিকে অগ্রসর করাতে হবে। তোমার বেলাতেও আমরা বরাবরই তাই করেছি।

২৯-৩-১৯৩৩

অতিরিক্ত করুণা

প্রঃ আমি অভিভূত ও আশ্চর্য হই এই দেখে যে কত

ধৈর্য ও করুণার সঙ্গে আপনারা আমাদের যত কিছু গাফিলতি আর অবাধ্যতা আর শৈথিল্যগুলোকে সহ্য করেন।

উঃ মানব প্রকৃতি মজ্জাগতভাবেই ঐরকম হয়; আমরা যদি সহিষ্ণু না হই তাহলে পরিবর্তনের কোনো আশাই থাকে না। কিন্তু মানুষের মধ্যে আরো এমন কিছু আছে যা ঐকান্তিক, পরিবর্তন আনার পক্ষে যা শক্তিশালী হতে পারে। তবে ক-এর মতো ব্যক্তিদের পক্ষে সেটিকে জাগিয়ে তুলে কাজ করানোই কঠিন (তা এমনই ঢাকা পড়ে থাকে)।

৮-৭-১৯৩৪

সাধকদের সঙ্গে তুলনা

আমি এমন বলতে চাইনি যে আমার কিংবা মায়ের জায়গা নিয়ে কেউ আমাদের সমান হবে...তবে ক বা খ বা গ-এর পক্ষে নিজেদের বর্তমান সংকীর্ণ ব্যক্তিত্বকে বর্জন ক'রে সম্পূর্ণ পরিবর্তন এনে এখনকার চেয়ে আমাদের অনেক কাছাকাছি আসতে পারা সম্ভব---যদি তাদের তেমন ঐকান্তিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা থাকে।

১০-৮-১৯৩৫

কেবল আমি আর মা ছাড়া অন্য সকলেরই পক্ষে অধিমানস এখনও অনধিগম্য কিংবা মাত্র প্রভাবের দ্বারা স্পর্শিত, এবং তা বেশির ভাগই ভাব-বাচক।

২৪-৩-১৯৩৪

আশ্রমে দুইরকম আবহাওয়া

এখানে দুইরকম আবহাওয়া রয়েছে, এক হলো আমাদের আর এক

সাধকদের। লোকে যখন বাইরের থেকে একটু অনুভবশক্তি নিয়ে আসে, তারা এসে দেখে এখানে আবহাওয়াতে রয়েছে গভীর শান্তি ও স্তব্ধতা, তার পর যখন তারা সাধকদের সঙ্গে মেশে তখন সে ভাব তাদের চলে যায়। এখানে যে নিশ্চেষ্টতা ও অস্থিরতার আবহাওয়া আছে তা [illegible] সাধকদের নিজেদের সৃষ্টি—তারা যদি মায়ের দিকে নিজেদের খুলে রাখে তাহলে এমন অস্থিরতা বা নিশ্চেষ্টতার বদলে মেলে শান্তি স্থিরতা।

১৫-৩-১৯৩৭

আগ্রহ

তুমি যে মাছ ধরার চিত্র দিচ্ছ তা ভুল। আমি কাউকে ধরতে বা এখানে ডেকে আনতে চাই না, যারা আসে তারা আপনি আসে তাদের চৈত্য প্রেরণাতে। বিশেষত বড়ো বড়ো বিখ্যাত লোককে আমি এখানে চাই না। মন প্রাণের দিক থেকে তারা বড়ো হতে পারে কিন্তু তারা নিজে-দের বড়োত্ব নিয়েই খুশি থেকে আধ্যাত্মিক কিছু চায় না, কিংবা চাইলেও তাদের বড়োত্ব তাতে সাহায্য না করে বরং বাধা দেয়। কএর মতলব ছিল ক,খ,গ প্রভৃতি বড়ো জনদের এখানে ঢোকাতে, কিন্তু তারা এলে কষ্ট-দায়ক হয়ে পড়তো। এসব নিতান্ত ভুল ধারণা; আত্মা কখনো কোনো খ্যাতি বা বৃহত্ত্ব চায় না। লোকেদের একটা ধারণা আছে যে মা এবং আমি শিষ্যদের ধরে রাখতে চাই, তার মধ্যে কেউ চলে গেলে তাতে আমাদের আঘাত লাগে, সেটা আমাদের পরাজয়ের মতো, একটা দারুণ দুর্ঘটনা। অনেকে ভাবে যে তারা এখানে থেকে যেন আমাদের অনুগ্রহ করছে, যার জন্য আমরা খুব কৃতজ্ঞ। এসব অতি বাজে কথা।

আশ্রমের "মর্যাদা"

অজ্ঞ ব্যক্তিদের নিন্দা ও প্রশংসাকে যদি আমরা মূল্য দিতাম তাহলে আমাদের আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা কবে বাতিল হয়ে যেতো। মা আর আমি যদি কোনো নিন্দা প্রশংসাকে গ্রাহ্য করতাম তাহলে এতদিনে কবে আমরা

চূর্ণ হয়ে যেতাম। কেবল ইদানিং এই আশ্রমের কিছু "মর্যাদা" হয়েছে। এর আগে সর্বত্র কেবল নিন্দাই শোনা যেতো, এমন কি অনেক রকম জঘন্য আক্রমণও এর উপর হয়ে গেছে।

ছেলেমানুষি অভিমান

ছেলেমানুষদের মতো অভিমান করা নিতান্ত বোকামি; তার মানে এই হয় যে আমি আর মা আর অন্যান্য সকলেই যেন তোমার ইচ্ছামত চলি, তুমি যা চাও তাই কেবল করি, এমন কিছু করি না যাতে তুমি অখুশি হও। কিন্তু এখানে মা নিজে যা ভালো বোঝেন এবং যা করা প্রয়োজন তাই তিনি করবেন। এটা তোমার বোঝা দরকার; নতুবা অনর্থক নিজে নিজেই কষ্ট পাবে।

২৮-৪-১৯৩২

আসল দরকার

এখনকার বিবর্তনের অবস্থাতে চৈত্যসত্তা আর স্ফুলিঙ্গ মাত্র নয়, তা এখন একটা অগ্নিশিখা। যদিও তা ধোঁয়াতে বা কুয়াশাতে আবৃত থাকে তথাপি তা ঘুচে যাবে। মেঘ কাটিয়ে উচ্চতর চেতনার দিকে তার উন্মুক্ত হওয়াই দরকার, নতুবা তার পক্ষে যে শ্রীঅরবিন্দ অথবা মা হতে পারা দরকার এমন নয়। কিন্তু আমরা যদি দিব্যই হই, তাহলে সেই দিব্যের অংশ হতেই বা কি বাধা আছে, অল্প মাত্রাতে হলেও দিব্য চেতনাতে বাস করা তো ভালোই

১০-২-১৯৩৫

নিতান্তই চাই

আমি এটা নিতান্তই চাই যে সাধকেরা তাদের ঝগড়াঝাটি এবং সন্দিগ্ধতা

পরিত্যাগ করুক; কারণ যতদিন এই ভাবে চলবে এবং চারিদিকে আগুন জ্বলবে ও গণ্ডগোল বাধবে, ততদিন পর্যন্ত আমি যে কাজ করতে চেষ্টা করছি (কোনো আমার ব্যক্তিগত কারণে নয়) তা বিঘ্নিত হবে, যে জিনিসকে নামিয়ে আনতে চাইছি তা সার্থক হবে না। বস্তুত আমি আর মা আমাদের সময়ের দশ ভাগের মধ্যে নয় ভাগই তোমাদের ঠাণ্ডা রাখার কাজে লেগে থাকি, সাধকদের খুশি রাখতে চেষ্টা করি, ইত্যাদি। বাকি একভাগও সময়ও মা পান না আসল কাজ করতে।

সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

×

> প্রঃ আমি ভাবতাম যে আমরা যা ভালোরকম অনুভূতি পাই তা আপনি আগের থেকে জানেন, তবেই তা সম্ভব হয়।

উঃ আগের থেকে আমার জানা! হা ঈশ্বর, তাহলে সাধকেরা কে কবে অনুভূতি পাবে তাই নিয়ে আমায় লেগে থাকতে হবে। তুমি কি ভাবো যে মায়ের আর কোনো কাজ নেই? আর আমার কথা, আমি আগে কিছুই দেখি না, যা দেখবার তা নিজেই বারে বারে দেখি।

১৮-১০-১৯৩৬

ভুল শোনা ও ভুল বোঝা

আমি তোমাদের বরাবরই বলেছি যে কোনো সাধক যদি বলে যে কোনো একটা কথা মায়ের কাছে শুনেছে, তাহলে সে যাই কেন বলুক তা বিশ্বাস করবে না। এমন কি যদি সে বলে যে আমি কিংবা মা আমাদের নিজের মুখে বলেছি তবুও তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তারা যা বলে তা নিজেদের মনের ভাব দিয়ে বলে, অর্থাৎ তারা মনে করে যে আমরা সেই-রকম বলেছি, কিংবা যা শুনেছে তা ভুল বোঝে, তাদের মনের কথাটা তার মধ্যে প্রয়োগ করে। কোনো সাধকই আমাদের স্থান নিয়ে কিছু বলতে পারে

না। প্রত্যেকে তাদের নিজের নিজের কথাই বলতে পারে।

৩-৬-১৯৩৭

×

আমি এবং মা সবই করবো যাতে তোমার দেহাত্মক মনের মেঘ কেটে যায় এবং মায়ের সঙ্গে তোমার আত্মার স্থায়ী সম্পর্কে কোনো বাধা না হয়। কিন্তু তোমার চিন্তাক্রিয় মনকে দৃঢ় থেকে আমাদের শক্তির সাহায্য চাইতে হবে।

৬-২-১৯৩৬

×

না. আমরা যখন প্রথম আশীর্বাদ দান করি তখন কারো অন্তরের মধ্যে আমাদের ছবি ঢুকিয়ে দিই না। তবে যদি অন্তরের দিকে চাও তখন কোনোদিন সেখানে মাকে দেখতে পাবে।

×

প্র ঃ ক মনে করে যে মা আপনার চেয়ে কঠোর।

উ ঃ তার কারণ মা পরিবর্তন আনার জন্য কড়া রকমের চাপ দেন -তাঁর দিব্যশক্তি আপনা হতেই অমন কাজ করে, তিনি চাপ না দিলেও।

১১-৩-১৯৩৭

নিত্য উপস্থিতি

নিশ্চয় কথা যে দিবারাত্র আমরা তোমার কাছে আছি। স্বপ্নে মাকে দেখতে না পেলেও জানবে যে তাঁর উপস্থিতি তোমাকে সমর্থন ক'রে যাচ্ছে।

তুমি যদি শিবকে দেখে থাকো এবং চিনে থাকো এবং দেখ যে শিব

আমার মধ্যে চলে এসেছেন, তবে তাতে ক্ষতি কি? হয়তো স্বাভাবিক ভাবেই অমন পরিবর্তন এসে গেছে, ওর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। তোমার প্রণাম আমরা নিশ্চয় সর্বদাই গ্রহণ করি এবং সর্বদাই করবো।

সাধকদের জন্য কাজ করা

সাধকদের জন্য কাজ করলে তোমার নাকি মান খোয়া যায়? এটা তোমার সম্পূর্ণ অহংগত মনোভাব যা কোনো সাধকের পক্ষে অনুচিত। ডাইনিং রুমে, স্থাপত্য সার্ভিসে, গুদাম বিভাগে, ছুতারশালাতে, শিল্পশালা, কামারশালাতে যারা সর্বক্ষণ কাজ করছে তারা সাধকদের জন্যই তা করছে, মা নিজেও সারাদিন ধরে সাধকদের জন্যই কাজ করছেন; এই যে আমি লিখছি এও একজন সাধকের জন্যই আমার সময় নণ্ট করছি। খাবার ঘরের বা রান্নাঘরের কর্মীরা যদি বলে "আমরা সাধকদের জন্য রাঁধব না বা তাদের পরিবেশন করব না, তাতে আমাদের মান যাবে; আমরা কেবল মায়ের জন্যই রাঁধবো," তাহলে সেটা কেমন হবে মনে করো? আর আমি যদি সাধকের কাজ ভেবে তোমার চিঠির কোনো জবাব না দিয়ে বলি যে কেবল মাকে ছাড়া আর কাউকে কিছু লিখব না, তাহলে সেটা কেমন হবে?

এত বছর ধরে ক রান্নাঘরে যে কাজ করছে সেটা সে সাধকদের ছাড়া আর কার জন্য করছে? আর খ যে শস্যভাণ্ডারে কাজ করে সেটা সে কাদের জন্য করে? ও সব ধারণা করা নিতান্ত নির্বোধের মতো। মা যা কিছু কাজ দেন সবই তো মায়ের কাজ।

নভেম্বর ১৯৩৮

×

বই লেখা আর চিঠি লেখা বন্ধ হবে না—তবে সপ্তাহে একটা দিন (রবিবার) এর বিরতি চাই। চিঠিপত্রের মাত্রা এত বিরাট হয়ে উঠেছে যে সারা রাত এবং দিনেরও অনেকটা অংশ আমার ওতেই কাটে—তাছাড়া মা-ও তাঁর নিজের দৈনিক কাজগুলি ছাড়া রাত্রের অধিকাংশই স্বতন্ত্রভাবে এই কাজে নিযুক্ত থাকেন। সেই কারণেই প্রণামে যেতে উত্তরোত্তর বিলম্ব

হয়ে যাচ্ছে, কারণ সাড়ে সাতটা কিংবা তার পরে পর্যন্ত এই কাজ শেষ হয় না। তৎ সত্ত্বেও অনেক কাজ পড়ে থাকে এবং জমে থাকে, আর অনেক জরুরী কাজকে বন্ধ ক'রে দিতে হয়েছে। কিছু উপশম হওয়া খুবই দরকার।

১৯-১২-১৯৩৩

আধ্যাত্মিক সাফল্যের দুটি মূল উপাদান

সাহায্য থাকবেই (উপরের সাহায্যের কথা বলছি না কিন্তু বলছি আমার ও মায়ের সাহায্যের কথা)। তোমার দেহগত মনের বাধা থাকাতেও তা কাজ করতে পারে, কিন্তু আরো ভালো ভাবে কাজ হবে যদি তোমার অটল ইচ্ছা সেখানে তার যন্ত্রবৎ হয়ে কাজ করে। আধ্যাত্মিক সাফল্যের পক্ষে দুটি মূল জিনিস থাকা সর্বদাই দরকার—একটি হলো তোমার নিজের দিকের অটল ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা, আর অন্যদিকে সেই শক্তি যা সাহায্য দিয়ে কোনোপ্রকারে তাকে সার্থক করবে।

২৬-১-১৯৩৪

লিখে সাহায্য পাওয়া

> প্রঃ আপনি ও মা সব কিছুই জানছেন যে আমাদের মধ্যে কি হচ্ছে, কিসের আস্পৃহা আমরা করছি, আমাদের প্রকৃতি আপনাদের সাহায্য ও নির্দেশকে কেমন ভাবে নিচ্ছে, সবই আপনাদের জানা। তবে আবার ঐসব কথা আপনাদের লিখে জানানোর কি দরকার?

উঃ এটা দরকার যে তোমরা ঐগুলি সম্বন্ধে নিজেরা চেতন হয়ে তোমাদের আত্মপর্যবেক্ষণের ফল আমাদের অবগত করবে; তারই উপর আমরা কাজ করব। আমরা যেটা লক্ষ্য করি তা যদি সাধকের চেতনার

দিক থেকে না শুনি তাহলে কিছু কাজ হয় না।

৭-১-১৯৩৬

×

একথা অবিসম্বাদী সত্য বলে শত শত ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে আমাদের কাছে যদি সকল বিপত্তির কথা সঠিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, তবে তাতেই অনেক ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ সে বিপত্তি কেটে যায়, সকল ক্ষেত্রে তা না হলেও। এ কেবল এখানকার সাধকদের বেলাতেই নয়, বহু দূরের ব্যক্তিদের পক্ষেও তাই, আর কেবল আভ্যন্তরিক বিপত্তির বেলাতেই নয়, কিন্তু দৈহিক রোগব্যাধি এবং নানা বাহ্য প্রতিকূল অবস্থারও বেলাতে। কিন্তু তার জন্য একটা বিশেষ রকমের মনোভাব থাকা দরকার হয়---মনে বা প্রাণে একটা সুদৃঢ় বিশ্বাস, অথবা আভ্যন্তর সত্তার মধ্যে গ্রহিষ্ণুতা ও অনুকূল সাড়া দেবার অভ্যাস। এই অভ্যাসটি প্রতিষ্ঠিত হলে আমি দেখেছি যে সেখানে অব্যর্থ ফল মেলে, যদিও বিশ্বাসের দিকটা থাকে হয়তো অনিশ্চিত, মনের বাহ্য দিকের ভাবটা থাকে অস্পষ্ট বা ভ্রান্ত। আর এ কাজের ফল হয় সব চেয়ে অনিবার্য যখন লেখক তার নিজের অবস্থার কথা একজন সাক্ষীস্বরূপ হয়ে লিখতে পারে নিখুঁত নিরপেক্ষভাবে, যেন তার প্রকৃতির মধ্যে কি হচ্ছে বা কোনো শক্তি সেখানে কিভাবে ক্রিয়া করছে তা জানিয়ে তার থেকে নিষ্কৃতি চাইছে। অপরপক্ষে যদি তার প্রাণসত্তা নিজের সাফাই জানাবার জন্য কলম ধরে---এমন কি তার মধ্যে নিজের সংশয়, বিদ্রোহ, হতাশা প্রভৃতিও ফলাও ক'রে জানিয়ে দেয়, তাহলে তা আলাদা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাতে কিছু দিলখোলসাও হয় বটে; কিন্তু আবার ঐরকম ভাবে লিখতে গিয়ে ঐগুলির আক্রমণ আরো জোরদার হয়ে ওঠে, অন্তত তখনকার মতো, তার পর ঐ সংশয়াদি প্রবল হয়ে উঠে. শেষে ক্লান্ত হয়ে আপনা থেকেই একটা স্বস্তি আসে, কিন্তু অনেক গুরুতর আলোড়ন হয়ে যাবার পরে---আবার তা ফিরেও আসতে পারে পৌনঃপুনিক ভাবে,---কারণ যা বিরতি এসেছিল তা সাময়িক অবসন্নতা মাত্র, সাধকের সমর্থন ও আনুকূল্য পেয়ে দিব্যশক্তি যে বিশুদ্ধি এনে বিপত্তিকে দূর ক'রে দিতে পারে তেমন অবস্থা নয়। কারণ সেক্ষেত্রে শক্তিতে শক্তিতে একটা এলোমেলো সংগ্রাম চলে---তার মধ্যে সাহায্যকারী শক্তির

কাজ ঘুলিয়ে যায়। তোমার বিপদগুলির ক্ষেত্রে তাই হতো; তোমার প্রাণ-সত্তা তাতে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে সেই আক্রমণী শক্তির সমর্থনে অনেক কথা বলেছে, যেন তারই সপক্ষে সোচ্চারে সওয়াল জবাব দিচ্ছে,—কিন্তু নিরপেক্ষ মনের সুস্পষ্ট পর্যবেক্ষণের দ্বারা যেমন ভাবে বিপত্তির অবস্থাটি খুলে ধরা উচিত যাতে উচ্চতর শক্তি এবং আলো পড়ে তার উপর ক্রিয়া করতে পারে তেমন ভাবে নয়। অনেক সাধকই (এমন কি অগ্রগামীরাও) ঐভাবে তাদের বিপত্তির কথা লিখতে শুরু করেছে এবং এখনও তাই করছে; বুঝতে পারে না যে এমন উপায়ে কোনো কাজ হতে পারে না। এক সময়ে এই আশ্রমে সবাই ধরে নিয়েছিল যে এই হলো প্রকৃষ্ট উপায়—কেন তা জানি না, কারণ এমন ভাবে যোগের শিক্ষা আমি কখনই দিইনি—কিন্তু অভিজ্ঞতায় বেশ জানা গেছে যে এতে কোনো কাজ হয় না; কেবল চলে পৌনঃপুনিক বিপত্তি আর অফুরন্ত সংগ্রামেব পালা। আত্মোদ্‌ঘাটনের দ্বারা যে সুন্দর ফল হতে পারে এতে তার সম্পূর্ণ বিপরীত হয়, (যদিও সে উদ্‌ঘাটন এককালেই না হয়ে ক্রমশই হতে পারে) কিন্তু সেটাই তারা ভালো বলে ভাবে যারা বলে যে গুরুর কাছে সব কিছু খুলে ধরবে, তবেই সেখানে গুরুর সাহায্য উত্তমরূপ কার্যকরী হতে পারবে।

১৭-১২-১৯৩২

রক্ষাশক্তির উপর নির্ভরতা

মা আর আমি যে তোমাদের নিরাপত্তা দান ক'রে থাকি তার উপর নির্ভর ক'রে থাকার মতো শক্তি পেতে অভ্যাস করা উচিত। সেই কারণেই বলি যে বাহ্য মনের দ্বারা বিচার করা বা খুঁত ধরা বা একটা ধারণা ক'রে নিয়ে তাকে পোষণ করা, এগুলো ছাড়তে হবে। ঐসব জিনিস মনের মধ্যে জেগে উঠতে চেষ্টা করলেই তখন মনে মনে বারে বারে বলতে থাকবে, "শ্রীঅরবিন্দ এবং মা আমার চেয়ে অনেক ভালো বোঝেন—তাঁদের মতো জ্ঞান ও অনুভূতি আমার নেই—তাঁরা সাধারণ জ্ঞানের চেয়ে বৃহত্তর জ্ঞানা-লোকে যা করবেন তাই হবে সবচেয়ে ভালো।" এই ভাবটি বলতে বলতে যদি স্থায়ী হয়ে যায় তাহলে অন্ধকার মুহূর্তেও তা থাকবে, তাতে আসুরিক মায়ার প্রভাবকে অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

মুক্তিদানের চাপ

তুমি এত কষ্ট পেয়েছ জেনে আমরা খুবই দুঃখিত। তোমাকে কষ্ট দেবার জন্য মা কোনো চাপ দেননি, মুক্ত হবার জন্য দিয়েছিলেন। তোমার মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হলে মা সর্বদাই গভীর স্নেহ ও সহানুভূতির সঙ্গে তোমাকে সাহায্য দিতে চেষ্টা করেন। যাই হোক আমি বিশ্বাস করি যে অচিরেই তুমি মনের স্বস্তি ও শান্তি লাভ করবে। আমি তোমাকে যথাসম্ভব সাহায্য দিতে চেষ্টা করব।

২৩-১-১৯৩৫

ব্যক্তিগত সংস্পর্শ আর শক্তির প্রতি গ্রহিষ্ণুতা

যারা ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে থাকে তাদের দলে ক যোগ দিতে চায়, কিন্তু তা হতে পারে না। তারা সাধনার প্রয়োজনে আমার কাছে থাকে না, থাকে ব্যবহারিক প্রয়োজনে। এখানেও একটা ভুলবোঝা হচ্ছে। সর্বদার সংস্পর্শ ঘটলেই যে তাতে শক্তি বিশেষ কাজ করবে এমন কথা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কাছে হৃদয় বরাবরই থেকেছে এবং সর্বদা তাঁর সেবা করেছে, কিন্তু তবু সে কিছুই পায়নি, আর যদিও কেবল একবারের জন্য তিনি তাকে উপলব্ধি দিয়েছিলেন কিন্তু সে তা ধারণ করতেই পারলে না। ক নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিল দর্শনের সময় আর মাকে প্রণাম করবার সময়। তাতেই দেখা যাচ্ছে যে শক্তির ডাকে সে সাড়া দিতে পারে, তার সেই গ্রহিষ্ণুতা আছে যা আমরা চাই, সেটা খুব বড়ো কথা কারণ সকলের তা থাকে না, আর যাদের থাকে তারাও কেবল ফলটাই দেখে কিন্তু তার কারণটা জানে না। ওর পক্ষে কিন্তু উচিত হবে এইসব সময়ে বুদ্ধিবিচার কমিয়ে দিয়ে নিজেকে খুলে ধরতে চেষ্টা করা। আমি যে শক্তির কথা লিখলাম, তার কারণ মা আর আমি অনেক সহস্র ক্ষেত্রে দেখেছি যে তা ঠিক কাজ ক'রে সকল রকমের সুফল ঘটিয়েছে। এই শক্তির সম্বন্ধে কথাটা কোনো থিওরি বা যুক্তির কথা নয়, প্রত্যেক যোগীই এটি অনভব করতে পারে; সাধারণ যোগ চেতনার ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার

তা অঙ্গস্বরূপ।

২৮-৫-১৯৪৫

×

প্র : আপনার বা মায়ের সঙ্গে বেশি বেশি বাহ্য সংস্পর্শ হলে কি আস্পৃহা ও আভ্যন্তরীণ উন্নতির মাত্রা হ্রাস পাবে না?

উ : তা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের উপর। কারো বা তাতে লাভ হয়, কারো তা হয় না। এ বিষয়ে সাধারণ ভাবে কিছু বলা যায় না।

১৮-৮-১৯৩৩

সূক্ষ্মদেহে শক্তির ক্রিয়া

ওটা ঠিক স্বপ্নের কথা নয়, যাকে বলে স্বপ্ন-সমাধি সেইরূপ চেতন স্বপ্নাবস্থায় আভ্যন্তরীণ সত্তার একটা অনুভূতি। অসাড় ভাব এসে চেতনা-লোপের মতো বোধ করা আসে উচ্চশক্তির নেমে আসার চাপে, যাতে দেহ অভ্যস্ত নয়, তাই অমন বোধ করে। এ স্থলে স্থূল দেহে নয়, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরে তা ঘটেছিল যার মধ্যে আভ্যন্তরীণ সত্তা অবস্থান করে, এবং ঘুম বা স্বপ্নের সময় বা মৃত্যুকালে যার মধ্যে চলে যায়। কিন্তু স্থূল দেহ তখন বোধ করে যে অনুভূতিটি তারই হচ্ছে, সেই চাপ অনুভব করেই দেহ অসাড় হয়েছে। সমগ্র দেহে চাপ মানে সমগ্র আভ্যন্তরীণ চেতনাতে চাপ, হয়তো কোনো পরিবর্তন এনে তাকে জ্ঞান বা অনুভূতির পক্ষে প্রস্তুত ক'রে তোলার জন্য; তৃতীয় বা চতুর্থ পাঁজরের হাড় হলো প্রাণপ্রকৃতির অবস্থানের জায়গা, যেখানে থাকে প্রাণশক্তি, সেখানেও চাপ পড়েছে পরিবর্তনের জন্য।

হাতের যে জোরালো এবং ভারী চাপের কথা তুমি বলেছ তা আমার হাতের চাপ এমন কথা নয়—ওটা স্থূল হাতের বা স্থূল দেহের উপর চাপ নয়, ওটা সূক্ষ্ম রাজ্যের ব্যাপার, আর সেখানে মায়ের হাতের স্পর্শ ও চাপ আমার চেয়েও জোরালো এবং ভারী হতে পারে। তারিখটির কথা মায়ের

স্মরণ নেই, কিন্তু ঐ সময়েই এক রাত্রে তিনি ওর কথাই চিন্তা করছিলেন আর বাধা কাটিয়ে আধ্যাত্মিক দিকটা খুলে দিতে চাইছিলেন। তাতেই হয়তো অমন অনুভূতি এসে থাকবে। যদি সেটা আমি হতো, তাহলে নিশ্চয় আমি ঐ সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দিকে শক্তি প্রেরণ করতে একাগ্র হতাম, কিন্তু তেমন কিছু আমার স্মরণ হয় না। অবশ্য আমি ওর কথা প্রায়ই ভেবেছি ও তার সাহায্যে শক্তি পাঠাতে চেষ্টা করেছি।

আমরা যে কাজ করছি তার সম্বন্ধে সর্বদাই যে স্থূল ভাবে চেতন হওয়া দরকার হয় এমন কথা নয়, কারণ সে কাজ প্রায়ই করা হয় যখন মন থাকে বাহ্য কাজে নিযুক্ত কিংবা যখন আমরা ঘুমোই। মায়ের ঘুম ঠিক ঘুম নয়, কারণ তিনি থাকেন আভ্যন্তর চেতনাতে যার দ্বারা তিনি লোকেদের সংস্পর্শে যান বা সর্বত্রই কিছু কাজ করেন। সেই সময়টাতে তিনি তা জেনেই করেন, কিন্তু তাঁর জাগ্রত চেতনাতে বা স্মৃতিতে তা থাকে না। তবে জাগ্রত মনে কাজ করতে করতে হয়তো চিন্তার মধ্যে ডাক এলো যে অমুক ব্যক্তি আসছে—কিংবা মুক্ত একাগ্র অবস্থাতে তার বক্তব্য তিনি শুনতে পেলেন; আর গভীর একাগ্রতা বা নিদ্রা বা সমাধির মধ্যে তিনি দেখলেন যে সেই লোকটি তাঁর কাছে এসে কথা বলছে, কিংবা তিনিই তার কাছে চলে গেছেন। আর তাঁর শক্তি যেখানে কাজ করে সেখানে তাঁর উপস্থিতিও থাকে।

২৮-৯-১৯৩৬

শক্তিকে অচেতনে গ্রহণ

আমাদের কাছ থেকে কখনই তুমি শক্তি পাওনি একথা ঠিক নয়, তা যথেষ্টই পেয়েছ; বরং বলতে পারো যে তা তুমি জানতে পারোনি, কিন্তু এমন অনেকেরই হয়। অবশ্য মা যত শক্তি প্রেরণ করেন তা কোনো সাধকই সম্পূর্ণভাবে নিতে কিংবা তার সদ্ব্যবহার করতে পারে না, কিন্তু তা হলো সাধারণ কথা, কেবল তোমার বেলাতেই তা নয়।

২৯-৫-১৯৩৬

অবস্থানুযায়ী শক্তির ক্রিয়া

শক্তির সম্বন্ধে তোমাকে অন্য সময়ে লিখব। আগেই তোমাকে বলেছি যে তা সকল সময়েই কাজ করে না, তা কতকগুলি অবস্থানুযায়ী কাজ করে, যেমন সকল শক্তিই করে। সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত রূপে কাজ করে কেবল অতিমানস শক্তি, কারণ তা তার সমুচিত অবস্থাকে আপনিই তৈরি ক'রে নেয়। কিন্তু আমি যে শক্তি প্রয়োগ করি তা কাজ করে জগতের বর্তমান অবস্থানুযায়ী। তাই বলে এ শক্তি কিছু কম নয়। এর দ্বারা আমি নিজের সবগুলি রোগ সারিয়েছি, কেবল তিনটি ছাড়া, আর তাও যখন আসে তখন তাকে থামিয়ে দিই; ওগুলিকে যে সম্পূর্ণ দূর করতে পারিনি তাতে প্রমাণ হয় না যে অন্যগুলির বেলাতেও তা পারিনি। আর মায়ের সম্বন্ধে, আগে আগে তিনি এই শক্তিরই জোরে সব কিছুই তখনই আরোগ্য করে ফেলতেন —কিন্তু এখন আর তাঁর নিজের দেহ সম্বন্ধে চিন্তা করবার বা ঐদিকে একাগ্র হবার মতো অবসর নেই। রোগপীড়া দেখা দিচ্ছে একথা সত্য; জড়ের রাজ্যে যে সংগ্রাম এখন চলেছে এ হলো তারই একটা অংশ। তথাপি এই আশ্রমে এমন অনেকেই আছে যারা মায়ের উপর নির্ভর ক'রে রোগ-মুক্ত হয়েছে। সকলের বেলা তা হতে পারে না, তার থেকে কি প্রমাণ বা অপ্রমাণ হয়? তাতে এই প্রমাণ হয় যে এই শক্তি সকল ক্ষেত্রেই সুনিশ্চিত-ভাবে, অলৌকিক ভাবে, অসম্ভব রকমের কাজ করে না, কিন্তু কাজ করে কেবল নির্দিষ্ট উপায়ে ও অনুকূল অবস্থানুযায়ী। বরাবরই তাই বলে এসেছি, তাহলে যোগের সত্য তাতে খণ্ডিত কেমন ক'রে হলো?

৬-২-১৯৩৫

×

প্র: আপনি বলেন যে আভ্যন্তরীণ চেতনা বাড়লে রোগের শক্তি আক্রমণ করতে আসছে তা টের পাওয়া যায়; আগের থেকেই সূক্ষ্ম দেহে তার লক্ষণ অনুভব ক'রে প্রকাশ পাবার আগেই তাকে নাশ করা যায়। তাহলে আপনার নিজের রোগ কেন হয় আর সাধকদেরই বা কেন হয়, যখন আমরা না দেখতে পেলেও আপনি তার আসা দেখতে পান?

উঃ আবার সেই একই মনের অনড় যুক্তি যা সকল তথ্যকেই বিনা ব্যতিক্রমে অকাট্য ও সুনিশ্চিত হবে বলে ধরে নেয়! এটা আমারও এবং মায়েরও অনুভূতি যে সব রোগই স্থূল দেহে ঢোকার আগে সূক্ষ্ম দেহ ও সূক্ষ্ম চেতনার ভিতর দিয়ে অতিক্রম ক'রে যায়। যখন কেউ তেমন চেতন হয়, তখন সে তার স্থূল দেহে প্রবেশ থামিয়ে দিতে পারে, তেমন ক্ষমতা সে অর্জন করতে পারে। আমরা নিজেরা তা লক্ষ বার করেছি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে প্রতিবারেই আমরা তা করব। হয়তো রোগটা না জানিয়ে বা ঘুমের সময় এলো বা অবচেতনের ভিতর দিয়ে বা অসতর্ক মুহূর্তে এলো, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আর যদিও আমি সদা সতর্ক থাকি আর ঘুমের মধ্যেও চেতন থাকি---তবুও আমি সকল রোগের সম্পর্কে অনাক্রম্য না হতে পারি। এ হলো রোগের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার কথা, যখন রোগটা আসতে চেষ্টা করছে। এই আত্মরক্ষা শক্তি এমন প্রবল হতে পারে যাতে দেহ কার্যত পক্ষে সকল রোগকেই প্রতিরোধ করে, যেমন শক্তি অনেক যোগীদের আছে। তবুও "কার্যতপক্ষে" মানে "বিনা ব্যতিক্রমে" নয়। বিনা ব্যতি-ক্রমে পুরোপুরি ভাবে তা হতে পারে কেবল অতিমানস রূপান্তর ঘটলে। তার নিচেকার যে শক্তি তা হলো বহু প্রকার শক্তির মধ্যে অন্যতম---আর অতিমানসের বেলাতে তা হয় প্রকৃতিরই গুণ।

২৬-৩-১৯৩৫

রোগারোগ্যে শক্তির গ্রহিষ্ণুতা

আমি বলছি চেতনাতে গ্রহিষ্ণুতার কথা---মনে, প্রাণে, দেহে যেখানেই তার প্রয়োজন। মা কিংবা আমি আরোগ্য শক্তিকে প্রেরণ করলাম। চেতনা যদি সেখানে খোলা না থাকে তাহলে বাধা পেয়ে তা ফিরে আসবে (যদি আমরা খুব জোর চাপ না দিই, যেটা সমুচিত নয়), কিংবা থেমে যাবে; যদি সেখানে কিছুটা খোলা পায় তাহলে তার ফল হবে আংশিক বা বিলম্বিত; যদি পুরো খোলা পায় বা তেমনই গ্রহিষ্ণুতা থাকে তাহলে হয়তো তৎক্ষণাৎ তার ফল হবে। অবশ্য সব কিছুকেই তখনই দূর ক'রে দিতে পারা যায় না, যা প্রকৃতির স্থায়ী অংশের মতো হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু তেমন গ্রহিষ্ণুতা থাকলে তাকেও সার্থকভাবে হটানো যায়। কেউ কেউ এমন আছে যারা

এতই উন্মুক্ত যে আমাদের কাছে লিখে তা এখানে পৌঁছবার আগেই তারা সেরে যায়।

৮-৬-১৯৩৩

ওটা নির্ভর করে আভ্যন্তর সত্তা কতটা জেগেছে তার উপর—নতুবা দরকার হয় কিছু স্থূল অবলম্বনের। কেউ কেউ আছে যারা সেরে ওঠে আমরা তাদের চিঠি পড়বামাত্র, কেউ কেউ আবার চিঠি লিখে তা আমাদের কাছে পৌঁছবার আগে কিংবা পৌঁছলেও তা আমরা পড়ে দেখার আগেই সেরে যায়। কেউ কেউ আবার মনে মনে আমাদের কাছে জানিয়েই আরোগ্য হয়ে যায়। ধাতু বৈচিত্র্যের কথা!

মার্চ ১৯৩৫

সঠিক খবরটা চাই

> প্র : আপনি কিংবা মা যখন কোনো অচেনা রোগীর উপর আপনাদের আধ্যাত্মিক ক্রিয়া প্রয়োগ করেন তখন যদি তার ভুল পরিচয় দেওয়া হয়, তাতে কি কাজ ঠিক হয় বা তা ব্যর্থ হয়?

উ : কাজ করার মধ্যে ভুল খবর এলে তাতে কাজের গণ্ডগোল হয়, সেখানে কাজ সফল হবে কিনা বলা যায় না। আর যদি গোড়াতেই ভুল খবর আসে তাহলে আরো খারাপ। সঠিক খবরটা পাওয়া নিশ্চয় দরকার।

১০-৬-১৯৩৫

ডাক্তারের মাধ্যমে শক্তির ক্রিয়া

মা এবং আমি অ্যালোপ্যাথিকে তত পছন্দ করি না। মা মনে করেন

যে ডাক্তারেরা নানা ভুল নির্বাচিত কড়া ওষুধ দিয়ে প্রায়ই প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তিকে নষ্ট ক'রে দেয়। কএর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে কাজ ক'রে সব চেয়ে ভালো ফল পেয়েছি—তবে যে সকল হোমিওপ্যাথ চেতন ভাবে যন্ত্রস্বরূপ হয় না, তাদের বেলায় অ্যালোপ্যাথের চেয়ে যে ভালো কাজ হবে তা নয়।

সাধনা ও খেলাধূলা

এই আশ্রমে সবাই কেবল খেলোয়াড় হোক তা আমরা নিশ্চয়ই চাই না; তাহলে এটি আশ্রমের বদলে ক্রীড়াভূমি হয়ে দাঁড়াবে। মূলতঃ স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্যই খেলাধূলা ও ব্যায়ামাদির ব্যবস্থা, কিন্তু ও ছাড়া তারা রীতিমত লেখাপড়াও করে। কিন্তু এই ব্যবস্থাতে তারা এখন স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলার দিক দিয়ে অনেক উন্নতি করেছে, আর আচরণের দিক দিয়েও মূল্যবান সুফল পাওয়া গেছে। দ্বিতীয়তঃ, যারা তরুণ বয়স্ক সাধক তাদের এতে যোগ দিতে বলা হয়, বাধ্যতা বা অবশ্যপালনীয় নিয়ম হিসাবে নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু তারা যে কেবল খেলোয়াড় হয়ে দাঁড়াবে তেমন কথাও নয়, ও ছাড়া তাদের অনেক কিছু দরকারী কাজ করবার আছে। কেউ যদি ইচ্ছা ক'রে খেলোয়াড় হতে চায় তা সে হতে পারে, সেটা তারই উপর নির্ভর করে। মায়ের নিজের কাছাকাছি এমন অনেকেই আছে—যেমন ক—যারা খেলার মাঠে যাবার কথা স্বপ্নেও ভাবে না, আর মা নিজেও তাকে সে কথা কখনই বলবেন না। সুতরাং তুমি যে ওটা পরিহার করছ তাতেও মা তোমার উপর অসন্তুষ্ট হবার কথা ভাবতেই পারেন না। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে, আশ্রমের কাজ হলো কেবল ধ্যানধারণা ও আভ্যন্তর অনুভূতি পেয়ে জীবনকে এড়িয়ে ব্রহ্মের জন্য সাধনা করা, সেখানে খেলাধূলার ব্যবস্থাই বা কেন। কিন্তু ওকথা কেবল মামুলী আশ্রমের পক্ষে খাটে, এই আশ্রমে তেমন গোঁড়ামি নেই। এখানে জীবনকে যোগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সুতরাং জীবনের পক্ষে যা কিছু দরকার আমরা বুঝবো তার সবই এখানে স্থান পাবে, আর তাতে আত্মার সাধনক্রিয়ার সঙ্গে কোনো বিরোধ হবে না। বস্তুত তেমন পূর্বোক্ত রকমের আশ্রম তখনই দেখা দিয়েছিল যখন জগৎ-বর্জনকারী ব্রহ্মসাধনা চালু হলো এবং বৌদ্ধধর্ম সারা দেশকে প্লাবিত ক'রে

আশ্রমকে মঠে পরিণত করলে। কিন্তু তার আগেকার আশ্রমগুলি অমন ছিল না; সেখানকার যে সব ছেলেরা ও যুবকেরা থাকতো তাদেরকে জীবনের অনেক কিছু বিষয়েই শিক্ষা দেওয়া হতো: একজন ঋষির আশ্রমে থেকে পুরুরবা ও উর্বশীর পুত্র ধনুবিদ্যা শিখে সুদক্ষ ধনুর্বীর হয়ে উঠেছিল; একজন মস্ত ঋষির শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে কর্ণ অতি দুর্বার রকমের অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিলেন। সুতরাং আমাদের মতো যে আশ্রমে আত্মার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য রাখা হচ্ছে সেখানকার জীবনে খেলাধূলাকে বাদ দেবার কোনো কারণ নেই। এমন কি টেবিল-টেনিস ও ফুটবলকেও ছেঁটে দেওয়া হবে না। কিন্তু এসব তর্কের কথা বাদ দিয়ে আমার বক্তব্য হলো এই যে, কেউ খেলবে কিংবা না খেলবে তা হলো আপন ইচ্ছা ও পছন্দের কথা, খেলোয়াড় হতে না চাওয়ার দরুন মা যেমন কএর প্রতি বিমুখ নন, তেমনি তোমার প্রতিও বিমুখ নন। তাই নিয়ে তোমার কোনো চিন্তা নেই, মা যে ওরই জন্য তোমার প্রতি নারাজ হবেন এটা অসম্ভব কথা। তুমি কিছু একটা করলে কিংবা করলে না তাই জন্য মা তোমার থেকে সরে দাঁড়াবেন এটা ভিত্তিশূন্য ভুল ধারণা, যার কোনো কারণও হয়নি আর মায়ের মনে সে কথা একবারও হয়নি। বরং মা নিজেই আমাকে বলেছেন ওর উল্‌টো রকমের কথা, যার মধ্যে তাঁর করুণার যথেষ্ট আভাষ ছিল। তিনি কেবল এই চেয়েছেন যে তুমি চৈত্য ও আধ্যাত্মিক দিয়ে আরো আভ্যন্তরীণ উন্নতির প্রচেষ্টা করো—আর তাতে তুমি পিছপাও হওনি। তাছাড়া তুমি যে এমন হলে না বা তেমন হলে না আর তাতেই মা তোমার উপর বিরূপ হলেন, এটা নিতান্ত উদ্ভট ধারণা, যা একচক্ষুবৎ ও অযৌক্তিক।

১০-৭-১৯৪৮

যার খেলাধূলার দিকে কোনো ইচ্ছা বা স্বাভাবিক টান নেই এমন কাউকেই মা ওতে যোগ দিতে বলেন না; স্বেচ্ছায় যে আসবে সে আসুক, কিন্তু যারা আসবে না তাদের প্রতি মা যে তারই জন্য নিষ্করুণ হবেন এমন কথাই নয়। তেমন মনোভাব নেওয়া মায়ের পক্ষে অসম্ভব; সেবাতে যারা নিযুক্ত আছে তাদের সকলকেই মা গভীরভাবে স্নেহ ও বিশ্বাস করেন, কিন্তু তাদের মধ্যে যারা ইচ্ছা বা সময়ের অভাবে খেলার মাঠে কখনো

যায় না—তুমি কি ভাবো যে সেই কারণে তাদের প্রতি মায়ের স্নেহ কিছু কম হয়ে যাবে? মা এমন কথা কখনই মনে করেন না যে এই আশ্রমের সকলের পক্ষে খেলাধূলাতে যোগ দেওয়াই হবে প্রধান কর্তব্য। এমনকি ছেলেমেয়ে যারা এখানে পড়ছে এবং যাদের দেহোন্নতির পক্ষে এইসব ক্রীড়া ও ব্যায়াম দরকারী বলেই সেরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাদের ও ছাড়া আরো অনেক কিছু করবার সুযোগ আছে, তাদের লেখাপড়ার কাজ ছাড়াও অন্য কাজে এবং নানা আমোদপ্রমোদে তারা নিজেদের পছন্দমত যোগ দিতে পারে। আর ওর চেয়েও বড়ো কাজ রয়েছে: যোগ, আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা, ভক্তি, পূজা, সেবা...

আমার "খেলার ব্যাপারে সময় দেওয়া" কাকে বলছ বুঝলাম না। মায়ের অনুরোধে বুলেটিনের প্রথম সংখ্যাতে একটি প্রবন্ধ লেখা এবং আগামী সংখ্যাতে আরো একটি লেখা ছাড়া এ বিষয়ে আমার আর কিছু সময় দিইনি। ও ব্যাপারে যা কিছু ব্যবস্থা করবার তা মা-ই করছেন, এবং তা তাঁকে করতেই হবে যতদিন না সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে তা আপনা থেকেই চলে, এবং তখন উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং দৈনিক খেলার মাঠে একবার মাত্র গেলেই চলবে। আমি অবশ্য আমার শক্তি দিয়ে তাঁকে সমর্থন করি, কিন্তু তা ছাড়া ওদিকে আমি সময় দিই না।

৪-৩-১৯৪৯

যোগের পক্ষে কিংবা মায়ের স্নেহ করুণা লাভের পক্ষে খেলাধূলাতে অংশ নেওয়া যে কারো পক্ষে অপরিহার্য এমন কথা নয়। যোগের যা আপন উদ্দেশ্য ও আপন প্রণালী তা একেবারেই স্বতন্ত্র; আর খেলাধূলা তার থেকে স্বতন্ত্র জিনিস, সে কথা মা নিজেই তোমাকে জানিয়েছেন, যখন তিনি বলেছিলেন যে খেলার মাঠে যে একাগ্র হবার ব্যবস্থা তা ধ্যানের জন্য নয়, শৃঙ্খলার উন্নতির জন্য, যোগের উদ্দেশ্য নিয়ে নয়।

১৪-৩-১৯৪৯

এটাও সত্য নয় যে মা কিংবা আমি যোগের দিক ছেড়ে কেবল স্পোর্টের দিকেই ঝোঁক দিচ্ছি; এই আশ্রমের মূল চরিত্র পাল্‌টে দিয়ে একে ক্রীড়া সংঘে পরিণত করবার কোনো মতলবই আমাদের নেই। সেটা হবে নিতান্ত পাগলামির কাজ, আর এমন কথা যে বলেছে তার নিশ্চয় ডিগবাজী খাওয়া উদ্ভট ধারণার উত্তেজনাতে সাময়িক ভাবে মাথাখারাপ হয়েছিল। মা তোমাকে তো স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে খেলার মাঠে একাগ্র হবার যে নিয়ম তা ধ্যান বা যোগের জন্য নয়, কেবলই তা ব্যায়ামের একটা অংশ, স্থির হয়ে থাকা। এখন তিনি যে এই সব ব্যবস্থা নিয়ে নিযুক্ত আছেন—এবং তিনি কেবল যে ঐ নিয়েই আছেন তাও ভুল কথা—তার কারণ এ কাজকে তিনি যত শীঘ্র সম্ভব শেষ ক'রে ফেলতে চান যাতে তার পর থেকে কাজটা আপনা হতেই চলে তাঁর বিশেষ মনোযোগ ছাড়াও, আর আশ্রমের অন্যান্য কাজের প্রতিষ্ঠার বেলাতেও তিনি বরাবর এই রকমই করেছেন। আর আমার কথা, নিশ্চয়ই এমন ভাবা বাতুলতা যে আমি ধ্যান আর যোগকে অবহেলা ক'রে কেবল লম্ফঝম্প, দৌড়োদৌড়ি আর কুচকাওয়াজ প্রভৃতির দিকেই মন দেবো! বুলেটিনে যে দ্বিতীয় প্রবন্ধ আমি লিখেছি তাই নিয়ে আশ্চর্য রকমের ভুলবোঝা ঘটেছে। প্রথম প্রবন্ধে আমি লিখেছিলাম খেলাধূলার উপকারিতা নিয়ে, যেমন রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি নিয়েও আমি লিখেছি। দ্বিতীয় প্রবন্ধে, আশ্রমে খেলাধূলার কেন স্থান হবে সে বিষয়ে লোকের অজ্ঞানতা দূর করবার জন্য ঐ প্রশ্ন নিয়ে কিছু আলোচনা করেছি। তাতে সাধারণ ভাবে বলেছি যে ঐটি এবং আরো সব মানবীয় ক্রিয়াকলাপ কেন থাকা দরকার সত্তার সর্বাঙ্গীন পরিণতির জন্য এবং দেহেরও উন্নতির জন্য, বিশেষত দেহের পূর্ণতা কেমন রকমের হওয়া উচিত তাই নিয়ে। সেই প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলেছি যে কেবল যোগের দ্বারাই আত্মার সকল যন্ত্রগুলির সামগ্রিক পূর্ণতা এসে সমগ্র সত্তা উচ্চ স্তরে উঠতে পারে এবং জগতে দিব্য দেহ নিয়ে দিব্য জীবন লাভ করতে পারে। স্পষ্টই বলেছি যে ব্যায়ামাদি মানবীয় দৈহিক উপায়ে কেবল সীমাবদ্ধ ও অনিশ্চিত সাফল্যই মেলে। ঐসব উক্তি থেকে এমন মানে করা যায় না যে স্পোর্টের জোরেই অতিমানসে লাফ দিয়ে উঠতে পারা যাবে, কিংবা কেবল খেলার মাঠেই অতিমানস এসে অবতরণ করবে, আর যারা সেখানে যাবে তারাই কেবল তাকে গ্রহণের সুযোগ পেতে পারবে; অন্তত আমার পক্ষে তা খুব খারাপ কথা হবে, কারণ আমি তো সেই সুযোগ হারাবো!

এত কথা লিখলাম আশ্চর্য রকমের ভুল ধারণাটা দূর করার জন্য, যা এখানকার আকাশে বাতাসে ঘন হয়ে উঠেছে আর যার দ্বারা তোমরাও কিছুটা আক্রান্ত হয়েছ।

২৭-৪-১৯৪৯

দেখতেই পাচ্ছ যে আমরা তোমাকে খেলার মধ্যে যোগ দেওয়াতে চাইছি বা তাই মেনে নিতে বলছি এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমি নিজে স্পোর্টস্‌ম্যান কোনো কালেই ছিলাম না---কেবল ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলা দেখা ও বরোদাতে ক্রিকেট ক্লাবের বসা-মেম্বর হওয়া ছাড়া---আর ব্যায়ামও কিছু বিশেষ করিনি, কেবল বরোদাতে এক মাদ্রাজী মল্লের কাছে শিখে দণ্ড-বৈঠক করা ছাড়া, তাও দরকার হয়েছিল অসুস্থ না হলেও দুর্বল ও ভঙ্গুর দেহে কিছু শক্তি সঞ্চয়ের জন্য,---কিন্তু তা ছাড়া ও জিনিসে কোনো গুরুত্বই কখনো দিইনি, আর তাও যা করেছিলাম তা অনাবশ্যক মনে হওয়াতেই ছেড়ে দিলাম। তবে ব্যায়াম করা অভ্যাসটা ধরা বা ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে আমার যোগের কোনো সংস্রব নেই, বা আমার তাতে কিছু যায় আসে না। আর তোমার ওতে অপছন্দ বা অন্যেদের ওতে পছন্দ কিনা তাই নিয়ে সাধনার কাজের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোনো ইতরবিশেষ হয় না, ওতে কেউ বেশি কেউ কম যোগ্য হয় না। সুতরাং আমরা কেনই বা তোমাকে ওর জন্য পীড়াপীড়ি করব আর তুমিই বা কেন তাই মনে করে নিয়ে এত চিন্তিত হবে। এ বিষয়ে সকলেই যেমন স্বাধীন, তুমিও তেমনি স্বাধীন থেকে নিজের মতে চলতে পারো।

২৮-৪-১৯৪৯

ভগবৎ উপলব্ধিই হলো একমাত্র কাম্য, আর অন্য যা কিছু দরকার তা ওরই সহায়ক হিসাবে, আর উপলব্ধি ঘটলে তখন তাকে অভিব্যক্ত করবার প্রয়োজনে। সমগ্র জীবনকেই ভগবৎ কর্মের অভিব্যক্তি ঘটাবার উপযোগী করতে হবে: প্রথমত, তার জন্য চাই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত

সাধনা এবং ঈশ্বরানুভূতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সম্মিলিত জীবন,---দ্বিতীয়ত, জগৎকে সেই দিকে ফিরতে ও তারই আলোতে অবস্থান করতে সাহায্য করা,---এই হলো আমার যোগের মোট কথা এবং একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু সব প্রথমে দরকার উপলব্ধি, আর যা কিছু করণীয় তা ঐ জিনিসকেই ঘিরে, নতুবা কিছুরই কিছু মানে হবে না। আমিও না আর মা-ও না, আমরা স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি যে ঐটিকে অবহেলা ক'রে অন্য কোনো দিকে মন দেবো। মায়ের প্রায় সারা দিনটাই কাটে ঐদিক দিয়ে নানা ভাবে সাধকদের সাহায্যদান করতে, আর বাকী সময়টা কাটে আশ্রম পরিচালনাতে, কারণ সেটাও ভগবানের কাজ, ফেলে রাখা যায় না। আর খেলার মাঠ প্রভৃতির ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে মা প্রথম থেকেই পরিষ্কার ক'রে বলেছেন ওগুলির স্থান কোথায়; মূল কাজকে ছোটো ক'রে কিংবা বাদ দিয়ে এই আনুষঙ্গিক জিনিসকে বড়ো ক'রে তুলবেন, মা এতখানি নির্বোধ নন।

৪-৪-১৯৫০

...প্রধান বিষয়টিতে আসবার আগে আমি অন্য প্রসঙ্গে একটা কথা পরিষ্কার ক'রে বলে নিতে চাই---বুলেটিনে যে প্রবন্ধ কিংবা বাণী আমি লিখেছি তাই নিয়ে; ওতে খানিকটা ভুলবোঝা ও ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছে তোমার মনে, বিশেষত দিব্য দেহ সম্বন্ধে আমার উক্তিটি নিয়ে। প্রথম প্রবন্ধে লিখেছি স্পোর্টকে কেন আশ্রমের কার্যতালিকার অন্তর্গত করা হবে, এবং পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছি যে স্পোর্ট জিনিসটা সাধনা নয়, ওটা তার নিম্নস্তরের জিনিস, কিন্তু তার প্রয়োজন কেবল আমোদপ্রমোদ বা স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্যই নয়, কিন্তু দেহকে সুপটু ক'রে তার বিশেষ কতকগুলি গুণ ও সামর্থ্য বাড়িয়ে দেবার জন্য, আর শুধু দেহেরই নয় কিন্তু মনেরও তেজ ও সুষ্ঠু সঙ্গতির ভাবকে বাড়াবার জন্য। তবে একথাও বলেছি যে ওর কার্যকারিতার একটা সীমা আছে, ঐসকল গুণকে অন্যরূপেও বাড়াতে পারা যায়। বস্তুত কেবল যোগ সাধনার দ্বারাই ঐরূপ সীমাবদ্ধ সাফল্যের চেয়ে আরো অনেক বেশি সাফল্য মেলে। বোধ করি এর মধ্যে ভুল বোঝার কথা খুব কমই ছিল,---কিন্তু মা আমাকে স্পোর্টের কথা ছাড়াও আরো

কিছু নিয়ে লিখতে বলেছিলেন, যেমন দিব্য দেহের ক্রম-বিবর্তনের সম্ভাবনার কথা; আর তাই নিয়ে লিখতে গিয়ে আমি অতিমানস ও ঋত-চেতনার প্রসঙ্গও এনে ফেলেছি, যার সঙ্গে স্পোর্টের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই। উদ্দেশ্যটা ছিল এই যে কেবল ব্যায়াম ক্রীড়ার ফিরিস্তি ছাড়াও কিছু উচ্চতর ও পড়্‌বার মতো কথাও যেন ওর সঙ্গে থাকে, যাতে পাঁচজনের কারো কারো কাছে তা মনোজ্ঞ হতে পারে। ঐ দিব্য দেহের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি সুদূর ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে বলেছিলাম যে আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা বিবর্তন ক্রিয়া কতদূর পর্যন্ত হওয়া সম্ভব, কিন্তু তা সম্প্রতির সম্ভাবনা আদৌ নয়, স্পষ্টই বলেছি যে আমাদের গোড়া থেকে শুরু করতে হবে, মাঝখান থেকে হঠাৎ কিছু করলে চলবে না। হয়তো বর্তমানেরই সীমা নিয়ে আরো কিছু বলা উচিত ছিল, এখন তা পরিষ্কার ক'রে বলি। আমার প্রচেষ্টার বর্তমান উদ্দেশ্য তাই যাতে পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়, আর তার জন্য প্রথমেই চাই ভগবৎ উপলব্ধি; তার পরেই জীবন পুরো আধ্যাত্মিক হয়ে উঠতে পারবে এবং যাকে বলেছি দিব্য জীবন তা সম্ভব হতে পারবে। জীবনের এইরূপ রূপান্তর ঘটলে তবেই শেষ পর্যন্ত যাকে বলেছি দিব্য দেহ তার সৃষ্টি হতে পারবে, যার সম্ভাবনা অনেক পরের বিবর্তনের শেষ পরিণাম স্বরূপ, সুতরাং ওতে এখন থেকে ভয় পেয়ে ভড়কাবার কোনো কারণ নেই। ওকে একটা মনের খেয়াল বলে ধরে নিতে পারো, যা হয়তো সুদূর ভবিষ্যতে একদিন সত্য হয়ে উঠবে।

এখন আসল কথাটায় আসি, অর্থাৎ মা যে মতলব করেছেন এবার সাধনার ও আধ্যাত্মিক প্রয়াসের সব কিছু কাজ থেকে সরে কেবল স্পোর্টের দিকেই স্থায়ীভাবে লাগবেন,—এ ধারণা মিথ্যা মরীচিকার মতো, ওর মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্য নেই। তিনি সন্ধ্যায় কেবল দু'ঘণ্টা বা কখনো তিন ঘণ্টার মতো খেলার মাঠে যান এবং নিজেও শারীরিক ব্যায়াম করেন—তাছাড়া ভোরের সময় থেকে রাত্রের অধিকাংশ সময় পর্যন্ত তিনি সাধনার কাজেই লেগে থাকেন—নিজের নয় কিন্তু সাধকদের সাধনা নিয়ে—তাদের প্রণাম, আশীর্বাদ দেওয়া, ধ্যানে বসা, সিঁড়ির কাছে বা অন্যত্র তাদের সাক্ষাৎ দেওয়া, কখনো কখনো একাদিক্রমে দুই ঘণ্টা ধরে তাদের বক্তব্য শোনা, সাধনা ঘটিত তাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া, তাদের কাজের কি ফল হচ্ছে তা জানা, তাদের নালিশের, দ্বন্দ্বের, ঝগড়ার মীমাংসা করা, কিসের জন্য কোথায় কি সম্মেলন বসবে তা স্থির করা—এমনি অফুরন্ত কাজের ফর্দ; এ ছাড়াও

আছে তাদের চিঠির জবাব দেওয়া, আশ্রমের বিভিন্ন বিভাগে কে কি কাজ করলে তার সমস্ত রিপোর্ট দেখা, বাইরের জগতে যাদের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটেছে তাদের নানারকম দায় অদায় বা গুরুতর আপদ বিপদের বৃত্তান্ত জেনে তাদের সাহায্য ও সান্ত্বনা ও মীমাংসার সন্ধান দিয়ে বহু চিঠিপত্র লেখা, ইত্যাদি অনেক কিছু। এগুলির মধ্যে স্পোর্টের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, আর ঐ সন্ধ্যার সময়টুকু ছাড়া তাই নিয়ে তাঁর ভাববারও সময় নেই। তাহলে অমন ধারণা আসার কোনো হেতুই ছিল না যে তিনি সাধকদের বা সাধনার সম্বন্ধে সকল চিন্তা ছেড়ে কেবল স্পোর্ট নিয়েই মেতেছেন, আর ঐ ধারণার মধ্যে আমাকেও বিলক্ষণ জড়ানো হয়েছে। কেবল এই বছরে পয়লা ও দোসরা ডিসেম্বরের আগে কিছু সময়ের জন্য ঐ দুদিনের বিশিষ্ট ফাংশন উপলক্ষে প্রোগ্রাম তৈরি করতে তাঁকে খাটতে হয়েছিল—যেমন তাঁর নিজের রচনা Vers l' Avenir বইটির অভিনয়, নত্যাভিনয়, Savitri থেকে আবৃত্তি ও Prayers and Meditations থেকে আবৃত্তি, এগুলি প্রথম দিনে, আর দ্বিতীয় দিনে নানারকমের খেলাধূলার ব্যবস্থা। এতে যথেষ্ট সময় দিতে হয়েছে বটে, তাতে কিন্তু শেষের দিকে দুই একটি বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে কাজের ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু এমনিই যে বরাবর চলবে আর আশ্রমের জীবনধারা বদলে যাবে এমন মনে করার, অথবা আধ্যাত্মিক জীবন ছেড়ে স্পোর্ট দেবতারই স্থায়ী পূজক হতে হবে এমন কথা ভেবে নেবার কোনোই কারণ ছিল না। যারা এমন কথা বলেছে যে এবার থেকে স্পোর্টে যোগ দিতে সকলকেই বাধ্য করা হবে তারা তা বলেছে নিজেদের কল্পনা থেকে যা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যাই হোক দোসরা ডিসেম্বরের পর থেকে সব আবার স্বাভাবিক হয়েছে, এমন কি খেলার মাঠেও সব ঠাণ্ডা, সুতরাং এখন সেই কথা বলা যেতে পারে যে "একদিন যা হয় সবদিন তা নয়"।

কিন্তু তবু সেই কথাটা রয়ে গেল যে প্রত্যেক সাধককেই স্পোর্টস্‌ম্যান হতে হবে, নতুবা মায়ের স্নেহ দয়া পাবে না। এখানে তাহলে সেই কথাই আমাকে আবার খুব জোর দিয়ে বলতে হয় যা বলেছিলাম সেই রটনার সময় যে অতিমানস কেবল খেলার মাঠেই নামবে আর সেখানে যারা থাকবে কেবল তারাই তার স্পর্শ পাবে—সুতরাং আমাকে বাদ দিয়ে! তাই আবার বলি, মায়ের মনে কখনো অমন ভাব হয়নি আর কাউকেই তিনি বাধ্য করতে চান না। ইচ্ছা না থাকলে তোমাকেও না আর অন্য কাউকেও

না। বহু জন রয়েছে যারা তাঁর খুবই প্রিয়, যারা উৎকৃষ্ট কর্মী ও সেবক, সর্বক্ষণ যারা কাছে কাছে থাকে, অথচ কখনো তারা খেলার মাঠে পদার্পণ করেনি। সুতরাং খেলা যাদের মনঃপূত নয় তারা যে তার জন্য মায়ের স্নেহ ভালোবাসা হারাবে এমন কথাই হতে পারে না; মাল যেমন ধাতু সে তারই মতো হবে, আর কিছু নয়। যে কেউ মায়ের ইচ্ছাকে ব্যক্ত করবার অধিকার পেয়েছে মনে ক'রে এইরূপ কথা বলবে যে এখন থেকে স্পোর্ট জিনিসটাকেই মা সব চেয়ে গুরুত্ব দেবেন এবং সাধনার পক্ষে তা অপরিহার্য হবে, সে যতই বড়ো হোক তার কথা অসম্ভব ও অযৌক্তিক।

৬-১২-১৯৪৯

নীরবতা ও সক্রিয়তা

প্র ঃ ভাষা শিখতে গেলে মনকে সক্রিয় হতে হয়। যোগে তো মনকে নীরব করা দরকার কেবল ভগবানেরই দিকে তাকে নিযুক্ত রেখে?

উ ঃ যে মনকে নীরব করবে সে কি কোনো কাজই করবে না? তাহলে আমার কিংবা মায়ের কিংবা এখানকার কারোই তো নীরব মন নয়।

৬-৪-১৯৩৭

সংবাদপত্র পড়া

প্র ঃ সাধনা করতে হলে কি সংবাদপত্র পড়া ছাড়তে হবে? আমি দেখি যে সকলেই সংবাদপত্র পড়ে, এমন কি আপনিও পড়েন। না পড়লে কোনো খবর জানা যায় না।

উ ঃ ওটা তোমার নিজের অবস্থার উপর নির্ভর করে। এ-সম্বন্ধে কোনো সাধারণ নিয়ম নেই। আমি কাগজ পড়ি, কিন্তু মা পড়েন না, কেউ

কিছু পড়তে বললে তখন পড়েন। ক যে একবছর কাগজ পড়া বন্ধ রেখে-ছিল তা ভালোই করেছিল। মনকে যদি বিচলিত করে তাহলে ওটা বাদ দেওয়াই ভালো। তবে যদি কেউ সাধনাতে ধীরগতিতে এগিয়ে চলে, ভিতরে বিশেষ কোনো তাগিদ থাকে না, সেখানে কাগজ পড়লে কোনো ক্ষতি হয় না। অপর পক্ষে যদি কাগজ পড়াতে আভ্যন্তরীণ চেতনার মধ্যে কোনো আলোড়ন জন্মায় না (যেমন অন্যমনস্কতা, বাহ্যমনস্কতা ইত্যাদি) সেখানে কাগজ পড়া যেতে পারে। আমি কাগজ পড়ি কারণ আমি জানতে চাই কোথায় কি ঘটনা ঘটছে যেটার সঙ্গে আমার কাজের সংযোগ থাকতে পারে। কেবল পড়ার জন্যই পড়ি না।

৯-৭-১৯৩৬

এই যোগের একমাত্র মন্ত্র

সাধারণত এখানকার যোগের সাধনাতে মায়ের কিংবা আমার ও মায়ের নামই মন্ত্র। চেতনাকে হৃদয়ে কিংবা মস্তকে দুই স্থানেই একাগ্র করা যায় ——প্রত্যেকটির বিভিন্ন ফল। হৃদয়ে কেন্দ্রীভূত হলে আসে ভক্তি, প্রেম, মায়ের সঙ্গে মিলন, হৃদয়ে তাঁর উপস্থিতি, প্রকৃতির উপর তাঁর শক্তির ক্রিয়া। আর মস্তকে কেন্দ্রীভূত হলে আসে আত্মোপলব্ধি, মস্তকোত্তীর্ণ চেতনা লাভ, দেহ ছেড়ে উচ্চ চেতনাতে উত্তরণ, দেহের মধ্যে উচ্চ চেতনার অবতরণ।

১৩-১০-১৯৩৪

প্র ঃ যখন মাকে স্বপ্নে ডাকি তখন তাঁর শক্তির ক্রিয়াতে আর যখন বলি 'শ্রীঅরবিন্দ-মীরা' তার ক্রিয়াতে কোনো তফাৎ আছে কি?

উঃ তেমন কিছু তফাৎ নেই। মায়ের নামেই রয়েছে সম্পূর্ণ শক্তি; তবে দুজনের নামে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ ফল হতে পারে।

মন্ত্র

ওঁ শ্রীঅরবিন্দ মীরা।

আমার মনকে, আমার হৃদয়কে, আমার জীবনকে যেন তোমাদের আলোতে, তোমাদের শক্তি ও তোমাদের প্রেমের দিকে উন্মীলিত করে। সব কিছুতে যেন আমি ভগবৎ সাক্ষাৎ লাভ করি।

১৬-৭-১৯৩৮

আশ্রমের সম্প্রসারণ

> প্র ঃ যদি আশ্রম বাড়তে থাকে আর পণ্ডিচেরীতে বাড়ী না পাওয়া যায়, তাহলে আশপাশের গ্রামে বোধ হয় ছড়িয়ে পড়তে হবে ?

উ ঃ কয়েকবছর আগে সে রকম কথাই ভাবা হচ্ছিল, কিন্তু পরিস্থিতি অন্য দিকে ঘুরে যায়, এবং ঐ প্রস্তাবটিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা হয়নি।

১৪-৪-১৯৩৫

আধ্যাত্মিক মাতৃত্বের যথার্থতা--সব রকম ধর্মান্ধতার অসারতা

তুমি যদি স্পষ্ট সত্য কথা জানতে চাও, তাহলে বলি যে তুমি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছ, এবং এক বিরুদ্ধ শক্তি, যা অবিদ্যা ও বিশৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে, তার হাতে পড়েছ। তোমার অপরিণত চিন্তাশক্তি একটি মহান সত্য ও জ্ঞানের বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করছে। মিথ্যা যুক্তিজালে তোমার মন এমনই জড়িয়ে গেছে যে, সেটি সম্পূর্ণভাবে বিপর্যাস্ত ও দিশাহারা হয়ে গেছে এবং সত্য মিথ্যার বিভেদ ভুলে গেছে। তুমি যা কিছু বলছ বা করছ তা থেকে এটাই স্পষ্ট বোঝা যায়--এটা সত্য বা ধর্ম নয়, কিন্তু তোমার বিপর্য্যস্ত দুর্বল মনের অপরিণত ধারণা যেটা তুমি অপরদের উপর জোর করে চাপাবার চেষ্টা করছ।

তুমি আমাকে যে চিঠি লিখেছ সেটা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে তুমি অতি সাধারণ বিচার, বিভেদ বা সত্য বুঝতে অক্ষম। যাঁর গর্ভে 'ক'র জন্ম, তিনি তাঁর জীবিতকালে পার্থিব হিসাবে 'ক'র মা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু শ্রীমা ও 'ক'র বা অন্যান্য লোকেরা যাঁরা তাঁকে স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সম্পর্কটা হোল চৈত্যিক বা আধ্যাত্মিক। এই সম্পর্ক পার্থিব জগতে গর্ভধারিণী মা ও তাঁর ছেলের মধ্যে যা সম্পর্ক তার চেয়েও মহত্তর। গর্ভধারিণী মা যা দিতে পারেন, শ্রীমা তাতো দিতেই পারেন, এবং আরও বিশদভাবে, আর এই সম্পর্কে বিরাট সম্ভাবনাও অন্তঃনিহিত। এই সম্পর্ক আরও মহত্তর পরিপূর্ণতর বলে, গর্ভধারিণী মা ও ছেলের সম্পর্কের স্থান নিতে পারে অন্তরের ও বাই-রের দুই জীবনেই। যার সাধারণ বিচারবিবেচনা বা সরল বুদ্ধি আছে, তার এতে বিভ্রান্ত হবার কোনও অবকাশ নেই। পার্থিব সম্পর্ক এই চৈত্যিক আধ্যাত্মিক সত্যের অন্তরায় হতে পারে না, বা অস্বীকার করতে পারে না। ক ঠিকই বলেছে যে শ্রীমাই তার সত্যিকারের মা---কেননা শ্রীমা তাকে নতুন জীবন দিয়েছেন অন্তরে, এবং দিব্য জীবনের জন্য প্রস্তুত করছেন।

আধ্যাত্মিক মাতৃত্ব এই আশ্রমের আবিষ্কার নয়। এটি একটি চিরন্তন সত্য, যা যুগ যুগ ধরে ইউরোপ ও এশিয়ায় স্বীকৃত হয়ে এসেছে। পার্থিব সম্পর্ক ও চৈত্যিক বা আধ্যাত্মিক সম্পর্কের মধ্যে যে প্রভেদ আমি দেখি-য়েছি, সেটিও একটি নতুন আবিষ্কার নয়---এটিও সর্বত্র লোকে জানে বা বোঝে, এবং খুবই সাধারণ কথা। তোমার মানসিক বিভ্রান্তির জন্যই তুমি এই সহজ সরল সত্যটি বুঝতে পারছ না।

'ক' ও 'খ'র উপর তোমার কোনও দাবী থাকতে পারে না, তাদের কাজ বা চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করবার তোমার কোনও অধিকার নেই। 'ক'র যা বয়স হয়েছে তাতে সে নিজেই ভাবতে বা কাজ করতে পারে, এবং তার জন্য তোমার মাথাব্যথার কোনও প্রয়োজন নেই। তুমি তার বা 'খ'র অভিভাবক নও, এমনকি তুমি পরিবারের কর্তাও নও। কোন অধিকারে তুমি ঠিক করতে চাও যে সে কোথায় যাবে বা থাকবে? ভগ-বানের কাছে 'ক' বা 'খ'র দায়িত্ব যে তোমার এই ধারণা অহমিকার পরি-চায়ক ও একদম বাজে। ভগবানের কাছে প্রত্যেকেই নিজের নিজের জন্য দায়ী, যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ, বিশ্বস্ত কারও উপর, স্বেচ্ছায় সেই দায়িত্ব চাপায়। কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তার কাছে গুরু হিসাবে নিজেকে খাড়া করার

অধিকার কারোও নেই। 'ক' বা 'খ'র বাইরের বা অন্তরের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার কোনও অধিকার তোমার নেই। তোমার মানসিক বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার জন্যই তুমি এই সব সহজ সরল সত্যকে স্বীকার করতে পারছ না।

তুমি আরও বলেছ যে তুমি শুধু সত্যকেই চাও। কিন্তু তুমি যা বলছ তা খুব সঙ্কীর্ণ-চেতা মূর্খ পাগলের মত---যে পাগল উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধর্ম ছাড়া অন্য কিছুকে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নয়। সব রকম ধর্মান্ধতাই মিথ্যে, সত্যের বা ভগবানের স্বরূপের প্রতিকূল ওটা। সত্যকে, কোনও পুস্তক-বিশেষে, তা সে বাইবেলই হোক্, বেদ বা কোরাণই হোক্ না কেন, বা ধর্মবিশেষে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না। ভগবান নিত্য, অসীম, চরাচর পরিব্যাপ্ত, মুসলমানদের, বা সেমিটিক ধর্মমতের নিজস্ব সম্পত্তি নয়, যেসব ধর্মগুলি বাইবেলের সঙ্গে একই শ্রেণীভুক্ত, বা ইহুদি ও আরবদেশীয় পয়গম্বর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুদের, কনফুসিয়ানদের, তাও মতাবলম্বীদের, বা আর সকলের, নিজের নিজের ভাবে, ভগবানকে পাবার, বা সত্য আবিষ্কারের, সমান অধিকার আছে। প্রতিটি ধর্মমতের ভিতরে কিছু না কিছু সত্য নিহিত আছে, কিন্তু পরিপূর্ণভাবে নয়। প্রতিটি ধর্মই কালে জন্মায় ও লয় পায়। মহম্মদ নিজে কখনও এ দাবী করেননি যে কোরাণই ভগবানের শেষ বাণী, এবং আর কোনও বাণী আসবে না। ভগবানের বা সত্যের, এই সব ধর্মমত বিনষ্ট হবার পরও, অস্তিত্ব থাকে, এবং নতুন ভাবে, নতুন রূপে প্রকাশিত হয়। তোমার সীমাবদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে ভগবানকে বন্দী করে রাখতে পার না, বা তুমি ভগবৎ শক্তি বা চেতনাকে হুকুম করতে পার না, কিভাবে, কোথায় বা কার ভিতর দিয়ে সেটি প্রকাশিত হবে। ভগবানের সার্বভৌমত্বকে বেড়া দিয়ে আটকাতে পার না। এই সব অতি সাধারণ সত্য পৃথিবীর সর্বত্রই স্বীকৃত হচ্ছে, মন যাদের অপরিণত, বা আদিযুগের কোনও ধারণাতে যারা আচ্ছন্ন তারাই এসব স্বীকার করে না।

তুমি আমার জবাব দাবী করেছিলে, এবং যা সত্য তা জানতে চেয়েছিলে, তাই এই সব লিখলাম, তুমি যদি মুসলমান হতে চাও, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। যে সত্যকে আমি নামিয়ে আনছি, তা বোঝবার বা গ্রহণ করবার মত শক্তি যদি তোমার না থাকে, তুমি যেখানে খুসী যেতে পারো, এবং অর্দ্ধ-সত্যে বা অজ্ঞানতায় বাস করতে পারো। কারোও উপর জোর করে নিজের মত চাপিয়ে দেবার জন্য, আমি এখানে আসিনি---আমি কাকেও

ডাকিনি আমার কাছে আসবার জন্য, বা ডাকবও না। যারা নিজেদের মধ্যে আমার কাছে আসবার জন্য তাগিদ পেয়েছে এবং আমার প্রদর্শিত পথ আঁকড়ে রয়েছে, কেবলমাত্র তাদের মধ্যে ভাগবত জীবন বা ভাগবতী চেতনা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই আমি এখানে আছি। আমি বা শ্রীমা তোমাকে বলছি না যে আমাদের আনুগত্য স্বীকার করো। তুমি যে কোনও দিন চলে যেতে পারো, এবং সাংসারিক জীবন, বা তোমার নিজের পছন্দ-মত ধর্মীয় জীবন যাপন করতে পারো। কিন্তু তোমার যে স্বাধীনতা আছে, সেই স্বাধীনতা অপরদেরও আছে এখানে থাকবার এবং নিজের মতে চল-বার। অপরের বিরক্তি উৎপাদনের কেন্দ্র হিসাবে, বা তাদের শান্তির ও আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় হিসাবে থাকবার কোনও অধিকার তোমার নেই।

তোমাকে লিখতে গিয়ে যে আসুরিক অবিদ্যার শক্তি নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য তোমাকে অপব্যবহার করছে এবং তোমার মনের ভিতর ঐসব ধারণা ঢুকিয়েছে, তাকেই জবাব দিচ্ছি। এটা সহজেই বোঝা যায় যে এই শক্তি দিব্য শক্তি নয়। এটি মিথ্যারই শক্তি যা তোমাকে দিয়ে অনেক বাজে জিনিস বলাচ্ছে বা করাচ্ছে, যার সঙ্গে ইসলাম ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই বা যা ইসলাম ধর্ম বা কর্মের অপভ্রংশ। এই শক্তি চায় শুধু ইসলাম ধর্মকে নয়, সব ধর্মকে বা আধ্যাত্মিকতাকে, তোমার মাধ্যমে হেয় করা। পৃথিবীতে ভগবানের কাজকে ব্যাহত করতে এ চায়, যতটুকুই তা হোক না কেন। এ চেষ্টা করছে তোমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাতে, তোমাকে দিয়ে বোকার মত কথা বলাতে বা কাজ করাতে, তোমার বন্ধুবান্ধবদের বা শুভানুধ্যায়ী-দের কাছে তোমাকে কৃপার পাত্র করতে, অপরদের কাছে হাস্যাস্পদ করতে। তোমার যদি এতটুকু আত্মসম্মানজ্ঞান থাকে, ভগবান বা ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, তুমি যদি সত্যিই সত্য বা আলোর সন্ধানী হও, তুমি যদি তোমার আত্মার স্ফুরণ বা মুক্তি চাও, তাহলে তোমাকে এই সব বাজে কথা বলা বা কাজ করা বন্ধ করতে হবে, যে শক্তি তোমাকে এখন পরিচালিত করছে, তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

২৩-১০-১৯২৯

প্রত্যেকেরই সাধনা করবার এবং ভগবানের কাছে যাবার নিজস্ব পন্থা আছে; কাজেই অপরে কিভাবে সাধনা করছে, সেই নিয়ে বিব্রত না হলেও চলবে। তাদের সাফল্য, অসাফল্য, অসুবিধা, ভুলভ্রান্তি, অহমিকা, গর্ব সব মা-ই দেখবেন। অসীম তাঁর ধৈর্য্য, কিন্তু তার মানে [illegible] নয় যে তিনি তাদের দোষ-ত্রুটি পছন্দ করেন, বা তারা যা কিছু করছে বা বলছে সবই তিনি অনুমোদন করেন। মা ঝগড়া-ঝাটি, শত্রুতা, বিবাদ-বিসম্বাদের কোনও পক্ষ অবলম্বন করেন না---কিন্তু তিনি চুপ করে থাকেন বলে এটা মনে করা ঠিক হবে না যে তিনি তারা যা বলে বা করে, তা অন্যায় হলেও তিনি সমর্থন করেন। আশ্রমে বা আধ্যাত্মিক জীবনে কেউ খুব বড় বলে মনে করার কারণ নেই বা এটা একটা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নয় যেখানে কেউ নিজেকে অপরের চেয়ে বড় বলে মনে করতে পারে। সাধারণ পৃথিবীর ক্ষেত্রেই এগুলি প্রযোজ্য, কিন্তু সাধারণতঃ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও লোকে এটাকে টেনে আনে, কিন্তু সেখানে এটা সত্য নয়। মা সকলকেই সহ্য করেন--- সাধকরা পরস্পরের যে সমালোচনা করে, তা তিনি বন্ধ করেন না, কিন্তু এই সমালোচনার কোন মূল্যও তিনি দেন না। যখন সাধকরা বুঝতে পারবে যে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এসব জিনিসের কোনও দাম নেই, তখনই এসব বন্ধ হবে বলে আশা করি।

এসবের মধ্যে এমন কিছু নেই যার জন্যে কাকেও আধ্যাত্মিক জীবন ছেড়ে দিতে হবে বা গুরুর কাছ থেকে চলে যেতে হবে। আমার মনে হয় একমাত্র গুরুই ঠিক বলতে পারেন কেউ উপযুক্ত কিনা। এই বিষয়ে অন্য কারও বিপরীত মত নেওয়া বোকামি এবং সেই মত অনুসারে কাজ করা নিজের আত্মার অপমান। নিজেই নিজেকে অনুপযুক্ত বিচার করা ও সেই অনুসারে কাজ করা খুবই বিপদজনক---কেননা এরকম সিদ্ধান্ত অবসাদ থেকে বা প্রাণ-জগতের কোনও বিপর্যয় থেকে আসতে পারে। তুমি সাধনায় অগ্রসর হতে পারবে এটা যদি না বুঝতাম, বা সাধনায় তোমার উন্নতি যদি না দেখতাম, তাহলে তোমাকে এখানে থাকবার জন্য বারংবার অনুরোধ করতাম না বা চিঠির পর চিঠি লিখতাম না (যা আমি আর কাকেও লিখি না) তোমার অসুবিধা দূর করবার জন্য।

যাকে অপছন্দ করার জন্য তুমি আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে চাইছ, তুমি কি মনে করো যে মা এতোই বোকা বা অন্ধ যে তিনি লোকেদের বা তাদের সাধনার মূল্য দেন তাদের নিজেদের মূল্যায়নে? যে তিনি যেমন তাদের

গুণ দেখেন, তেমনি তাদের দোষত্রুটি তাঁর চোখে পড়ে না? বা তিনি তাদের নিম্ন প্রকৃতির খেলা সম্বন্ধে অন্ধ? বা তারা তাঁকে ঠকাতে, বা পরিচালনা করতে পারে?

সরাসরি যোগাযোগ

প্র: 'ক' আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে সরাসরি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভবপর কিনা, আপনার নির্দেশ পাবার জন্য, যাতে চিঠি লেখার প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না। আমি বলেছিলাম যে যতক্ষণ না সে টেলিপাথির ও অন্তরে জবাব পাওয়ার ক্ষমতা আয়ত্ত করছে, ততক্ষণ সম্ভবপর নয়। সে ক্ষেত্রেও, যতক্ষণ পর্যন্ত চৈত্যপুরুষ চেতনায় স্বাধিকার বিস্তার না করছে, ততক্ষণ অস্পষ্টতা বা বৈপরীত্য আসতে পারে। এমনকি চৈত্যপুরুষ সম্পূর্ণভাবে চালিত করলেও সবকিছুই ভিতর থেকে জানা যাবে না, যেমন অধিমানস বা অতিমানসের অবস্থার অনুভূতিসমূহ—কেননা চৈত্য-পুরুষের সে সব জানবার কোনও উপায় নেই। কাজেই চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতেই হবে। কিন্তু মনে হয় যে যদি কেউ যার চেতনার সঙ্গে নিজের চেতনাকে একেবারে মিশিয়ে দিতে পারে, তাহলে হয়তো চিঠিপত্রের দরকার হবে না। কিন্তু যার অধিচেতনায় সিদ্ধি হয়েছে, তার পক্ষে কি এরকম চেতনার মিলন সম্ভব?

উ: আমার মনে হয় ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে অতিমানসের অবতরণ না ঘটলে এরকম অবস্থা সম্ভবপর নয়। চৈত্যপুরুষ এরকম ক্ষেত্রে অনেকটা কাজ করতে পারে, যদি তা পুরো অধিকার পায়। অধিমানস বা বোধি নিজের নিজের ক্ষেত্রে এ কাজ করতে পারে, কিন্তু যে জিনিস তুমি চাইছ, সেখানে একেবারে পার্থিব চেতনায় নেমে আসতে হয়, এবং সেই চেতনায় অস্পষ্টতা, বা মন-প্রাণের বাধা দেয়।

২৭-৫-১৯৩৪

ভুল উদ্দেশ্য আরোপ করা

তুমি অনেক কিছু উদ্দেশ্য আরোপ করছ---যথা, মা প্রথমে প্রাণসত্ত্বাকে খেলতে দিয়ে তাকে বশীভূত করেন। তাঁর এরকম কোনও উদ্দেশ্য নেই। তিনি প্রাণসত্ত্বার সঙ্গে সহজ সরলভাবে ব্যবহার করেন---যেটুকু পরিবর্তন দেখা যায় তা হচ্ছে তাঁর কাজ দেখে প্রাণসত্ত্বার যে রকম ধারণা হয়, ঠিক কাজের সম্বন্ধে ধারণা নয়---অবশ্য চেতনায় পরিবর্তন আসার সঙ্গে যে পরিবর্তন আসে তার কথা বলছি না। পূর্বে তুমি যা লিখতে তার বেশীর ভাগই আসত তোমার মনের উচ্চস্তর থেকে, এবং কিছুটা প্রাণের স্তর থেকে---তোমার প্রাণসত্ত্বা আমার জবাবে সন্তুষ্ট হ'ত না, কাজেই আমি তার জবাব দিতাম না, শুধু লিখতাম সেই সব যাতে তোমার মনের উচ্চস্তর ও চৈত্যপুরুষ সাহায্য পায়। এখন তুমি তোমার পার্থিব মনের বা প্রাণের স্তর থেকে লিখছ, এবং আমার জবাব যাচ্ছে তাদের কাছেই, তাদের মনোমত জবাব বা আদরের ভাষা পাচ্ছে না বলে তাদের ধারণা। কিন্তু তাদের সন্তুষ্ট করতে গেলে সেটা তোমার সাধনার অনুকূল হবে না।

৯-১২-১৯৩৫

অন্তরে উপস্থিতি

আনন্দে থাকো, বিশ্বাস রাখো। সন্দেহ, বাসনা প্রভৃতি থাকবেই, কিন্তু স্বয়ং ভগবানও তোমার মধ্যে আছেন। চোখ খুলে রাখো, তাকাও, শুধু তাকাও, যতক্ষণ পর্যন্ত না আবরণ ছিন্ন হয়, এবং ভগবান বা ভগবতীকে দেখতে পাও।

৩০-১২-১৯৩৩

* * * *